যৌবন

সূচীপত্র

ছোট গল্প

ভূতের গল্প

গোয়েন্দা গল্প ও অ্যাডভেঞ্চার

হাসির গল্প

রূপকথা

বিজ্ঞান নির্ভর রচনা

রম্য রচনা

খেলা নিয়ে লেখা

ছড়া ও কবিতা

উদ্বোধন

'বোধন' নামে এই সংকলনের পরিকল্পনা একেবারেই আকস্মিক। খ্যাতনামা লেখকদের নতুন লেখা দিয়ে ছোটদের জন্য একটা সংকলন করার কল্পনা কিন্তু একেবারে আনকোরা নয়। বরং বলা চলে সেই কল্পনার সূত্র হতেই এই পরিকল্পনার জন্ম। হঠাৎই একদিন মনে হয়, যাদের জন্য এই সংকলন তাদের পছন্দসই লেখক কারা? এই মনে হওয়া বা ভাবনা থেকেই নানা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে সরাসরি জানতে চাওয়া—ছোটরা কোন্ কোন্ লেখকের লেখা পড়তে চায়, কোন্ কোন্ কবির কবিতা বা ছড়াদারের ছড়া? এবং দেখতে চায় প্রথিতযশা কোন্ কোন্ শিল্পীর আঁকা ছবি?

মনে অবশ্য সন্দেহ ছিল ছোটরা সাড়া দেবে তো! কিন্তু—

কিন্তু বিস্মিত। অজস্র পত্র আসে ছোট পড়ুয়াদের হাতের। এক-একজনের কী বিরাট নামের ফর্দ। খুবই উৎসাহিত হই। তাই সেই ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ছোটদের আর্জি নিয়ে বড়ো লিখিয়েদের দরবারে পেশ করি।

আবার বিস্ময়। নতুন এই প্রচেষ্টায় সব লিখিয়েই সমর্থন জানান। ছোটদের জন্য কলম ধরেন তাঁরা। তারই ফলশ্রুতি এই সংকলন— ছোটদের ইচ্ছেপূরণ সংকলন!

যে কোন সংকলনের লেখক নির্বাচন করেন সম্পাদক অথবা সম্পাদক মণ্ডলী। এই প্রথাই তো এতোদিন ধরে চলে আসছে। এবারে এর ব্যতিক্রম। বলতে গেলে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন। সম্ভবত বাংলা-সাহিত্যে এই প্রথম।

প্রথম প্রয়াস হলেই যে সফল হবে এমন কোন কথা নেই। বরং না হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে অধিক। তবু নতুন পথে যাত্রা শুরু। এতেও তো আনন্দ। নিছক নতুন কিছু করার উন্মাদনা আছেই।

যাত্রা-পথে পদে পদে বাধা না এলেও সুশ্রী-মসৃণ পথ নিশ্চয়ই নয়। তবু শেষ পর্যন্ত শেষ সীমায় পৌঁছানো গেল।
পড়ুয়াদের পছন্দসই লিখিয়েদের লেখায় ভরপুর হয়ে এই ইচ্ছেপূরণ সংকলন তাদের হাতে পড়ল।

ওই যে আগে বললাম, বিজ্ঞাপন দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম কার কার লেখা ছোটরা বেশি পছন্দ করে, তাতে যে-সব নাম এসেছে তার মধ্যে বিশেষ একজন—শিবরাম চক্রবর্তী।
বোধন-এর ভাগ্য ভাল যে, সদ্যপ্রয়াত শিবরাম চক্রবর্তীর শেষ লেখাটি (অসমাপ্ত) পাঠকদের দিতে পেরেছি। তবে দুঃখ, শিবরাম জেনে যেতে পারলেন না, এখনও তিনি ছোটদের কাছে কতো প্রিয় ছিলেন। প্রিয় লোক আরও অনেকেই। সবার লেখা দিয়েই ভরে উঠেছে এই বোধন।

'বোধন' শব্দটির অনেক অর্থ—জ্ঞান বা বোধ; জ্ঞানদান বা বোধ সম্পাদন; উদ্বোধন; উদ্দীপন বা প্রজ্বলন; সন্দীপন বা উৎসাহিত করা; জাগরণ; জাগানো বা নিদ্রাভঙ্গ করণ এবং শারদীয় দুর্গাপূজার আগে দেবীর জাগরণ সম্পাদন প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপ।
আমরা সাধারণত 'বোধন' বলতে শেষের এই বিশেষ অর্থই বুঝি এবং প্রয়োগ করি। এই বিশেষ অর্থটি তো বটেই এবং আর সব অর্থও এই সংকলন-এর ভিতর দিয়ে ছোটদের কাছে অর্থবহ হবে—এই আশা আর বিশ্বাস নিয়েই তাদের হাতে বোধন তুলে দেওয়া। অর্থাৎ এখানেই বোধন-এর প্রকৃত উদ্বোধন।

মনোজ দত্ত

শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ ১

অপ্রকাশিত কবিতা

শিবনাথ শাস্ত্রী

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আমি এই ভিক্ষা চাই।
সত্য ধনমান চাহেনা এ প্রাণ
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই ;
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঈশ্বর।
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব।
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

সতা সাঁই এর সৌজন্যে
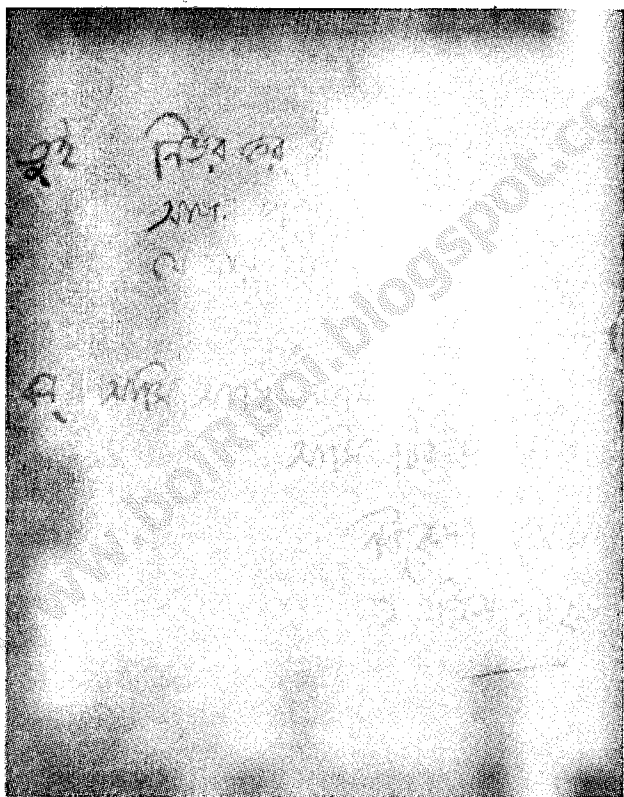
অপ্রকাশিত কবিতা

নজরুল ইস্‌লাম

তুই নির্ভর কর্ আপনার 'পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্,
যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল্,
'আমার হয়নি লয়'।
বল্ আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম,
আমি চির-দুর্জ্জয়।

১লা এপ্রিল ১৯২৬

হাত সাফাইয়ে হদ্দ !

॥ অসমাপ্ত গল্প ॥

শিবরাম চক্রবর্তী

হাত সাফাইয়ের কাজটা, এক কথায়, দারুণ! একেবারে যৎপরোনাস্তি!

তারপরে সব কিছুই বিলকুল নাস্তি হয়ে যায় বলতে পারি।

মনি ব্যাগের জায়গাটা ফাঁক দেখার সাথে সাথে গোটা দুনিয়াটাই যেন গায়েব!

ব্যাগ গেল তো সব ব্যগ্রতাও গেল। কিছুই করার নেই তখন আর। কোথাও যাবার নেই, কিছু পাবার নেই, এমন কি ভালোমন্দ এটা সেটা খাবার বাঞ্ছাও যেন চলে যায়।

হাত সাফানো না বলে সাফ হাতানোই বলতে পারি ব্যাপারটাকে···অবশ্যি হাত সাফানোর গল্প শোনা ছিল দেদার,

কিন্তু সে ব্যাপারে এমন সাফ হাতানো যে কারো হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না আমার।

যেমন অদ্ভুত, তেমনি মজবুত হাত!

মৌচাকে কতকগুলো গল্প বেচে তার দক্ষিণা নিয়ে পাশের গোলদিঘিতে গিয়ে বসেছি। টাকাগুলো বুক পকেটে যেন উপচে পড়ছিল! সেই উপচীয়মান টাকাটা নিয়ে কী করা যায়—ভাবছিলাম সেই কথাই।

এই সময়ে এক ভদ্রলোক গোলদিঘিতে চক্কর মারছিলেন। আমার ভাবুক দশা কি বুকের দশা কী দেখে জানিনে, আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

'টাকাগুলো সাবধানে রাখুন মশাই!' বললেন তিনি। আমি কিছু না বলে কেবল সপ্রশ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছি। তিনি বললেন, 'না না! দিতে হবে না। নোটগুলোর নম্বর—সব বলুন তো আমায়।'

নোট নয়, নোটের নম্বর! শুনে আমার অবাক হবার কথাই। তিনি বিশদ হলেন তারপর।

একশো টাকার নোটের নম্বর সংগ্রহ করা আমার একটা হবি, এক রকমের বাতিক বলতে পারেন।

একটু হবাক হলেও, সত্যি বলতে অবাক হবার কিছু ছিল না। কতো রকমের তো হবি হতে পারে মানুষের।

হবিষ্যির ওপরে কোনো কথা চলে না। অতি অবিশ্যি সেটা পালনীয়।

বলতে বলতে তিনি প্ল্যাসটিকের একটি ব্যাগ বার করলেন পকেট থেকে।

'প্ল্যাসটিকের এই পার্সটা আপনি নিতে পারেন। আমার কোন কাজে লাগছে না।'

মনি ব্যাগটা তিনি আমার হাতে দিলেন—একটু ব্যগ্র হয়েই বলতে কি!

নোটগুলোর নম্বর আমি বলে গেলাম। তাঁর পকেট বইয়ে তিনি টুকে রাখলেন বেশ আগ্রহভরে।

কাঁকনবতী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লো বেঙ্গমা ও বেঙ্গমী
জান কি জান না—
গো নিবাসিন্দা বেঙ্গমা—
কঙ্কাবতীর ঘরখানা, আছে কি তোমার জানা ?
ওগো বাসিন্দা বেঙ্গমী,
জান কি জান নি—কোন পাড়ায় তার ঘরখানি ?

কোন দেশে কোনখানেতে ছিল সে
কে জানে রে কে জানে ?
ছিল কি আছে বা কে জানে ?
নামটি তার কঙ্কনবতী, কেউ বা কয় কাঁকনবতী
কাঁকইবতী কপালে টিপ—
ইহার অধিক না জানি
—লো বেঙ্গমা বেঙ্গমী !
হয়তো বা সে লুকিয়ে আছে
বনের কোণে এইখানে,

দীঘির পারে সেই গ্রামে
আমবাগানের ছায়ার পাশে—যায় আসে
সকাল সাঁঝে রোদ যেখানে রোজই নামে
প্রথম আর শেষের যামে।

একটি বার চায় সে থামে গো
ঘরবাসিন মন উদাসীন
চেয়ে অচিন আকাশ পারে—

কে জানে লো বেঙ্গমা গো বেঙ্গমী
—কে জানে ?
হয়তো বা আছে হয়তো বা নাই,
আলোছায়ার মায়াই শুধু
ও সে আছে কি নাই

ঐখানে কি, সেইখানে কি, এই গানে—
কে জানে গো, কে জানে॥

প্রিয় কুকুরের কাহিনী

অন্নদাশঙ্কর রায়

বোঝে নাকো ইংরেজী
বোঝে নাকো হিন্দী
বাংলা শেখাই ওকে
তাই বোঝে বিন্দি।
ওর দুই বোন ছিল
ইন্দি ও সিন্দি।
ইন্দি ও সিন্দি
কোথায় কে জানে!
বিন্দিকে আনা হয়
আমার এখানে।
ভুটিয়া কুকুরছানা
বেশ পোষ মানে।
যখনি বেড়াতে নিই
যাবেই সে আগে।
উৎসাহে চনমন
লাফ দিয়ে ভাগে।
পাড়ার কুকুরদের
সঙ্গে সে লাগে।
যোধপুর পার্কের
কে না চেনে তাকে?
চোর ডাকু ভয় পায়
তার হাঁকে ডাকে।
ঘুমোবে না, ঘুমোতেও
দেবে না আমাকে।

বেড়ালকে করে তাড়া
ইঁদুরের যম
ইঁদুরকে খায় নাকো
করে সে খতম।
মেজাজটি তবু তার
বেজায় নরম।
সবার আদর খায়
স্নেহের কাঙাল
কোল ঘেঁষে থাকে যেন
আদুরে দুলাল।
বিন্দি কুকুর নয়,
বিন্দি বেড়াল।
অতিথি বাড়িতে এলে
সেও পাবে ভাগ
মিষ্টি না দিলে খেতে
মানবে না বাগ
হ্যাংলামি দেখে ওর
আমি করি রাগ।
চোদ্দ বছর ছিল
সঙ্গে আমার
নিত্য বেড়াতে যেত
পুকুরের পাড়।
ওরই এক ঝোপঝাড়ে
কবরটি তার।

রাম-রাবণের ছড়া

পূর্ণেন্দু পত্রী

১

সূর্পনখা ! সূর্পনখা !
পরে শুনবো নালিশ,
নাকে কেন মাখলি শুনি
এতটা নেল পালিশ ?
রাবণ দাদা ! রাবণ দাদা !
নাক কি আছে ?
নাক তো খাঁদা ।
কে করলো এই সর্বনাশটা ?
রাম-লক্ষ্মণ হারামজাদা

২

রাবণ রাজার দশটা মুণ্ড
জ্বলে ওঠে যেন আগুনে-কুণ্ড
রাগে গরগর
কাঁপে থরথর
হাত হয়ে যায় হাতীর শুণ্ড

৩

মারীচ মারীচ ডাক ছাড়ি
মারীচ গেছে কার বাড়ি ?
মারীচ যাগে যজ্ঞে
ব্যস্ত আছে ? হোক গে
শোনরে মারীচ এখুনি
রাম নামে আছে এক খুনী
রাক্ষসদের করেছে শেষ
যেন তারা সব ছুবেবোঘাস ।
আমি চাই ঐ রামের লাশ ।

৪

রামচন্দ্রকে মারবে ?
তোমার চোদ্দপুরুষ
চোদ্দ বছর তরোয়ালে ঘষে বুরুশ
সাত জন্মেও পারবে ?
হারবে ।

৫

মারীচ আমার ! লক্ষ্মী !
খানিকটা পোয়া ঝক্কি ।
সোনার পানা বেরাল ছানা
সাজতে কি তোর আছে মানা ?
রাম-সীতাদের রান্নাঘরে

ঢুকতে হবে তিন প্রহরে।
বেরাল হতে চাইছে না মন ?
তাহলে হ' শেয়াল-রতন।
শেয়াল হতে গুলোচ্ছে গা ?
সোঁদর বনের বাঘ হয়ে যা।
বাঘ সাজতেও গা রিন্‌রিন্ ?
তাহলে হ' সোনার হরিণ।

৬

তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠতি!
রাগ ছেড়ে হও শিষ্টটি।
রামকে খ্যাপালে—সংঘাতে
ম্যাসাকার হবে লঙ্কাতে।
রক্ষে পাবে না একটিও,
ফরগেট দেম, ফরগিভও।

৭

চুপ কর ওরে মূর্খ
বুঝবি আমার দুঃখ
নেই তোর সেই গুণ
বেশি বক্‌বক্ করলে
রামের পক্ষ ধরলে
তোকেই করবো খুন।
যা বলি সেটাই কর
মায়ামৃগ বেশ ধর।
পঞ্চবটিতে যাবি
গেলেই দেখতে পাবি
ছোট্ট একটা কুঁড়ে
আছে জঙ্গল ফুঁড়ে!
দুই ভাই এক বৌ
খায় ফল-মূল মৌ
ঘুরবি এমন করে
সীতার নজর পড়ে।
তারপরে যেই সীতা
দেখে হবে মূর্ছিতা
লাগাবি মায়ার খেল
করিস না যেন ফেল।

৮

দেখো দেখো দেখো দেখো আর্য!
গায়ে অপরূপ কারুকার্য
সোনার হরিণ এক চরছে
সোনালী আগুন যেন ঝরছে।
খুরে খুরে ঝলসায় মুক্তো
শিঙে শিঙে মরকত গুপ্ত।
অমন হরিণশিশু যদি পাই
রাজ সুখ চলে গেলে ক্ষতি নাই।
হরিণটা এনে দেবে ? আর্য!
রাম উঠে বলে, শিরোধার্য।

লক্ষ্মণ ভাই ! লক্ষ্মণ ভাই !
আমি চললাম শিকারে।
প্রাণাধিকা সীতা রইলো, দেখিও
সুখে-দুখে জ্বরে-বিকারে।
যতক্ষণ না কাম ব্যাক করি
সর্বতোভাবে সীতাকে
আগলে রাখবে, নার্ভ হারাবে না
আচমকা কোনো বিপাকে।

১০
হরিণ ছোটে হরিণ ছোটে
চোখেই দেখা যায় না মোটে
বন-বাদাড়ের হাত-পা কাঁপে
হরিণ ছোটে লম্বা লাফে।
ছুটছে যেন অ্যামব্যাসাডার
নেই কোনো ভয়, নেই কোনো ডর।
ছুটছে যেন ইলেকট্রিকের
রেল গাড়িটি, দিকবিদিকের
সব ডিঙিয়ে সব মাড়িয়ে
জাম্বো জেটের স্পীড ছাড়িয়ে
এই দেখা যায় অদৃশ্য এই
হঠাৎ ঝিলিক তার পরে নেই
পাতাল-রেলে চাপলো নাকি ?
পাতাল-রেল তো বছর-থাকী।

১১
সারা গায়ে ঝরে দরদর ধারা ঘর্ম
রাম বলে, হায় ! এ নহে আমার কর্ম।
এই ধনুকেই তাড়কা হয়েছে চিৎপাত
খর-দূষণের দাপটে করিনি দৃকপাত।
তুচ্ছ একটা হরিণের কাছে ঘাড় হেঁট ?
সীতাকে কিকরে দেখাব নিজের পোর্টেট
রেগে-মেগে রাম প্রচণ্ড তীর হাঁকড়ান,
সোনার হরিণ হাতের মুঠোয় পাকড়ান।

১২
মরেছি না মরতে বাকি
রাবণ ভাববে দিলাম ফাঁকি
তিনি যখন জড়িয়ে আছেন ধকলে,
এখন তবে উপায়টা কি,
ভাই লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে ডাকি
রামচন্দ্রের গলার স্বরের নকলে।

১৩
দেবর লক্ষ্মণ
করহ শ্রবণ
ঘটেছে বিষম বিঘ্ন,
শোনো আহ্বান !
হও আগুয়ান
হাতে তীর নাও তীক্ষ্ণ।

১৪

যেতে হবে তাই যাচ্ছি

কিন্তু গন্ধ পাচ্ছি

ভয়াবহ কিছু ঘটবে।

বৌদি! তুমি কি চটবে

যদি আঁকি এই বক্র

খড়ির দাগের চক্র ?

এই গোলাকার গণ্ডী

এতেই থাকবে বন্দী।

সীতা কেঁদে বলে, হাঁদারে!

আগে বাঁচা তোর দাদারে।

১৫

আতা গাছে তোতা পাখি

ডালিম গাছে মৌ।

রাবণ রাজা দেখতে পেলেন

একা রামের বৌ।

১৬

একটি মুঠো অন্ন দে মা

একটি বাটি ফ্যান।

দেখবি তোকে রাজমহিষী

করবে ভগবান।

ইনফ্লেশনে ইনফ্লেশনে

আগুন লাগা পণ্য

সে সব কী মা আমার মতো

গরীব দুঃখীর জন্য ?

রেশন-কার্ডে চাল দেয় মা

চাল পচে দ্যুগন্ধো

তিনটি বছর মাছ খাইনি

এমনি কপাল মন্দো।

এত রকম শাক-পাতা মা

রয়েছে বন-ভরা

ভাজবো কিসে ? তেলের যা দাম

চক্ষু ছানাবড়া।

একটি মুঠো অন্ন দে মা

একটি মুঠো চাল

বুক জ্বলছে পেট জ্বলছে

একটু দয়া ঢাল।

ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে

রাবণ পাতেন ঝুলি.

দয়ার দখনি হাওয়া ওঠে

সীতার বুকে দুলি।

১৭

সীতা আসে গণ্ডীটা ছাড়িয়ে

যেখানে রাবণ-রাজা দাঁড়িয়ে।

যেই না বাইরে আসা তখুনি

যেন এক ভাগাড়ের শকুনি

ছোঁ মারাটি করে যায় ঠিক তার।

সীতা করে রাম! রাম! চীৎকার।

তখন নাকি

অমিতাভ চৌধুরী

বাঙালীদের পাতে পাতে
তখন নাকি মাছ ছিল।
মাছ ছিল।
মাছে ভাতে রাত্রি-দুপুর
চেটেপুটে খাচ্ছিল।
খাচ্ছিল ॥
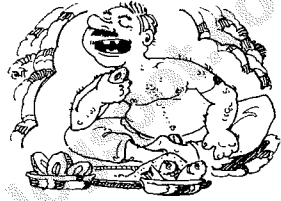
তখন গরুর দুধ ছিল
দুধ খেয়ে সব বুঁদ ছিল
ট্রামে-বাসে সীট ছিল
শয়তানরা ঢিট ছিল
বাড়ি ভাড়া মিলছিল
এখন যা তাল তিল ছিল
বিজলি আলো জ্বলছিল—
ঠাকুরদাদা বলছিল।

পাস করলেই তখন নাকি
চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল।
যাচ্ছিল ॥
এখন কেবল নেই আর নেই
আগে অনেক আচ্ছিল।
আচ্ছিল।

আত্ম-প্রতিকৃতি —নন্দলাল বসু

নোবেল প্রাইজ স্বর্ণপদক—(এক পিঠ)

নোবেল প্রাইজ স্বর্ণপদক—(অপর পিঠ)

রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল-প্রাইজের অজানা কথা

চিত্তরঞ্জন দেব

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, এবং এশিয়া মহাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম নোবেল প্রাইজ এনেছিলেন, এ-কথা কার না জানা। নোবেল প্রাইজ বলতে বোঝায়—একটি স্বর্ণপদক, এক লক্ষাধিক টাকা, এবং একটি প্রমাণপত্র। শান্তিনিকেতন সংগ্রহালয়ে শুধু স্বর্ণপদক এবং প্রমাণপত্রটি দেখা যায়। স্বর্ণপদকটি 'নোবেল মেডেল' এবং প্রমাণপত্রটি 'নোবেল ডিপ্লোমা' নামে পরিচিত। স্বর্ণপদকের একপিঠে দেখা যায় নোবেল প্রাইজ প্রবর্তক আলফ্রেড বারনহারড্ নোবেলের প্রতিকৃতি এবং তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, অন্য পিঠে লেখনী হাতে উপবিষ্ট কবি এবং আশীর্বাদ হাতে দণ্ডায়মান বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাল্পনিক মূর্তি। প্রমাণপত্রটি চিত্রাঙ্কিত সুদৃশ্য চামড়ায় আবৃত বড় আকারের বইয়ের মলাটের মতো। এর বাইরে ভিতরে নানা রঙের লতাপাতা ফুল ও পাখির নক্‌শা। বাইরে বিচিত্র চিত্রের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম পদবীর দুটি আদ্যক্ষর 'আর' এবং 'টি'র মনোগ্রাম। ভিতরে পাশাপাশি দুই পৃষ্ঠায় চিত্রলেখার মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দুটি স্তবক—সুইডিশ ভাষায় যার বাংলা অর্থ :

> "১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বরে আলফ্রেড নোবেল-কৃত তাঁর শেষ ইচ্ছা পত্র (উইল) অনুসারে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতে এই বছরের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিলেন।
>
> কারণ, মহান্ উদ্দেশ্যে রচিত এবং বিস্ময়কর রচনাশৈলীতে ইংরেজি ভাষায় রূপায়িত তাঁর কবিতাগুলি নিগূঢ়তা, সজীবতা ও মাধুর্য দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ অর্জনের সংবাদ সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে প্রচার করেন রয়টার ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর তারিখে। স্বতন্ত্র তারবার্তায় রবীন্দ্রনাথকেও এই সংবাদ জানানো হয়েছিল। তারপর কিছুকাল ধরে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ-বিজয়ের খবরের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হয় নোবেল প্রাইজের অর্থের পরিমাণ-আট হাজার ব্রিটিশ পাউণ্ড বা এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ৬৭ বছর ধরে দেশ-বিদেশের সকলে জেনে আসছেন যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পয়েছিলেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার।

আমরা, সবাই শুধু নোবেল প্রাইজ স্বর্ণপদক ও প্রমাণপত্রটি দেখতে পাই। কিন্তু নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা-তো দেখতে পাইনে। সেই টাকাটা কোথায় রেখেছিলেন অথবা কিভাবে খরচ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? নোবেল প্রাইজের মোট টাকা থেকে একটি পয়সাও তিনি নিজের সুখভোগের জন্য খরচ করেন নি। টাকা পেয়ে অবধি তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, এই টাকাটা তিনি পল্লীবাসী কৃষকদের দুঃখদুর্দশা মোচনের কাজে নিয়োগ করবেন। দুটাকা পাঁচ টাকা করে দান করবেন, এমন নয়। টাকা তিনি রেখে দেবেন পল্লীগ্রামের কোনো কোষাগারে অর্থাৎ ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে গরীব চাষীরা খুব সামান্য সুদে ঋণ নিতে পারবে। ফলে, গ্রামের সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে আর যেতে হবে না দরিদ্র কৃষিজীবীদের। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। নোবেল প্রাইজের টাকা রবীন্দ্রনাথ জমা রাখলেন বাংলাদেশের এক পল্লীর কোষাগারে—তার নাম 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক'। লক্ষাধিক টাকার তহবিল থেকে টাকা পেতে সুবিধে হল দরিদ্র পল্লীবাসী চাষীর। চাষের সময় গরু কেনা, লাঙল কেনা, আর বীজ বোনার টাকার জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হবে না। চাষীরা ঋণ নেওয়ায় পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে নোবেল প্রাইজের আমানতী টাকার অঙ্ক কমতে কমতে এসে দাঁড়াল পঁচাত্তর হাজারে। মোট আমানতে অঙ্ক ছিল এক লক্ষ বারো হাজার। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। কবি এবং কবিপুত্র কারও ইচ্ছে নয় যে নোবেল প্রাইজের টাকা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেইজন্য পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে রথীন্দ্রনাথ কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্পত্তি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে ধরে দিলেন বিশ্বভারতীকে। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকেই নোবেল প্রাইজের অর্থ দান করেছিলেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ জোড়াসাঁকোর সম্পত্তির আয় থেকে পতিসর আমানতের অনাদায়ী টাকার অঙ্ক পূরণ করে নিয়ে বিশ্বভারতীর নোবেল প্রাইজ তহবিল পূর্ণ করে দিলেন। এই হল নোবেল প্রাইজের টাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিশ্বভারতীর হিসাবপত্র নোবেল প্রাইজ তহবিলে টাকার অঙ্ক দেখা যায় এক লক্ষ বারো হাজার। অথচ, আমরা প্রথম থেকে শুনে এসেছি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজরূপে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন। তাহলে বাকি টাকাটা গেল কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হল নোবেল প্রতিষ্ঠান থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের একখানি পত্র।

উল্লিখিত পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ হিসেবে স্টকহোমের নোবেল প্রতিষ্ঠান ১৪৩০১০ : ৮৯ সুইডিশ ক্রোনার দিয়েছিলেন। উক্ত পত্রের নির্দেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ তারিখে কলকাতার চারটারড্ ব্যাঙ্ক থেকে নোবেল-প্রাইজের টাকা আনতে গিয়েছিলেন সে-কথা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু তিনি যে

১৯১৪ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যেই নোবেল প্রাইজের টাকাটা পেয়ে গিয়েছিলেন সে—কথা জানা যায় রবীন্দ্রনাথের নিজ হিসাবের একখানি খাতা থেকে। উক্ত খাতায় লেখা নিম্নোক্ত বিবরণ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের অজানা খবরের অন্যতম প্রধান সূত্র :

বিতারিখ—	১১ মাঘ ১৩২০
শনিবার—	২৪ জানুয়ারি ১৯১৪
জমা	খরচ
নোবেল প্রাইজ খাতা	বেঙ্গল ব্যাঙ্ক খাতা
জমা—১, ১৫, ২৬৯	খরচ—১, ১৬, ২৬৯
দং ১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়	বং উক্ত ব্যাঙ্ক জমা দেওয়া যায়
Chartered Bank-এর	গুঃ গোপাল—
এক চেক—১, ১৬, ২৬৯	১, ১৬, ২৬৯

নোবেল প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪৩'০১০'৮৯ সুইডিশ ক্রোনারের নোবেল প্রাইজের অর্থমূল্য স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ এক লক্ষ ষোলো হাজার দুই শত উনসত্তর টাকা পেয়েছিলেন। ওই টাকা তিনি চারটারড্ ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে' জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অঙ্ক কেমন করে এক লক্ষ বারো হাজারে পরিণত হল, সে ইতিহাস আমাদের অজানা।

তবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের অর্থমূল্য স্বরূপ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন—এই জনশ্রুতি তথ্য নির্ভর নয়।

নোবেল প্রাইজ ঘোষণার তারিখ থেকে দুই মাস দশ দিন পর নোবেল প্রাইজের টাকা নোবেল প্রাইজ বিজয়ীর হাতে এসে গেল। টাকা পাবার পাঁচ দিন পর তিনি পেলেন নোবেল প্রাইজের স্বর্ণপদক ও প্রমাণপত্র। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি প্রথমেই বিতরণ করা হয়েছে ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠান সুইডেনের স্টকহোমে হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন সুইডেনের ব্রিটিশ লিগেশন। (তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের কবির জন্য এই ব্যবস্থাই যথোপযুক্ত ছিল)। পরে ব্রিটিশ লিগেশনের কাছ থেকে পুরস্কারের সামগ্রী চলে আসে বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেলের কাছে। তিনি কলকাতার গবর্নমেণ্ট হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার তুলে দেন রবীন্দ্রনাথের হাতে ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের অজানা কথা কিছু জানা গেল। কিন্তু, ইংরেজিতে লেখা গীতাঞ্জলি (সং অফারিংস) নামে মাত্র একশ তিনটি কবিতার একখানি বইয়ের জন্যই যে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, সে-কথা হয়তো অনেকের অজানা। ১৩২১

সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে এই বই সম্বন্ধে একটি খবর বেরিয়েছিল। সেই খবর এখানে তুলে দিলাম :

"রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আট লক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে। ইহা ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইংরাজী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা সকলেই বিষয় সুখে মত্ত বা বিষয় সুখের জন্য লালায়িত নহে : অনেকের ধর্মপিপাসা আছে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ তাঁহারা বুঝেন।

"বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি আনুমানিক চারিহাজার বিক্রী হইয়াছে।"

বাংলা গীতাঞ্জলিতে মোট কবিতার সংখ্যা একশ সাতান্ন। তার থেকে মাত্র তিপ্পান্নটি কবিতা বেছে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য তর্জমা করেছেন। আর যে-সব বই থেকে ইংরেজী গীতাঞ্জলির উপাদান সংগ্রহ করেছেন সেগুলির নাম—নৈবেদ্য, খেয়া, কল্পনা, শিশু, চৈতালি, অচলায়তন, স্মরণ, উৎসর্গ এবং গীতিমাল্য। কাজেই বাংলা গীতাঞ্জলি আর ইংরেজি গীতাঞ্জলি এক জিনিস নয়। তবু, ভাবের দিক থেকে দু'খানি বই এক। এবার শুধু জেনে রাখা যে গীতাঞ্জলির জন্য বিশ্বের সেরা সম্মান পেলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে বিশ্বপিতা ও বিশ্বমানবের জয়গান—মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের মন্ত্র, দূরকে নিকট করার এবং পরকে আপন করার জাদু। যেমন :—

'বিশ্বযোগে যেথায় তুমি বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো…'

আবার,

"কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

---

* নোবেল প্রাইজ সম্পর্কিত তথ্য ও ফটোচিত্র ব্যবহারে অনুমতি দানের জন্য লেখক বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

মহিষমর্দিনী উদ্ধার

সমরেশ বসু

গোগোলের বাবার এক বন্ধু, নাম বিধান চক্রবর্তী। গোগোল তাঁকে বিধানকাকা বলে ডাকে। বয়স তাঁর বাবার থেকে সামান্য কম হতে পারে। অন্ততঃ দেখলে তাই মনে হয়। তিনি মাঝে মাঝেই সন্ধের পরে গোগোলদের বাড়ি আসেন। মোটেই আস্তে কথা বলতে পারেন না। মজার মজার গল্প বলতে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি এলেই, বাড়িতে যেন হৈচৈ লেগে যায়! এসেই, ছেলেমানুষের মত মায়ের কাছে, এটা খাব সেটা খাব করে বায়না শুরু করে দেন। মাও বিধানকাকাকে খাইয়ে খুব খুশি। অথচ বিধান-কাকা নিজে নানারকম খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসেন। তার মধ্যে গোগোলের জন্য বিশেষ করে, সব থেকে সেরা চকোলেট। এত বেশী করে আনেন, গোগোলের পক্ষে একলা খাওয়া সম্ভব নয়। বাবা মা মিষ্টি খেতেই চান না। বাধ্য হয়ে গোগোল স্কুলে গিয়ে, ওর ক্লাসের বন্ধুদের খাইয়ে দেয়।

বিধানকাকা কবে আসবেন, তার কোন ঠিক থাকে না। ফিটফাট স্মার্ট লোক। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে আসেন। হঠাৎ এক একদিন সন্ধের পরে এসে হাজির হন। বাবার নাম ধরে ডাকলেও, মাকে বউদি বলে ডাকেন। গোগোল শুনেছে। বিধানকাকা বাবার সঙ্গে কলেজে পড়েছেন। এলেই হৈচৈ নানান গল্প, মায়ের কাছে এটা সেটা খাবার ফরমাশ। তারপরেই তাঁর এক কথা, 'সমীর, আমাদের বাড়ি বউদি আর গোগোলকে নিয়ে এ সপ্তাহের শেষেই চল।"

গোগোলের সঙ্গেও বিধানকাকার খুব ভাব। গোগোলের খেলার দিকে ঝোঁক বেশি। আজকাল ওর ঘরে, অনেক খেলোয়াড়দের ছবি ছাড়াও, ব্রুস্লীর একটা বড় ছবিও টাঙানো হয়েছে। বাবার সঙ্গে গিয়ে, ময়দানের একটা শিবিরে, ক্যারাটে শেখানো দেখে এসেছে। বিধানকাকা গোগোলকে ডেকে ক্যারাটে শুরু করে দেন। না জানলেও তিনি এমন অদ্ভুত সব ভঙ্গি করেন, যেন সত্যি একজন দারুণ ক্যারাটেক। গোগোলও তাঁর সঙ্গে হাত পা চালায়। আর বিধানকাকা গলা থেকে নানা শব্দ করে, লম্ফঝম্প করেন। দেখে গোগোলের হাসি পায়। আর বাবা-মা তো হেসেই বাঁচেন না। বাবা বলেন, 'বিধান, তুই দেখতে বড় হয়েছিস, নিজের চেষ্টায় বেশ বড়লোকও হয়েছিস। কিন্তু এখনও একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস।'

বিধানকাকা বলেন, 'তোমাদের মত গোমড়ামুখো একজিকিউটিভ হয়ে আমার

দরকার নেই। সারাদিন কেবল অফিসের চিন্তা, আর তাবড় তাবড় সাহেবসুবোর সঙ্গে মিটিং করা, মেজাজ খারাপ করা, ওসবের থেকে এই আমার ভাল! ধরে নাও, আমি গোগোলেরই বন্ধু। তবে গোগোলের মত গোয়েন্দাগিরি আমাকে শিখে নিতে হবে।"

গোগোল লজ্জা পায়। হেসে বলে, 'আমি মোটেই গোয়েন্দা নই বিধানকাকা। এক একটা ঘটনা এমন ঘটে যায়, আমি কেমন করে যেন জড়িয়ে যাই। আমি গোয়েন্দাগিরি করব বলে কিছু করিনি।'

বিধানকাকা গোগোলকে আদর করে বলেন, 'তাতেই যা কাণ্ড কর, খবরের কাগজে পর্যন্ত তোমার কীর্তিকাহিনী বেরিয়ে পড়ে। তোমার কথা ভেবে আমিই ভয়ে মরে যাই।'

কিন্তু যে-কোন কথা বলাই হোক, ঘুরে ফিরে বিধানকাকার একটাই কথা, তিনি গোগোলদের নিয়ে তাঁদের দেশের বাড়ি যাবেন। এমন কিছু দূরেও নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গ্রাম। গাড়ি নিয়ে গেলে, সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। বিধানকাকা প্রত্যেক উইক এণ্ড-এ গ্রামের বাড়িতে যান। বলেন, 'কলকাতায় কি থাকা যায় নাকি? নেহাত কাজের জন্য থাকতে হয়।'

এরকম বলতে বলতে, এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় এসে, বিধানকাকা বলতে গেলে জোর করেই বাবা মা আর গোগোলকে নিয়ে গেলেন। বাবা মায়ের কোন আপত্তিই মানলেন না। বাবাকে বললেন, 'গোগোলের শনি রবি ছুটি। তোমাকে শনিবারটা ছুটি নিতে হবে। সেটা কাল আমাদের দেশের বাড়ির টেলিফোনে জানিয়ে দিলেই হবে।' বলে নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকে, সকলের জামাকাপড় টানাটানি করতে লাগলেন।

মা বললেন, 'আচ্ছা বিধানঠাকুরপো আপনি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। জামাকাপড় আমি গুছিয়ে নিচ্ছি।'

বিধানকাকার তাড়ায় এক ঘণ্টার মধ্যে বাবা মা সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বিধানকাকা সবাইকে গাড়িতে তুলে, সাঁ সাঁ গাড়ি চালিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, 'সত্যি বিধান, তুই একটা পাগল।'

গাড়ি তখন যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার দিকে চলেছে। বিধানকাকা তাঁর পাশে নিয়েছেন গোগোলকে। বাবা মা পিছনে। বিধানকাকা বললেন, 'পাগলামি না করলে, তোমাদের নিয়ে আসা হতো না।'

অন্ধকার নেমে এসেছিল। রাস্তার দু পাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোগোল খালি বুঝতে পারছে, মাঠ গাছপালা দুদিকে। মাঝে মাঝে বাজার সিনেমা দোকানপাট আর লোকের ভিড় চোখে পড়ছে। ইলেকট্রিকের আলো রয়েছে। গোগোল আগেই শুনেছে, বিধানকাকাদের বাড়ি গ্রামে হলেও, সেখানে ইলেকট্রিক আছে।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি পৌঁছে গেল বিধানকাকাদের বাড়ি। ডান দিকের

একটা খোলা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকলো বিরাট একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া চত্বরে। গেটের সামনেই দু দিকে দুটো পাম গাছ। চত্বরের ডাইনে বাঁয়ে বড় বড় দুটো শেডে ঢাকা আলো জ্বলছে। সামনেই দোতলা বাড়ি। ওপরে নীচে আলো জ্বলছে। ডান দিকে বেড়া ঘেরা বাগান। বাঁ দিকে, বাড়িটা যেন এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কিন্তু সেটা একতলা। একতলার সামনে, মাথায় ছাদ আঁটা, বড় থামে ঘেরা আর একটা ঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন, ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানে। একজন ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে। আর বড় বাড়ির গায়ে লাগানো একতলার ঘরের মধ্যে বাজছে কাঁসর ঘণ্টা।

বিধানকাকা গাড়ি থেকে নেমে ডাকলে, 'বেরিয়ে এস গোগোল। সবাই বেরিয়ে এস। জামাকাপড়ের ব্যাগটা কেউ এসে ভেতরে নিয়ে যাবে।'
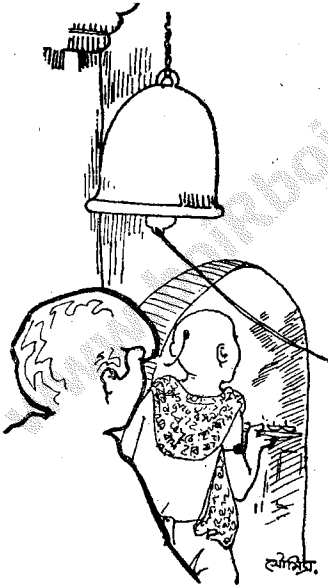
বাবা মা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। গোগোল বাঁ দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞস করল, 'বিধানকাকা, ওখানে কী হচ্ছে?'

বিধানকাকা বললেন, 'মহিষমর্দিনীর পূজা হচ্ছে। রোজই হয়। এখন আরতি হচ্ছে। সামনে থামওয়ালা, যে-ঘরটা দেখছ, ওটা নাটমন্দির। নাট-মন্দিরেরও পর মহিষমর্দিনীর মন্দির।'

গোগোল বলল, 'আমি একটু দেখে আসব?'

বিধানকাকা বললেন, 'হ্যাঁ চলে যাও। তবে জুতো খুলে যেও, নইলে ওখানে ঢুকতে দেবে না। আর ওখান থেকে অন্য কোথাও যেও না। আমি বাবা মা'কে ভেতরে পুরে দিয়েই তোমার কাছে চলে আসছি।'

জুতোর জন্য গোগোলের ভাবনা ছিল না! ওর পায়ে স্যাণ্ডেল ছিল। নাটমন্দিরের সামনে গিয়ে, স্যাণ্ডেল খুলে রেখে ও নাটমন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঢাকের তালে তালে নাচছে। নাটমন্দিরের সামনে সিঁড়ি। ওপরে উঠলে মন্দির। মন্দিরের দরজার সামনে কয়েকজন মহিলা পুরুষ বসে আছেন। আর একজন ভিতরে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছেন।

গোগোল সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের রকে উঠল। যারা সামনে বসেছিলেন, তাঁরা অচেনা গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল দেখল, মন্দিরের বাইরে, মাথার ওপরে ঘণ্টা। তার সঙ্গে লম্বা দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি ধরে একজন টানছে আর ঘণ্টা বাজছে। ভিতরেও একজন কাঁসর বাজাচ্ছে। যিনি আরতি করছিলেন, তাঁর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে মহিষমর্দিনীর মূর্তি। গোগোল দেখতে পাচ্ছে না। ও সরে এসে দেখল, রকটা বেশ লম্বা। সেদিকেও বড় বড় থাম দেখা যাচ্ছে।

গোগোল সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখল সামনে কয়েকটা বড় থাম। ভিতরে বিরাট একটা বড় ঘর। একটি মাত্র টিমটিমে আলো জ্বলছে। আর কিছুই নেই। কেবল কোথা থেকে এ সময়েও পায়রা ডেকে উঠছে। এই সময়ে বিধানকাকা গোগোলের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'তুমি এখানে কী করছ গোগোল ? পুজো তো হচ্ছে ওদিকের মন্দিরে।'

গোগোল বলল, 'মহিষমর্দিনীর মূর্তিটা দেখতে পাইনি। আরতি হয়ে গেলে দেখব। এ ঘরটা কিসের ?'

বিধানকাকা বললেন, 'এটা হল ঠাকুর দালান। দুর্গাপুজোর সময়, এখানে পুজো হয়। তখন মন্দিরের মহিষমর্দিনীর মূর্তি এখানে আনা হয়। কিন্তু মাটির বড় মূর্তিও তৈরি হয়। এবার পুজোর সময় তোমাকে নিয়ে আসব, তখন দেখবে। চল ওদিকে যাই।'

বিধানকাকা হাত ধরে গোগোলকে মন্দিরের সামনে নিয়ে গেলেন। আরতি শেষ হয়েছে। যিনি আরতি করছিলেন, তিনি পঞ্চপ্রদীপটা সকলের সামনে ধরছিলেন। সবাই প্রদীপের শিখার কাছে হাত বাড়িয়ে, নিজেদের বুকে মাথায় ঠেকাচ্ছিল। বিধান-কাকাও তাই করলেন, আর গোগোলের মাথায় বুকে প্রদীপের তাপ ছুঁইয়ে দিলেন। গোগোল তখন মহিষমর্দিনীর মূর্তি দেখতেই ব্যস্ত। ঠিক দুর্গা প্রতিমার মতই, দশভুজা। একটি সিংহাসনের ওপরে মূর্তিটা রয়েছে। লালপাড় শাড়ি। লাল জামা, গলায় চওড়া চন্দ্রহার। মাথায় সুন্দর মুকুট। দুটো চোখই ঝকঝক করছে। কপালের চোখটিও উজ্জ্বল।

বিধানকাকা বললেন, 'দেবীর দুটো চোখ হীরের। কপালের চোখটি পান্নার। মাথার মুকুট গলার হার, সবই সোনা আর হীরে দিয়ে গড়া। আর মূর্তি হচ্ছে অষ্ট ধাতুর।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'অষ্টধাতু কী ?'

বিধানকাকা বললেন, 'অষ্টধাতু কী, আজকালকার ছেলেরা অনেকেই জানে না। তোমার জেনে রাখা উচিত। ধাতু মানে মেটাল, জানোই তো। এই অষ্টধাতু হল, সোনা রূপা পেতল কাঁসা তামা লোহা রাং আর সীসা।'

গোগোলের কৌতূহল, সিংহ আর অসুর নিয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'সিংহ আর অসুর কোথায়?'

বিধানকাকা হেসে বললেন, 'সিংহটা সিংহাসনের জন্য ঢাকা পড়ে গেছে। অসুরটা তারও নীচে। কাল বিকালে তোমাকে দেখাব। এখন চল, বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক।'

গোগোল দেখল, বাড়িটা বিরাট। থামওয়ালা বিরাট বারান্দা। ঘরের পর ঘর। দেওয়ালও সেইরকম। সব ঘরে আলো জ্বলছে। অথচ লোক তেমন নেই। গোগোল বিধানকাকার সঙ্গে, অনেক ঘর ঘুরে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। একটা সাজানো গোছানো ঘরে বাবা মা বসেছিলেন। গল্প করছিলেন একজন মহিলার সঙ্গে। টি. ভি. চলছিল। কেউ দেখছিলেন না। বিধানকাকা বললেন, 'জবা, এই হচ্ছে শ্রীমান গোগোল, সমীরের ছেলে।'

বাবা মায়ের সঙ্গে যিনি গল্প করছিলেন, তিনি উঠে এসে গোগোলকে কাছে টেনে নিলেন, বললেন, 'বাহ্, সুন্দর ছেলে!'

বিধানকাকা বললেন, 'শুধু ডাকাত ধরে না, আমার সঙ্গে ক্যারাটে লড়ে। খুদে ব্রুস লী!'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে ভাই বোন কেউ নেই?'

বিধানকাকা বললেন, 'অনেক আছে। চল, তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাই।'

গোগোল বিধানকাকার সঙ্গে অন্য আর একটা ঘরে গেল। সেখানে চার পাঁচজন ছেলেমেয়ে ছিল, যারা গোগোলেরই বয়সী। বিধানকাকা সকলের সঙ্গে গোগোলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুজন বিধানকাকার ছেলে আর মেয়ে। লোটন আর রুমি। তাঁর দাদার তিন ছেলেমেয়ে। তোতা, অপু আর ঝুমকি। গোগোল তাদের সঙ্গে জমে গেল।

পরের দিন শনিবার। গোগোলের ঘুমটা ভেঙে গেল, নানারকম শব্দে। ও চোখ খুলেই শব্দগুলো শুনল। শব্দগুলো নানারকম পাখির ডাক। দোয়েল শ্যামা বুলবুলি। এক সঙ্গে এত পাখির ডাক আর কখনও শোনে নি। ও চোখ তাকাল। খোলা জানালা চোখে পড়ল। দেখল, তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি। জানালা দিয়ে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা ঘুমোচ্ছেন। অন্য দিকে, আর একটা ছোট খাটে বাবা ঘুমোচ্ছেন।

গোগোল শুয়ে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ওর গায়ে একটা জামা। যেদিকে জানালা, তার পাশেই রয়েছে একটা দরজা। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। গোগোল জানালা দিয়ে দেখল, ঘরের লাগোয়া খোলা ছাদ। ওর ভিতরে থাকতে ইচ্ছে করল না। শব্দ না করে দরজার ভারি হুড়কোটা

খুলে, বাইরের ছাদে এল। চারিদিকে গাছপালা, পাখির ডাক। আর বাতাসটা খুব ভাল লাগছে। গোটা বাড়িটা একেবারে নিঝুম। কেউ এখনও জাগে নি।

গোগোল খোলা ছাদের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ছাদটার তিন দিকেই আলসে। উত্তরের আলসের কাছে গিয়ে ওর চোখে পড়ল বাড়ির গায়ের সঙ্গে লাগানো মন্দির। তার মানে এটাই মহিষমর্দিনীর মন্দির। মন্দিরের চুড়োটা দোতলার ছাদের কাছাকাছি উঠেছে। আর এই ছাদটা একতলার ওপরে।

গোগোল পুবদিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, নীচে একটা শব্দ শুনতে পেল। দাঁড়িয়ে আলসের ওপর ঝুঁকে নীচে তাকাল। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দেখল, একটা খালি গা লোক, মন্দিরের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তার দু হাতে কাপড়ে জড়ানো কী একটা রয়েছে। লোকটা আশেপাশে দেখে, গোয়ালের পাশ দিয়ে ছুটল। কী ব্যাপার? লোকটার তাকানোটা মোটেই ভাল নয়। তার চেয়েও অবাক কাণ্ড, মন্দিরের পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা গোয়াল পেরিয়ে, ছোট বাগানের পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কী ঘটতে পারে? গোগোল পিছন ফিরে এসে, নীচে যাবার দরজা খুঁজল। দরজাটা পেয়েও গেল। সিঁড়িতে এখনও অন্ধকার। নীচে নেমে ও দেখল, একটা লম্বা দালান। সেখানেও এখনও প্রায় অন্ধকার। উত্তরের একটা জানালা খোলা। সেই জানালা দিয়ে গোয়ালঘর, ছোট বাগান আর পাঁচিলের গায়ে ছোট খোলা দরজাটা চোখে পড়ল। জানালার পাশে একটা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গোগোলের কৌতূহলটা বরাবরই বেশি। লোকটা মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে কী নিয়ে বেরোল? ওরকম চোরের মত তাকাচ্ছিল কেন? দরজাটা বন্ধই বা হয়ে গেল কী করে। নিশ্চয়ই তা হলে মন্দিরের মধ্যে কেউ রয়েছে। কিন্তু লোকটা কী নিয়ে গেল, সেটাই ওর আগে জানবার ইচ্ছে হল।

কথাটা মনে হতেই, গোগোল দরজা খুলে ফেলল। রক থেকে লাফিয়ে পড়ে, দৌড়ে ছোট দরজা দিয়ে বাইরে এল। এদিক ওদিক তাকাতেই, চোখে পড়ল, লোকটা উত্তর দিকে, পোড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছে। এগিয়ে গেছে অনেক দূর। গোগোল ছোটবার আগেই, লোকটা বেঁকে গেল ডানদিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। কাছে পিঠে একটা লোকও নেই।

গোগোল জোর দৌড় লাগাল। লোকটা যেখান থেকে ডানদিকে মোড় বেঁকেছিল, সেখানে থমকে দাঁড়াল। দেখল, চারপাশে ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছ। আর বিরাট উঁচু একটা ঢিবি। লোকটা কোন দিকে যেতে পারে? ঢিবিটার আড়ালে চলে গেছে? ঢিবিটা একটা যেন বিরাট লম্বা আর চওড়া দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল আশেপাশে দেখে ঢিবিটার ওপর উঠতে গেল। গড়ানো ঢিবি, সহজে ওঠা যায় না।

হড়কে যায়। নেহাত খালি পা ছিল বলেই, ছোট ছোট গাছের মুণ্ডু ধরে গোগোল ঢিবিটার ওপরে উঠে অবাক! দেখল, ঢিবিটা আসলে বিরাট একটা দীঘির ধার। দীঘির চারিদিকে চারটে বাঁধানো ঘাট। কোন ঘাটে লোক নেই। কিন্তু লোকটা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই এদিকে আসে নি।

গোগোল ঢিবির ওপর থেকে নামতে যাবে। এমন সময় ওর চোখে পড়ল, দীঘির ডানদিকের কোণে, নীচের ঝোপঝাড়ে। দেখল, সেই লোকটাই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। ভোরের আলো একটু স্পষ্ট হলেও, ভাল করে না তাকালে, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কী করছে লোকটা? হাতের কাপড়ে মোড়া সেই জিনিসটা কোথায়? ভাবতে ভাবতে গোগোল ঢিবির ওপর দিয়ে লোকটার দিকে এগোল। অনেকটা কাছাকাছি গেল। তবু লোকটা ফিরেও তাকাচ্ছে না। ঝপ্‌ ঝপ্‌ কোদাল চালাচ্ছে। তারপরেই গোগোলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও দেখল, লোকটার কাছাকাছি শোয়ানো রয়েছে মহিষমর্দিনীর সেই মূর্তি। মূর্তিটা ও পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। মাথায় কাজ করা মুকুটটা দেখেই চিনতে পারল।

গোগোল কী করবে ভেবে পেল না। চিৎকার করবে? না কি বাড়িতে গিয়ে বিধানকাকাকে ডেকে আনবে?

কিন্তু কিছুই করতে হল না। গোগোল টেরই পায়নি, ওর পিছনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে একটা লোক। হাতে তার একটা গামছা। সে ঝপ্‌ করে গামছা দিয়ে আগেই গোগোলের মুখটা বেঁধে ফেলল। গোগোল পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করল। পারল না। লোকটার গায়ে বেশ শক্তি। এত জোরে মুখ বেঁধেছে, গোগোল একটা শব্দ করতে পারছে না। তারপরেই লোকটা বাঁ হাতে গোগোলকে বুকের কাছে চেপে ধরে, কোমরের কাছ থেকে বের করল, গরু বাঁধার দড়ি। সেই দড়ি দিয়ে গোগোলের দু হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। ফেলেই গোগোলকে কাঁধে ফেলে ঢিবির উল্‌টো দিকে ঢালুতে নেমে দৌড় দিল। গোগোল জোরে জোরে পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটা একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল।

জঙ্গলের মধ্যে এখনও তেমন আলো ঢোকেনি। গায়ে মুখে মাকড়সার জাল লাগছে। লোকটা এসে দাঁড়াল একটা ঘরের কাছে। মাটির দেওয়াল, মাথায় টালি। দরজায় শিকল টানা। লোকটা এক হাতে শিকল খুলেই গোগোলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল, আর ওকে শুইয়ে দিল কাঁচা মাটির মেঝের ওপর। ঘরটা রীতিমত অন্ধকার। তবু গোগোল লোকটার মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! মনে হল, এ লোকটাই গতকাল মহিষমর্দিনীর মন্দিরের দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। এই প্রথম লোকটা কথা বলল, 'কলকাতার ছেলে, বেশি চালাকি শিখেছ, না? থাক এখন এখানে, আবার ঘোর দুপুরে এসে তোমাকে ঐ দীঘির জলে ডুবিয়ে শেষ করে দেব।' বলে গোগোলের হাত আর মুখের বাঁধন ভাল করে দেখে, ঘরের একদিকে চলে গেল। সেখান থেকে কী যেন একটা নিল। দরজার কাছে যখন গেল, দেখা গেল লোকটার হাতে তালা চাবি। দরজাটা টেনে বন্ধ করে, শিকল লাগিয়ে, তালা বন্ধ করল। তারপরে আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না।

গোগোল খানিকক্ষণ কিছু ভাবতেই পারল না। তারপরে সমস্ত ঘটনাটা পরপর ভেবেও, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যি ও ঘটনাগুলো দেখেছে কী না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তা না হ'লে, ওকে এভাবে এমন একটা ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখত না। এখন গোগোল কী করবে? ওর কান্না পেল। তারপরে লোকটার কথা মনে পড়ল, জলে ডুবিয়ে মারবে। অসম্ভব কিছু না। আসলব্যাপারটা দেখে ফেলেছে। লোকটা ভালই জানে। গোগোলের পা খোলা থাকলেও, কিছুই করতে পারবে না। মুখ বাঁধা, চিৎকার করতে পারবে না। দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। হাত দিয়েও কিছু করতে পারবে না।

গোগোল উঠে বসল। ওর এখনও ঘাম হচ্ছে। বাবা মা বিধানকাকা, সকলের কথা মনে পড়তে লাগল, আর গলার কাছে কান্না ঠেলে আসতে লাগল। কেউ জানতেও পারবেন না, গোগোল কোথায় আছে। অথচ এখন কেঁদেও কোন লাভ নেই। ও দেখল, টালির ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসছে। কিন্তু ঘরে একটাও জানালা নেই। গোগোল উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল। হাত পিছনে বাঁধা। হাতের ভর না দিয়ে, উঠে দাঁড়ান মুশকিল। তবু কয়েকবারের চেষ্টায় ও উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এগিয়ে গেল। সামান্য একটুও ফাঁক নেই। বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকজনের সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘরের মধ্যে আলো বাড়ছে। টালির ফাঁক দিয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে, রোদ উঠে পড়েছে জঙ্গলের মাথা ডিঙিয়ে। গোগোল দেখল, ঘরটা একেবারে ফাঁকা নয়। একটা লাঙল, একটা কাস্তে, কিছু দড়ি। একটা লম্ফ আর একটা মাদুর রয়েছে। কিন্তু এখান থেকে বেরোবে কী করে। সেটাই আসল কথা। বেরোবার কোন উপায় নেই। তবু টালির চালের দিকে তাকিয়ে মনে হল, হাত দুটো খুলতে পারলে, খুঁটি বেয়ে, টালির বাঁশ ধরে, টালি খুলে বেরোন যায়। কিন্তু হাত দুটে খুলবে কী করে?

গোগোল জোরে দু হাত মোচড় দিল। দিতেই ব্যথা লাগল। বেশ জোরে বাঁধা। লাঙলটার লোহার ফালে দিকে নজর পড়তেই, সেদিকে এগিয়ে গেল। পিছন উপর, সেই লোহার গলে দড়িটা ঘষবার চেষ্টা করল। কিছুই হল না। বরং ওরই হাতে লাগল। পাটের পাকানো মোটা দড়ি, লাঙলের ফালে, ঘষে কাটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সরে এল। আর হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বুদ্ধিটা আসলে ওর নিজের নয়। একটা বইয়ে পড়েছিল।

গোগোল মেঝেতে বসে পড়ল। পিছনের বাঁধা দু হাতের ফাঁকের মধ্যে, ও ওর পিছন দিকটা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করল। যতটা সহজ ভেবেছিল, ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়। ও বারে বারে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত, দু হাতের ফাঁকে পিছন দিকটা ঢুকিয়ে দিতে পারল। তারপরে শুয়ে পড়ে, বাঁধা হাত দুটো নীচে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত এনেই, আবার ঠেকে গেল। অনেক চেষ্টার পরে, হাঁটু ছাড়িয়ে একটা পা অনেকটা হাতের বাঁধনের কাছে এল। কিন্তু আর্চ করা ওর অভ্যাস নেই পিঠে ভীষণ ব্যথা লাগছে। তবু ও প্রাণপণ চেষ্টায় একটা পা বের করতেই, আর একটা পাও লাইনে বের করে আনল। পিছমোড়া বাঁধা দু হাত এখন ওর সামনে।

এবার খুলবে কী করে? গোগোল তা জানে। এবার এ এগিয়ে গেল কাস্তেটার কাছে। পা দিয়ে সেটাকে বঁটির মত চেপে ধরে, দড়ি কাটতে লাগল। কয়েক মিনিটের চেষ্টায় দড়ি কেটে গেল। গোগোল এখন দরদর ঘামছে। গায়ের জামাটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। করুক। ওর এখন তা দেখবার সময় নেই। মুখে বাঁধা গামছাটা খুলতে বিশেষ কষ্ট হল না। তারপরেও প্রথমেই দরজার ওপর দুম্ দুম্ করে পেটাতে লাগল। কয়েকবার পিটিয়েই থেমে গেল। বুঝল, কাজটা বোকামি হচ্ছে। টের পেলে, সেই লোকটাই আবার এসে পড়বে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। ও একবার খুঁটির দিকে দেখে নিল। মাটির দেওয়ালের ওপরে আড়াআড়ি একটা বাঁশ রয়েছে। ওটার ওপর উঠে দাঁড়াতে পারলে, টালিতে হাত পেয়ে যাবে। দু একটা টালি খুলতে পারলেই, বেরিয়ে পড়তে পারবে।

গোগোল আর দেরি করল না। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ও খুঁটি চেয়ে, টালির মাথার বাঁশ ধরল। সেখান থেকে পা ঝুলিয়ে দিল, আড়াআড়ি বাঁশের ওপর। কোন-

রকমে পা ঠেকিয়ে, টালির গায়ে হাতের চাপ দিল। কিন্তু সহজে খুলল না। যেদিকেই সরাতে যায়, টালি যেন সহজে নড়তেই চায় না। তখন হাত দিয়ে জোরে ঘুষি মারতেই একটা টালি একটুখানি উঠে পড়ে গেল। কোন রকমে সেটাকে ঠেলে সরাতেই, গোগোলের গায়ে রোদ লাগল। পাশের টালিটা ঠেলতে সহজেই সরে গেল। কোন রকমে মাথাটা বের করে বাইরেটা একবার দেখল। চারপাশে গাছ। রোদ গাছের মাথায়। এবার ও দু হাত বের করে, টালি ধরে বাঁশের থেকে জোরে লাফ দিয়ে পা তুলল। টালিতে ঠং ঠং শব্দ হল। কিন্তু ও টালির চালে উঠে পড়ল।

গোগোল জানে দরজাটা কোন্ দিকে। সেদিকে একবার দেখল। দেখেই ওর বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। দেখল, সেই লোকটা ঘরের দিকে আসছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু লোকটার নজর দরজার দিকে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে এগিয়ে আসছে। গোগোল টালির ওপর শুয়ে পড়ল। লোকটা এগিয়ে এসে যখন তালা খুলছে, শব্দ পেয়েই গোগোল টালির চালের পিছনে গিয়ে, সামনের একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। কিন্তু গাছ বেয়ে নামার সময় আর নেই। ও দরজার পাল্লার জোর শব্দ শুনতে গেল। পেয়েই নীচে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করল। কোন্‌দিকে ছুটছে, কিছুই জানে না। কেবল শুনতে পেল, পিছনেও কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

গোগোলের দম ফুরিয়ে আসছে। তবু প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। আর হঠাৎ ওর সামনে এসে পড়ল একটা সাইকেল। সাইকেল চালক আর দুজনেই লুটিয়ে পড়ল। গোগোল চিৎকার করে উঠল, 'ডাকাত! ডাকাত!'

সাইকেল যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি অল্পবয়সী ভদ্রলোক। আগেই গোগোলকে টেনে তুললেন, বললেন, 'কোথায় ডা তে? কে তুমি?'

গোগোল বলল, 'আমার নাম গোগোল। বিধানকাকাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছি। একটা লোক মহিষমর্দিনীর মূর্তি চুরি করেছে, আমি দেখেছি।'

ভদ্রলোক ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি দেখেছ? মহিষমর্দিনীমূর্তি নিয়ে তো গোটা গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেছে। পুলিশ এসেছে। আর একটি ছেলেকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমিই তা হলে সেই ছেলে?'

গোগোল তখন পিছনে তাকিয়ে দেখছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, বলল, 'আপনার সাইকেলে আমাকে একটু বিধানকাকার বাড়ি পৌঁছে দেবেন? চোরকে আমি দেখেছি। আর মহিষমর্দিনী কোথায় রেখেছে, তাও জানি।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সাইকেল রাস্তা থেকে তুললেন। সীটের সামনে গোগোলকে বসিয়ে বাঁই বাঁই চালিয়ে দিলেন। মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন বিধানকাকার বাড়ির সামনে। সেখানে তখন লোকজনের ভিড়। পুলিশের জীপ। বিধানকাকা কোথা থেকে ছুটে এসে গোগোলকে জড়িয়ে ধরলেন। গোগোল প্রায় অজ্ঞানের মত

বিধানকাকার কোলে ঢলে পড়ল। বিধানকাকা গোগোলকে কোলে নিয়ে বাড়ির সামনের বারন্দায় উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'শিগ্‌গির কেউ এক গ্লাস জল নিয়ে এস।'

গোগোলের মনে হচ্ছিল, ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিধানকাকা ওর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। গোগোল চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'জল খাব।'

বিধানকাকা ওর মুখের সামনে গেলাস ধরতেই চোঁ চোঁ করে চুমুক দিল। কিন্তু ভাল করে খেতে পারল না।

বলল, 'বিধানকাকা, মহিষমর্দিনীকে দীঘির এক কোণে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে। আমি সব দেখেছি। যে লোকটা আরতির সময় ঘণ্টা বাজায়, সে আমাকে দীঘির ধার থেকে ধরে নিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। আমি……।'

একজন বলে উঠলেন, 'তুমি আর কথা বলো না গোগোল, সবই বুঝেছি। আমরা যাচ্ছি।'

পুলিশ আর লোকজন সব ছুটে বেরিয়ে গেল। বিধানকাকার কোলে বসে গোগোল দেখল মা আর কাকীমা সামনে দাঁড়িয়ে। দুজনেই কাঁদছেন। বাবা ওর দিকে উদ্বেগে তাকিয়ে আছেন।

বিধানকাকা বললেন, 'সব কথা পরে শুনব গোগোল। তুমি এখন ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আগে কিছু খেয়ে নেবে চল।'

বিধানকাকা গোগোলকে কোলে নিয়েই বাড়ির ভিতরে গেলেন।

এক ঘণ্টা পরেই, মহিষমর্দিনীর মূর্তি বাড়িতে নিয়ে আসা হল। মূর্তির দামী গহনা কিছুই খোয়া যায়নি। চোরেরা সময় পায় নি। ভেবেছিল, ধীরে সুস্থে সব কাজ করবে। কিন্তু গোগোল তাদের সব্বোনাশ সাধল।

বিধানকাকার বাড়ির সামনে সবাই তখন গোগোলকে দেখতে চাইছে। সবাই জেনে গেছে, গোগোলের জন্যই চোর ধরা পড়েছে। গোগোলও জানল, স্বয়ং পুরোহিত নাকি চোরদের সাহায্য করেছে। বিধানকাকা তো গোগোলকে মাথায় নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'আমাদের সাতপুরুষের দেবীকে গোগোল পাইয়ে দিয়েছে।'

থানার ওসি, বললেন, 'কিন্তু খুবই ভাগ্য ভাল, গোগোল বেঁচে গেছে। গোগোলকে সত্যি হয়তো জলে ডুবিয়েই মারত।'

বিধানকাকা হাসছেন, কাঁদছেন। পাগলের মত হয়ে গেছেন। বললেন, 'ভাগ্যিস গোগোলকে জোর করে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। নইলে আজ আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেত। আর ওকে চিরদিনই মহিষমর্দিনীই রক্ষে করবেন।' বলে গোগোলকে চুমো খেয়ে আদর করলেন।

সবাই তখন চিৎকার করছে, 'জয়, গোগোলের জয়। জয় মহিষমর্দিনীর জয়।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে হাসছে।
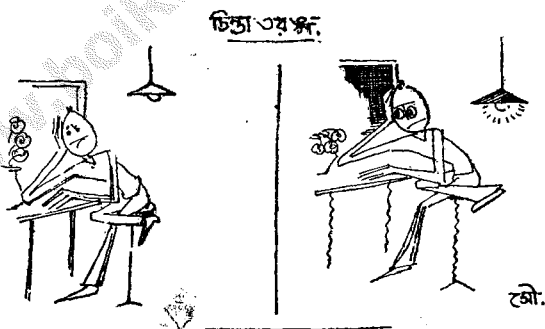
অন্তঃশীলা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক পর্ব কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল।

অনেক দিনের অশান্তি আর অসন্তোষের যে বাষ্প এতদিন আবদ্ধ হইয়াছিল, আজ হঠাৎ ছাড়া পাইয়া তাহার বেশ একটা হিসাব-নিকাশ হইয়া গেল। পাশাপাশি দুই বাড়ি। মুকুন্দ লাহিড়ী ও শ্যাম চক্রবর্তী। দুইখানা আটচালা টিনের ঘর পরম সুহৃদের ন্যায় পাশাপাশি অনেক দিন দাঁড়াইয়াছিল। গৃহস্বামীদ্বয়ের সৌহৃদ্য এক কালে যে ছিল না এমন নয়। সেরেস্তার আর নাজিরের এই মানিকজোড়টি যখন গুটি গুটি পা ফেলিয়া প্রত্যহ বিকালে নদীর তীরে বাহির হইত, পাড়ার একশ্রেণীর পরম সুখ-কাতর ব্যক্তিরা আক্ষেপে গা চুলকাইয়া মরিত। কেমন করিয়া ইহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে। মনো-মালিন্যেরবীজ তাহাদের অন্তরে রোপণ করিয়া একটু স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিবে।

ভগবান পূর্ণ করিলেন তাহাদের মনস্কামনা। তাঁহারা রিটায়ার করিয়া আসিলেন এবং তাহার পরই উভয়ে কেমন স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দেখা হইলে আর প্রাণের কথা জমিয়া ওঠে না, চক্রবর্তী বার দুই কাশিয়া বাতের ব্যথার অজুহাত তোলে,

লাহিড়ী মোকদ্দমার নথিপত্র উল্লেখ করিয়া এক পা দু পা করিয়া সরিয়া পড়ে। কেহ অপরকে·কেমন সহজে বরদাস্ত করিতে পারে না।

অপ্রীতি বিদ্বেষের এই প্রচ্ছন্ন ধারাটা অবশেষে প্রকাশিত হইল। লাহিড়ীর ছেলে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাইল অথচ চক্কত্তি-তনয় পাস করিতে পারিল না। প্রথম সূত্রপাত এই হইল। তাহার পর একটা-না-একটা সূত্র ধরিয়া এ পর্ব সমানে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল।

লাহিড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলের বয়স হইবে দশ কি এগার। চক্কত্তির ছোট মেয়ের অপর্ণার সহিত তাহার ভারি ভাব। দুই সংসারের এই নিত্য কলহের মধ্যে ইহারা যেন একটি মূর্তিমান ছন্দপতন।

ব্যাপারটা ইহাদের উপলক্ষ্য করিয়া।

কয়েকটা পেয়ারা লইয়া কথায় কথায় একটু ঝগড়া হইয়াছিল। পুরুষের দাবী চিরকালই অধিক। এ মন্তব্য করিয়া শ্যামল তিনটা অতিরিক্ত লইতেই নারীর অধিকারে ঘা লাগিল। অপর্ণা ঠোঁট উঁচু করিয়া দুএকটা ভাল কথা শুনাইয়া দিল।

কিন্তু শ্যামল পুরুষ। তাছাড়া গায়ে সে কম শক্তি রাখে না। কাজেই পৌরুষের অপমানটা সহজে সে হজম করতে পারিল না। আগাইয়া আসিয়া অপর্ণার ঝুলন্ত বেণীতে এক হেঁচকা টান দিয়া কহিল: বাঁদরী জিব খুব বেড়েছে না? মেয়েমানুষের এত লোভ কেন শুনি?

টানটা একটু বেসামাল হইয়া গেল। অপর্ণা ভ্যাঁ করিয়া ক্রন্দন জুড়িল। চক্কত্তি হাঁই-হাঁই করিয়া রঙ্গস্থলে ছুটিয়া আসিলেন। এবং তাহার পরই চরম। বকিয়া ঝকিয়া পাড়া সে মাথায় তুলিল। চক্কত্তির গৃহিণী অ'ড়াল হইতে লাহিড়ীর উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষ আপ্যায়িত করিলেন। এবং চক্কত্তি আদালতের স্মরণাপন্ন হইবেন—এই শেষ কঠিনবাক্য বলিয়া লম্বা পা ফেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ধড়াস্ করিয়া সশব্দে দরজা আঁটিয়া দিলেন।

ও বাড়ি শ্যামলের পিঠেও পূর্ণোদ্যমে কিছু পড়িতেছিল। অপর্ণা কাঁদিতেছিল। সত্যই শ্যামলদার জন্য তাহার মনটা হু-হু করিয়া কাঁদিতেছে। অকারণ অনর্থক সে চীৎকার করিল বলিয়াই তো এমন অপ্রীতি ঘটিল। শ্যামলদা কী ভীষণ মার খাইয়া গেল। সে না হয় পাইত ভাগে তিনটা কম। তাহাতে কী আসে যাইত। শ্যামলদা তো কষ্ট করিয়া গাছে চড়িয়া পাড়িয়া আনে। দুঃখ সমবেদনা এবং নিজের বিরুদ্ধে অপর্ণার মনটা রুদ্ধ ক্ষোভে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দুই বাড়ির প্রাচীর কিনারে একটা আমড়া গাছ। তাহারই ডালে বসিয়া অপর্ণা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্যামলদা তাহার জন্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই। আর আজ সম্পূর্ণ অকারণে তাহাকে এমন করিয়া মার খাওয়াইল ভাবিয়া নিজেকে সে কিছুতেই সংযত করিতে পারিতেছে না। আর বাবা মা কেমন অযথা চটিয়া

আছে উহাদের উপর, যেন একবার ঝগড়ার গন্ধ পাইলেই তাহাদের মন রক্তলোলুপ জোঁকের মত লি-লি করিয়া ওঠে। অত্যন্ত ক্রোধ আর বিরক্তিতে অপর্ণার এই মুহূর্তে যেন মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

অপু ?

সহসা অপর্ণা চমকিয়া উঠিল। পেছনের প্রাচীর বাহিয়া কে একেবারে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর্ণা চাহিয়া দেখিল শ্যামলদা। অত্যন্ত ম্লান ব্যথিত মুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার হাতে তিনটা পেয়ারা। কহিল: সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে অপু। তোর খুব লেগেছে নারে ?

অপর্ণা কিছু বলিতে পারিল না। ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শ্যামল তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। পরে সান্ত্বনা ভরা কণ্ঠে কহিল: চলরে অপু, আমরা হালদার বাড়িতে একটু ঘুরে আসি। জানিস তো আজ সন্ধ্যায় গান হবে সেখানে। কী চমৎকার যাত্রাপার্টি এসেছে—দেখবিখন।

প্রস্তাব হইতে যা দেরি। দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। মামলা রুজু করিতে হইবে—। চক্কত্তি গলদঘর্ম হইয়া তাহার খসড়া করিতে লাগিলেন।

আশা দেবী (গঙ্গোপাধ্যায়)-এর সৌজন্যে পাওয়া। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বালক-বয়সের এই লেখাটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।

ঠিকুজির নিকুচি

প্রমথনাথ বিশী

এক ধনী গৃহস্থের প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। পুত্রসন্তান সকলেরই কাম্য। পিতা যদি ধনী হয়। আর পুত্রসন্তান যদি প্রথম হয়, তবে তার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। পিতা এই উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করলো। বাড়িটি আলোতে আর ফুলে সুসজ্জিত করলো আর বন্ধুবান্ধবদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলো। বলাবাহুল্য বাড়ির গৃহিণী ও দাসদাসী নূতন বস্ত্র অলঙ্কার লাভ করলো, সর্বোপরি পুত্রটি রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত হ'ল। এই উৎসব বেশ কিছুদিন ধরে চললো। এইভাবে উৎসব শেষ হ'লে একজন পারিষদ প্রস্তাব করলো, বাবুজি সমস্তই তো আশানুরূপ হ'ল, কেবল একটি অবশ্য-কর্তব্য বাকী রইলো। পিতা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো কি সেই অবশ্য-কর্তব্য শীঘ্র বলো। পারিষদটি বলল, এই নগরে একজন বিচক্ষণ জ্যোতিষী আছে, তার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না, সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি তার নখাগ্রে। তাকে দিয়ে আপনার পুত্রের একটি ঠিকুজি তৈরি করে নিন। এ নগরের বহু লোকের ঠিকুজি সে রচনা করেছে, তার গণনা কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নি। এই বলে অনেকগুলি সার্থক গণনার উদাহরণ বিবৃত করলো। এই কথা শুনে পুত্রের পিতা বললো এখনি তাকে তলব করো। আহ্বান পেয়ে বৃদ্ধ জ্যোতিষী তখনি পুঁথিপত্তর ও খড়ি নিয়ে উপস্থিত হ'লে পিতা আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করলো। পিতার অভিলাষ শুনে জ্যোতিষী বললো, এ আপনার মতোই কথা। আমি এখনই ওই শিশুর ঠিকুজি তৈরি করে দিতেছি। আপনি শিশুটিকে এখানে আনবার আদেশ দিন। শিশুটি আনীত হ'লে অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিরীক্ষণ করে জ্যোতিষী বললো, এমন সর্বলক্ষণ যুক্ত শিশু আগে আর কখনো আমার চোখে পড়েনি। এ জাতক শতায়ু, বলবান, বিদ্যা, বিনয়সম্পন্ন হবে, আর এর খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। জ্যোতিষীর বাক্যে পিতা সবিশেষ আহ্লাদিত হ'ল। তথাপি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা জ্যোতিষী মহাশয় আমার পুত্রের কোন অরিষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন? জ্যোতিষী যথোচিত পরিমাণে নস্য গ্রহণ করে বললো, চন্দ্রেও কলঙ্ক থাকে, সর্বগুণোপেত শিশুতেও অরিষ্ট সম্ভব, তবে সে অরিষ্ট না থাকবারই সামিল। পিতা সভয়ে বললো কি সেই অরিষ্ট?

জ্যোতিষী বললো, শিশুর সিংহারিষ্ট আছে।

সিংহারিষ্ট কি?

সিংহ থেকে এর ক্ষতি হ'তে পারে।

পিতা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলল, আপনার কথাই সত্য, ও অরিষ্ট না থাকবারই শামিল।

সংবাদপত্রে পড়েছি, এই দেশের পশ্চিম প্রান্তে গির নামক অরণ্যে ছাপ্পান্নটি মাত্র সিংহ আছে। আমরা থাকি দেশের পূর্বপ্রান্তে—মাঝখানে হাজার যোজনের ব্যবধান। সেখানে আমার পুত্রের যাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই সিংহারিষ্ট সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। তখন পিতা প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে জ্যোতিষীকে বিদায় দিল।

জ্যোতিষী যাওয়ার সময়ে বলে গেল, আমি অচিরে শিশুটির লিখিত ঠিকুজি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। নিশ্চিন্ত নির্ভয় পিতা পারিষদ দলের মধ্যে বললো, হ্যাঁ, আমার পুত্রের যোগ্য জ্যোতিষী বটে। পারিষদদল একযোগে বলে উঠলো, হাঁ বাবুজি, এঁর গণনা কখনো নিষ্ফল হয় না। এদিকে পুত্রটি শনৈঃ শনৈঃ চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে শিশুটির পিতামহ তীর্থযাত্রা অসমাপ্ত রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে, পৌত্র মুখ দেখার আসায়। পৌত্রকে কোলে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর তার সিংহারিষ্ট আছে শুনে পৌত্রের নাম রাখলো 'সিংহদমন'। বুড়ো ঐ শব্দটা উচ্চারণ করে আর হাসে, বলে সিংহগুলোকে জব্দ করবার জন্যেই এর জন্ম, দেখে নিয়ো তোমরা। একদিন শিশুটিকে কোলে নিয়ে বৃদ্ধ গেল জ্যোতিষীর বাড়িতে, বলল চমৎকার গণনা করেছ, আমি নাম রেখেছি সিংহদমন। জ্যোতিষী বললো, ঠাকুর আমার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না; অন্ততঃ এ পর্যন্ত তো হয় নি।

বৃদ্ধ বললো জ্যোতিষী আমার একখানা ঠিকুজি করে দাওনা কেন, যদিও জীবনের বারো আনা কাটিয়ে দিয়েছি।

বাধা দিয়ে জ্যোতিষী বললো শেষের চার আনাই তো আসল। কিছু ভাববেন না

কালকেই আপনার ঠিকুজি দিয়ে আস্‌বো। পরদিন ঠিকুজি হাতে নিয়ে এসে জ্যোতিষী জানালো আপনার সমস্তই ভালো কেবল একটি 'ইষ্টকারিষ্ট' আছে।

বৃদ্ধ শুধালো, সেটা আবার কি ?

মাথায় ইটের আঘাত লাগতে পারে।

বৃদ্ধ মাথার প্রমাণ সাইজ টাকটির উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললো—এটা কি কও জ্যোতিষী, মাথায় ইটের আঘাত লাগ্‌বে কেমন করে। আমি তো শয়ন করি নবনির্মিত বাড়িতে।

সে যা বলেছেন ঠাকুরমশাই, প্রচণ্ড ভূমিকম্প না হ'লে ও বাড়ি টলবে না। তবে শাস্ত্রে লেখা আছে তাই বললাম।

বুড়ো আশ্বস্ত হ'ল। তবে যতই আশ্বস্ত হোক, নবনির্মিত ইষ্টকালয়ের মধ্যে আর ঘুমোত না। ঘুমোত ফাঁকা মাঠের মধ্যে। প্রথমটা অস্বস্তি বোধ হ'ত, কিন্তু ক্রমে সয়ে গেল।

এদিকে পৌত্রের বয়স পাঁচ সাত বছর হ'য়েছে। জানতে পেরেছে যে সিংহ তার শত্রু। তাই বইয়ের পাতায় বা অন্যত্র সিংহের ছবি দেখলেই সরোষে ছিঁড়ে ফেলে দেয়—বলে বেটা আমাকে মারবি, এখন তোকে রক্ষা করে কে ?

একদিন রথের মেলায় গিয়ে একটা কাঠের সিংহ দেখে ভাঙতে উদ্যত হ'লে দোকানী বললো কি করো ?

শিশুটি বললো ভাঙবো, সিংহ আমার শত্রু।

দোকানী হেসে বলল, দাম দিয়ে কিনে নাও, তারপরে বধ করো। দেখো কর্তা ওর মধ্যে পেরেক আছে।

ছেলেটি কঠোর সিংহটি বাড়িতে নিয়ে এসে আছাড় দিয়ে ভাঙলো। সিংহটি কাঠের বিধায় সহজেই ভেঙে গেল, সিংহদমনের হাতে বিঁধে গেল একটা পেরেক, ঐ পেরেকটি দিয়ে সিংহের দুটো অংশ জোড়া দেওয়া ছিল। ছেলেটির হাতে রক্তপাত হ'ল। পেরেকটি ছিল মরচে ধরা। রাতে শিশুর জ্বর হ'ল।

এদিকে বৃদ্ধ মাঠের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। আকাশে উড়ে যাচ্ছিল একটা ঈগল পাখি, মুখে ছিল একটা কচ্ছপ। কচ্ছপের ছট্‌ফটানিতে হঠাৎ সেটি মুখভ্রষ্ট হ'ল আর পড়বি তো পড়, পড়লো সুখশায়িত বৃদ্ধের প্রশস্ত টাকের উপরে। ভোর রাত্রে এক সঙ্গে পৌত্রের ও পিতার মৃত্যু। শোকাকুল পিতা দুই ঠিকুজি হাতে করে সগর্জনে ছুটে গেল জ্যোতিষীর বাড়িতে। জ্যোতিষী শান্তভাবে বলল—বাবুজি এরকম ক্ষেত্রে শোক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভেবে দেখুন—আমার গণনা তো নিষ্ফল হয়নি, সিংহারিষ্ট ও ইষ্ট-কারিষ্টই তো এদের মৃত্যুর কারণ।

ক্রুদ্ধ পিতা বলে উঠলো তোর ঠিকুজির নিকুচি করি। এই বলে ঠিকুচি দুখানা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

এক রাজার পাঁচ রানী। পাঁচ পাঁচটি রানী থাকলে কি হবে রাজা নিঃসন্তান। রাজার বাড়ি যেন বাড়ি নয়, মাঠঘাট। খাঁখাঁ করছে, ধুধু করছে। ছেলে নেই, পুলে নেই। এমন বাড়িতে কখনো মন বসে? রাজার মনমেজাজ সব সময়েই তিরিক্ষি! পাঁচ রানী যেন চোর হয়ে থাকেন। একদিন এক সন্ন্যাসী ভিক্ষে চাইতে রাজবাড়ির দুয়োরে এসে দাঁড়ালেন। পাঁচ রানী ছুটে গেলেন পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে। সন্ন্যাসীর ধুলো পা ধুইয়ে, রেশমী আঁচলে মুছিয়ে, যেন সোনাপা করে দিলেন। সন্ন্যাসী অনেক দূর হেঁটে আসছেন তো, সেই হিন্দুকুশ পর্বত থেকে। সব ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল রানীমাদের যত্নে। এক রানীমা বাতাস করছেন, এক রানীমা পদসেবা করছেন, এক রানীমা ফলমূল ধুয়ে এনে শ্বেতপাথরের থালায় সাজিয়ে দিচ্ছেন, এক রানীমা গরম দুধ জুড়িয়ে স্ফটিকের গেলাসে ভরে দিচ্ছেন। এক রানীমা আসন পেতে দিচ্ছেন—সন্ন্যাসী খুব খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন—'মায়েরা, তোমরা বড়ো ভালো মেয়ে, তোমাদের মেয়ে যেন তোমাদের ঠিক এমনি করেই যত্ন করে।'

—পাঁচ রানীমা তখন হাপুস নয়নে কেঁদে বললেন—"থাকলে তো করবে ? মেয়ে কোথায় ?

সন্ন্যাসী তখন ওঁর ঝুলি থেকে পাঁচটি পারিজাত কুসুম বের করে পাঁচ রানীকে দিলেন। বললেন—'পরশুদিন দোলপূর্ণিমা। মধ্যরাত্রে নদীতে স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে, এই পাঁচটি ফুল তোমরা সোনার ঘটের মধ্যে ফেলে, দোলমঞ্চে বসিয়ে রেখো। পাঁচ দিন পরে দেখো, কী হয়।' পাঁচ রানী তো ভীষণ খুশি। তাঁরা ছুটে গিয়ে সোনার ঘট গড়তে দিলেন স্যাকরাকে। দোলপূর্ণিমার চাঁদ যখন মাঝগগনে, সেই মধ্যরাত্রে তাঁরা নদীতেস্নান করে এসে ঘটটির মধ্যে পাঁচটি ফুল ফেলে সেই ঘট দোলমঞ্চে স্থাপন করলেন। পাঁচ দিন পরে ভোরবেলা দোলমঞ্চে ছুটে গেছেন পাঁচ রানী। দেখেন ঘটের মধ্যে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে খেলা করছে। রানীদের খুশি আর ধরে না। দোল-পূর্ণিমার চাঁদের মতোই তার রূপ ফেটে পড়ছে, গায়ে পারিজাত কুসুমের সুগন্ধ। মায়েরা নাম রাখলেন পঞ্চপুষ্পা।

মেয়েকে দেখে কোথায় গেল রাজার সেই তিরিক্ষি স্বভাব ? রাজার হাসি খুশি যেন উথলে পড়ছে। রাজসভায় আনন্দের বান ডেকেছে।

রাজকুমারী পঞ্চপুষ্পা মায়েদের যত্নে সংসারের সব কাজে যেমন নিপুণ হয়ে উঠলেন, আর বাবার যত্নে পৃথিবীর সব শাস্ত্রেও তেমনি পারদর্শিনী হলেন। কিন্তু তাঁর ওজন পাঁচটি পারিজাত কুসুমের সমানই রইল। আর বাড়ল না।

এমন গুণী কন্যার জন্য পাত্র পাবেন কোথা থেকে রাজামশাই ? কত পাত্র আসে, রাজপুত্রেরা, মন্ত্রিপুত্রেরা, পণ্ডিতপুত্রেরা, সদাগরপুত্রেরা, রাজামশায়ের আর কাউকেই পছন্দ হয় না। শেষে রাজা ঘোষণা করলেন, যে-পাত্র এসে কন্যার ওজন কত বলে দিতে পারবেন, তাঁর হাতেই কন্যা সম্প্রদান করা হবে। কিন্তু চেষ্টা করেও যে বলতে না পারবে, তার শাস্তি, চিরদিনের জন্য কারাগারে বন্দী থাকতে হবে। এদিকে পঞ্চপুষ্পার ওজন কত, সেই খবর তাঁর বাবামায়েরা ছাড়া জগতে আর কেউই জানত না।

শুভদিন দেখে কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে রাজামশাই তো স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে এক হাজার দুর্বার সাহসী রাজপুত্র এলেন কিন্তু কেউই আর কন্যার ওজন বলতে পারেন না ! সবাইকে রাখবার জন্য তখন মস্তবড় এক কারাগার বানাতে হল। আলাদা লোকজন রাখা হলো, সেই কারাগারটা ঝাড়পোঁছ করতে, আলাদা রান্নাঘর হলো, আলাদা ঠাকুর রাখতে হলো—স্বয়ম্বর সভার বন্দীদের পুষতেই যেন রাজ্যে যজ্ঞিবাড়ি পড়ে গেল। মাথা নেড়ে মন্ত্রিমশাই বললেন—'রাজামশাই, আর তো স্বয়ম্বর ডাকা চলবে না ! এবার থেকে যে নিজে আসবে খবর শুনে, শুধু সেই আসবে। নইলে এই ফেল-করা পাত্রদের পুষতে-পুষতেই তো রাজভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে।'

তারপর থেকে রাজকুমারী পঞ্চপুষ্পার জন্যে আর পাত্র খোঁজা হয়না। রাজকুমারী আপন মনে থাকেন। ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, গান করেন, বীণা বাজান আর সকাল বেলায় নানা বিষয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে বিশ্বের যত কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করেন।

একদিন রাজবাড়িতে এক সন্ন্যাসী ক্লান্ত হয়ে এলেন। রাজকুমারী পঞ্চপুষ্পা তখন বীজগণিতের একটা জটিল অঙ্কের সমাধান খুঁজছেন, সন্ন্যাসীকে মোটে দেখতেই পেলেন না। সন্ন্যাসী বারবার ডাকলেন। ডাক শুনতে পেয়ে পাঁচ রানীমা বেরিয়ে এলেন। এসে দেখেন আরে, এই তো সেই মহান্ সন্ন্যাসী যার কৃপায় তাঁরা কন্যা পেয়েছেন! সন্ন্যাসীকে পেয়ে রানীদের আনন্দ ধরে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী বললেন—

—'কই মা, তোমাদের মেয়েরা কোথায়?'

রানীরা বললেন—'মেয়েরা মানে? আমাদের তো একটিই মেয়ে।'

—'কেন? পাঁচটি ফুল দিলুম, একটি মেয়ে কেন? পাঁচটি ফুল পাঁচটি ঘটে রাখোনি!' রানীরা হায় হায় করে উঠলেন।

—'আমরা তো বুঝতে পারিনি সন্ন্যাসী ঠাকুর। আমরা ভেবেছি সবগুলি ফুল একটি ঘটেই রাখতে হবে।'

সন্ন্যাসী বললেন—'বড় মুশকিল হল। এখন পাঁচ কন্যার মত গুণ নিয়ে যে কন্যা জন্মেছে, তার যোগ্য বর পাবে কোথায়?'

—'পাত্র পাচ্ছিনাই তো। পাত্ররা সবাই ফেল্ করে, কারাগারে শুয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন।'

'তাই বল! সব পাত্তর ফেল্ করেছে? ও—সেইজন্যই মেয়ে আমার ডাক শোনেনি!' পাঁচ পারিজাত ফুলের গুণ নিয়ে একটিমাত্র মানুষ জন্মেছে, তার মনে কি শান্তি আছে? বরং ওকেই যুবরাজ করে দাও। রাজ্য পরিচালনার ভার মাথায় পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজা বরং সিংহাসন থেকে নেমে বিশ্রাম করুন।'

চোখ কপালে তুলে পাঁচ রানীমা বললেন—'সে কি কথা, মেয়ের বিয়ে হবে না? জামাই হবে না? নাতি নাতনীর মুখ দেখা হবে না?'

—'হবে হবে। সময় মতন সবই হবে। পঞ্চপুষ্পাকে এবার সন্ন্যাসীর কাছে ডেকে নিয়ে আসা হলো। পঞ্চপুষ্পা খুব যত্ন করে তাঁকে সেবা করলেন। বার বার মাপ চাইলেন ডাক শুনতে না পাওয়ার জন্য। ইনি তো দুর্বাসা নন। এই ভালোমানুষ সন্ন্যাসী অভিশাপ তো দিলেনই না, মাপ করে দিলেন। উপরন্তু যাবার সময়ে পঞ্চপুষ্পার হাতে তাঁর জটার একটি লম্বা চুল দিয়ে বলে গেলেন—'কখনো মুশকিলে পড়লে, এই জটাকেশকে জিজ্ঞেস কোরো, সে সুবুদ্ধি দেবে।'

রাজামশাই বুড়ো হয়েছেন। রাজ্য আর ভাল লাগে না। সন্ন্যাসীর কথা শুনে তাঁর খুবই আনন্দ হলো। তিনি পরদিনই শুভমুহূর্ত খুঁজে, মেয়েকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। পাঁচ রানীর মনে শান্তি নেই। এইটুকুনি মেয়ে, যেন টুনটুনি পাখির প্রাণ, এম্নি হালকাপলকা, এম্নি পরী পরী, পাঁচটা পারিজাত ফুলের

সম্মান যার ওজন। তাকে কিনা বসানো হলো রাজ্যশাসনের মতন একটা ভারী কাজে!

রাজকন্যা কিন্তু খুব খুশি। এতদিনে তাঁর এত লেখাপড়া শেখা কাজে লাগবে। রোজ সিংহাসনে বসে রাজকন্যা বিচার করেন। রাজ্যশাসনে তাঁর জুড়ি নেই বোঝা গেল। বাবার চেয়েও দক্ষ। দেশের লোক খুব খুশি। শুকনো ক্ষেতে জল দেবার জন্যে নালা খোদাই করা হলো। দূর নদীর জল গাঁয়ে-গাঁয়ে চলে এল, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ঢলে পড়ল। ফল বাগানের পোকাদের উৎপাত বন্ধ করা হলো ওষুধ লাগিয়ে গাছের পাতায়। গাছে গাছে ফল উপচে পড়ল। রাস্তার ধারে ধারে সাধুসন্ন্যাসী, বণিক সদাগর, পথচারীদের বিশ্রামের জন্যে ঘর তৈরি হলো, জলসত্র হলো। পুকুর খোঁড়া হলো।

কন্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কে নয়? বাচ্চাদের জন্যে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা হলো, রোদ্দুরের মধ্যে তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে তাদের আর দূরে দূরে পণ্ডিতদের বাড়ি পড়তে যেতে হয় না। সব বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দেখতে না দেখতে অ আ ক খ শিখে ফেলল।

রাজকন্যার সবই ভাল, তবুও পাঁচ রানীর মনে সুখ নেই। তাঁদের কেবল জামাই-জামাই মন করে।

একদিন রাজামশাই তপস্যা শেষ করে ভাবলেন—'যাই দেখে আসি মেয়েটা কেমন রাজ্যপাট করছে।'

রাজ্যে ঢুকে তো রাজা অবাক! নতুন নতুন রাস্তাঘাট, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল, বাগানে বাগানে ফল, দোকানে দোকানে মালপত্তর চারিদিকে কত কুয়ো, কত পুকুর, পথিকদের বিশ্রামঘর, পাড়ায় পাড়ায় বাচ্চাদের স্কুল—এ কি তাঁর সেই রাজ্য? সব লোকের মুখে হাসি। তিনি খুশি হয়ে ভাবলেন যাক, তবে আর রাজপুত্তুর খুঁজতে হবে না, যে কোনো একটি ভাল ছেলে পেলেই জামাই করা যাবে। মেয়ে তো আমার পাঁচ রাজপুত্তুরের সমান রাজ্যপাট করছে।'

রাজা এবার দেশে দেশে পাত্র খুঁজতে বেরুলেন।—রাত্রি হয়েছে, রাজা তখন পাশের রাজ্যে। এক চাষার বাড়িতে গিয়ে তিনি আশ্রয় চাইলেন। চাষার দুই বাপ বেটার সংসার। তার বৌ নেই। চাষা খুব যত্ন করলে ফরসা মাদুর পেতে বিছানা করে দিলে, গরম গরম ভাত-আলু সেদ্ধ-ডিম সেদ্ধ রেঁধে পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা-সর্ষের তেল দিয়ে তরিবৎ করে মেখে দিলে। তরমুজের শরবত করে দিলে।

রাজা শুলেন। তাঁর পায়ে তেল মালিশ করে দিতে দিতে চাষীর চোখ থেকে একবিন্দু জল পড়ল রাজার পায়ে।

রাজা চমকে উঠলেন।—'কী পড়ল?'

চাষা বললে—'ও কিছু নয়, চোখের জল।'

—'সেকি কথা? চোখের জল পড়ে কেন? আমার মেয়ের রাজ্যে তো চোখের জল পড়ে না কারুর?'

'আমাদের রাজ্যেও পড়ত না। কিন্তু এখন পড়ে। রাজপুত্তুর যে ঘুমিয়ে পড়েছেন সাত বছর হলো। বিদেশ থেকে দৈত্য এসে রাজ-রানীকে মেরে ফেলেছে। রাজপুত্তুর বুকে অমরকবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, আয়ু না ফুরোলে কেউ তাকে মারতে পারবে না। তাই তিনি মরেন নি, ঘুমিয়ে পড়েছেন। দৈত্য রোজ একজন করে ছেলে খায়। তিন দিন বাদে আমার ছেলেকে খাবে। আমি বলছি 'আমাকে খাও' তা খাবে না। তার কচিমাংস চাই। রাজা নেই, কে আমাদের রক্ষা করবে।

রাজামশাই শুনে খুব বিব্রত হলেন। কিন্তু তিনি তো বুড়ো হয়েছেন, দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তাঁর নেই। ছেলেও নেই তাঁর, যাঁকে পাঠাবেন দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। পঞ্চপুষ্পার যদিও বুদ্ধির জোর আছে, গায়ে তো জোর নেই। রাজার আর ঘুম হলো না। রাজা খুব ভোরবেলা উঠে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেছে। তিনি বন্দীশালায় গিয়ে রাজবন্দীদের ডেকে বললেন—'পাশের রাজ্যের দৈত্যকে মারতে পারলে আজই তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে।'

তখন একসঙ্গে একহাজার দুঃসাহসী রাজপুত্তুরের হাতের তরোয়াল আর মুখের হাসি ঝলসে উঠল। বন্দীশালার দরজা খুলে দেওয়া হলো। হাজার রাজপুত্তুর ঝন্ ঝনাৎ করে পায়ের শেকল বাজিয়ে পাশের রাজ্যে চললেন। দৈত্য তো সেই শব্দ শুনেই ভয়ে কাঠ! আর যেই না একহাজার খাপখোলা তরোয়ালে রোদ্দুরের ঝলক লেগেছে, মনে হলো যেন দিগন্তে দৈবী আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে উঠল, যেন লক্ষ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। দৈত্য তো বাপ্‌রে মারে বলে ছুটে পালাচ্ছে। পালাবে আর কোথায়? শেকল দিয়ে বাঁধা এক হাজার রাজপুত্তুর তো প্রাসাদ ততক্ষণে ঘিরেই ফেলেছেন। দৈত্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। পঞ্চপুষ্পার ওজন তাঁরা জানে না বটে, কিন্তু তরোয়াল তো চালাতে জানেন।

মুহূর্তে পাশের রাজ্য ভয়মুক্ত হয়ে গেল। তখন রাজা প্রত্যেকের পায়ের শিকল কেটে, রাজপুত্রদের ঘোড়া, রথ, মুকুট, সমস্তই ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরা মনের আনন্দে যে যার রাজ্যে ফিরে গেলেন, পঞ্চপুষ্পার সঙ্গে চির বন্ধুত্বের শপথ পাতিয়ে। রাজকন্যারএখন এক হাজারটি বন্ধুরাজ্য গড়ে উঠল। প্লাস একটি। মানে এই দৈত্য-তাড়ানো চাষাদের রাজ্যটি।—কিন্তু এই রাজ্য নিয়ে একটা মুশকিল বাধলো। রাজবাড়িতে কেউ নেই, রাজ-বংশেই কেউ বেঁচে নেই। একমাত্র ঘুমন্ত রাজপুত্তুর ছাড়া। রাজ্যশাসন করবে কে?

রাজামশাই বললেন—'ক'দিন না হয় আমিই রাজ্যটা দেখছি। কিন্তু কবে তোমাদের রাজপুত্রের ঘুম ভাঙবে? আমাকে তো মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে যেতে হবে।' প্রজারা কেউ জানে না রাজপুত্রের এই ঘুম কত দিনের জন্য। সাতটা বছর তো পূর্ণ হয়ে গেছে।

রাজা বললেন—'দাঁড়াও বাপু, আমার মেয়েকে বরং ডেকে নিয়ে এসো, তার সঙ্গে আগে একটু পরামর্শ করি আমি।'

তখন এদের প্রজারা গিয়ে সোনার রথে করে পঞ্চপুষ্পাকে ডেকে নিয়ে এল। রাজা আর পঞ্চপুষ্পা মিলে ঘুমন্ত রাজপুত্রকে দেখতে গেলেন।

—ওহো, কী রূপ। যেন গোলাপী আকাশে ভোরের সূর্যটি ঘুমিয়ে পড়েছে। গোলাপী ভেলভেটের বিছানায় রাজপুত্তুর, যেন গোলাপী ভেলভেটের খাপে ঝকঝকে রুপোলি ইস্পাতের তরোয়ালটি শুয়ে আছে। পঞ্চপুষ্পার চোখে জল এসে গেল।

তিনি জটাকেশের শরণ নিলেন।

—'হে জটাকেশ, বলো এই রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হবে কিসে?'

জটাকেশ বললে—'মাথায় পাঁচটি পারিজাত ফুল ছুঁইয়ে দিলেই তিনি জেগে উঠবেন।'

এখন, পাঁচটি কেন, একটিও পারিজাত ফুল পৃথিবীতে ফোটে না।

হায় রে! এ যে অসাধ্যসাধনের ব্যাপার। সে তো দেবতাদের বাগানের ফুল। এ ঘুম তবে ভাঙবার নয়।—ফিরে যাবার সময়ে পঞ্চপুষ্পা মায়াভরে রাজপুত্তুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলেন। আহা রে, এমন যার দেবতার মত রূপ, সেই ছেলের জীবনটা ব্যর্থ হলো!

পঞ্চপুষ্পার পাঁচটি পুষ্পকলির মতো আঙুল রাজপুত্রের কপালে রেখেছেন—কি-না-রেখেছেন, ঘুমন্ত রাজপুত্র তাঁর বিশাল দুটি চোখ খুলে ভ্রমরকালো মণি দুটি মেলে পঞ্চপুষ্পার মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইলেন।

—'তাই তো! তাই তো!' রাজা বললেন—'সত্যিই তো! সত্যিই তো! আমাদের মেয়ে নিজেই তো পাঁচটি পারিজাত ফুলের সমান, তাইতেই রাজপুত্রের ঘুম ভেঙেছে!'

দুই দেশ জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেল। দুই রাজ্যের প্রজারা সবাই বললে—'রাজপুত্তুরের সঙ্গেই রাজকন্যা পঞ্চপুষ্পার বিয়ে দেওয়া হোক।' পাঁচ রানী, রাজারও তাই মত। কিন্তু, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, মাথা নেড়ে রাজকন্যা বললেন—'না।'

সে কী? না কেন?

কন্যা বললেন—'পিতৃসত্য সবার আগে। রাজপুত্র যদি আমার ওজন বলতে পারেন, তবেই বিয়ে হবে। নইলে কারাগার।'

ইতিমধ্যে বিয়ের যোগাড় শুরু করেছেন রাজ্যসুদ্ধু লোক—রাজাপ্রজা সকলে। একথা শুনেই আবার দুই রাজ্যে কান্নার ঢেউ বয়ে গেল। ও প্রশ্নের উত্তর তো কেউই জানে না!

কিন্তু ঘুমভাঙা রাজপুত্তুর অবাক হয়ে বললেন—'এই প্রশ্ন? এ আর কঠিন কী? রাজকন্যে পঞ্চপুষ্পা তো পাঁচটি পারিজাত ফুলের সমান!'

ঘুম ভাঙবামাত্র তিনি রাজাকে ওই কথাটিই বলতে শুনেছিলেন কিনা! তখন রানীমাদের আহ্লাদ আর দেখে কে? আর রাজারই বা সে কী গোঁফের নিচে মুচকি হাসি!

রাজবাড়িতে সানাই বেজে উঠলো।

ভূতের জ্বর

বিমল কর

দত্তকাকার বাড়িতে আমরা গল্প শুনতে যেতাম। দত্তকাকা ছিলেন রেলের গার্ড। মালগাড়ি নিয়ে গয়া মোগলসরাই সাসারাম করে বেড়াতেন। কাকিমা ছিলেন শান্ত-শিষ্ট মানুষ, ছেলেপুলেদের বড় ভালবাসতেন, আমরা কত রকম অত্যাচার যে করতাম কাকিমার ওপর! ওঁদের নিজের কেউ ছিল না, বাচ্ছা-কাচ্চাও নয়। বলতে গেলে আমরাই ছিলাম সব।

একদিন, খুব বর্ষা চলেছে তখন, দত্তকাকা গিয়েছিলেন সাসারাম মালগাড়ি নিয়ে, ফিরে এলেন দিন দুই পর, এক গা জ্বর নিয়ে। আমরা গেলাম দত্তকাকাকে দেখতে। গিয়ে দেখি, কাকা গাঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেও চোখ লালচে, গলার স্বর ভাঙা ভাঙা, নাক-মুখ ফোলা ফোলা। দত্তকাকা বললেন, "আয় আয়! মালগাড়ি নিয়ে লাইনে ফেঁসে গিয়েছিলাম। গোটা একটা দিন বৃষ্টির মধ্যে সাসারাম থেকে মাইল দুই দূরে দাঁড়িয়ে। কী বৃষ্টি রে! ভিজে ন্যাতা হয়ে গেলাম।"

"জ্বরও হয়ে গেল!"

"জ্বর! না না, জ্বর তো বৃষ্টিতে ভিজে হয়নি। সে একটা কাণ্ডই ঘটে গেল।"

"কী কাণ্ড কাকা?" আমরা হইহই করে উঠলাম।

দত্তকাকা সব গল্পই শুরু করতেন কাণ্ড দিয়ে। বুঝলাম, আজও একটা গল্প হবে। আমাদের হইহই শুনে কাকা বললেন, "শুনবি কাণ্ডটা?"

"নিশ্চয়ই শুনব।"

"বেশ তা হলে, শোন। কিন্তু একটা কথা বলতে পারিস? আমাদের জ্বর হলে আমরা বগলে থার্মোমিটার লাগাই, দেখি কতটা জ্বর হয়েছে, একশো না একশো এক দুই। কিন্তু ভূতেদের জ্বর হলে কী দিয়ে দেখা হবে কত জ্বর হল?"

শুনে আমরা হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

আদি বলল, "কাকা, ভূতেদের জ্বর হয়?"

"অ্যাঁ! বলিস কিরে, ভূতেদের জ্বর হয় না। হরদম হয়। না হবে কেন?"

"না না, ভূত কি মানুষ যে জ্বর হবে!" আমি বললাম।

কাকা ভুরু কুঁচকে বললেন, তুই একটা মুখ্যু। ভূতের জ্বর হবে না কেন? ভূত কি প্রাণী নয়? ভূত কথা বলে, নাকী সুরে; ভূত ঢিল ছোঁড়ে; ভূত ঘাড় মটকায়; ভূত নাচানাচি, ছোটাছুটি করে, ভূত হাসে হা হা করে। এত কাজ সে করতে পারে মানুষের

মতন, আর তার জ্বর হতেই মানা! কে বলল তোকে, ভূতের জ্বর হয় না!"

অকাট্য যুক্তি।

আদি বলল, "ভাল্লুকেরও তো জ্বর হয়, কাকা।"

"ইয়েস। প্রাণী মাত্রেরই জ্বর হয়। ভূতেরও হয়।"

ঘাড় নাড়লাম। মানে, মেনে নিলাম—জ্বর হয়।

কাকা বললেন, "তা হলে গোড়া থেকে বলি, শোন। আমার যাবার কথা মোগলসরাই পর্যন্ত, কিন্তু সাসারামের আগে গিয়ে গাড়ি গেল আটকে। ঝড় বৃষ্টি জল—সে এক ভীষণ কাণ্ড। লাইনের ওপর জল দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি আর যায় কেমন করে। এঞ্জিনের কয়লা ভিজে জবজবে। ওদিকে সোন নদী ফেঁপে ফুলে উঠেছে। সব গাড়ি—আপ ডাউন—সব বন্ধ। কাজেই গাড়ি নিয়ে আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কাকা দু' টিপ নস্যি নিয়ে নাক ঝেড়ে নিল। হাঁচল।

"তারপর?"

দত্তকাকা বললেন, "অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম—আমাদের কিছু করার নেই! লাইন থেকে জল না সরে গেলে গাড়ি চলবে না। আর চোখে একবার লাইন না দেখলে ড্রাইভারই বা কী ভরসায় গাড়ি চালাবে! আমার গাড়ির এঞ্জিনের ড্রাইভার ছিল হায়দার। পাকা ড্রাইভার। আধ বুড়ো। ফায়ারম্যান ছিল জগদীশ। আর ছিল রবীন বলে এক ছোঁড়া। তা গাড়ি থেমে যাবার পর জল ভেঙে এসে হায়দার বলল, বাবু এঞ্জিনের বয়লারের আগুনটা আমি কোনো রকমে জ্বালিয়ে রাখব। আমার আর কিছু করার নেই।...আমি বললাম, তাই করো, তারপর ভাগ্যে যা হয় হবে। হায়দার চলে যাবার সময় বলল, আমরা তিন জন আছি। একজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আর থোড়া পরে সাঁঝ হয়ে আসবে। ফাঁকা জায়গা।...আমি মাথা নাড়লাম। একলাই থাকতে পারব। হায়দার চলে গেল।

"সন্ধ্যে হবার মুখে মুখে আবার নামল বৃষ্টি। যেমন বৃষ্টি তেমনি মেঘের ডাক আর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল আকাশে। চারদিক কালো হয়ে গেল। তুমুল বৃষ্টি। গাছপালা জঙ্গল, মাঠ—সবই ঢেকে গেল অন্ধকারে আর বৃষ্টিতে।

"তা ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি থামল। সন্ধ্যেও হয়ে গিয়েছে। ব্রেকভ্যানের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে পাগল হবার অবস্থা। বাইরে এসে দেখি—অন্ধকার আর অন্ধকার, চারদিকে শুধু জল, রেল লাইনের ওপর দিয়ে কলকল করে জলও বয়ে যাচ্ছে। ঝিঁঝি ডাকছে সারা জায়গা জুড়ে। "এমন সময় কে একজন দেখি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমার ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল। ভাবলাম হায়দার।

"বললাম কে হায়দার নাকি?...জবাব এল, আজ্ঞে না—আমি তরফদার।

"তরফদারটা আবার কে। এখানে এলোই বা কেমন করে? রসিকতা করছে নাকি

হায়দার ? বললাম, তুমি এই জল বৃষ্টি ঠেলে বারবার কেন আসছ হায়দার ? আমি ঠিক আছি।

"জবাব এল, আজ্ঞে আমি হায়দার নই, তরফদার।"

"'তরফদার ! সে আবার কে ?'

'তারিণী তরফদার।'

'এখানে তরফদার ! এলে কেমন করে ?'

'আমি দু বছর ধরে এখানেই আছি গার্ডবাবু।'

'এখানেই আছ মানে ?'

'আজ্ঞে আমাদের দেশবাড়ি ছোট বাঁকাবনী। জেলা পুরুলিয়া। রেলে চাকরি করতাম। পয়েন্টসম্যান। একদিন গয়ার শর্মাবাবুর সঙ্গে এই রকম মালগাড়িতে বসে মোগলসরাই যাচ্ছিলাম বেড়াতে। দু ডেলা আফিং খেয়েছিলাম। পা দানির কাছে বসে হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছিলাম—ঘুম এল। পড়ে গেলাম। রেল চলে গেল। আমি মরে গেলাম। তাতে কোনো অসুবিধে হল না। সামান্য তফাতে একটা ভাঙা কেবিন পড়ে আছে, সেখানেই সংসার পেতেছি।'

'বলো কি ! তুমি ভূত ?'

'আজ্ঞে ভূত হয়ে অসুবিধে তো কিছু হয়নি গার্ডবাবু। দিব্যি আছি। আমার সঙ্গী সাথীও আছে। একটা অসুবিধে অবশ্য হয়েছে বাবু। এই জায়গাটায় বড্ড মশা। ম্যালেরিয়ার মশা। আমায় ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। এক হপ্তা অন্তর অন্তর কাঁপিয়ে জর আসে। আজ সকাল থেকেই জর। হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তা আপনার গাড়ি দেখে বড় আশা নিয়ে এসেছি গার্ডবাবু। আমার জরটা একটু ঠাওর করে দিন। আর চার ছ'টা কুইনিন বড়ি দিন খেয়ে ফেলি।'

'কুইনিন বড়ি ? সে আমি পাব কোথায় ?'

স্বার্থপর হবেন না গার্ডবাবু! আপনাদের কাছে কুইনিন থাকে। শর্মাবাবুকে রাখতে দেখেছি।'

'আমার কাছে তো নেই।'

'কি আছে তবে ?'

'জোয়ানের আরক।'

'ওতে কি হয় ?'

'ওই অম্বল-টম্বল হলে খায়।'

'না বাবু, অম্বল আমার হয় না।...বেশ, তবে জরটা একটু ঠাওর করে দিন।'

'জর ! সে তো বগলে কাচের কাঠি দিয়ে দেখতে হয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্মাবাবুর সঙ্গে থাকত।'

'আমার কাছে ওটাও নেই।'

'কিছুই নেই! তা হলে আপনি বেরিয়েছেন কোন ভরসায়?'

'তা অবশ্য ঠিক।...তা আমি নাড়ি দেখতে পারি। জ্বর হলে নাড়ি দ্রুত হয়।'

'তবে তাই দেখুন।'

'হাতটা দাও।'

দত্তকাকা বললেন, "তোরা বিশ্বাস করবি না। নাড়ি দেখে আমি অবাক। নাড়িই নেই। বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হাত। মানে হাড়। একেবারে কনকন করছে। জ্বরের চিহ্নমাত্র নেই। তা তরফদারকে বললুম, তোমার তো বাপু সবই ঠাণ্ডা। জ্বর কোথায়?

"আমার কথা শুনে তরফদার হেসে উঠল কী হাসি। বলল কী জানিস? বলল, ভূতেদের জ্বর ঠাণ্ডার দিকে আর মানুষের জ্বর গরমের দিকে। মানে আমাদের যত গা গরম হবে তত জ্বর। ভূতদের বেলায় একেবারে উল্টো, যত ঠাণ্ডা হবে—তত জ্বর। শুনে আমি হাঁ। এ-রকম কথা জন্মেও শুনিনি।...তা তরফদার তো চলে গেল। কিন্তু বেটা ওই যে কাছে এসে জ্বর দেখিয়ে গেল, ব্যাস—আমারও ম্যালেরিয়া। মশার কামড় আর ভূতের ছোঁয়া—দুই হল ম্যালেরিয়ার কেরিয়ার। তা আমি বাড়ি এসেই টপাটপ কুইনিন খেয়ে নিয়েছি। জ্বরটাও যাই যাই করছে।...কিন্তু একটা কথা ভাবছি—ভূতের জ্বর দেখা একটা যন্তর বের করলে কেমন হয়!"

আমরা হট্টগোল করে বললুম, "খুব ভাল হয়। পারার বদলে কি থাকবে কাকা? আর কতটা লম্বা হবে? এক ফুট?"

দত্তকাকা বললেন, "দাঁড়া, জ্বরটা ছাড়ুক, তারপর ভাবব। এখন আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কুইনিন খেয়ে।"

বাঁশি বাজেনা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ডাঃ সেন বিষণ্নভাবে মাথা নাড়লেন।

রজতের বাবা শিবশঙ্করবাবু চেয়েছিলেন ডাঃ সেনের মুখের দিকে। ডাঃ সেনের মাথা নাড়া দেখে কোন মতে একটা ঢোক গিলে শিবশঙ্কর শুধালেন, রজতের ব্লাড রিপোর্ট পেয়েছেন ডাঃ সেন।

হাতের রেড ব্লু পেনসিলটা দিয়ে একটা সাদা কাগজের বুকে এলোমেলোভাবে আঁচড় টানতে টানতে ডাঃ সেন বিষণ্নগলায় যেন কতকটা ফিসফিস করে বললেন, পেয়েছি—

কি! রিপোর্টে কি পেলেন ডাঃ সেন। শিবশঙ্করের গলার স্বরে যেন একরাশ উৎকণ্ঠা আর ভয় ঝরে পড়লো। রিপোর্ট খারাপ।
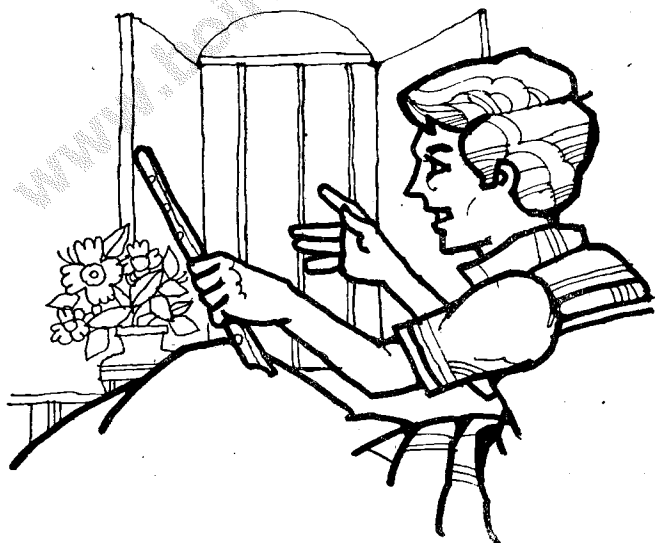
খারাপ। কি—কি খারাপ? কি হয়েছে কি রজতের।

ব্লাড ক্যান্সার। কথাটা প্রকাশ করলেন মাথাটা মৃদুভাবে নেড়ে।

ধক্ করে যেন একটা হাতুড়ির ঘা পড়লো শিবশঙ্করের বুকের উপর। হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেলেন শিবশঙ্কর। তার মুখ থেকে কোন শব্দ আর বের হল না।

স্ফূর্তিবাজ ছটফটে প্রাণচঞ্চল ছেলে তার বরাবর। তাছাড়া খেলায়ধুলায় এবং লেখাপড়াতেও ভাল—যাকে বলে একেবারে চৌকস রজত।

সেই রজতের যে কিছু দিন থেকে কি হলো—কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল গত মাস তিনেক। আগের মত আর দৌড়াদৌড়ি করে না, খেলার মাঠে নেমেও কিছুক্ষণ পরই খেলার মাঠ থেকে বের হয়ে আসে।

পড়ার টেবিলে বসেও পড়ায় মন বসে না।

ব্যাপারটা প্রথমে নজর পড়েছিল তার দিদি শর্মিলার।

শর্মিলা রজত থেকে বয়েসে প্রায় সাত বৎসরের বড়। কিন্তু বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাড়ির মধ্যে একমাত্র সঙ্গী ছিল ঐ দিদিই রজতের।

মাত্র ত এই বার বৎসরে পড়েছে রজত। সত্যিই কিই বা এমন বয়েস রজতের।

আর তার দিদি শর্মিলার উনিশ বৎসর বয়েস।

ক্লাস এইটের ছাত্র রজত।

ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

পড়ার ঘরে পাশাপাশি দুটো টেবিল।

একটা শর্মিলার অন্যটা রজতের।

খুব ছোটবেলায় রজতের যখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স ওদের মা মারা যান। শিবশঙ্কর আর বিবাহ করেন নি। শিবশঙ্কর ওকালতী করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন।

বাড়িটা সেকেলে, পৈতৃক বাড়ি, চক্রবেড়েতে।

বিরাট দোতলা বাড়ি।

রাস্তার উপর খানচারেক ঘর—তারপরই একটা বাঁধানো উঠান। তারপর অন্দর মহল বা বাড়ির ভিতরের অংশ, ভিতরেও একটা ছোট উঠান—তারপর দোতলা। মাঝখান দিয়ে উঠে গিয়েছে দোতলার সিঁড়ি।

নীচেতলায় চারটে ঘর—দোতলায় পর পর চারটে ঘর পুবমুখী—ছোট একটা ছাত—ছাতের পশ্চিম প্রান্তে আর একটা ঘর।

বাড়ির পিছন দিকে একটা পুকুর ও তার চারপাশে বাগান—নানা জাতীয় ফল ও ফুলের বাগান, বহির্মহলে একপাশে শিবশঙ্করের বাবার আমলে যে আস্তাবল ছিল তারই একাংশ গ্যারেজ। বাবা অনাদিশঙ্করবাবুর নিত্য ব্যবহৃত জুড়িগাড়িটা এখনো আছে—তবে ব্যবহৃত হয় না বড় একটা। বৃদ্ধ কোচওয়ান আবদুল এখনো বেঁচে আছে—আছে

বয়েসের ভারে জীর্ণ ওয়েলার ঘোড়া দুটো কেবল অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্যের সাক্ষী হয়ে। মাঝখানে একটা পার্টিশন—অন্যদিকে থাকে শিবশঙ্করের ঝকঝকে প্লিমাউথ গাড়িটা। আর ড্রাইভার রামনারায়ণ। অনাদিশঙ্করও উকিল ছিলেন—ছেলেকেও উকিল করে গিয়েছেন।

বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এখনো শিবশঙ্করের বৃদ্ধা মা হেমাঙ্গিনী দেবী বেঁচে আছেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই এখনো কর্ত্রী। বয়েস হলেও কিন্তু আজো অথর্ব হয়ে পড়েন নি।

তপ্তকাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

পরনে সর্বদা থাকে একখানা দুধ গরদ।

দাসদাসী অনেক।

তাদের মধ্যে পুরাতন ভৃত্য নারাণ—

সে অনাদিশঙ্করের আমলের অনেক দিনের লোক।

আর আছে দাসী সরলা।

সে ছিল শিবশঙ্করের স্ত্রী বিমলা দেবীর দাসী। বয়স হয়েছে তারও।

আর চার পাঁচজন দাসদাসী—ঠাকুর পঞ্চানন, মালী শম্ভু—কোচওয়ান—ড্রাইভার, আবদুল ও রামনারায়ণ।

ব্যাপারটা প্রথমে নজরে পড়েছিল শর্মিলারই।

কয়েকদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছিল পড়ার টেবিলে বই খুলে রেখে সামনে কেমন যেন ঝিম মেরে বসে থাকে রজত।

সেদিনও ভাইকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে শর্মিলা ডাকল, রজত।

কি দিদিভাই।

অমন করে বসে আছিস কেন রে।

ভাল লাগছে না।

শরীরটা ভাল লাগছে না।

হ্যাঁ—

শর্মিলা উঠে ভাইয়ের কপালে হাত রাখল, গাটা সামান্য গরম, ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

জ্বর হয়েছে বোধহয় রে তোর।

না—জ্বর হয়নি দিদিভাই, রজত বললে।

তবে—শর্মিলা ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

জানি না—শরীরটা যেন কেমন লাগছে।

যা শুয়ে থাক গে—

শুয়ে থাকবো কি? স্কুলে যাবো না—সকাল নটা বেজে গিয়েছে।

না—আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

শর্মিলা ভাইকে স্কুলে যেতে দিল না।

কিন্তু পরের দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, ভাল লাগে না রজতের, কিছু ভাল লাগে না। শর্মিলা বাবাকে জানাল কথাটা।

ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ চক্রবর্তী এলেন—দেখলেন ভাল করে রজতকে পরীক্ষা করে। কিন্তু তেমন কোন রোগ ধরতে পারলেন না।

তবু কিছু ঔষধপত্র দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ঔষধে কোন কাজ হলো না, রজত যেন দিনকে দিন কেমন ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। জোর করে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে—খেলার মাঠেও যায়—স্কুলেও যায় কিন্তু বেশীক্ষণ কিছুই করে না। কেননা একটা অবসন্নতা তাকে যেন ক্রমশঃ ক্ষয় করে ফেলছে। মধ্যে মধ্যে সর্দি কাশি দেখা দেয়—মাথা ধরা, পেটের গোলমাল, অবসন্নতা, রজতের মনে হয় কাল বোধহয় সে একটু ভাল বোধ করবে কিন্তু পরের দিন সেই একই ব্যাপার, সেই মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, নয়ত অন্য কিছু। ডাঃ চক্রবর্তীই তখন মাস দুই বাদে শিবশঙ্করকে বললেন একবার ডাঃ সেনকে দেখান।

ডাঃ সেনের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো।

তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন রক্ত পরীক্ষা করতে।

রক্ত পরীক্ষা করেই ধরা পড়ল।

লিউকোমিয়া—ব্লাড ক্যান্সার।

অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন শিবশঙ্কর।

লিউকোমিয়া—ব্লাড ক্যান্সার তার ত কোন চিকিৎসাই নেই, মৃত্যু অবধারিত। আজ না হয় কয়েক মাসের মধ্যেই।

অবধারিত, অনিবার্য।

কিন্তু অনিবার্য—অবধারিত মৃত্যু জেনেও ডাক্তার ত নিশ্চেষ্ট থাকে না—শুরু হলো চিকিৎসা রজতের।

ডাঃ সেন বার বার করে বলেছিলেন একটা কথা মিঃ বোস রজত যেন তার রোগের কথা না জানতে পারে।

শিবশঙ্করের দু চোখে জল।

রজতের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

ডাঃ সেনেরই পরামর্শে। তিনিই বললেন ওকে এখন স্কুলে যেতে দেবেন না—

ও স্কুলে না যাওয়ায় ক্লাসের অন্য ছেলেরা মাথা ঘামাল না—কিন্তু নিমাই ক্লাসের মধ্যে যে দ্বিতীয় হতো—একদিন সে স্কুলের ছুটির পর রজতদের বাড়িতে এসে হাজির হলো সোজা পায়ে হেঁটে।

গরীব বিধবা মায়ের ছেলে নিমাই—স্কুলে সে ফ্রিতে পড়ত।

অসাধারণ বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে—রজত ও নিমাই।

দারোয়ান কিষণ সিং বাধা দিল।

বললে, নেহি খোকা বাবুকা সাথ মোলাকাৎ নেহি হো সেকতা।

কেন ?

নেহি। হুকুম নেহি।

তুমি একবার দাদাবাবুকে গিয়ে বলোনা—তার স্কুলের বন্ধু নিমাই এসেছে।

নেহি, দারোয়ান কিষাণ সিং মাথা নাড়ে।

শর্মিলা ঐ সময় কলেজে যাচ্ছিল—নিমাইকে দেখে সে দাঁড়াল, নিমাইকে সে চিনত।

নিমাই তুমি।

দিদি, রজত স্কুলে যায় না কেন ?

তার শরীরটা ভাল না নিমাই।

কি হয়েছে রজতের, দিদি ?

শর্মিলা কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

খুব অসুখ কি রজতের, তার সঙ্গে একটিবার আমি কি দেখা করতে পারি না, দিদি ?

দেখা করতে চাও তুমি রজতের সঙ্গে ?

হ্যাঁ দিদি।

শর্মিলা কি যেন ভাবল—তারপর বলল চল—সে উপরে শুয়ে আছে।

শর্মিলা নিমাইকে সঙ্গে করে এনে রজতের ঘরে ঢুকল।

রজত শয্যায় শুয়ে বাইরের জানালার পানে তাকিয়েছিল।

রজত—ডাকল শর্মিলা।

দিদিভাই—রজত ফিরে তাকাল।

দেখ কে এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে—

কে !

আমি নিমাই রজত।

নিমাই কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে, বললে, তোমাকে দেখতে এলাম রজত। কতদিন তুমি স্কুলে যাও না।

ডাঃ সেন যে বারণ করেছেন—বলেছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে।

শর্মিলা বললে তোমরা কথা বল—আমি যাই রজত—

কেন দিদিভাই।

গোবিন্দকে বলো রজত তোমার বন্ধু যখন যাবে তাকে যেন গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কেমন।

বলবো।

এসো নিমাই আমার বিছানার পাশে এসে বসো।

নিমাই বিছানার পাশে একটা ছোট টুল ছিল তার উপরে এসে বসলো।

তুমি অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেবে ত, নিমাই জিজ্ঞাসা করে।

পরীক্ষা।

হ্যাঁ, দেবে না?

না। এবার তুমিই ক্লাসে ফার্স্ট হবে নিমাই—

না—

কি না।

সেরকম ফার্স্ট হতে আমি চাই না। তুমি পরীক্ষা না দিলে ত কোন কম্পিটিশনই হবে না।

সে কি—তুমি ত গতবারের পরীক্ষায় আমার চাইতে মাত্র সাত নম্বর টোটালে কম পেয়েছিলে।

সাত নম্বর ত কম নয়—অনেক নম্বর, ও সব কথা থাক ভাই তুমি, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে স্কুলে এসো—তুমি ক্লাসে নেই—ক্লাসটাই অন্ধকার।

এবছরে বোধহয় আর ক্লাস করা আমার হবে না নিমাই।

কেন, কেন হবে না, কি এমন তোমার হয়েছে যে তুমি স্কুলে যাবে না।

জানি না কি হয়েছে—তবে ডাঃ সেন কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন।

তাহলে রেস্ট তোমাকে নিতেই হবে।

মুখে ঐ কথাগুলো নিমাই বললে বটে কিন্তু রজতের শরীর ও মুখের দিকে তাকিয়ে নিমাইয়ের মনে হচ্ছিল রজত খুবই অসুস্থ। এই কয়দিন বিশ্রী রোগা হয়ে গিয়েছে—কেমন ফ্যাকাসে রক্তহীন, মনে হচ্ছিল নিমাইয়ের, রজতের যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে নিমাই—

এখনো বাইশ দিন বাকী আছে, দেখো তুমি এর মধ্যে ভাল হয়ে উঠবে রজত।

কি জানি নিমাই—আগে আগে প্রতিদিন ভাবতাম কাল নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবো—এই ঘুষঘুষে জ্বর—ক্লান্তি কেটে যাবে, কিন্তু—

ভেবো না—দেখো ঠিক ভাল হয়ে যাবে। নিমাই আশ্বাস দেয়।

নিমাই—

বল রজত।

তুমি আজকাল খেলার মাঠে যাও না।

না—জানই ত সামনে পরীক্ষা, পরীক্ষায় ভাল ফল না করতে পারলে আমার ফ্রি-শিপ কাটা যাবে।

আমাদের নতুন ড্রিল মাস্টারের কাছে ড্রিল কর না।

না, হেডমাস্টারমশাইকে বলে ড্রিল থেকে এ মাসটা রেহাই পেয়েছি পরীক্ষার জন্য। আজ আমি উঠি রজত কেমন।

যাবে।

হ্যাঁ—

আবার আসবে ত—

আসবো।

কবে আসবে ?

কালই আসবো।

এসো কিন্তু নিমাই।

আসবো,—

দাঁড়াও গোবিন্দ তোমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, বলে রজত গোবিন্দকে ডাকল, গোবিন্দ দরজার ওপাশেই ছিল—তার ডিউটিই সর্বদা রজতের কাছাকাছি থাকা।

গোবিন্দ বাচ্চা চাকর—রজতেরই বয়সী হবে।

কালো কুচকুচে পাথরে খোদাই করা গাট্টাগোট্টা চেহারা যেন। হাসি হাসি মুখ, পরনে একটা হাফ প্যান্ট ও শার্ট, গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে ওকে পুরাতন ভৃত্য নারাণ, নারায়ণের সম্পর্কের বিধবা বোনের ছেলে গোবিন্দ। গোবিন্দ ডাক শুনে সামনে এসে দাঁড়াল, ডাকছো দাদাবাবু।

হ্যাঁ—নিমাইকে তুই গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।

আচ্ছা দাদাবাবু—গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক প্রায় ছিল নিমাই, অনেক দিন পরে রজতের নিমাইকে পেয়ে ভারী ভাল লাগছিল। সে যেন বাইরের জগতের আনন্দ বহে নিয়ে এসেছিল।

বাইরের জগৎটা ত আজ মাস তিনেকেরও বেশী রজতের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছে। সেই স্কুল, স্কুলের ছেলেরা, মাস্টারমশাইরা—ক্লাস-রুম, খেলার খোলা

মাঠটা। মাঠের একধারে সেই বিরাট স্বর্ণচাঁপার গাছটা—হলুদ রংয়ের ফুল ধরে সেই গাছে।

বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়।

এই ত স্বর্ণচাঁপা ফোটার দিন, নিশ্চয়ই অনেক ফুল ধরেছে।

একটু পরে গোবিন্দ ফিরে এলো।

গোবিন্দ—

কিছু বলছো দাদাবাবু!

গোবিন্দ তুই বাঁশী বাজাতে জানিস না।

জানি।

তবে বাজাস না কেন।

বাজালে বাবু যদি বকেন।

কেন, বোকবেন কেন রে।

আমার ভয় করে।

তোর ভয় কি। বাবা কাউকে কিছু বলেন না। যা নিয়ে আয় তোর বাঁশী—

আনবো।

যা নিয়ে আয়—

বাবু বোকবেন না।

না, না-যা তুই নিয়ে আয়।

গোবিন্দ একটু পরে একটা বাঁশের আড়বাঁশী নিয়ে এলো।

বাজা—বাঁশী।

দাদাবাবু—

কি রে!

তুমি বাঁশী বাজাতে জান না।

জানি।

তবে তুমি বাজাও না কেন বাঁশী!

তুই কি করে জানলি যে আমি বাঁশী বাজাতে জানি।

কেন আমি দেখেছি—

কোথায় দেখলি।

দিদিমণির বাক্সর মধ্যে, দিদিমণি সেদিন বাক্স গোছাচ্ছিলেন—তার বাক্সের মধ্যে দেখলাম বাঁশীটা। শুধালাম ওটা কার বাঁশী দিদিমণি—তিনি বললেন, তোমার বাঁশী, ডাক্তারবাবু মানা করেছেন বাজাতে—তাই তিনি বাঁশীটা তার বাক্সে রেখে দিয়েছেন।

হ্যাঁ—দিদিভাই বাঁশীটা নিজের কাছে তার রেখে দিয়েছে। ডাক্তার সেন বাজাতে মানা করেছেন কিনা।

কেন—বাঁশী বাজালে বুকে লাগবে তাই।

বোধহয়। তুই বাজা—

বাজাবো।

হ্যাঁ, বাজা শুনবো আমি।

গোবিন্দ বাঁশীতে ফুঁ দিল। একটা মেঠো গেয়ো সুর।

গোবিন্দ তেমন ভাল বাজাতে পারে না। কিছুক্ষণ গোবিন্দর বাজানো শোনার পর রজত বললে, দেখি তোর বাঁশীটা।

গোবিন্দ বাঁশীটা রজতের হাতে তুলে দিল।

রজত বাঁশীটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঠোঁটের কাছে তুলে বাঁশীতে ফু দিল।

রজতের বাঁশী শুনে গোবিন্দ আহ্লাদে একেবার ডগমগ। বললে, এত সুন্দর বাঁশী বাজাও তুমি দাদাবাবু।

রজত মৃদু হাসলো।

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে তখন সে।

সেই রাত্রেই হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল রজতের।

রজতের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে গোবিন্দ ভয় পেয়ে যায়—ছুটে গিয়ে শর্মিলাকে ডেকে আনে।

দিদিমণি শিগগিরি চলুন। দাদাবাবুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ডাঃ সেন বলেই রেখেছিলেন রক্ত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে—শিবশঙ্কর তার অফিসঘরে বসে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছিলেন—শর্মিলা তখুনি তাকে নীচে সংবাদ পাঠাল, ডাঃ সেনকে ফোন করে দেবার জন্য।

ডাঃ সেন আধঘণ্টার মধ্যেই ফোন পেয়ে ছুটে এলেন।

পরীক্ষা করে বললেন ব্লাড ট্রানসফিউশন দিতে হবে—নার্সিং হোমে রিমুভ করাই ভাল।

সেই মতই ব্যবস্থা হলো।

পাশের ঘরে ডাঃ সেন শিবশঙ্করকে বলছিলেন, এটাই আমি ভয় করছিলাম শিববাবু, ব্লাড ক্যানসার—

বাঁচবে ত ডাঃ সেন, ব্যাকুল কণ্ঠ শিবশঙ্করের।

এ রোগের ব্যাপার ত আপনি জানেন শিববাবু—আমরা ডাক্তাররা কেবল চেষ্টাই করতে পারি।

রজত তার কি রোগ হয়েছে জানত না। আজ প্রথম শুনল তার ব্লাড ক্যানসার।

শুনেছিল তার মাও ব্লাড ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। মনটা যেন তার কেমন উদাস হয়ে গেল।

পরের দিন নার্সিং হোমে শর্মিলা দেখা করতে এলো ভাইয়ের সঙ্গে।

রজত বললে, দিদিভাই, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চল।

নিশ্চয়ই—আর একটু ভাল হলেই—

রজত মৃদু হাসলো, তারপর বললে, আমি জানি দিদিভাই।

কি জানিস!

আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না।

কে—কে বললে এসব বাজে কথা।

তোমরা এতদিন বলনি কেন দিদিভাই—যে আমার ব্লাড ক্যানসার হয়েছে।

ধ্যাৎ কি সব বাজে বকছিস।

বাজে নয়, তাতে কিই বা হয়েছে, কেবল—

রজত।

এই সুন্দর পৃথিবী, নীল আকাশ, যখন ভাবি এসব কিছু ছেড়ে চলে যাবো—তোমার কাছ থেকে দূরে আরো দূরে—সে যে কোথায় তাও জানি না।

ছিঃ ভাই। ওসব কথা বলে না। শর্মিলার গলার স্বর কান্নায় জড়িয়ে আসে।

জান দিদিভাই—কাল রাত্রে মাকে দেখেছি।

মা।

হ্যাঁ—সেই যে বাবার ঘরে মার বড় এনলার্জ ছবিটা—চওড়া লালপাড় শাড়ি—মাথায় সিঁদুরের টিপ, ঠিক সেই মা—মা আমাকে ডাকছিল। আচ্ছা দিদিভাই, আমাদের মা দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তাই না।

হ্যাঁ।

তোমার মনে আছে মাকে দিদিভাই।

আছে।

আমাকে বাড়ি নিয়ে চল দিদিভাই—যে কটা দিন আছি তোমার কাছে কাছে থাকবো।

সেই মত ব্যবস্থাই হলো—দিন চারেক পরে রজতকে গৃহে নিয়ে আসা হলো।

রজত একেবারে শোওয়া।

ডাঃ সেন মানা করেছেন, বিছানা থেকে উঠতে।

শর্মিলা কলেজে যায় না। সব সময় ভাইয়ের কাছে থাকে।

প্রত্যেক সাত দিন পর পর ব্লাড পরীক্ষা করা হয়—ব্লাড পিকচার সামান্য উন্নতি দেখায়। ডাঃ সেন রোজ আসেন একবার করে।

রজতের মধ্যে কিন্তু কোন বিষণ্ণতা বা ভয় নেই। সে সর্বদাই হাসি খুশি।

সেদিন ডাঃ সেন এলে রজত বললে, আচ্ছা ডাঃ সেন, আমার ত ব্লাড ক্যান্সার লিউকোমিয়া হয়েছে। তাই না।

না, না, কে বললে।

তবে।

তোমার রক্তে কিছু গড়বড় হয়েছে।

রজত হাসলো, বললে না—আমি জানি, আমার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে।

কে বললে তোমাকে।

আমি জানি, কিন্তু আমার একটুও ভয় করছে না জানেন। আমি ত জানিই এরোগ ভাল হয় না। এ রোগ কখনো কারো সারে না।

ও সব বাজে চিন্তা তুমি মন থেকে মুছে ফেল। আমি বলছি আবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

রজত আবার হাসলো।

জানেন ডাঃ সেন আমি কাউকে বলিনি। দিদিভাইকেও বলিনি—খুব ছোট যখন ছিলাম আমি মধ্যে মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম।

স্বপ্ন।

হ্যাঁ।

কি স্বপ্ন দেখতে রজত।

যেন সাদা মেঘের উপর দিয়ে আমি ভেসে চলেছি—হাওয়ায় ভেসে চলেছি—সে এক ভারী সুন্দর জায়গা—সেই স্বপ্নটা আজকাল প্রায়ই দেখি। রোজ রোজ দেখি। আমার খুব ভাল লাগে তখন।

রাত্রে তুমি ঘুমাও না ভাল করে।

কেন, ঘুমাই ত, ঘুমাই।

ডাঃ সেনকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হয়। পাশেই দাঁড়িয়েছিল শর্মিলা—তার দুচোখের কোলে জল।

ডাঃ সেনের কেন যেন মনে হচ্ছিল আর খুব বেশী দিন বুঝি ছেলেটা বাঁচবে না।

ডাঃ সেন।

বল।

দিদিভাইকে বলুন না আমার বাঁশীটা দিতে।

শর্মিলা ডাঃ সেনের মুখের দিকে তাকাল।

শর্মিলা, ওকে ওর বাঁশীটা দিও।

কিন্তু ডাঃ সেন।

দিও, তবে একটা কথা দিতে হবে তোমাকে রজত।

কি বলুন।

বাঁশী কিন্তু তুমি বাজাবে না। যদি না বাজাও ত দিদি তোমায় বাঁশীটা দেবে।

বেশ, বাজাবো না। দিতে বলুন বাঁশীটা আমাকে।

শর্মিলা আলমারি থেকে বাঁশীটা বের করে এনে দিল রজতের হাতে। রজতের মুখে হাসি, সে বাঁশীটা বুকের কাছে চেপে ধরে চোখ বোজে।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা—রজতের আবার জ্বর বেড়েছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জানালার পাল্লা বন্ধ।

রজতের শিয়রের পাশে বসে শর্মিলা রজতকে গুনগুন করে গান গেয়ে শোনাচ্ছিল।

রজত এক সময় বললে, দিদিভাই—আজ মাঘী পূর্ণিমা না।

হ্যাঁ।

জানালাটা খুলে দাও না—বাইরে খুব জ্যোৎস্না উঠেছে নিশ্চয়ই।

জানালা খুললে যে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে ভাই।

না, না—কিছু ঠাণ্ডা লাগবে না। এইত আমার গায়ে শাল রয়েছে। দাও না দিদিভাই।

না ভাই, ডাঃ সেন মানা করে গেছেন।

একটু—একটুক্ষণের জন্য খুলে দাও জানালাটা দিদিভাই। বাগানের আমার সেই স্বর্ণচাঁপার গাছটায় নিশ্চয়ই ফুল ফুটেছে।

না, এখন ত সে ফুল ফোটে না।

কিন্তু আমি গন্ধ পাচ্ছি। ফুটেছে—দোখো না নিশ্চয়ই ফুটেছে। গোবিন্দ—এই গোবিন্দ, যা না বাগানে গিয়ে একটিবার দেখে আয় না।

যাচ্ছি দাদাবাবু। গোবিন্দ চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই রজত বললে, গোবিন্দ আসছে না কেন?

রাত্রি বেলা ত—তাই হয়ত খুঁজে দেখছে—

ও পাবে না খুঁজে—তুমি একটিবার যাও দিদিভাই। আমি জানি—অন্তত একটা ফুল ফুটেছে।

শর্মিলা উঠে দাঁড়াল।

নিশ্চয়ই ফুটেছে। তুমি একটিবার দেখে এসো দিদিভাই।

শর্মিলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জানে শর্মিলা ঐ সময় স্বর্ণচাপা ফুল ফুটতে পারে না—তবু সে বাগানে গেল।

হঠাৎ কানে এলো তার বাঁশীর সুর।

চমকে ওঠে শর্মিলা সেই বাঁশীর সুরে।

এযে সেই রজতের প্রিয় গান।

যে গানটি রজত প্রায়ই বাজাতো, যে গানটা রজত প্রায়ই বাজাতো বাঁশীতে।

শর্মিলা যেন কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা স্বর্ণচাপা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকে।

গাছটা খুব বড় নয়—

বছর তিনেক আগে রজতই রথের মেলা থেকে গাছটা এনে বাগানে পুঁতেছিল একদিন। ওদের স্কুলে একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ আছে—তার ফুল রজতের খুব প্রিয় ছিল—তাই সে গাছটা এনে পুঁতেছিল। আর বলতো, দেখো দিদিভাই—ঐ গাছে যখন ফুল ফুটবে কি মিষ্টি তার গন্ধ। আঃ—

বাঁশীর সুর শুনতে শুনতেই হঠাৎ নাকে আসে শর্মিলার সত্যি সত্যিই স্বর্ণচাঁপার গন্ধ।

ঐ ত—ঐ ত ফুল একটা ফুটেছে—

কেন যেন ধক্ করে ওঠে শর্মিলার বুকের মধ্যে—সে হাত বাড়িয়ে তারপর ফুলটা ছিঁড়বার চেষ্টা করে কিন্তু নাগাল পায় না।

বাঁশী তখনো বেজে চলেছে।

তাড়াতাড়ি ফিরলো বাগান থেকে শর্মিলা।

কিন্তু কই বাঁশীত আর বাজছে না। আর ত শোনা যাচ্ছে না বাঁশী।

দ্রুতপায়ে রজতের ঘরে ঢুকল শর্মিলা।

ঘরের জানালাটা খোলা।

একরাশ জ্যোৎস্না ঘরের মেঝেতে এসে লুটিয়ে পড়েছে। আর সেই মেঝেতে শুয়ে রজত। পাশেই বাঁশীটা পড়ে আছে।

রজত—

একটা দীর্ণ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো শর্মিলা।

ছুটে এসে ভাইয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিল।

ক্ষীণ কণ্ঠে রজত বললে, দিদিভাই—মা—

আর কোন কথা বেরুল না।

সারা ঘরে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ। আর বাতাসে রজতের বাঁশীর সুর।

রজতের বাঁশী আর বাজবে না।

কোন দিনই আর বাজবে না।

রজতের দু' চোখে ঘুম।

॥ উপন্যাস ॥

এক ঃ কাগজের খবর

মাকাসিকো আইল্যাণ্ড, ২৪ জুন—গতকাল থেকে কাম্বো পর্যটনকেন্দ্রে নিষিদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই পাহাড়ী হ্রদ এবং বনভূমি এতকাল দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে স্বর্গ বলে পরিচিত ছিল। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ কাম্বোতে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছিল, যার ফলে মাকাসিকো সরকার পর্যটনকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। কাম্বো পৌঁছানোর একটিমাত্র পথে সশস্ত্র সেনাবাহিনী যখন মোতায়েন করা হয়েছে। সরকারী সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

সংবাদসংস্থা আরও জানাচ্ছেন : কিছুকাল যাবৎ কয়েকজন পর্যটক একত্রে রহস্য-জনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর কাম্বো টুরিস্ট লজ এবং বেসরকারী হোটেলগুলি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ইয়ারা হ্রদের ধারে কিছু সৌখীন ধনীর যেসব কুটির ছিল, সেখানেও আর কেউ ছিল না। গত ১২ জুন জনৈক মার্কিন পর্যটক কারও কথা না মেনে কাম্বো চলে যান পায়ে হেঁটে। তিনি গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন, তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য টুরিস্ট লজের দরজায় একটা বেড়াল ছাড়া আর কেউ নেই। আগের বছর এমনি জুনের গরমে ওই শীতল ও মনোরম প্রকৃতি-ভূমিতে তিনি যখন গিয়েছিলেন, তখন আনুমানিক আড়াই হাজার পর্যটক দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন গিয়ে অবাক হয়ে যান। তিনি বলেছেন, সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার—ইয়ারা হ্রদের জলে হাজার-হাজার পাখি দেখতে পেলুম। মানুষের ভিড়ে ও উৎপাতে আগে সেখানে একটাও পাখি ছিল না। তারা এখন ফিরে এসেছে। নির্ভয়ে হ্রদের জলে খেলা করছে। প্রাণ খুলে গান করছে। কলকাকলীতে কান পাতা দায়।

মার্কিন পর্যটক আরও বলেছেন, পায়ে হেঁটে তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা এবং চড়াই ভেঙে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। নইলে কিছুতেই ওখানে থাকার সাহস ছিল না। কারণ—শুধু পাখি নয়, হ্রদের ধারে এবং গাছপালার মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তুকে চলাফেরা করতে দেখছিলুম। একটা বাঘ তো টুরিস্ট লজের কাচের দরজায় এসে গাল ঘষছিল। হয়তো নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে কেটে পড়ল। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, ততক্ষণ আমি ওপরের একটা ঘরের জানলা থেকে অসংখ্য নেকড়ে, হায়েনা, হাতি, ভালুক, চিতাবাঘ, বাঘ, রক্তপায়ী শেয়াল, এমন কী গরিলাও দেখেছি। তারা নির্ভয়ে চলাফেরা করছে এবং কেউ কারুর সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করছে না। আনন্দে যেন খেলাই করছে বরং একটা চিতা আর বাঁদরের খেলা খুব জমেছিল অথচ চিতা বানরের মাংস খুব ভালবাসে। হ্রদের ধারে সবুজ

ঘাসের ওপর চিতাটা শুয়ে পড়ল। বাঁদরটা তার কান টেনে ও সুড়সুড়ি দিয়ে খুব মজা পাচ্ছিল দেখলুম। পাখিরাও কী নির্ভীক হয়ে উঠেছে! হিংস্র জন্তুদের পিঠে বসে থাকছে। তাদের দাঁতের পোকা ঠোঁট দিয়ে উজাড় করে ফেলছে। অন্ধকার নামলে কিছুক্ষণের জন্য পশুপাখিদের সব চিৎকার থেমে গেল। তারপর চাঁদ উঠল। তখন হঠাৎ আবার একসঙ্গে সব পাখি ও জন্তুজানোয়ার চিৎকার করে উঠলো মনে হল কী একটা ঘটছে। কিন্তু কিছু ঠাহর করতে পারলুম না। শুধু ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আবছা দেখতে পেলুম, হ্রদের ধারে পার্কটার মধ্যে কালো কালো কয়েকটা মানুষের মতো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলুম, সাহস করে একবার সাড়া দিই। কিন্তু আসার সময় ভূত-প্রেতের যা গুজব শুনেছি, তাতে সাড়া দেবার সাহস পেলুম না। সত্যি বলতে কী, ওই খাঁ খাঁ জনহীন জায়গায়—বিশেষ করে রাতের বেলায়, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতে একটুও বাধে না।

সংবাদদাতা তাঁকে প্রশ্ন করেন, কালো-কালো মূর্তিগুলো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? মার্কিন পর্যটক জবাব দেন, কোনো ধারণাই নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি ওরা মানুষের মতো। কিন্তু মানুষ নয়। অবশ্য এও বলতে পারি, ওদের আসতে দেখেই হয়তো পাখি ও জন্তুজানোয়ারগুলো আচমকা অমন চিৎকার করে উঠেছিল। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে আবার সব চুপ হয়ে গেল। কালো মূর্তিগুলোকে আর দেখতে পেলুম না—যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রাতে আর বিস্ময়কর কিছু ঘটেনি। ক্লান্তির জন্য ঘুমটাও ভাল হয়েছিল। তবে শেষরাতে একবার আধমিনিটের জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সেইসময় মনে হল, পাশের ঘরে কিংবা বারান্দায় খসখস শব্দ করে চুপিচুপি কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। নিচের তলার বড় দরজা, ওপরতলার সিঁড়ির দরজা এবং আমার ঘরের দরজা—সব বন্ধ থাকায় ব্যাপারটা কানের ভুল বলে মনে হল। ফের ঘুমিয়ে পড়লুম। ভোরে উঠে নিচে নেমে গেলুম। তারপর হ্রদের দিকে পা বাড়াতেই জন্তুদের কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, চারপাশে ঘাসের ওপর অজস্র জন্তু ঘুমিয়ে আছে। তখনও রোদ ফোটেনি। পাছে আমার পায়ের শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে যায়, পা টিপে টিপে টুরিস্ট লজে ফিরে এলুম। তারপর ওই অভিশপ্ত জায়গায় এক মুহূর্ত থাকার মতো মনোবল আমার ছিল না। সোজা ঘর থেকে হ্যাভারস্যাক পিঠে ঝুলিয়ে কেটে পড়লাম। পথে কোনো বিপদ ঘটেনি। নিরাপদে ফিরেছি, এর জন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সংবাদসংস্থার খবরে আরও জানা গেছে, ওই দুর্গম পর্যটন কেন্দ্রটি গতকাল নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মাকাসিকো মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করেছেন, একটি তদন্ত কমিটি গড়া হবে এবং সেই কমিটিতে থাকবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। তারা কাছে গিয়ে সবিশেষ তদন্ত করে এই বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন। সরকারী সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীদের তদন্ত

কমিটির নেতৃত্বে প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডঃ মেনহার্স্ট থাকতে পারেন। ডঃ মেনহার্স্ট কাম্বোতে একসময় প্রকৃতিবিষয়ে অনেক গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কাম্বো আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি বিশাল আগ্নেয়গিরির ক্রেটার—অর্থাৎ ওই দশ বর্গ কিলোমিটার হ্রদ এবং তার চারপাশের সমতল ভূমি প্রশস্ত একটি জ্বালামুখ। ওখান দিয়েই লক্ষ বছর আগে লাভা ও অগ্নিস্রাব নির্গত হয়েছিল। কালক্রমে আগ্নেয়গিরি মৃত। জ্বালামুখে একটি হ্রদ সৃষ্টি হয় এবং তার চারদিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতলভূমি রয়েছে। সেখানে অরণ্য গজিয়ে উঠেছে। কাম্বোর চারপাশে প্রায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। কোথাও খাড়া পাঁচিলের মতো, কোথাও একটু ঢালু। কোথাও বনজঙ্গল গজিয়েছে পাহাড়ে, কোথাও খালি ন্যাড়া পাথর। শুধু পশ্চিমদিকে পাহাড়ের কিছুটা ধস ছেড়ে অতীতকালে একটি গিরিপথ সৃষ্টি হয়। সতের শতকে স্পেন জলদস্যুরা ওখানে লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিয়ে লুকিয়ে থাকত। সংকীর্ণ গিরিপথ 'কাম্বো পাস' বন্ধ করে দিলে আর কারুর সাধ্য নেই কাম্বোতে ঢোকে। গত শতকে ব্রিটিশ সরকার ওখানে পর্যটনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাস্তা তৈরি করেন। —রয়টার

দুই : চিরকুটে লেখা একটা কথা

হিরণমামার মাথায় কখন কোন প্ল্যান গজিয়ে ওঠে বলা কঠিন। একবার হরিণমারা গ্রামে কৃষিখামার খুলে চাষবাস করতে গিয়েছিলেন। সে নেশা বেশিদিন টেকেনি। ইদানীং নতুন একটা প্ল্যান এসেছিল মাথায়। জন্তুর চামড়া থেকে পেট্রল বানাবেন। ভাবা যায়? কোন বইতে হয়তো পড়েছেন, চামড়া থেকে পেট্রল তৈরির সম্ভাবনা আছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছেন। দক্ষিণ কলকাতায় পৈতৃক বাড়িতে ওঁর শখের ল্যাবরেটরি। দিন নেই, রাত নেই,—খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ওই নিয়ে কদিন গেছে। তারপর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হিরণমামার ডাক শুনলেই আমার রক্ত নেচে ওঠে। ছুটে এসে শুনি, 'চল্ টিটো। আমরা ভারত মহাসাগরে পাড়ি জমাই।'

আমি না বলার ছেলে নই—বিশেষ করে হিরণমামা বললে।

মরিশাস দ্বীপ থেকে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে সোজা সমুদ্রে এগোলে পড়ে মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জ। আফ্রিকার প্রায় লেজের কাছে।

রাজধানী ও বন্দরের নামও মাকাসিকো। পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট শহর। একসময় ছিল স্পেনের দখলে। পরে ইংরেজরা দখল করেছিল। এখন স্বাধীন দেশ।

সমুদ্রের খাড়ির মাথায় পাঁচতলা হোটেলের তিনতলার একটা ঘরে আমরা আছি। ব্যাপার কী, না—চামড়া।

চামড়া তো সব জায়গাতেই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাকাসিকোয় নাকি চামড়ার দর এখন খুব সস্তা। হিরণমামা জলের দরে চামড়া কিনে নিয়ে যাবেন সঙ্গে। সেজন্যেই এসেছেন। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে বেরিয়েছেন। আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিচের খাড়িতে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখছি। কী সুন্দর দৃশ্য! ঢেউগুলো বিশাল ও উঁচু হয়ে এসে পাথরের দেয়ালে ধাক্কা মারছে এবং প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা ধরে যায়। জলের ওপর অজস্র সামুদ্রিক চিল ও শকুন ওড়াওড়ি করছে। তন্ময় হয়ে দেখছি। এখন সকাল নটা বেজেছে।

হঠাৎ মনে হল, রামের জন্মের আগেই নাকি বাল্মীকিমুনি রামায়ণ লিখে ফেলেছিলেন। এ যে দেখছি তাই করছেন হিরণমামা। আগে চামড়া থেকে পেট্রল তৈরি করুন, তারপর চামড়া কেনার কথা উঠবে। কিন্তু আগেই চামড়ার পাহাড় জমানোর মতলব কেন রে বাবা? হিরণমামার মতো বিচক্ষণ মানুষের মাথায় স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেল কেন?

দরজা নক করল কেউ। খুলে দেখি হিরণমামা এবং সঙ্গে এক সায়েব। ঘরে ঢুকে হিরণমামা বললেন, আলাপ করিয়ে দিই ডঃ মেনহার্স্ট! এ আমার ভাগ্নে শ্রীমান্ টিটো। মহা দুরন্ত ডানপিটে ছেলে। আর টিটো, ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডঃ কার্ল মেনহার্স্ট।

মেনহার্স্ট আমার একটা হাত খপ করে ধরে বললেন, হ্যাল্লো ইয়ংম্যান! হাউ ডু-ইউ ডু। তারপর মামার দিকে ঘুরে বললেন, ইয়ংম্যান কী বলছে মিঃ চৌধুরী! আপনার ভাগ্নে দেখছি নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য বালক। তারপর হোহো করে হেসে উঠলেন।

হিরণমামাকে কেমন হতাশ দেখাচ্ছিল। একটু হাসলেন মাত্র। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, টিটো! সস্তায় চামড়া কিনতে এসে দেখছি খুব ঠকে গেলুম।

বললুম কেন মামা?

ব্যাপারটা গুজব—আবার গুজবও নয়। হিরণমামা বললেন। আসলে এখানে চামড়া সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়—গোপনে। একদল চোরাকারবারী তিরিশ কিলোমিটার দূরে কাম্বো পাহাড় থেকে প্রচুর জন্তুজানোয়ার মেরে তার চামড়া গোপনে সমুদ্রপথে চালান দিচ্ছে। সেই থেকে গুজবটা রটে গেছে। সবটাই বেআইনী কারবার।

ডঃ মেনহার্স্ট বললেন, কারবার কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে মিঃ চৌধুরী। বললুম না, গিরিপথে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। তাছাড়া চোরা চামড়া ব্যবসায়ী বোকাসোকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে, সেটা এবার বলি।

হিরণমামা ফোনে কফির অর্ডার দিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসলেন। আমি কান পাতলুম।

ডঃ মেনহার্স্ট বললেন, বোকাসো গত সপ্তাহে চারজন শিকারী পাঠিয়েছিলেন কাম্বোতে। তারা তিনদিন বাদেও ফিরছে না দেখে বোকাসো একটা লোক পাঠায়। লোকটা গিয়ে দেখে, শিকারীদের লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে একপাল নেকড়ে। সে আতঙ্কে তক্ষুনি পালিয়ে আসে। তবে তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, গিরিখাতের একটা পাথুরে দেয়ালে স্থানীয়ভাষায় কালো হরফে লেখা আছে: 'মানুষের জন্য কাম্বো নিষিদ্ধ এলাকা। পা বাড়ালেই মৃত্যু।' তারপর এই দেখুন, গতকাল কাগজে কী বেরিয়েছে।

মেনহার্স্ট কোটের পকেটে থেকে একটা ভাঁজকরা খবরের কাগজ বের করলেন। হিরণমামা কাগজটা নিয়ে পড়তে থাকলেন। আমি এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালুম।

খবরটা বেশ বড়। পড়তে পড়তে টের পেলুম, হিরণমামা উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, ক্রমশ পড়া শেষ করে বললেন, হুঁ, বুঝলুম। যে কারণেই হোক, জনমানুষবর্জিত পর্যটনকেন্দ্রে পশুপাখিরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত। চোরাশিকারীরা গিয়ে সহজে তাদের গুলি করে মারত এবং চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে আসত। আচ্ছা ডঃ মেনহার্স্ট, তাহলে সরকার সত্যি তদন্ত কমিটি করছেন?

অলরেডি করেছেন। মেনহার্স্ট মৃদু হেসে বললেন। আমি কমিটির চেয়ারম্যান। যাই হোক, দৈবাৎ এখানে আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা যখন হয়েছে, তখন আমি আপনাকে সঙ্গে চাই। উপদেষ্টা হিসেবে আপনাকে আমি নিতে পারি। সরকার বাধা দেবেন না।

হিরণমামা বললেন, আমি রাজি। কিন্তু টিটো...টিটো কি এখানে একা থাকবে?

মেনহার্স্ট আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, থাকার অসুবিধে কী? হোটেলের লোকদের বলে যাব আমরা।

আমি বলে উঠলুম, মোটেও না। আমিও যাব।

হিরণমামাকে চিন্তিত দেখাল। একটু পরে বললেন, টিটো, খুব সহজ ছেলে নয়। অনেক বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারে ও আমার সঙ্গে থেকেছে। আপনাকে সব আমি বলব। এও বলব, টিটো সঙ্গে না থাকলে আমি অসহায় বোধ করি।

বলেন কী! ডঃ মেনহার্স্ট হেসে উঠলেন। ঠিক আছে, ওকে নিতে আমার আপত্তি নেই। সরকার আমার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। আমি আপনার ওপর আস্থা রাখি। কাজেই আপনার ভাগ্নে বাবাজীকেও সঙ্গে নেব আপনার খাতিরে। কিন্তু এখনও বলছি, ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক।

হিরণমামা বললেন, বিপদের মাত্রা বেশি না হলে আমাদের মামা—ভাগ্নের প্রাণে আনন্দ হয় না ডঃ মেনহার্স্ট! যাক্ সে কথা। কমিটিতে আর কে থাকছেন?

ডঃ ইকানা বারগুচি—প্রখ্যাত ইতালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী এবং ডঃ হেলমুথ—জার্মান প্রাণী বিজ্ঞানী। ব্যস, আর কেউ না। ডঃ মেনহার্স্ট জবাব দিলেন। তাঁদের সকালেই পৌঁছবার কথা। জানি না পৌঁছেছেন কিনা।

এবার আমি বলে উঠলুম, সেই মার্কিন ট্যুরিস্ট ভদ্রলোককে দলে পেলে ভাল হত!

ডঃ মেনহার্স্ট হাসলেন। ভাল তো হত! কিন্তু তাকে পাচ্ছি কোথায়?

আমি বললুম, এই হোটেলে একজন ঢ্যাঙা ট্যুরিস্ট ধরনের লোককে দেখেছি। আমেরিকান বলে মনে হচ্ছিল। নাকে কথা বলার অভ্যাস আমেরিকানদের আছে। তাই মনে হচ্ছিল…

কথা কেড়ে মেনহার্স্ট বললেন, কী কাণ্ড! মিঃ চৌধুরী, আপনার ভাগ্নে তো ভারি ধুরন্ধর ছেলে! না আর কিন্তু রইল না। ওকে সঙ্গে নেবই। যাই হোক, আপনি ফোনে ম্যানেজারকে জিগ্যেস করুন তো, তেমন কেউ হোটেলে আছেন নাকি।

হিরণমামা তক্ষুনি ফোন করে জেনে বললেন, আছেন। আমাদের পাশের ঘরে।

এ্যাঁ! বলে মেনহার্স্ট লাফিয়ে উঠলেন। তারপর 'আসছি' বলে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।

হিরণমামা বললেন, কী রে! কী মনে হচ্ছে?

খুব জমবে মামা। কারণ, প্রথম প্রশ্নটা হল: কেন জন্তু ও পাখিরা হঠাৎ কাম্বোতে দলে দলে জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল? দ্বিতীয় প্রশ্ন: তারা হিংসা ভুলে গেল কেন?

ভুলল কোথায়? শুনলি তো চারজন শিকারীকে খেয়ে ফেলেছে!

আহা, সে তো ওদের গুলি করে মারছিল বলে শোধ নিয়েছে।

হিরণমামা মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, ঠিক বলেছিস। এ যেন আমাদের পুরাণের কৈলাস পাহাড়ের ব্যাপার। তবে আরও দুটো প্রশ্ন আছে টিটো। তা হল: গিরিখাতে ওই কথাগুলো কে লিখল? আর পর্যটকদের অনেকে নিখোঁজ হল কেন?

ডঃ মেনহার্স্ট সেই মার্কিন ভদ্রলোককে নিয়েই ঘরে ঢুকলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি নরম্যান মেলার। পরস্পর হ্যাণ্ডশেক ও সৌজন্য প্রদর্শন হল। কফিও এসে গেল। কফি খেতে খেতে নরম্যান বললেন, একটা কথা আমি খবরের কাগজের লোকদের বলিনি। সকালে ট্যুরিস্ট লজে ঢুকে আমার হ্যাভারস্যাক আনতে গিয়ে একটুকরো দলা পাকানো কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। তাতে অশুদ্ধ ইংরেজিতে আনাড়ি হাতে লেখা আছে: 'আমি ছায়ামানুষের কবলে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করো।'

একসঙ্গে তিনজনে বলে উঠলুম, ছায়ামানুষ। সে আবার কী?

মেলার বললেন, আমি জ্যোৎস্নায় হ্রদের ধারে ছায়ামানুষদেরই দেখেছিলুম!

ডঃ মেনহার্স্ট আপন মনে ফের বললেন, ছায়ামানুষ?

হিরণমামা বললেন, কায়া থাকলে তবে ছায়া থাকে। এক্ষেত্রে কায়া নেই, তবু ছায়া?

মেলার বললেন, ছায়া কোন কিছুর ওপর পড়ে। কাম্বোর ছায়ামানুষরা চলমান ছায়া সম্ভবত। তারা কোন কিছুর ওপর পড়ে না। মানুষের মতো দাঁড়াতে পারে। ছায়াই ওদের কায়া হয়তো।

আমি বললুম, আচ্ছা—আমরা তাহলে, রওনা হচ্ছি কখন?

ডঃ মেনহার্স্ট ঘড়ি দেখে বললেন, লাঞ্চের পর ঠিক দুটোয় রওনা হবার কথা আছে। তারপর একটু হেসে বললেন, মিঃ চৌধুরী! আপনার ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়েছি দেখে হয়তো আমার মেয়ে এমাও জেদ ধরবে। সেও ভীষণ জেদী আর ডানপিটে মেয়ে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন দুবছর আগে। কাজেই বুঝতেই পারছেন, ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়। এমা সমস্যা বাধাবে। দেখা যাক্। এখন বারগুচি আর হেলমুথ এলেই হয়।

তিন : কাম্বো পাহাড়ের প্রান্তে

সংকীর্ণ গিরিপথের মুখে বাঁদিকটায় একটা লম্বা চওড়া চাতাল আছে। সেখানেই আমাদের তাঁবু বিকেলের মধ্যে পাতা হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর তাঁবু আছে সামান্য দূরে—রাস্তার ওপর। আমরা কাম্বোতে ঢুকলুম না—তার কারণ, ছায়ামানুষ যদি সত্যি থাকে এবং আমাদের বিপদে ফেলে। বরং বাইরে থাকলে নিরাপদে থাকব।

হেলমুথ এবং বারগুচি এসে পৌছতে পারেন নি। মেনহার্স্ট বলছিলেন সম্ভবত প্লেন ধরতে পারেননি ওঁরা। পরের প্লেনে নিশ্চয় আসবেন। ওঁদের একসঙ্গে আসার কথা রোম থেকে।

মেনহার্স্টের মেয়ে এমা খুব চঞ্চল প্রকৃতির। প্রথম আলাপেই জিগ্যেস করল, আমি বন্দুক ছুঁড়তে পারি নাকি? আমি পাল্টা জিগ্যেস করলুম, সে পারে কিনা। এমা গর্বের সঙ্গে জানাল, সে রাইফেল স্যুটিংয়ে ইংল্যাণ্ডের টিন এজার (কুড়ির মধ্যে বয়স যাদের) গ্রুপে এবছর সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে জিতেছে। সে আমাকে গলায় হারের মতো ঝোলানো একটা ব্রোঞ্জের পদকও দেখিয়ে দিল।

আমার পদক-টদক নেই। বললুম—ওই যে পাখিটা দেখছ, উড়ে যাচ্ছে। তুমি যদি ওটা চাও, আমি তোমায় উপহার দিতে পারি।

এমা বললে, ইস্! খুব বাহাদুর ছেলে তুমি।

চুপি চুপি আমাদের তাঁবুতে ঢুকে হিরণমামার রাইফেলটা নিয়ে এলুম। মামা যে দেশেই যান, এটা সঙ্গে থাকা চাই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দ্বীপটা পাহাড়ে ভরা।

পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবেছে সবে। পাখিরা উড়ে সম্ভবত বৃত্তাকার কাম্বো পর্বতমালার ভেতর সেই ইয়ারা লেকের দিকে চলেছে পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে। হিরণমামা, মেনহার্স্ট আর মেলার একটু দূরে স্কয়াখবুর্টে একটা গাছের তলায় ক্যাম্প চেয়ারে বসে আলোচনা করছেন। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন বাবুর্চি ও চাকর এসেছে। তারা রাতের খাবার তৈরি করতে স্টোভ জ্বেলেছে। মাঝে মাঝে ঘুরে আতঙ্কের দৃষ্টিতে কাম্বো পাহাড় আর গিরিপথটার দিকে তাকাচ্ছে।

কোন পাখিটা চাও? বলে এমার দিকে তাকালুম।

এমা মাথার ওপর আঙুল তুলে বলল, ওইটে। সবার শেষে যেটা যাচ্ছে।

টিপ করে ট্রিগারে চাপ দিলুম। আকাশ ফাটানো প্রচণ্ড শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। পাখিটা ঝুপ করে এসে সামনে পড়ল। এমা প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। মাথার ওপর পাখির ঝাঁক তুমুল কলরব করতে করতে পালিয়ে গেল।

ওদিকে হিরণমামারা লাফিয়ে উঠেছেন। মেনহার্স্ট লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে বললেন, এ কী টিটো! বারণ করেছিলুম না এখানে কোনোরকম আওয়াজ করতে?

আমি অপ্রস্তুত। এমাকে তাক লাগিয়ে দিতে গিয়ে কথাটা ভুলেই বসেছি। মুখ নিচু করে বললুম, এবারকার মতো ক্ষমা করবেন ডঃ মেনহার্স্ট!

এমা দৌড়ে বাবার সামনে গিয়ে বলল, না বাবা। ওর কোনো দোষ নেই। আমিই ওকে রাইফেল ছুঁড়তে বলেছি। তুমি বকতে হলে আমায় বকে দাও।

মেনহার্স্ট ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে বললেন, পাগলী মেয়ে! আর কখনো না।

উনি চলে গেলে এমা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, হার মানছি টিটো।

জুন মাসের শেষ হলেও এত উঁচু পাহাড়ী এলাকায় সন্ধ্যার দিকে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা টের পাচ্ছিলুম। চাতালের অন্য দিকটায় ঢালু পাড় মতো জায়গায় জঙ্গল রয়েছে। জঙ্গলটার ডানদিকে খাড়া হয়ে উঠেছে কাম্বো পাহাড়। আমি সেদিকে তাকিয়ে ছিলুম। তখনও দিনের আলো মিলিয়ে যায়নি। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, খাড়া ও

ন্যাড়া পাহাড়ের ওপরদিকে একটা ফাটলের পাশে কালো কী নড়াচড়া করছে। প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে রয়েছে ফাটলটা।

কালো লম্বাটে জিনিসটা যেন মানুষের মতো লম্বা হয়ে পাহাড়ের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওটা যেন কাগজে আঁকা কালো রঙের মূর্তি—যার মুখচোখ আকার প্রকার বিশেষ কিছু নেই!

এমা বলল, কী দেখছ টিটো?

ওই জিনিসটা কী হতে পারে, দেখ তো এমা! বলে আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গেলুম। আমার হাতে তখনও রাইফেল আছে। গুলিও আছে।

এমা দেখতে দেখতে চমক খাওয়া স্বরে বলল, টিটো! টিটো! ওটা মানুষের মতো যেন!

চাপা গলায় বললুম, সেই ছায়ামানুষ নয় তো?

এমা বলল, এই! গুলি করো না যেন। বাবা রাগ করবেন।

আমি রাইফেল তাক করেছিলুম। গুলি করব না—নেহাত ওটাকে ভয় দেখাতে। রাইফেল নামিয়ে বললুম, আরও খানিকটা কাছাকাছি গেলে ভাল করে দেখা যেত। তবে অনেকটা পাহাড়ে চড়তে হবে।

এমা আমার একটা হাত ধরে বলল, চলো না টিটো। দেখে আসি, সত্যি ওটা কী?

যাবে? হিরণমামাদের দিকে চোখ রেখে বললুম। ওঁরা আপনমনে আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে দৃষ্টি নেই। কিচেন-ক্যাম্পের সামনে একটা হ্যাজাক জ্বালা হচ্ছে এতক্ষণে।

এমা পা বাড়িয়ে বলল, বেশি কাছে না গেলেই হল। ওই ধাপবন্দী জায়গাটা দেখছ? ওখানে উঠে গেলে আরও স্পষ্ট দেখা যাবে।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেতে হলে আর একটুও দেরি করা ঠিক নয়। এগিয়ে যেতে-যেতে বললুম, তুমি পাহাড়ে চড়তে পারো তো?

এমা একটু হেসে বলল, মাউন্টেনিয়ারিং? সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস পাহাড়ে গিয়ে রীতিমতো ট্রেনিং নিয়েছি। এত আনাড়ি ভেবো না।

আমরা ফাটলের নিচে ধাপবন্দী জায়গায় পৌঁছে গেলুম। কিন্তু ছায়ামূর্তিটা আড়ালে পড়ে গেল। তখন দুজনে ধাপের মতো বড়-বড় পাথর বেয়ে উঠতে শুরু করলুম। ঠাণ্ডায় এরই মধ্যে পাথরগুলো বরফ হয়ে উঠেছে যেন। হাতে দস্তানা নেই। তার ওপর এই রাইফেল। খুব সাবধানে কষ্টেসিষ্টে শেষ ধাপের মাথায় পৌঁছে দুজনে বসে পড়লুম।

তারপর অবাক হয়ে গেলুম। সেই ছায়ামূর্তিটা এবার বসে পড়েছে এবং হাঁটু দুমড়ে বসার ভঙ্গিতে একটু ঝুঁকে আমাদেরই যেন দেখছে। আমরা হতবাক। ওই বিদঘুটে মানুষের মতো প্রাণীটাই কি তাহলে ছায়ামানুষ?

একটু পরে মজা করার জন্য রাইফেল তাক করলুম ওটার দিকে। কিন্তু ওটা তেমনি বসে রইল। এমা বলল, এই টিটো! ওটার মুখচোখ কোথায়? নিরেট কালো পাথরের মূর্তি যে!

বললুম, ভুল করছ, এমা। নিরেট নয়, লক্ষ্য করে দেখ, ওটা কালো কাচের মতো স্বচ্ছ জিনিস যেন। ওর শরীরের ভেতর দিয়ে পেছনকার পাথুরে দেয়াল দেখা যাচ্ছে!

এমা চমকে উঠে বলল, তাই তো বটে! ওটা যে ছায়ার মতো একেবারে। ছায়ার ভেতর যেমন সবকিছু দেখা যায়, তেমনি! মেলার কাকা ঠিকই বলছিলেন!

দিনের আলো প্রায় মিলিয়ে গেছে। ধূসর আলোটা যত কালো হয়ে যাচ্ছে, ছায়া-মূর্তিটা তত আশপাশের জিনিসের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বুঝলুম, আর দু এক মিনিট পরে আবছা আঁধারে ওটাকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। অন্ধকার হলে তো বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এতক্ষণে ভয় পেলুম। দেখলুম, এমার মুখেও আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। ফিসফিস করে বলল, আর নয়। কেটে পড়ি এস। ব্যাপারটা ওদের এক্ষুনি জানানো দরকার।

ঠিক বলেছ। বলে নামবার জন্য পা বাড়িয়ে ফের একবার ঘুরে অন্তত শখানেক ফুট উঁচুতে ছায়ামূর্তিটাকে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আর দেখতে পেলুম না। তখন অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি নামতে থাকলুম।

এমা আমার পাশেই নামছিল। ফুট তিরিশেক নামার পর ঘুরে বললুম, সাবধান এমা! এখানে একটা খাদ আছে। কই, হাতটা বাড়াও।

পিছু ফিরে হাত বাড়িয়ে দিলুম। অন্ধকার দ্রুত এসে গেছে। ডাকলুম, কই এমা! হাত ধরো। নইলে পড়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় এমা?

চমকে উঠে ডাকলুম, এমা! এমা! কোথায় তুমি?

কোনো সাড়া এল না। ওপরে ধাপবন্দী পাথরের ওপর কেউ নেই। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠলুম, এমা! এমা।

পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকল। নিচের চাতাল থেকে এবার হিরণমামা ও মেনহার্স্টের ডাক ভেসে এল—টিটো! টিটো! এমা! কোথায় তোমরা?

তারপর কয়েকটা টর্চের আলো এসে পড়ল। হিরণমামা চেঁচিয়ে বললেন, এই বাঁদর। ওখানে কী করছিস তুই? নেমে আয় বলছি।

টর্চের আলো আমার পিছনে উঁচু পাহাড়ে অনেকটা দূরঅব্দি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেই আলোর শেষদিকটায় অনেক উঁচুতে একপলক যেন দেখলুম ছায়ামূর্তিটাকে।

দুহাতে সে এমাকে তুলে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে টিকটিকির মতো উঠে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড। তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। অসহায় রাগে

তক্ষুনি রাইফেল তাক করে পরপর তিনবার ট্রিগারে চাপ দিলুম। অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি বেরুল। ভয়ংকর শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল চারদিকে।

তারপর কেউ আমাকে ধরে ফেলল। দেখি, হিরণমামা। তাঁর পেছনে উঠে এসেছেন মেনহার্স্ট আর মেলার। আমার মাথা ঘুরে উঠল। অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

চার : এমার সন্ধানে

জ্ঞান হলে দেখি ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছি। তাঁবুর ভেতর টুলে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। পাশে উদ্বিগ্নমুখে বসে আছেন হিরণমামা।

উঠে বসলুম ধুড়মুড় করে। হিরণমামা বললেন, ওঠে না। শুয়ে পড়ো!

বললুম, আমার ঠিক হয়ে গেছে মামা। ওঁরা কোথায়?

এমার খোঁজে কাম্বো পাহাড়ের ভেতরে গেছেন। আমি তোমার জন্য বাধ্য হয়ে থেকে গেছি।

আমি নেমে গেলুম ক্যাম্প খাট থেকে। বললুম, আমিও যাব মামা। আপনার রাইফেলটা কই?

হিরণমামা আমার হাত ধরে বললেন, পাগল হয়েছিস টিটো? তুই কোথায় যাবি?

বললুম, না মামা। আমারই বোকামিতে এমাকে ধরে নিয়ে গেছে ছায়ামানুষ। আমার যাওয়া উচিত।

হিরণমামা একটু হেসে বললেন, আমরা সবাই ব্যাপারটা দেখেছি। টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখেছি, কালো একটা ছায়া এমাকে দুহাতে তুলে পাহাড় বেয়ে ওপারে চলে গেল। তবে ব্যস্ত হবার কারণ নেই। চুপটি করে শুয়ে থাকো। মেনহার্স্ট এবং মেলার গেছেন। আমি তোমার জ্ঞান হবার অপেক্ষায় ছিলুম। এবার আমি যাচ্ছি। ওঁরা আমার জন্য হ্রদের ধারে ট্যুরিস্ট লজে অপেক্ষা করবেন।

রাগ দেখিয়ে বললুম, বারে! আমি যাব না কেন তোমার সঙ্গে?

তুই তো অসুস্থ!

আমার কিছু হয়নি। উত্তেজনার চোটে মাথা ঘুরে উঠেছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

হিরণমামা একটু ভেবে বললেন, পারবি তো? ভেবে ছাখ বাবা!

পা বাড়িয়ে বললুম, খুব পারব।

হিরণমামা উঠলেন। তারপর ওঁর ক্যাম্প খাটের বিছানার পাশ থেকে রিভলবার নিয়ে বললেন, এটা বরং তুই কাছে রাখ। সাবধান, এটাও অটোমেটিক। ট্রিগারে চাপ

দিলেই গুলি বেরিয়ে যাবে। ছটা গুলি ভরা আছে। এই নে আরও ছটা গুলি পকেটে রাখ। আর এই টর্চটা নে।

উনি রাইফেলটা নিলেন, আমি প্যাণ্টের পকেটে রুমালে জড়িয়ে ছঘরা রিভলবারটা নিলুম। হিরণমামা বেরিয়ে ডাকলেন, বোটা! শোনো। আমরা বেরুলুম।

কালো কুচকুচে বিশাল দানোর মতো চেহারার একজন নিগ্রো চাকর সেলাম দিয়ে মাথা দোলাল। যেতে যেতে হিরণমামা বললেন, বোটাকে দেখলি তো? মাকাসিকো আইল্যাণ্ডের সবাই ওকে ভয় পায়। দুর্দান্ত লোক বোটা। ডঃ মেনহার্স্ট ওকে জুটিয়ে এনে ভালই করেছেন।

সমতল চাতালের শেষে একটা চড়াই ভেঙে আমরা কাম্বো রোডে উঠলুম। সুন্দর একখানি পিচের রাস্তা তিরিশ কিলোমিটার দূর থেকে উঠে এসেছে কাম্বো গিরিপথে। এঁকেবেঁকে সাপের মতো এসেছে। অন্ধকার রাত। রাস্তায় পৌঁছে আর টর্চ জ্বালালেন না হিরণমামা। আমিও জ্বাললুম না। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। দস্তানা পরে এলে ভাল হত।

নিঃশব্দে গিরিপথের দিকে হাঁটছি আমরা। হিরণমামা চাপা গলায় বললেন, কাম্বো পর্যটনকেন্দ্রে একটা পাওয়ার হাউস ছিল। সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। শুনলুল, পাওয়ার হাউসের যন্ত্রপাতি মাসখানেক আগে বিগড়ে যায়। অনেক চেষ্টাতেও আর চালু করা যায়নি। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। দেশবিদেশের অনেক ইঞ্জিনিয়ার এসেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপর…

হিরণমামা হঠাৎ থেমে গেলেন। বললুম, কী হল মামা?

গিরিপথে ঢুকে পড়েছি আমরা।…বলে উনি টর্চের আলো ফেললেন বাঁ পাশের খাড়া দেয়ালে। ওই দেখ্‌, টিটো, সেই লেখাটা। স্থানীয় ভাষায় লেখা। আমরা পড়তে পারছি না। ওতে নাকি লেখা আছে: 'মানুষের জন্য কাম্বো নিষিদ্ধ এলাকা। পা বাড়ালেই মৃত্যু।'

কালো ধ্যাবড়া হরফে লেখা। মনে হল, কতকগুলো আলকাতরার হিজিবিজি পোঁচ টেনে দিয়েছে কেউ। কিন্তু মইয়ের সাহায্য ছাড়া ওখানে উঠে লেখা যাবে না। মই এনেছিল নাকি?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, ছায়ামানুষটাকে টিকটিকির মতো পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে উঠতে দেখেছি।

গিরিপথ—কাম্বো পাস প্রায় আধ কিলোমিটার লম্বা। চওড়া খুব কম। এখানে রাস্তাটায় বড় জোর একটা গাড়ি পাস করতে পারে। দুধারে খাড়া দেয়ালের মতো পাথরের পাহাড় অন্তত দুহাজার ফুট উঠে গেছে। ভয় হচ্ছিল, আচমকা ভেঙে পড়লেই গেছি।

খুব সাবধানে অন্ধকারে হাঁটছি আমরা পাশাপাশি। সামনে পিছনে এবং দুপাশে লক্ষ্য রেখে চলেছি। নিঝুম হয়ে আছে কাম্বো পাস। সামনে দূরে ঘন অন্ধকার। কী আছে বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ পরে আবছা কানে এল জলের শব্দের সঙ্গে মেশা পাখিদের কলকাকলি। হিরণমামা বললেন, রাতচরা পাখি ওগুলো। বেশির ভাগই বুনোহাঁস।

তারপর কানে এল বাঘের ডাক। থমকে দাঁড়ালুম। পরক্ষণে হিরণমামা হাসলেন। নাঃ। ভয় নেই। ওরা তো অহিংস! আয় টিটো। আমরা যদি ওদের না ঘাঁটাই, ওরা কিছু বলবে না।

পাস শেষ হতেই গরমটা কেটে গেল। ফের ঠাণ্ডা লাগল। কিন্তু আগের মতো ঠাণ্ডা নয়। বরং কাম্বো ক্রেটারের ভেতরটা বেশ মনোরম। একটু দূরে উঁচুতে একবার আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। হিরণমামা বললেন, ট্যুরিস্ট লজে ওঁরা আলোর সংকেত দিচ্ছেন। আমি সাড়া দিই।

বলে উনি টর্চটা জেলে এপাশে-ওপাশে নাড়া দিয়েই নেভালেন।

তারপর দুদ্দাড় করে দুপাশে কীসব আওয়াজ হল। হিরণমামা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, টর্চ জ্বালিসনে টিটো! খবর্দার!

এ কিসের শব্দ মামা!

জন্তুজানোয়ারের। ওরা আমাদের অতিথির মতো যেন সংবর্ধনা করতে এসেছে। ঠাহর করে দেখলেই টের পাবি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ডাইনে আর বাঁয়ে তাকালুম। কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকার স্বচ্ছ মনে হল। তারপর বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে কাঠপুতুলের মতো মামার পাশে-পাশে হাঁটতে থাকলুম।

আমাদের দুধারে কালো-কালো অসংখ্য চারপেয়ে পশু চলেছে। গুঁতোগুঁতি ঠেলাঠেলি করে এগোচ্ছে। তাই দুদ্দাড় খট্‌খট্ শব্দ হচ্ছে।

আরও একটু পরে আবছা টের পেলুম, বাঘ নেকড়ে চিতা ভালুক শেয়াল—কী নেই! একটু তফাত রেখে ওরা দুপাশ থেকে আমাদের অনুসরণ করছে। জ্বলন্ত চোখও অনেকগুলো ঠাহর হচ্ছে এবার। তারপর দেখি, সামনে হ্রদ—ঢেউখেলানো জলে নক্ষত্রের আলো ঝিকমিক করছে। পাখিদের চ্যাঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

এখন একটা ব্যাপার দেখে আরও অবাক হলুম। অন্ধকারটা আর অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে না। ধূসর আলো ছড়িয়ে রয়েছে—ঠিক সন্ধ্যার প্রথম প্রহরের মতো। হ্রদের ধারে ডানদিকে ট্যুরিস্ট লজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দরজায় গিয়ে নক করলেন হিরণমামা। সিঁড়িতে আলো ও পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজাটা কাঁচের। আমি পেছন ঘুরে দেখি, পশুদের পাল সরে গেছে তফাতে। চলে যাচ্ছে ওদিকে কোথাও।

মেনহার্স্ট ও মেলার দরজা খুলে দিলেন। মেলারের হাতে মোমবাতি। দরজা আটকে আমরা দোতালায় পুব-দক্ষিণ কোণের একটা ঘরে পৌঁছলাম। মেলার বললেন, এই ঘরে আমি ছিলুম।

ডবলবেড বড় ঘর। আসবাবপত্র সুদৃশ্য। সোফায় বসে আলোচনা চলতে থাকল। টেবিলে মোমবাতিটা জ্বলছে। আমি পুবের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্ধ্যার প্রথম প্রহরের মতো আবছায়া ছড়িয়ে আছে। কিন্তু অস্পষ্টভাবে সব দেখা যাচ্ছে। সত্যি, বড় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে।

হিরণমামা হঠাৎ ডাকলেন, টিটো! সরে আয় ওখান থেকে। জানালা আটকে দে। শোন্, কথা আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে যেতে হল। মেনহার্স্ট উদ্বিগ্নমুখে বললেন, ব্যাপারটা তোমার মুখে শুনতে চাই টিটো! বলো, কী হয়েছিল তখন? কেনই বা তোমরা ওখানে উঠেছিলে?

সব খুঁটিনাটি বিবরণ দিলুম। তারপর মেলার বললেন, রাতের বেলায় কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং সকাল হলে…

তাঁকে বাধা দিয়ে মেনহার্স্ট বললেন, না, মিঃ মেলার। কাম্বোর প্রতি ইঞ্চি মাটি আমার চেনা। একসময় এখানে আমি গাছপালা জন্তুজানোয়ার পাখি আর পোকা-মাকড় নিয়ে রিসার্চ করেছি। তখন কিন্তু ছায়ামানুষ-টানুষের কোনো উৎপাত ছিল না। অবাক হবার মতো কিছু দেখিওনি। যাই হোক, এমার জন্য রাতেই আমি বেরুতে চাই। আপনারা সঙ্গে এলে আসুন, নইলে আমি একাই বেরুব।

হিরণমামা বললেন, একা যাবেন কেন, ডঃ মেনহার্স্ট? আমরা আছি কী করতে? এখন কথাটা হল, এমাকে যেখান থেকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে, সেখানটা মনে হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। চলুন, বরং আগে সেদিকেই যাই।

মেলার বললেন, এক কাজ করা যাক্। আমরা দু-দলে ভাগ হয়ে যাই বরং। আমি আর মাস্টার টিটো যাই উত্তরে আরও একটু দূরে। কী টিটো? আমার সঙ্গে যাবে তো? ভয় করবে নাতো?

বললুম, মোটেও না।…

একটু পরে আমরা ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

চারজনে হ্রদের পশ্চিম পাড়ে পিচের রাস্তায় চলতে থাকলুম। এখন কিন্তু জন্তুরা আমাদের অনুসরণ করল না। তারা এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। অনেকে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি করে খেলছে। অদ্ভুত শব্দ করছে। মাঝে মাঝে কেউ নিজের ভাষায় গর্জনও করছে। আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে আমাদের দেখে।

সারবন্দী কটেজ ও কয়েকটা উঁচু বাড়ি পেরিয়ে হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে পৌঁছলুম। এবার মেনহার্স্ট ও হিরণমামা বাঁদিকে পাহাড় লক্ষ্য করে এগোলেন। মেলার ও আমি হ্রদের উত্তর পাড়ে গেলুম। সেই ধূসর রঙের অদ্ভুত আলোয় একটুও অসুবিধে নেই চলাফেরা করতে।

মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে মেলার বললেন, টিটো, উত্তরদিকটা ভীষণ জঙ্গল মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ, মিঃ মেলার।

গাছগুলো কত উঁচু দেখছ! ভেতরটা কিন্তু গাঢ় অন্ধকার।

টর্চ তো আছে। চলুন, যাই।

দুজনে হ্রদ থেকে দূরে সড়ে সেই বিশাল অরণ্যে গিয়ে ঢুকলুম। টর্চ জেলে দেখি, তলায় শুকনো পাতার স্তূপ। কিন্তু তলাটা বেশ ফাঁকা। মাঝেমাঝে ছোট বা বড় পাথর পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ চলার পর মেলার বললেন, খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা হচ্ছে না টিটো?

তা তো হচ্ছেই।

তাহলে?

তাহলে কী? আপনিই তো এদিকে এলেন। প্ল্যানটা কী আপনার?

আমার গলায় রাগের ঝাঁঝ টের পেয়ে মেলার আমার কাঁধে হাত রেখে একটু হেসে বললেন, প্ল্যান নিশ্চয় আছে। প্ল্যান হল, কাম্বো পর্বতমালার উত্তর অংশে পৌঁছানো। আমি কাম্বোর একটা ম্যাপ যোগাড় করেছিলুম। কাজেই ম্যাপ অনুসারে এগিয়ে যাব। সামনে একটা ঝর্ণা পড়বে। তার পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠব।

অধৈর্য হয়ে বললুম, তারপর?

মেলার বললেন, ঝর্ণার কাছে বসব কিছুক্ষণ। চাঁদ উঠবে রাত বারোটা নাগাদ। তখন আর অসুবিধে নেই। পাহাড়ে উঠে আমরা প্রথমে খুঁজব সেই ভূতুড়ে গুহাটাকে।

ভূতুড়ে গুহা মানে?

ওই গুহার সম্পর্কে অনেক গুজব শুনেছি মাকাসিকো আইল্যাণ্ডে। কয়েকটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনার পর ওদিকে সরকার আর কাউকে যেতে দেন না।"

কী দুর্ঘটনা?

কারা নাকি মারা পড়েছিল! এর বেশি কিছু জানি না। চলো।

সবে পা বাড়িয়েছি, পশ্চিমদিকে। সম্ভবত পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে আচম্বিতে কে চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও! তারপরই হিরণমামার গলা শুনতে পেলুম, টিটো! মেলার! এদিকে আয় তোরা।

অনেকটা দূর থেকে ভেসে এল কথাগুলো। অমনি আমি চেঁচিয়ে সাড়া দিলুম—মামা! হিরণমামা। আপনারা কোথায়?

মেলার দৌড়ুতে শুরু করলেন টর্চ জ্বেলে। আমি তাঁর পেছন পেছন চললুম। কিন্তু দূর থেকে আর কোনো সাড়া এল না।

কিছুটা ছুটে চলার পর মেলার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁর টর্চটা নিভে গেল। আমিও পড়লুম তাঁর গায়ের ওপর। পাথরে ধাক্কা খেয়ে আমার টর্চটাও নিভে গেল। ঘন অন্ধকারে অতি কষ্টে আমি পা বাড়িয়ে ডাকলুম, চলে আসুন মিঃ মেলার।

মেলারের সাড়া পেলুম না। কিন্তু আমার মাথায় ঝোঁক চেপে গেছে। ওঁর অপেক্ষা না করে দৌড়ে চললুম। অন্ধকারে কতবার পাথর ও গাছে ধাক্কা খেলুম, বলার নয়।...

পাঁচঃ ছায়ামানুষের মুখোমুখি

টিটো! মেলার! টিটো—ও—ও—ও!

একটা পাথরে উঠে পা বাড়িয়েছি এবং টর্চের সুইচ টিপেছি, কিন্তু আলো জ্বলল না। এমন সময় ফের হিরণমামার ডাক ভেসে এল। এবার ডাকটা অনেকটা দূরে। ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিভীষিকা ভরা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হিরণমামা কি দূরে সরে যাচ্ছেন? নাকি আমিই দূরে সরে যাচ্ছি? অন্ধকারে এখানে কিছুটা স্বচ্ছ। কারণ জঙ্গলের বাইরে চলে এসেছি। সাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, হিরণমামা! হিরণমামা—আ—আ—আ!

প্রতিধ্বনি শুনে বুঝলাম, পাহাড়ের খুব কাছে চলে এসেছি। এতক্ষণে মেলারের কথা মনে পড়ল।

তাই তো! মেলার কি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। চেঁচিয়ে ডাকলুম, মিঃ মেলার! কোথায় আপনি?

কোনো জবাব এল না। বারকতক ডাকার পর পাথরটা থেকে যেই নামতে গেছি, পা হড়কে গেল। পকেটে রুমালে জড়ানো ওটোমেটিক রিভলবার আছে—মনে পড়ামাত্র ওই অবস্থায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছিলুম, সেই রক্ষে। নইলে গুলি ছুটে গিয়ে উরু জখম হত, কিংবা তলপেটে গুলি লেগে মারা পড়তুম।

আমার ভাগ্য ভাল। সটান গড়িয়ে ধপাস করে ভিজে বালির ওপর পড়লুম। তারপর টের পেলুম, মেলারের বলা সেই ঝর্ণার স্রোত বয়ে যাচ্ছে কলকল শব্দে। বালিতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। শরীরের কয়েক জায়গা জ্বালা করছে। নিশ্চয়

ছড়ে গেছে। হাড়গোড় ভাঙেনি এই যা। কিন্তু তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। স্রোতের জলে নক্ষত্রের আলো ঝিকমিক করছে। উঠে গিয়ে জল খেলুম আঁজলা ভরে। ক্লান্তিটা চলে গেল। কিন্তু এবার ভয়ে গা ছমছম করে উঠল। ছায়ামানুষের কথা মনে পড়ল।

ওরা কি অন্ধকারে মিশে আমার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে? আমাকে অনুসরণ করছে, আর মুখ টিপে হাসছে আমার অবস্থা দেখে? গা শিউরে উঠল।

পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চারদিকে তাকালুম। ঝর্ণাটা এখানে সমতল মাটিতে নদীর মতো বইছে। তার ওধারে পাঁচিলের মতো পাহাড় উঠে গেছে। মেলার বলেছেন, ঝর্ণার মাথায় একটা নাকি ভূতুড়ে গুহা আছে। সেই গুহায় ওরা এমাকে রাখেনি তো? সম্ভবত এমার বাবাকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

টর্চটা কিছুতেই জ্বলল না। ঝর্ণার ধারে ধারে হাঁটতে থাকলুম বালির ওপর। একটু পরে বুঝলুম, ক্রমশ সবকিছু অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ আমার ডানদিকে উঁচু গাছপালার মাথায় হলদে আলোর ছটা হয়েছে। হ্যাঁ, এতক্ষণে তাহলে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা উঠছে। মনে জোর এল।

ঝর্ণার শব্দ বাড়ছিল। কিছুটা এগিয়ে দেখি, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় ছোট-বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণাটা উঁচু থেকে হাজারটা ধারায় নেমে এসে একটা ছোট পুকুরের মতো জায়গায় পড়ছে। সেখান থেকে জলটা সমতলে ছোট নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে।

পাথরের ধাপগুলো খুব পিছল। জল ছিটিয়ে পড়ে শ্যাওলা জমে আছে। খুব সাবধানে উঠতে থাকলুম। চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল হয়েছে। তাই আর অসুবিধা হচ্ছে না পা ফেলতে। কিন্তু মাঝে মাঝে চারদিকে তাকাতে গিয়ে যেখানে সেখানে ছায়ামানুষ দেখতে পাচ্ছি যেন। মনে হচ্ছে, চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওরা আমায় দেখছে।

না, চোখের ভুল। পাথর, ঝোপঝাড় বা গাছের ছায়া দেখেই ভুলটা হচ্ছে।

অনেক কষ্টে ঝর্ণার মাথায় গিয়ে উঠলুম। চাঁদ আরও উঠে এসেছে। আমার নিচে কালো জঙ্গল এবং তার ওপারে ইয়ারা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। সর্বনাশ! কত উঁচুতে উঠে এসেছি!

পিঠের দিকে একটা চাতাল মতো জায়গা। তার শেষে খাড়া পাহাড়। পাথরের পাঁচিল যেন।

সেই পাঁচিলের নিচে একটা গোল প্রকাণ্ড জায়গা নিরেট কালো। ওটাই কি সেই ভূতুড়ে গুহার দরজা? রিভলবারটা বাগিয়ে সাবধানে চাতালে এগোলুম। অকেজো টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছি।

হ্যাঁ, গুহার দরজাই বটে। প্রকাণ্ড হাঁ করে যেন এক প্রাগৈতিহাসিক দানব আমায়

গিলে ফেলার জন্য তৈরি হয়েছে। বুক কেঁপে উঠল। দাঁড়িয়ে গেলুম। অন্ধকারে গুহায় ঢোকা ঠিক হবে কি?

একটু পরে হঠাৎ কোথায় কে ফিসফিস করে কিছু বলল যেন। চমকে উঠেছিলুম। মনে হল, বাতাসের শব্দ।

কিন্তু ফের সেই রকম ফিসফিস করে কে যেন কিছু বলছে। শব্দটা অনেকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার মতো, কিংবা গাছপালার মর্মরধ্বনির মতো।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে?

এবার স্পষ্ট এবং জোরালো ফিসফিস শব্দে সাড়া এল, তুমি কে?

অবিকল বাতাসের শব্দের মতো। তার চেয়ে ভারি অদ্ভুত, ফিসফিস প্রশ্নটা বাংলা ভাষায়—তুমি কে? আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় একটা রাতের পাখি ঘুমঘুম করে গান গেয়ে উঠল, টুই টুই…টুই টুই…টুই! মাথার ওপর শনশন করে একঝাঁক বুনো হাঁস ইয়ারা হ্রদের দিকে চলে গেল। তারপর ফের সেইরকম বাতাসের শব্দে পরিষ্কার বাংলাভাষায় কেউ বলল, কথা বলছ না কেন?

আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললুম, তুমি কে আগে বলো?

বলব না। তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাস মেশানো ফিসফিস জবাব এল।

বলবে না? সাহস পেয়ে বললুম। সামনে এস তো দেখি, কে তুমি?

আমি একজন ছায়ামানুষ।

এবার ভীষণ চমকে উঠলুম। বললুম, কোথায় তুমি?

তোমার সামনে।

এতক্ষণে তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে গুহার দরজার অন্ধকার অংশ থেকে ছায়ার মতো কেউ সরে পাশে দাঁড়াল। অবিকল একটা ছায়ামূর্তি। কিন্তু মুখ নাক চোখ কিছু নেই। নিরেট কালচে রঙের দু-হাত, দু-পা এবং মুণ্ডুসমেত একটা মূর্তি।

ভয়ের বস্তু যতক্ষণ চোখের আড়ালে লুকোচুরি খেলে, ততক্ষণ সে সত্যি বিভীষিকাময়। কিন্তু এভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং মাকাসিকো দ্বীপের রহস্যময় কাম্বো পাহাড়ে দিব্যি বাংলাভাষায় কথা বলছে, কাজেই ভয়টা চলে গেছে এবার। বললুম, তুমিই কি ডঃ মেনহার্স্টের মেয়ে এমাকে তখন ধরে আনলে?

না। আমি কাকেও ধরে আনি নি। বরং আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য ওরা চেষ্টা করছে। পারছে না। আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

এখন তো তোমাকে সহজে ধরে ফেলতে পারে ওরা!

ওরা এখন পাতালপুরীতে বৈঠকে জুটেছে।

কিসের বৈঠক?

দুটো মানুষ ধরে এনেছে ওরা। তাই নিয়ে আলোচনা চলছে।

বুঝেছি, ডঃ মেনহার্স্ট এবং তাঁর মেয়ে এমাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু তুমি কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছ ?

আমার এসব পছন্দ নয়।

কী পছন্দ নয় ?

এইভাবে ছায়ার মতো বেঁচে থাকা। এক পাগলের গোলামি করা।

কে সে পাগল ?

তার পাল্লায় পড়লেই বুঝবে।...ছায়ামানুষটা আরও কাছে এল। তেমনি বাতাসের শব্দে কথা বলল। আমার গায়ে তার ঝাপটানি লাগল। সে বলল, তোমার বয়স কম। তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই দেখে আমার দয়া হল। সাবধান করে দিতে এলুম। শিগগির চলে যাও এখান থেকে। নইলে ওদের পাল্লায় পড়লে তোমাকেও আমার মতো ছায়ামানুষ বানিয়ে ছাড়বে।

রাগ দেখিয়ে বললুম, অত সহজ না।

বাহাদুর ছেলে! আমিও অমনি সাহস দেখাতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলুম। আমিও একদিন তোমার মতো মানুষ ছিলুম!

বলো কী! তুমি নিশ্চয় বাঙালী ?

না। আমি মাকাসিকোর একজন বাসিন্দা।

তাহলে বাংলা বলছ কী ভাবে ?

ছায়ামানুষ হওয়ার এই একটাই সুবিধা। আমি আমার ভাষাতেই বলছি, তোমার মগজে গিয়ে কথাগুলো তোমার ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললুম, আশ্চর্য তো!

হ্যাঁ, আশ্চর্য বটে। এমন কী, পাখি বা জন্তুজানোয়ারও ছায়ামানুষের ভাষা এভাবেই বোঝে। তাদের ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়। আর একটা কথা, দিনে আমার অস্তিত্ব থাকে না। টেরও পাই না যে আমি আছি। ঠিক সন্ধ্যায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠি। রাতেই ছায়ামানুষ হয়ে ঘুরি। ভোরে আবার যেন মৃত্যু হয়।

মানুষ থাকার সময় তোমার কী নাম ছিল ?

মিরান্দো।...বলে ছায়ামানুষটা একটু নড়ে উঠল। বলল, আর দেরি নয়, কেটে পড়ো। ওদের বৈঠক শেষ হয়ে এল হয়তো। পালিয়ে যাও, যদি বাঁচতে চাও।

ছায়ামূর্তিটা সরে যাচ্ছে। আমি কয়েক পা এগিয়ে বললুম, একটা কথা বলে যাও। একটুকরো কাগজে কি তুমিই লিখেছিলে...

হ্যাঁ। আমি লিখে ট্যুরিস্ট লজে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। তখনও বুঝতে পারিনি, ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে গেছে ওখান থেকে।

আর একটা কথা।

শিগগির বলো।

তুমি এখনও কাম্বো পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

আবার মানুষ হতে চাই, তাই, ওই বজ্জাত বুড়ো পাগলার কাছে এরকম ক্যাপস্যুল আছে। সেটা গিলে ফেললেই ফের রক্তমাংসের শরীর ফিরে পাব। কিন্তু ধূর্ত শয়তান ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।......ছায়ামানুষ মিরান্দো পাহাড়ের গায়ে টিকটিকির মতো উঠতে শুরু করলো। ফের সাবধান করে দিল, পালাও! পালাও! ওরা আসছে।

আমি ছুটে গিয়ে বাঁপাশে একটা বিরাট পাথরের আড়ালে বসে পড়লুম।...

ছয় : হিরণমামা বনাম মিরান্দো

চাঁদ তখন মধ্য আকাশে পৌঁছেছে। আধখানা রহস্যময় চাঁদ। চারপাশে জ্যোৎস্নায় মাঝেমাঝে যেন ছায়ামানুষ দেখছি, আর চমকে উঠছি। মিরান্দো বলে গেল, ওরা আসছে। কই আসছে? নিচের দিকে পাথরের ফাটলে প্রস্রবণ থেকে ঝর্ণাটা নেমে গেছে। খালি তারই ঝরঝর শব্দ। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া নিচের অরণ্য থেকে উঠে আসছে। দূরে ইয়ারা হ্রদে পাখিদের চিৎকার এবং মাঝে মাঝে জানোয়ারদের গর্জন ভেসে আসছে। আমি ওৎ পেতে বসে আছি।

হঠাৎ মাথায় এল, দিনে ছায়ামানুষদের অস্তিত্ব থাকে না। তাহলে তো দিনে এই গুহার ভেতর ঢুকে খোঁজ করাই উচিত। তখন কোনো ভয়ের কারণ হয়তো থাকবে না। অন্তত ছায়ামানুষদের কাছ থেকে কোনো বিপদ হবে না।

কিন্তু কে সেই শয়তান বুড়ো পাগলা—যে রক্তমাংসের মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে এরকম ছায়ামানুষ বানিয়েছে? নিখোঁজ ট্যুরিস্টদের রহস্যের সমাধান তাহলে হল।

ভাবনা হচ্ছে, যদি রাতারাতি ডঃ মেনহার্স্ট এবং এমাকে বজ্জাত বুড়োটা ছায়ামানুষ বানিয়ে ফেলে!

ঠিক একসময়ে নিচে খানিকটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে হিরণমামার চিৎকার শুনতে পেলুম —টিটো! মেলার! টিটো—ও—ও—ও!

সাড়া দিলে পাছে ছায়ামানুষদের কবলে পড়ি, সাহস হল না। কিন্তু এখানে বসে থেকেই বা কী হবে? ব্যাপারটা যখন মিরান্দো ফাঁস করে দিয়েছে, তখন প্ল্যানটা ঠাণ্ডা মাথায় ছক করা দরকার। এখানে বসে থাকার মানে হয় না।

সাবধানে দেখে শুনে ঝর্ণার পাশ দিয়ে নামতে শুরু করলুম। নামাটা কঠিন নয়। এখন জ্যোৎস্না চমৎকার ফুটেছে। একবারে নিচে সমতলে পৌঁছে বালির চড়া ধরে

কিছুটা এগিয়ে গেলুম। ওই সময় একটু ওপরে বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর টর্চের আলো আর হিরণমামার চিৎকার শুনতে পেলুম আবার—টিটো! মেলার! টিটো—ও—ও—ও!

এবার নির্ভয়ে সাড়া দিলুম,—মামা আ—আ! হিরণমামা—আ—আ—আ।

টর্চের আলো এগিয়ে আসতে থাকল গাছপালার ভেতর। একটু পরেই হিরণমামার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। হিরণমামা হাঁকতে হাঁকতে বললেন—মেলার কোথায়? মেলার?

সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা বললুম।

হিরণমামাও সংক্ষেপে জানালেন কী ঘটেছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে যখন ডঃ মেনহার্স্টের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, হঠাৎ মেনহার্স্ট চেঁচিয়ে ওঠেন—বাঁচাও! বাঁচাও! হিরণমামা টর্চ জ্বেলে হতভম্ব হয়ে দেখেন, পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা ছায়ামূর্তি মেনহার্স্টকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে টিকটিকির মতো উঠে যাচ্ছে। চোখের পলকে ওরা আড়ালে চলে যায়। মিছিমিছি গুলি ছুঁড়ে ফল হবে না বলে হিরণমামা সে চেষ্টা করেন নি। বরং তাঁর ভয় হয়েছিল, গুলির শব্দে জন্তুজানোয়াররা ক্ষেপে গিয়ে যদি চোরা শিকারীদের দশা করে তাঁর!

এবার দুজনে জঙ্গলে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলুম মেলারকে। মেলার যে ছায়া-মানুষদের কবলে পড়েন নি, তা ঠিক। কারণ মিরান্দো বলছিল, ওদের পাগলা সর্দারের সঙ্গে ওরা পাতালে বৈঠকে বসেছে।

কিছুক্ষণ পরে টর্চের আলো দুটো বিশাল গাছের মাঝখানে আটকে থাকা পাথরে পড়ল। তার ওধারে মনে হল, কেউ ঠেস দিয়ে বসে আছে।

দৌড়ে গেলুম দুজনে। দেখলুম, আহত রক্তাক্ত দেহে মেলার বসে আছেন। মাথা ফেটে গেছে। মুখে রক্ত পড়ে বীভৎস চেহারা হয়েছে। অতি কষ্টে বললেন, জল!

দুজনে ওঁকে ধরাধরি করে দক্ষিণে চলতে থাকলুম। ওদিকে ইয়ারা লেকের জলের শব্দ আর পাখিদের তুমুল চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল।

জন্তুরা দুপাশে সরে দাঁড়াল। আমরা হ্রদের ধারে সবুজ ঘাসে মেলারকে শুইয়ে রাখলুম। আঁজলা ভরে জল এনে মুখে দিলুম।

একটু পরে সুস্থ হয়ে উঠলেন মেলার। তখন তিনজনে ট্যুরিস্ট লজ লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকলুম। সেটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে। যেতে-যেতে হিরণমামা ও আমি মেলারকে সব কথা বললুম।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হ্রদের ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছ রয়েছে। তার নিচে দিয়ে রাস্তাটা এগিয়েছে। সেখানে ছায়ায় দুটো বাঘ গরগর শব্দ করে লেজ নেড়ে খেলা করছে। ওপাশে পার্কের ঘাসে জ্যোৎস্নায় একপাল হরিণ দর্শকের মতো ওদের

ফুর্তি উপভোগ করছে। আমরা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে এই আজব ঘটনা প্রত্যক্ষ করলুম।

হঠাৎ মেলার আমার একটা হাত চেপে ধরে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, ওই দেখ! ওই ওরা আসছে!

হিরণমামা বললেন, কী মিঃ মেলার? কারা আসছে?

কিছুদূরে জ্যোৎস্নায় চারটে ছায়ামূর্তি তরতর করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মেলার ফিসফিস করে বললেন, পালিয়ে চলুন! শিগগির!

হিরণমামা টর্চ জ্বালতে যাচ্ছিলেন। মেলার ওঁর হাত ধরে বাধা দিয়ে আবার বলে উঠলেন, পালান! পালান! ওই ওরা এসে পড়ল!

আমরা তিনজনে দৌড়তে শুরু করলুম। ট্যুরিস্ট লজের দরজার তালা কদ্দিন আগে এসে মেলার ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলেন। আমরা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ভালভাবে আটকে দিলুম। তারপর কাচের সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সারসার চারটে ছায়ামানুষ হ্রদের কোণা ঘুরে ট্যুরিস্ট লজের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল দেখে আতঙ্কটা চলে গেল। ওরা কিছুটা এগিয়ে ফাঁকা জায়গায় ঘাসের ওপর দাঁড়াল।

ওদের দিকে অসংখ্য পশু ছুটে যাচ্ছিল দড়বড় করে মাটি কাঁপিয়ে। তারপর শুরু হল এক অমানুষিক তাণ্ডব। সমস্ত পশুপাখি ওদের চারপাশে এবং মাথার ওপর ভিড় করে একসঙ্গে নিজের-নিজের ভাষায় যেন কথা বলতে থাকল। কিন্তু সব মিলিয়ে সে একটা সমুদ্রগর্জন যেন। কাচের দরজা বলে সম্মিলিত গর্জন অনেক অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। যেন দূরে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করছে। বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে।

তারপর হিরণমামা বলে উঠলেন, দেখুন দেখুন মিঃ মেলার! একদল হাতিও এসে গেছে দেখুন। শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

এবার শোঁশোঁ শব্দে বুঝি ঝড় বইতে থাকল। জ্যোৎস্নায় সে এক বিচিত্র ঝড়! গাছপালা প্রচণ্ড দুলতে থাকল। সামনের ফুলবাগিচা আর ঝোপঝাড় লুটিয়ে পড়তে থাকল। ইয়ারা হ্রদের জলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছিল কিনারায়। বাড়িটা ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল।

ব্যস্তভাবে মেলার বললেন, সর্বনাশ! ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

হিরণমামা বললেন, বলা যায় না। জায়গাটা তো আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। কে বলতে পারে, হাজার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠছে কি না!

আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম।

কিন্তু একটু পরে ঝড়টা থেমে গেল। জন্তুদের গর্জন, পাখিদের চিৎকারও থামল। আবার অবস্থা শান্ত হয়ে উঠল। ছায়ামানুষরা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ফিসফিস করে বাতাসের শব্দে ওদের সঙ্গে কথা বলছে।

মেলার বললেন, চলুন। ওপরের ঘরে যাওয়া যাক্। সাবধান, আলো জ্বালবেন না।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে সেই পুব-দক্ষিণ কোণার ঘরে গেলুম আমরা। মেলার সটান শুয়ে পড়লেন বিছানায়। হিরণমামা বললেন, টিটো! জানালায় দাঁড়াসনে। সরে আয়।

জানালা খুলে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ছায়ামানুষরা পুবদিকে চলে যাচ্ছে সার বেঁধে। পাখিরা আবার হ্রদের জলে ফিরল। জন্তুরা আবার খেলায় মেতে উঠল। একপাল হাতি শুঁড় তুলে জলে নামল।

মেলার বললেন, মিঃ চৌধুরী!. পাশেই এমনি একটা ডবলবেড ঘর রয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনারা শুতে পারেন। রাতে আর কিছু করা সম্ভব নয়। সকাল হলে আমরা সেই ভূতুড়ে গুহায় গিয়ে হানা দেব। আর শুনুন, জানালা বন্ধ রাখতে ভুলবেন না।

মেলার উঠে, আমি যে জানলাটা খুলেছিলুম, বন্ধ করে দিলেন। আমি ও হিরণমামা বেরিয়ে পাশের ঘরে গেলে দরজাটা ভালভাবে আটকে দিলেন।

দরজাগুলোতে ভাগ্যিস তালা দিয়ে যায়নি ট্যুরিস্ট লজের কর্মীরা। সম্ভবত ভয় পেয়ে তাড়াহুড়ো করে কেটে পড়েছিল। তাই এই অবস্থা।

এ ঘরটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায়। ডবলবেড। হিরণমামা সাবধানে টর্চ জেলে দেখে নেবার পর বললেন, খাসা!

তারপর চাপা গলায় ফের বললেন, তোর খিদে পায়নি টিটো? আমার তো বেজায় খিদে পেয়েছে। ডিনার করে বেরুনো গেল না—পোড়াকপাল! বাবুর্চি বুড়ো যা খাসা রেঁধেছিল, গন্ধটা এখনও নাকে লেগে আছে!

হিরণমামা একটু ভোজনবিলাসী মানুষ। তবে খিদে আমারও পেয়েছে। বললুম, খিদে পেলেই বা কি খাব?

হিরণমামা বললেন, দাঁড়া! আমি নিচের কিচেনে বা ভাঁড়ারে কিছু পাই নাকি দেখি। যেভাবে লোকেরা পালিয়ে গেছে, খাবারদাবার প্রচুর পাওয়ার কথা। তবে ওই বজ্জাত ছায়ামানুষগুলো যদি লুটেপুটে খেয়ে থাকে, আলাদা কথা।

উনি মেলারের দরজায় গিয়ে নক করছেন শুনলুম। মেলার কী বললেন বুঝতে পারলুম না। তারপর সিঁড়িতে হিরণমামার নেমে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

নিচে বাসনপত্র, টিনের কৌটো—এই ধরনের জিনিস ঠুংঠাং ঝনঝন করে নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছে। হিরণমামা খুঁজছেন নিশ্চয়। আমি খাবারের প্রত্যাশায় একটু চঞ্চলও হয়েছি ততক্ষণে।

হঠাৎ নিচে হিরণমামার হেঁড়ে গলায় চিৎকার শুনলুম—চোর! চোর! পাকড়ো! পাকড়ো!

তারপর ফের করুণ গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, টিটো! মেলার! শিগগির তোমরা এস! ব্যাটা চোর আমাকেই ধরে ফেলেছে!

দৌড়ে মেলারের দরজায় ধাক্কা দিলুম। মেলার ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, কী ঝামেলা করে সব! যাও! আমার ঘুম পাচ্ছে!

অগত্যা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম। কাঁচের ভেতর জ্যোৎস্নার ছটা এসে ঢুকেছে বলে সিঁড়িতে আলো রয়েছে। নিচের ডাইনিং হলটা আবছা অন্ধকারে ভরা। চেয়ার-টেবিলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বললুম, মামা! মামা! আপনি কোথায়?

ডাইনিং হলের ওপাশে করিডোর মত জায়গায় আলো দেখা গেল। গিয়ে দেখি, হিরণমামার জ্বলন্ত টর্চটা পড়ে আছে এবং সেই আলোর ছটায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে স্থির দাঁড়িয়ে গেলুম।

একটা ছায়ামানুষ হিরণমামাকে মাটিতে চিত করে ফেলে বুকে বসে আছে এবং তার একটা হাত মামার মুখে। মামা বেকায়দায় পড়ে পা দুটো ছুঁড়ছেন। আর বিড়বিড় করে বলছেন, ব্যাটা বরফ! একেবারে বরফের চাঁই! হি হি হি হি! হিরণমামার দাঁত ঠাণ্ডায় ঠকঠক করছে।

ছায়ামানুষটার অন্য হাতে একটা টিনের কৌটো। সে সেটা যেন মুখে ঢালছে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখের আকার নেই। তাছাড়া টিনের কৌটোর গায়ে তরল পদার্থটা গড়িয়ে শেষপর্যন্ত মামার বুকে এবং কানের কাছে পড়ছে।

এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে পেলুম না। তারপর আমার খটকা লাগল। বলে উঠলুম, হ্যাল্লো মিরান্দো! একী হচ্ছে!

অমনি ছায়ামানুষটা ঘুরে আমাকে দেখল। তারপর সেইরকম বাতাসের শব্দের মতো হিসহিস করে বুঝি হাসল। তারপর বলল, এই যে খোকাবাবু! এস, এস।

মিরান্দো! কী ব্যাপার? আমার মামাবাবুকে ধরে হেনস্তা করছ কেন? ছিঃ মিরান্দো! এটা ভারি অন্যায়!

মিরান্দো উঠে দাঁড়াল। হিরণমামা জিভ বের করে ঠোঁটের পাশ এবং আঙুল দিয়ে নিজের গালের গাঢ় তরলপদার্থটার স্বাদ নিতে নিতে বললেন, তাই বলো! তুমিই তাহলে সেই মিরান্দো—টিটো যার কথা বলছিল! দেখদিকি কাণ্ড, আগে জানলে তোমায় জাপটে ধরতে যেতুম না ভায়া!

হিরণমামা উঠলেন। টর্চটা তেমনি শুয়ে শুয়ে আলো ছড়াচ্ছে বলেই মিরান্দোকে দেখতে পাচ্ছি। এখন খুব কাছে বলেই ভালভাবেই দেখছি! সত্যি, ছায়ামানুষই বটে! শরীরটা নিতান্ত ছায়া দিয়ে তৈরি।

মিরান্দো বেজার মেজাজে বলল, সবে জেলিটুকুতে মুখ দিয়েছি, আপনি মশাই আচমকা হাঙ্গামা বাধিয়েছেন। রাগ হয় না বলুন?

আমি বললুম, কিন্তু খাওয়া তো তোমার হচ্ছেনা মিরান্দো! সব তো মেঝের গড়িয়ে পড়ছে!

মিরান্দো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সেটাই হয়েছে সমস্যা। ছায়ামানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু আগের লোভ, খিদে-তেষ্টা—কিছু যায়নি। সবই অভ্যেস তো! এই দেখ না—রোজ এসে ট্যুরিস্টলজের ভাঁড়ারে ঢুকি। আর খাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সব মেঝেয় পড়ে যায়। কী অবস্থা হয়েছে দেখ তোমরা!

হিরণমামা ততক্ষণে কান ও গাল সাফ করে ফেলেছেন। জিভ চুষতে চুষতে বললেন, ওহে মিরান্দো। খামোকা জেলিটা নষ্ট করে কী লাভ? আমায় দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে!

মিরান্দো রাগ করে কৌটোটা ঠকাশ করে ফেলে দিল। নাও! তোমাদের জ্বালায় পেট পুরে কিছু খেতে পাবার যো নেই!

হিরণমামা জেলির টিন কুড়িয়ে আঙুল পুরে দেখলেন কতটা আছে। তারপর আমার দিকে চোখ নাচিয়ে বললেন, থাম্। তোকেও দেব।

আমি টর্চটা তুলে আলো ফেলে দেখি, করিডোর থেকে শুরু করে ভাঁড়ারঘর এবং কিচেন পর্যন্ত মেঝেয়, টেবিলে, চেয়ারে, উনুনের পাশে সর্বত্র থকথক করছে রকমারি খাদ্য। এখন আবর্জনা বলাই উচিত। জমানো দুধ, জ্যাম, জেলি, পাউরুটি, কেক, ভাঙা ডিম, সেদ্ধ মাংস—সে এক বীভৎস ব্যাপার। পচা গন্ধ সবে ছুটেছে।

টর্চের আলোয় হঠাৎ কয়েকটা ফলের ঝুড়ি দেখতে পেলুম। বললুম, মামা! ফল! ফল!

কী ফল? হিরণমামা কৌটোর ভেতর জিভ ঢুকিয়ে জিগ্যেস করলেন।

জবাব দিল মিরান্দো। বলল, ফলে আমার রুচি নেই। আমার নিজের বাগানেরই

ফল ওগুলো। ভ্যান বোঝাই করে চালান দিতে এসেই না ব্যাটাদের পাল্লায় পড়েছিলুম। গিরিপথের কাছে দেখবে, আমার ভ্যানটা উল্টে খাদে পড়ে রয়েছে। যাই হোক, ফল আমি খাইনে। তোমরা ওগুলো খেতে পারো।

হিরণমামা বললেন, তুমি ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কথা বলছ কেন বাবু? তোমার গলার স্বর ভেঙে গেছে নাকি? যেন পাতিহাঁস! না—পাতিহাঁসও নয়, হাওয়াবাতাস!

মিরান্দো রেগে বলল, আর তোমার গলার স্বর তো ভাঙা ঢাকের বাদ্যি। উহুঁ—তাও না। পাহাড়ী রাখালদের ভেড়ার শিঙে তৈরি শিঙ্গা! ভ্যাঁ, ভোঁ!

আমি বিবাদ মিটিয়ে বললুম, ছেড়ে দাও মিরান্দো! আসলে মামাকে বলতে ভুলেছি, তোমরা বাতাসের মতো শব্দ করে কথা বলো।

হিরণমামা গম্ভীর মুখে বললেন, কই! আলো দেখা। ঝুড়ি দুতিন ফল নিয়ে ওপরে যাই। মেলারকে ওঠাই গিয়ে। ও বেচারারও খুব খিদে পেয়েছে বইকি।

আমি আলো দেখালুম। হিরণমামা গলাপচা খাদ্যবস্তুর ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে পা ফেলে তিনঝুড়ি ফল বগলদাবা করে আনলেন। তারপর গটগট করে ডাইনিং হলে ঢুকলেন। একটু পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুঝলুম, আপাতত খাদ্য ছাড়া আর কোনোকিছুতে মাথাব্যথা নেই হিরণমামার।

বললুম, তারপর মিরান্দো?

মিরান্দো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। বলল, কী?

তখন বলছিলে, মানুষজীবন ফিরে চাও। তাই না?

মিরান্দো ক্ষুব্ধভাবে বলল, আলবাৎ চাই! আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও চাইতে। ক্যাপসুলের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াতে।

কিন্তু কোথায় আছে তা—একটু আভাসও কি পাওনি মিরান্দো?

ভূতুড়ে গুহার ভেতর পাতালবাড়ি আছে। সেখানেই কোথাও আছে।

তাহলে সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখছ না কেন? নিশ্চয় পেয়ে যাবে।

তুমি মাইরি একেবারে গাড়োল! মিরান্দো ফের রেগে গেল। ওই সাংঘাতিক জায়গা থেকে কী কষ্টে যে পালিয়ে আসতে পেরেছি, বলার নয়। আর সেখানে ঢুকব ভাবছ? ঢুকলেই ব্যাটার খপ্পরে পড়ব।

তাহলে কী করে আর রক্তমাংসের মানুষ হতে পারবে?

মিরান্দো বলল, তুমি কিছু বোঝ না। চলো ডাইনিং হলের চেয়ারে বসবে। তোমায় সব বুঝিয়ে বলব। এখন আর ও ব্যাটাদের জন্য ভয় নেই। কারণ এখন ওরা চলে গেছে পুবের পাহাড়ের মাথায়। সেখানে আকাশের নিচে খোলামেলায় ভোর পর্যন্ত ওরা নাচবে গাইবে। ওখানে বুড়ো শয়তানটাও এসে গেছে এতক্ষণ। মেয়ে-ছায়ামানুষও আছে অনেক। তারা পুবের পাহাড়ের তলায় আরেকটা পাতাল বাড়িতে

থাকে। তারাই এসে নাচ গানের আসর জমিয়ে তুলবে। তারা কারা জানো? দেশ-বিদেশের যত নিখোঁজ নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েরা। শয়তান আলবার্ট্টো ওদের একটা জাহাজে বন্দিনী করে এই দ্বীপে এনেছিল। তারপর বেচারীদের ছায়ামানুষ বানিয়েছে।

আলবার্ট্টো? কে সে?

হ্যাঁ—মাকাসিকো ভাষায় আমরা আলবার্ট্টো বলি। লোকটা একজন ইতালিয়ান। আলবার্টো নাম। মিরান্দো এগোল। চল, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করবে তোমার। ছেলেমানুষ কিনা! আমার অবশ্যি আর ওসব বালাই নেই। কারণ আমার রক্ত-মাংস-হাড় ব্যাপারটা তো নেই। তুমিই ভেবে দেখ না, মাথা যার নেই—তার আবার কিসের মাথাব্যথা?

ডাইনিং হলে একটা চেয়ারে বসলুম। মিরান্দো বলল, ব্যাটারি পুড়িয়ে লাভ কী? টর্চ নেভাও। আমাকে দেখতে না পেলেও কথা তো শুনতে পাবে।

টর্চ নিভিয়ে দিলুম। ঘরের আবছা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল মিরান্দোর মূর্তি।...

সাত : ছায়ানাচের আসরে

এবার আমার রীতিমতো গা ছমছম করছিল। ছায়ামানুষ মিরান্দোকে যখন দেখতে পাচ্ছিলুম, তখন ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি না—সে ঘরের আবছা অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে এবং বাতাসের মতো হিসহিস শ্‌শ্‌ শোঁশোঁ শন্‌শন্‌—এইরকম আওয়াজ করে কথা বলছে—এটা বেশ ভূতুড়ে ব্যাপার। অন্ধকারে কেউ ফিসফিস করে কথা বললে অস্বস্তি হবে না কি?

তাই মেঝের দিকে টর্চের মুখ ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে আলো জ্বালছি এবং ওকে দেখে নিচ্ছি। এতে ও ধমক দিচ্ছে। কিন্তু কে বলতে পারে, ও অন্ধকারে আমার ঘাড় মটকে দেবার মতলব ভাঁজছে না? ছায়ামানুষের সঙ্গে ভূতের তফাতটা কোথায়?

কিন্তু মিরান্দো যা বলল, তা হল মোটামুটি এই :

পাগলা বুড়ো আলবার্টো দুরকম ছায়ামানুষ তৈরি করেছে তার পাতালপুরীতে। একরকম ছায়ামানুষ হল তারাই—যাদের রক্তমাংসের শরীর এখনও যত্ন করে কাচের কফিনে রেখে দিয়েছে। দরকার বুঝলে তাদের আবার সে মানুষ করে ফেলতে পারবে। অর্থাৎ এদের সে জ্যান্ত মানুষ থেকে তৈরি করেছে।

দ্বিতীয় রকমের ছায়ামানুষ হল তারাই—যাদের রক্তমাংসের শরীরটা আর নেই। নষ্ট হয়ে গেছে। এদের আর মানুষ করে ফেলতে পারবে না আলবার্টো। অর্থাৎ মরা মানুষ থেকেই এদের বানিয়েছে সে। সোজা কথায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছায়ামানুষ আস্ত ভূত।

মিরান্দো হলফ করে বলল, তোমার দিব্যি টিটো, আমি প্রথম শ্রেণীর ছায়ামানুষ। আমার জলজ্যান্ত শরীর থেকে শয়তান আলবার্টো আমাকে উপড়ে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। দুনম্বরী ছায়ামানুষ হলে কি আমি এতক্ষণ তোমাকে আস্ত রাখতুম ভেবেছ? ঘাড় মটকে তোমাকে মেরে তোমার ধড়টা নিয়ে যেতুম বুড়ো বজ্জাতটার কাছে। সে তোমাকে দুনম্বরী ছায়ামানুষ বানিয়ে ছাড়ত। আর কোনোদিন তুমি মানুষ হয়ে দেশে ফিরতে পারতে না।

এসব কথা শুনে আঁতকে উঠে বললুম, খুব হয়েছে মিরান্দো! সব বুঝতে পেরেছি।

মিরান্দো ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্ শিক্‌শিক্ শি শি শি শব্দ করল। অর্থাৎ হাসল। তারপর বলল, খোকাবাবু খুব ভয় পেয়েছ বুঝি? আজকাল আমার বড্ড ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে। ভয় দেখিয়েই তো কাম্বোর সব মানুষকে তাড়িয়েছি! একলাদোকলা যেই হয়েছে রাতবিরেতে, সামনে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছি, হ্যালো স্যার! গুড মর্নিং! অমনি ভিরমি খেয়েছে সে! একদিন এক জার্মান সাহেব বাথরুমে ঢুকে গান গাইতে গাইতে স্নান করছে। অমনি ওপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে মুণ্ডু বের করে...

বাধা দিয়ে বললুম, থাক থাক। এবার একটা কথা শোনো।

মিরান্দো মনে হল ব্যাজার হয়েছে। বলল, গল্পটা ছিল ভারি মজার।

পরে শুনবখন। শোনো একটা কথা।

কী, বলো?

আমাকে পুবের পাহাড়ে নিয়ে চলো না মিরান্দো! ওদের নাচ গানের আসর কেমন চলছে, দেখে আসি।

মিরান্দো বুঝি চঞ্চল হল। বলল, যাবে? কিন্তু ধরা পড়লে কেলেংকারি হবে যে! দুজনেই বিপদে পড়ব।

সাবধানে যাব। লুকিয়ে থাকব। চলো না মিরান্দো।

আচ্ছা, চলো তাহলে। সত্যি বলতে কী, আমারও বড্ড ইচ্ছে করছিল। খুব ভাল নাচে গায় ওরা। ওঠ।

পা টিপে টিপে দরজা খুলে বেরুলুম। মিরান্দো দরজা ভেজিয়ে দিল। তাকে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আবার। দুজনে রাস্তায় নেমে গেলুম। তারপর দেখি, মিরান্দো যেন ভাসতে-ভাসতে শোঁশোঁ করে ছুটেছে। বললুম, আস্তে! আস্তে! তোমার সঙ্গে হাঁটতে পারছি না যে মিরান্দো!

মিরান্দো থেমে বলল, তাই তো! তুমি মানুষ—সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম। তবে কী জানো? ছায়ামানুষ হয়ে এই এক মজা! ইচ্ছেমতো বোঁও করে যেখানে খুশি চলে যেতে পারি। এতটুকু কষ্ট হয় না। ইস্! মাইরি টিটো, তুমি বড্ড আস্তে হাঁটছ।

বলে কী! আমি প্রায় দৌড়ুচ্ছি। আর ও বলছে, আস্তে হাঁটছি! এই সময়

আমার বেজায় লোভ হল, আলবার্টের কাছে হাজির হয়ে বললে হয়, আমাকে ছায়ামানুষ করে দাও তো বুড়ো! সত্যি বলতে কী, মিরান্দোর ব্যাপার দেখে আমার ছায়ামানুষ হতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

কিন্তু পরক্ষণে দমে গেলুম। যদি হিরণমামা আমাকে উদ্ধার করতে এবং আবার মানুষে পরিণত করতে না পারেন, তাহলে?

জন্তুরা আপনমনে খেলা করছে। নিজেদের ভাষায় গলা ছেড়ে বুঝি গানও গাইছে মাঝে মাঝে। আমাদের লক্ষ্য করল না। আমরা অনেকটা দূর হেঁটে ইয়ারা লেকের পুবদিকে পৌঁছলুম। তখন আধখানা চাঁদ পেছনে অনেকটা ঝুলে রয়েছে। রাত তিনটে বাজছে আমার ঘড়িতে।

মিরান্দো বলল, জঙ্গলে ঢোকো। আমাকে তো অন্ধকারে দেখতে পাবে না। তাই আমি শিকশিক শব্দ করব। শব্দের পেছন পেছন আসবে। খবর্দার, টর্চ জ্বেল না।

বড় বড় গাছপালার জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়। পাহাড়ে ওঠার ট্রেনিং নেওয়া আছে। উঠতে অসুবিধে হচ্ছিল না। তবে পাহাড়টা ঢালু এবং ধাপবন্দী উঠে গেছে। আনাড়িরাও চড়তে পারে।

চূড়ার কয়েক মিটার নিচে পৌঁছলে মিরান্দো বলল, সাবধান। ওখানে ওই যে বড় পাথরটা ঝুলে আছে দেখছ, ওটার পাশে ফাটল আছে। ফাটলে গিয়ে বসলে পুরো আসর দেখতে পাব।

একটু পরে সেই ফাটলে পৌঁছলুম। মিরান্দো পাথরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে গেল অন্ধকারে। তাকে আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমি হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে বসলুম। যা দেখলুম, সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

অনেকটা সমতল জায়গা জুড়ে জ্যোৎস্নায় একদল ছায়া নাচছে। চারদিকে কালো-কালো বস্তার মতো বসে আছে অনেক ছায়ামানুষ। আর উঁচু বেদীর মতো একটা পাথরের ওপর যে বসে আছে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, সে কিন্তু আমাদের মতোই মানুষ। রক্ত-মাংসের মানুষ।

তাহলে ওই সেই আলবার্টো বুড়ো!

ওর পরনে একটা আলখাল্লার মতো পোশাক। মাথায় মনে হল সেকালের রোম-সম্রাটের মতো মুকুট। মুকুটটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে।

আসরে নীচের শব্দটা বাতাসের শনশনানির মতো। কিন্তু ছন্দ আছে। ছায়ামানুষরা নানা ভঙ্গিতে নাচছে আর শব্দ হচ্ছে ভারি অদ্ভুত—শন্‌শন্‌ শনাৎ শনাৎ! তারপর টের পেলুম, চারপাশে বসে থাকা ছায়ামানুষেরা বাতাসের মতো বুঝি গানই গাইছে।

গানটা কতকটা এরকম :

শি শি শি শি শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ

শন্ শন্ শন্ শন্

হিশ্ হিশ্ শ শ শিৎ শিৎ শিৎ……

মিরান্দো আমার কানে কানে বলল, গানটা কী জানো ?

চাঁদের আলোয় আমরা সবাই এসে গিয়েছি

হো হো এসে গিয়েছি

তোরা যারা বাইরে আছিস আয়রে ছুটে আয়

আয় রে আয় রে আয়…

আঁতকে উঠে ফিসফিস করে বললুম, ওরে বাবা ! ওরা আমাদেরই ডাকছে নাকি ?

মিরান্দো জবাব দেবার আগেই আলবার্টো গম্ভীর গলায় হঠাৎ কী বলে উঠল।

তার কথার আওয়াজ আমাদের—মানে মানুষদের মতো। মিরান্দো ফিসফিস করে বলল, শয়তানটা বলছে—বহুৎ আচ্ছা। চালিয়ে যাও !

ছায়ামানুষীদের দিকে এবার বসে থাকা ছায়ামানুষের কয়েকজন এগিয়ে গেল। তারপর জোড়া-জোড়া নাচ শুরু হল কোমর দুলিয়ে। চারদিকে আওয়াজ উঠল—চ্ছা চ্ছা চ্ছা ! আলবার্টো মানুষের স্বরে ফের চেঁচিয়ে কিছু বলল। মিরান্দো আমার দোভাষী এখন। কানে কানে বলল, বুড়ো বজ্জাত বলছে—খুব জমেছে। চাঁদের রঙ সাদা না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাও !

হঠাৎ আমার মাথায় মতলব খেলে গেল। ফিসফিস করে বললুম, মিরান্দো। ভোর হতে এখনো ঘণ্টা দুই দেরি। এই সুযোগে চলো না আমরা সেই গুহার ভেতর পাতাল-পুরীতে গিয়ে ঢুকি। তুমি সেই ক্যাপসুল খুঁজে বের করবে—আর আমি এমা আর তার বাবাকে উদ্ধার করব।

আমি নিতান্ত মানুষ। ফিসফিস করে কথা বলতে গিয়ে নিশ্চয় অভ্যাসবশে একটু জোরে কথা বলে উঠেছিলুম। আচম্বিতে ধূর্ত আলবার্টো আমাদের এই ফাটলের দিকে আঙুল তুলে কী বলে উঠল। অমনি নাচগান বন্ধ হল। ঝড়ের মাতা শোঁশোঁ শনশন আওয়াজ হতে থাকল। মিরান্দো বলল, সর্বনাশ। ওরা টের পেয়ে গেছে। পালিয়ে এস টিটো।

তার ছায়াশরীর শ্যাঁৎ করে পেছনে চলে যেতে দেখলুম।

আসর থেকে ছায়ামানুষেরা শোঁশোঁ করে এগিয়ে আসছে এই ফাটলের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান দিলুম। ধাপবন্দী পাথরের আড়ালে-আড়ালে প্রায় গড়াতে গড়াতে নামতে থাকলুম। কিন্তু চোখ ওপরের দিকে। ছায়াগুলো পাথর বেয়ে টিকটিকির মতো নামতে শুরু করেছে। বেগতিক দেখে একটা প্রকাণ্ড পাথরের তলায় ঢুকে পড়লুম।

ওরা আমার পাশ দিয়ে নেমে গেল ঝড়ের মতো। কানে এল, ওরা মিরান্দো মিরান্দো করে কিছু বলছে।

সব শব্দ থামলে উঁকি মেরে ওপরে তাকিয়ে দেখি, আলখাল্লা ও মুকুটপরা আলবার্টো ওপরে একটা চাতালে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে হল, এক্ষুনি রিভলবার বের করে শয়তানটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিই।

কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ওকে মেরে ফেললে একনম্বরী ছায়ামানুষ বেচারাদের উদ্ধার করার আর আশাই থাকবে না। এমা ও তার বাবাকেও হয়তো ফিরে পাওয়া যাবে না। ওর হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি। তাই ওকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

আলবার্টো হঠাৎ সরে গেল ওপাশে। আর তাকে দেখতে পেলুম না। আমি খোঁদল থেকে সাবধানে বেরিয়ে নামতে শুরু করলুম। ছায়ামানুষরা ঝোঁকের বশে নিচের সমতলে জঙ্গলের মধ্যে হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। সেই ভেবে জঙ্গলের প্রায় তিরিশ ফুট ওপরে আরেকটা গুহার মতো খোঁদলে ঢুকে পড়লুম। এখন আর দিনের প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। দিন এলে ওদের অস্তিত্ব থাকবে না—মিরান্দোর কাছে শুনেছি। সন্ধ্যায় ওরা নিজেদের অস্তিত্ব ফিরে পাবে। কাজেই ভোর পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারলে আপাতত আর ভয়ের কারণ নেই। ছোট্ট গুহার ভেতর ঢুকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইলুম।

আট : কে সেই অ্যালবার্টো

ক্লান্তিতে এবং রাত্রিকাল বলেই ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিস শব্দ শুনে এবং গায়ে কার ঠাণ্ডা—অতিঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। কয়েক-সেকেণ্ড বুঝতে পারলুম না, কোথায় আছি। তারপর মিরান্দোর কথা শুনতে পেলুম—টিটো! টিটো! ভারি অদ্ভুত ছেলে তো তুমি! দিব্যি এখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছ! ওদিকে সাংঘাতিক বিপদ—তা জানো?

বললুম, কী হয়েছে মিরান্দো? তুমি এতক্ষণ ছিলেই বা কোথায়?

মিরান্দো দ্রুত বলল, ভোর হয়ে আসছে। আমার গা ব্যথা করছে। একটু পরেই আমি 'না' হয়ে যাব, জানো? তাই ঝটপট বলতে এলুম। তখন ব্যাটাচ্ছেলেরা তোমার মামা আর ট্যুরিস্ট ভদ্রলোককে বন্দী করেছে!

এঁ্যা! সে কী!

হঁ্যা। ওঁরা তোমার খোঁজে আসছিলেন। পথে হারামজাদাদের সামনে পড়ে যান। ওঁদের দুজনকে ধরে ওরা পাতালপুরীতে নিয়ে গেছে।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলুম।

মিরান্দো বলল, উঃ বড্ড গা ম্যাজম্যাজ করছে! ঘুমেও চোখ জুড়িয়ে আসছে। চলি টিটো! সন্ধ্যায় দেখা হবে। যা হয়, করো!

শোন, শোন। তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মিরান্দো খাপ্পা হয়ে বলল, মরতে। ন্যাকামি করো না তো বাবু! বলেছি না? দিনের আলো ফুটলেই আমি মুছে যাই। খড়িতে আঁকা ছবির ওপর যেমন করে ডাস্টার ঘষে দিলে মুছে যায়, তেমনি। আমি গেলুম! বাই বাই টা টা!

মিরান্দো বেরিয়ে গেল। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে দেখি ভোরের আলো ফুটেছে। নিচে জঙ্গলের মাথায় ঘন কুয়াশা জমেছে। ইয়ারা হ্রদের জলের ওপরও কুয়াশা জমেছে। জন্তুরা এখানে-ওখানে চার ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পাখিরাও জলে চুপচাপ বসে ঘুমোচ্ছে।

নামতে শুরু করলুম পুবের পাহাড় থেকে। জঙ্গলে ঢুকে হনহন করে এগিয়ে সোজা হ্রদের ধারে পিচের রাস্তায় পৌঁছলুম। ট্যুরিস্টলজে আর যাওয়ার মানে হয় না। কাম্বো গিরিপথ পেরিয়ে যাবার সময় সূর্য উঠল পিছনে।

ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি বোটা উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। আমাকে দেখে ইংরেজিতে বলে উঠল, মাস্টার টিটো! ওঁরা সব কোথায়? ফিরে এসে ডিনার খাওয়ার কথা ছিল। আমরা তো ভেবেই সারা।

ক্যাম্পের ভেতর থেকে দুজন সাহেব ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন। একজন ঢ্যাঙা, অন্যজন বেঁটে। তাঁদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। ঢ্যাঙা সাহেব বললেন, ডঃ মেনহার্স্ট কোথায়? আমি ডঃ হেলমুথ। ইনি ডঃ বারগুচি। আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেছে। পৌঁছেছি রাত তিনটেয়। তারপর সব শুনে তক্ষুনি আমি একটা জিপ যোগাড় করে এখানে পৌঁছেছি। কী ব্যাপার খুলে বলো তো শুনি!

আগাগোড়া সব ঘটনা বর্ণনা করলুম।

শুনে ওঁরা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর ডঃ বারগুচি বললেন, কী নাম বললে? আলবার্টো? আলবার্টো······আপনমনে বিড়বিড় করতে থাকলেন তিনি।

হেলমুথ হঠাৎ নড়ে উঠলেন।—চিনতে পেরেছি! ডঃ বারগুচি, আপনি কি আপনাদেরই—মানে ইতালির এক বিজ্ঞানী আলবার্টো এসাণ্ডোর নাম শোনেন নি? পাঁচ বছর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে আণবিক জীববিজ্ঞানী আর জেনেটিক সায়েন্স—অর্থাৎ প্রজনন বিজ্ঞান নিয়ে রোমে সম্মেলন হয়েছিল, মনে পড়ছে না? সেখানেই তো আলবার্টো এসাণ্ডো নামে এক অপরিচিত বিজ্ঞানী···

কথা কেড়ে বারগুচি বললেন, ঠিক, ঠিক। মনে পড়েছে। আমরা তো ওঁকে কথা

বলতেই দিইনি। ভুইফোঁড় আগন্তুককে বক্তৃতার অধিকার স্বভাবত দেওয়া হয় না। হ্যাঁ. মনে পড়েছে বটে। আলবার্টো এসাণ্ডোর সঙ্গে পরে আমি কথা বলেছিলুম। ওঁর থিসিস ছিল ভারি অদ্ভুত—একেবারে উদ্ভট। আমি ভীষণ হেসেছিলুম। আলবার্টো বলেছিলেন, আমি প্রমাণ করে ছাড়ব ব্যাপারটা। এখন দেখছি, প্রমাণ করে ছেড়েছেন —এমন কী, ওঁর তত্ত্বটাও মিথ্যে নয় দেখছি।

হেলমুথ আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু এই বালক কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ? এ যে বাহাদুরি নেবার জন্য একটা ভূতুড়ে গল্প বানিয়ে বলছে না, তারই বা ঠিক কী?

আমি খাপ্পা হয়ে বললুম, আমি বালক নই। কিছু বানিয়েও বলিনি। সন্ধ্যা হলেই টের পাবেন সব। বুকের পাটা থাকে তো গিয়ে দেখবেন ওখানে।

বোটা আমাকে টেনে নিয়ে গেল কিচেনের তাঁবুতে। বলল, খিদেয় বড্ড কাহিল হয়ে গেছ মাস্টার টিটো। আগে খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর অন্য কথা।

কিচেনের তাঁবুর সামনে ঝাঁকড়া গাছের তলায় ডাইনিং টেবিলে বসে আমি কফি খাচ্ছি। এমন সময় দুই বিজ্ঞানী এসে বসলেন সামনে। বোটা দু'পেয়ালা কফি আনল। কফি খেতে খেতে বারগুচি বললেন, কিছু মনে কোরো না বাবা! তুমি যা দেখেছ, তাতে আমার অন্তত অবিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ আলবার্টোর থিসিস আমি পড়ে দেখেছিলুম।

হেলমুথ গোমড়ামুখে বললেন, থিসিসটা কী শুনি ?

বারগুচি বললেন, মানুষের দেহমনের নাকি দুটো অস্তিত্ব। বস্তুর ওপর আলো ফেললে যেমন ছায়া পড়ে, তেমনি। আলো না ফেললে বস্তুর ছায়া অস্তিত্বটা টের পাওয়া যায় না। আলবার্টো বস্তু থেকে ছায়া আলাদা করে ফেলার কৌশল আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। সম্প্রতি ভারতে তিন বিজ্ঞানী এধরনের একটা দাবি তুলেছেন। একটা গাছের পাতার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেললেও সেই অংশটার অদৃশ্য অস্তিত্ব নাকি থেকে যায় এবং তাঁরা ফোটো তুলেও সেই অদৃশ্য অংশটা পাতার সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে যুক্ত বলে দেখিয়েছেন।

হেলমুথ বললেন, হ্যাঁ—কাগজে পড়েছি। এ তো বিজ্ঞানের একটা পুরনো ধারণা। একজন রুশ বিজ্ঞানী এ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

বারগুচি বললেন, একে বলে 'ফ্যানটম' থেকে ফোটো নেওয়া। ফোটোতে পাতার ছেঁড়া অংশটার অস্তিত্ব আলোর রেখার মতো দেখা যায়। এখন কথা হচ্ছে, আলবার্টোর থিসিস বস্তুর এই ফ্যানটম-অস্তিত্বের অনুরূপ একটা ছায়া অস্তিত্ব নিয়ে।

হেলমুথ হাসলেন।—তাই বলে মানুষ থেকে তার ছায়াকে আলাদা করা!

অসম্ভব যে নয়, তা টিটোর বর্ণনায় বুঝতে পারছি। বারগুচি বললেন। জানি না,

কী কৌশলে আলবার্টো এটা সম্ভব করেছেন। নিশ্চয় কোনো নতুন ধরনের আলোক-রশ্মির সাহায্যে মানুষ থেকে আলোর ছায়াকে আলাদা করেছেন।

হেলমুথ বললেন, দুর মশাই! ছায়া তো ছায়া! তার আবার প্রাণ থাকে, না কথা বলতে পারে?

বারগুচি একটু হেসে বললেন, ছায়ার মধ্যে আলবার্টো মানুষটার সচেতন অস্তিত্বকেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় কোনো রহস্যময় উপায় তাঁর হস্তগত হয়েছে। যাই হোক, আপাতত চলুন না, আমরা টিটোকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভূতুড়ে গুহায় যাই। খোঁজ করে দেখি, যদি আলবার্টোর পাতালপুরীর দরজাটা খুঁজে পাই। আমার বিশ্বাস, আলবার্টো অন্তত আমার মুখ চেয়ে আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পরে ওঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলুম। আপনাদের মতো পাগলাবুড়ো বলে ঠাট্টা করিনি।

হেলমুথ ভড়কে গিয়ে বললেন, আমাকে দেখলে ভীষণ খাপ্পা হয়ে যাবে বুড়ো।

আমি বললুম, বেশ তো। আপনি বরং ক্যাম্পে বিশ্রাম করুন। আমরা যাই।

হেলমুথের আঁতে ঘা লাগল। বললেন, মোটেই না। অত সহজে আমি ভয় পাইনে কিছুতে। তাছাড়া এখনও আমার ঘোরতর সন্দেহ, তুমি বাবু ওই নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে ভয়ের চোটে কী দেখতে কী দেখেছ। কিংবা পুরোটাই তোমার নিছক স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন।

আমি আর তর্ক করলুম না। একটু পরে তিনজনে কাম্বো পাহাড়ের দিকে রওনা হলুম।

নয়ঃ ছায়ারূপিণী এমা

দিনের আলোয় আর একটুও ভয় করছিল না। অজস্র জন্তুজানোয়ার দেখে হেলমুথ ও বারগুচি প্রথমে ভড়কে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশ্বাস দিলুম, ওরা বেজায় অহিংস হয়ে গেছে। ওদের গায়ে আঘাত না পড়লে কিচ্ছু ক্ষতি করবে না।

ইয়ারা হ্রদের উত্তরের জঙ্গলে ঢুকে বারগুচি বললেন, আশ্চর্য। আলবার্টো পশুপাখিদের কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটাল? আমার মনে হচ্ছে, প্রজনন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে করতে সে অনেক এমন ধরনের প্রাকৃতিক রহস্যের চাবিকাঠি হাতে পেয়ে গেছে।

হেলমুথ বললেন, শুনেছি—হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় মুনিঋষিরাও ঠিক এমনি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পশুপাখিদের ভাষা বুঝতেন। কৈলাস নামে

সম্ভবত একটা স্যাংচুয়ারি করে সেখানে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। টিটো, তুমি তোমাদের মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা পড়েছ কি ?

পড়েছি ডঃ হেলমুথ। কে না পড়েছে বলুন ?

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে কণ্বমুনির আশ্রমে আনতে গিয়ে দেখেছিলেন, একটি ছেলে সিংহের সঙ্গে খেলা করছে। তাঁরই ছেলে ভরত। তাই না ?

বারগুচি হাসলেন। আলবার্টো বুড়ো কাম্বোকে কণ্বমুনির আশ্রম বানিয়ে ফেলেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ঝর্ণার ধারে পৌঁছলুম। কিছুটা চড়াই ভেঙে উঠে বললুম—ওই দেখুন সেই ভুতুড়ে গুহা !

গুহার সামনে চাতালে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হল। রাতে এটা টের পাইনি। চাতালে এবং গুহার গোল দরজার পাশে অনেকগুলো নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। দেখেই গা শিউরে উঠল। বারগুচি দেখলুম ডানপিটে মানুষ। পা বাড়িয়ে বললেন, কে বলতে পারে আলবার্টোর তৈরি দুনম্বরী ছায়ামানুষদের কঙ্কাল হয়তো এগুলোই।

তিনজনের হাতেই টর্চ আছে। গুহার ভেতর ঢুকলুম। চওড়া হলের মতো গুহা চলেছে তো চলেছে। দেয়ালে অজস্র নাম লেখা। একসময় ট্যুরিস্টরাই লিখে রেখেছে বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ পরে গুহা শেষ হয়ে গেল। সামনে পাথরের দেয়াল। আমরা দুধারে আলো ফেলে তন্নতন্ন খুঁজতে থাকলুম। কোনো গোপন দরজা নিশ্চয় আছে।

বারগুচি ডানধারের দেয়ালে মুঠোর ঘা দিয়ে খুঁজছেন। ফাঁপা আওয়াজ হলে বুঝতে হবে সেখানেই দরজা আছে। হেলমুথ বাঁ ধারের দেয়ালে খুঁজছেন। আর আমি সামনের পাথুরে দেয়ালে তন্নতন্ন করে খুঁজছি—যদি কোনো সূক্ষ্ম ফাটল কিংবা অন্য কোনো আভাস পেয়ে যাই।

হঠাৎ আমার কাঁধে ঠাণ্ডা হিম কিছু পড়ল। চমকে উঠলুম। তারপরই কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল মিরান্দো।...টিটো ! ভয় পেও না—আমি মিরান্দো !

অবাক হয়ে বললুম, সেকী ! দিনে তুমি 'না' হয়ে থাকো বলছিলে যে ?

হ্যাঁ। থাকি। কিন্তু এই গুহার ভেতর যে চিররাত্রির অন্ধকার। এখানে ঢুকলে আমার অস্তিত্ব লোপ পায় না। মিরান্দো ফিসফিস করে বলতে থাকল। তোমার কাছে তখন বিদায় নিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মনে হল, তুমি নিশ্চয় এই গুহার ভেতর হানা দেবে। তাই সোজা এখানে চলে এলুম। তাই দিব্যি টিকে আছি। ওঁরা ভড়কে যাবেন বলে এতক্ষণ কথা বলিনি। তোমাকে এখন একা পেলুম। তাই সাড়া দিলুম।

বারগুচি ওধার থেকে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছ টিটো ?

মিরান্দোর সঙ্গে।

এ্যাঁ! বলো কী? বলে ডঃ বারগুচি টর্চের আলো ফেললেন। মিরান্দোকে দেখতে পেলেন কালো ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে কাছে এসে বললেন, গুডমর্নিং মিরান্দো!

মিরান্দো বলল, গুড ইভনিং স্যার! এখন আমাদের সন্ধ্যাবেলা।

হেলমুথ থ বনে দূরে দাঁড়িয়ে গেছেন। এবার এগিয়ে বললেন, একী! তাহলে সত্যি?

বারগুচি বললেন, সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে? আমরা নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি না।

হেলমুথ বড় সন্দিগ্ধ মানুষ। ভুরু কুঁচকে টর্চের আলোয় মিরান্দোকে দেখতে দেখতে হাত বাড়িয়ে ছুঁলেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, বাপ্‌স! এ যে দেখছি মাইনাস বিশ ডিগ্রি ঠাণ্ডা! আঙুল জমে গেছে।

মিরান্দো শি শি খ্যা খ্যা করে হাসল। তারপর বলল, যাক্ গে। আপনাদের এখন সাহায্য করা কর্তব্য। কিন্তু একটা শর্ত—সবার আগে আমাকে মানুষ করতে হবে।

তিনজনেই বললুম, রাজী।

মিরান্দো বলল, বুড়ো বজ্জাতটা এ গুহায় তার ছায়ামানুষ প্রহরীদের রাখে না। কারণ তার বিশ্বাস, পাতালপুরীর দরজা কেউ খুঁজে পাবে না। তাছাড়া তার ছায়া-মানুষগুলো সারারাত হুকুম তামিল করে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আসলে মানুষ তো বটে। তাদের বিশ্রামের দরকার আছে না?

আমি বললুম, বক্তৃতা থামিয়ে এখন গুপ্ত দরজা কোথায়, সেটাই বলো মিরান্দো।

মিরান্দো আমার কথায় একটু রাগল বটে, কিন্তু সে এখন তার মানুষের শরীর ফিরে পেতে খুব আগ্রহী। তাই ঘুরে দাঁড়িয়ে পাশের একটা জায়গায় চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘঘঘঘ শব্দ করে দেয়ালটা হাতখানেক ফাঁক হল। সে উত্তেজিতভাবে বলল, ঢুকে পড়ো! কিন্তু সাবধান, চারজন ছায়ামানুষ পাতালপুরীতে একটা ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের জাগিও না যেন। ওরা আলবার্টোর বিশ্বস্ত অনুচর। বাকি ছায়ামানুষরা এখন 'না' হয়ে বাইরে আছে। সন্ধ্যায় তারা অস্তিত্ব ফিরে পেয়ে হাজির হবে। প্রভুর হুকুমের অপেক্ষা করবে।

ঢুকতে ঢুকতে হেলমুথ বললেন, সব বুঝতে পারছি, শুধু এই 'না' হওয়া ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। 'না' হওয়া মানেটা কী?

মিরান্দো রেগে বলল, টর্চ নেভানোটা কী? আলোর 'না' হয়ে যাওয়া নয়? খুব হয়েছে—আর কথা নয়। চলে আসুন।

হ্যাঁ—বলতে ভুলেছি, দরজার ফাটল বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আলোর আভাস পেয়েছিলুম। ভেতরে ঢুকে দেখি লম্বা টানা করিডোর। একটু দূরে একটা ধূসর-নীলে মেশানো আশ্চর্য আলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে, করিডোরে ভোর অথবা গোধূলির আলো রয়েছে।

পা টিপে টিপে আগেপিছে করে আমরা চলেছি। সবার আগে মিরান্দো, তার পেছনে আমি, আমার পেছনে বারগুচি এবং তাঁর পেছনে হেলমুথ। করিডোরটা সংকীর্ণ। মোটে হাত দুই চওড়া।

ডাইনে বাঁয়ে দরজা রয়েছে একটা করে। লাল নীল হলুদ সাদা রঙের বিচিত্র কপাট।

সাদা কপাট আস্তে ঠেলল মিরান্দো। ভেতরে তিনজন নিঃশব্দে ঢুকে গেলুম। এটা একটা বেশ চওড়া হলঘর। সেই নীলধূসর আলো। চমৎকার সাজানো রয়েছে আসবাবে।

ঘরের শেষ প্রান্তে ডাইনে ফের দরজা এবং করিডোর।

এইভাবে কত ঘর এবং করিডোর পেরিয়ে গেলুম কে জানে! শেষে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কপাটে কান পেতে কী শুনে মিরান্দো ফিসফিস করে বলল, বুড়ো বজ্জাত লেকচার দিচ্ছে।

আমরা তিনটে মাথা কপাটে ঠেকালুম। আবছা শোনা যাচ্ছে আলবার্টোর কথাবার্তা। ইংরেজিতে কথা বলছে সে। ...তাহলে দেখতে পেলে বাঙালীবাবু, কীভাবে আমি মানুষের রক্তমাংসের অস্তিত্ব থেকে তার ছায়া-অস্তিত্বকে আলাদা করে ফেলি। চোখের সামনে দেখলে, হতচ্ছাড়া মার্কিন ট্যুরিস্টটার ছায়া বের করলুম। তাকে এই খাড়া কফিনে দাঁড় করিয়ে রেখে তার শরীরে আমার আবিষ্কৃত আলোকরশ্মি ফেললুম। এ অবশ্য নেহাত আলো নয়, আলোর কণিকা—ফোটন বলতে পারো। অসংখ্য ফোটন গিয়ে ওর পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করতে থাকল। ওর দেহকোষের ভেতর ডি এন এ নামে পদার্থ বদলাতে শুরু করল। তারপর শরীর থেকে যে ছায়াটা দেয়ালে পড়েছিল, সেখানে ওর মানবিক অস্তিত্বের সব ধর্ম ও গুণাগুণ প্রতিফলিত হল। তারপর সে ছায়ামানুষ হয়ে গেল। ওই দেখ, দেয়াল থেকে সে এবার সরে আসছে। হ্যাল্লো মিস্টার শ্যাডো ম্যান! আমার অভিবাদন নাও। সুস্বাগত!

হিরণমামার গলা শুনতে পেলুম, অপূর্ব! অপূর্ব আপনার প্রতিভা মিঃ আলবার্টো এসাঙো!

আলবার্টো হেসে উঠল হা হা করে। তারপর বলল, কেন এই প্রচেষ্টা আমার জানো কি?

খুলে বলুন মিঃ এসাঙো!

মানুষের আত্মায় পচন ধরেছে। আলবার্টো গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠল। লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে বাস করে সে এই সুন্দর পৃথিবীর মধুর আস্বাদ আর বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে আজ বিজ্ঞানের জোরে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই আত্মবিশ্বাসী

জেদ থেকে তাকে সরিয়ে আনার উপায় হয়তো নেই। তাই আমি ভেবেছিলুম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বিস্ময়কর সৃষ্টি যে মানুষ, ধ্বংসযজ্ঞে সে যদি লোপ পায়—তাহলে তো ভারি কেলেংকারি ব্যাপার! বরং যদি মানুষকে কোনভাবে টিকিয়ে রাখা যায়, সেইটেই তো খাসা হয়। তাই না? যদি এমন করা যায়, যাতে সে আগুনে পুড়বে না—জলে ডুবে মরবে না—গাঁয়ে আঁচড়টুকু লাগবে না, তাহলে?

হিরণমামা বললেন, ঠিক, ঠিক। খাসা প্রস্তাব।

আলবার্টো বলল, এখন বুঝতে পারছ বাঙালীবাবু? ছায়ামানুষকে ধ্বংস করা যাবে না! রক্তমাংসের মানুষরা পরস্পর যুদ্ধ করে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু ছায়ামানুষ অজয় অমর। তারা পৃথিবীতে টিকে থাকবে। তাদের খাওয়াপরার সমস্যা থাকবে না। রক্তমাংসের শরীর টিকিয়ে রাখতে কত কষ্ট করতে হয়। ছায়ামানুষকে কিছু করতে হবে না অথচ তারা থাকবে আবহমানকাল!

আলবার্টো আবার হা হা করে হাসতে থাকল।

এইসময় হঠাৎ টের পেলুম, আমার হাতে কার ঠাণ্ডাহিম হাত পড়েছে। হাত ধরে কেউ টেনে নিয়ে যেতে চায়। ভাবলুম, মিরান্দো নাকি? না। মিরান্দোও একটু তফাতে কপাটে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। কান পেতে বুঝি আলবার্টোর কথা শুনছে। তাহলে এ কে? আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?

টানের চোটে আমি পিছিয়ে আসতে আসতে শুনলুম, ফিসফিস করে কেউ কানের পাশে বলল, আমি এমা! আমি এমা! ভয় পেওনা—আমি এমা।

চমকে উঠলুম। ওরা তিনজনে একমনে আলবার্টোর কথা শুনছে। টের পেলে না কিছু। এমা আমাকে টানতে টানতে একটা দরজার কাছে এনে বলল, হাঁ করে আছ কেন? আমায় দেখতে পাচ্ছ না?

দেখতে পেলাম। আমার সামনে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মন দুঃখে ভরে গেল।

এমা ফিসফিস করে বলল, ছিঃ! তোমার চোখে জল টিটো!

বললুম, না তো! ড্যাট, আমি কাঁদিনি।

চলো, তোমায় একটা জিনিস দেখাব। বলে সে পাশের দরজা খুলল।…

দশ: ছায়ামানুষদের জাগরণ

সেই নীলধূসর আশ্চর্য আলোয় এমার ছায়ামূর্তি দেখে আমি যতটা অবাক হলুম, মিরান্দোর ছায়ামূর্তি দেখে ততটা হইনি। কারণ মানুষ মিরান্দোকে আমি দেখিইনি কখনও।

অথচ এমাকে দেখেছি। এখন সে ছায়ামানুষী হয়ে গেছে। তার দিকে বারবার তাকাচ্ছি দেখে সে ফিসফিস করে উঠল, আমার দিকে কী দেখছ? ওই দেখ, কাচের কফিনে আমার শরীর রেখে দিয়েছে বুড়ো শয়তানটা।

ঘরের ভেতর সার সার পায়া লাগানো অনেকগুলো কফিন টেবিল। তার প্রথমটাতে এমা শুয়ে আছে। সেই রক্তমাংসের এমা! হাসিখুশি চঞ্চল মেয়েটি রজনীগন্ধা ফুলের মতো সুন্দর। চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে যেন।

দুঃখিতভাবে বললুম, তোমার বাবা কোথায় এমা?

এমা বলল, বাবাকে এখনও ছায়ামানুষ করেনি। বাবা বিজ্ঞানী তো! তাই তাঁকে আরও তাক লাগাতে চায় আলবার্টো। বাবাকে কোন ঘরে বন্দী করে রেখেছে, খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু একটা কথা বলি, টিটো! এরপর তোমাকে যে ঘরে নিয়ে যাব, সে ঘরে কিন্তু টুঁ শব্দটি করবে না। চার ছায়াপ্রহরী ঘুমোচ্ছে। ওদের ঘুম ভেঙে গেলে তোমার বিপদ হবে। ওরা আমাদের মতো নয়। কারণ ওদের শরীর নষ্ট করে ফেলেছে আলবার্টো।

বললুম, বুঝেছি। ওরা তাহলে নশ্বরী ছায়ামানুষ! আস্ত ভূত!

এমা চলতে থাকল। দুধারে সার-সার কাচের কফিনে অচেনা মানুষ ও মানুষীরা শুয়ে আছে। যেন ঘুমোচ্ছে। ঝটপট গুনে ফেললুম। তিরিশটা মোট।

এবার দরজা খুলে একটা অন্ধকার জায়গা। এমার ঠাণ্ডা হাত আমার হাতে পড়ল। সে আমাকে নিয়ে চলল। একটু পরে একটা দরজা খুলল সে। ঘরের ভেতর সেইরকম আলো।

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। অজস্র যন্ত্রপাতি, কাঁচের জার, আঁকাবাঁকা নল, শিশি বোতলভর্তি নানান রঙের তরল পদার্থ, কত কিছু। একটা যন্ত্র দেখতে কম্পিউটারের মতো। এমা আমার কানে-কানে বলল, এটাই আলবার্টোর ল্যাবরেটরি। সাবধান, ওই কম্পিউটারের দু-মিটার দূরে থাকবে সবসময়। নইলে আলবার্টো টের পেয়ে যাবে।

বললুম, আচ্ছা এমা! মিরান্দো নামে ছায়ামানুষটার কাছে শুনেছি, একরকম ক্যাপসুল আছে—সেটা খেলে…

এমা কথা কেড়ে বলল, সেজন্যেই এঘরে এলুম। তবে মিরান্দোর কথা বললে—তার নাম আমও শুনেছি আলবার্টোর মুখে। মিরান্দো নাকি বিদ্রোহী ছায়ামানুষদের একজন! তাদের খুব খোঁজা হচ্ছে।

অবাক হয়ে বললুম, আরও বিদ্রোহী ছায়ামানুষ আছে নাকি এমা?

এমা বলল, আছে। আলবার্টো বলছিল। কে নিজের রক্তমাংসের শরীরে না ফিরে যেতে চায় বলো? যাদের শরীর টিকে নেই, তাদের কথা আলাদা। তারাই বুড়োর বেশি করে বশ মেনেছে।

তা ঠিকই এমা! বেচারারা আর কী করবে? বলে আমি কম্পিউটারটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালুম।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। বললুম, এমা। ক্যাপসুলের কৌটো কি কম্পিউটারের মধ্যে রাখা আছে?

এমা বলল, বুড়ো শয়তান আমাকে ছায়ামানুষী করার পর বলছিল, যদি আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি হই, সে আমার রক্তমাংসের শরীরে অর্থাৎ মুখের ভেতর লাল ক্যাপসুল গুঁজে দিয়ে তখুনি আমাকে আবার মানুষী করে ফেলবে।
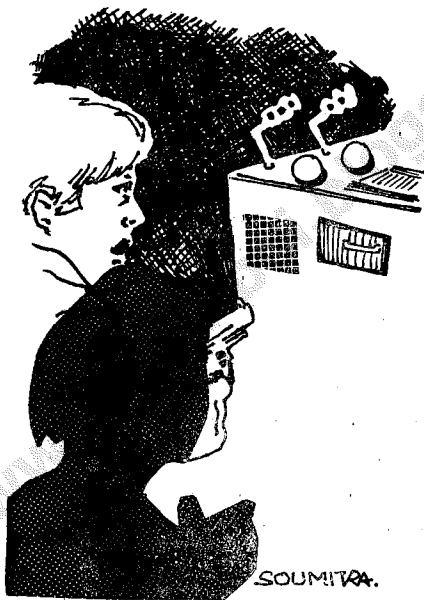
রাগে মাথায় আগুন ধরে গেল। বললুম, শয়তান, বজ্জাত, গাড়োল! গুলি করে ওর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাধ হয়েছে বুড়োবয়সে।

এমা হিসহিস করে হাসল। তারপর বলল, আলবার্টো শেষে কী বলল জানো? বলল, আমি রাজি থাকলে এক্ষুনি কম্পিউটারের দেরাজ থেকে লাল ক্যাপসুল বের করে খাইয়ে দেবে!

আমার চোখ ছিল কম্পিউটারের দিকে। খানিকটা দূরে-দূরে তার চারপাশটা ঘুরে পরীক্ষা করছিলুম, যন্ত্রটার কানেকশান কোথায় আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ভালভে লালনীল আলো জ্বলছে আর নিভছে এবং বিপ্ বিপ্ শব্দ হচ্ছে সেখান থেকে।

এমা আমাকে বারণ করার আগেই রিভলবার বের করে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভালভটা লক্ষ্য করে পর-পর দুবার গুলি ছুঁড়লুম। ঘরটা নিশ্চয় সাউণ্ডপ্রুফ। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য, রিভলবারের গুলির শব্দটা জলভরা বেলুন আছাড় দেওয়ার মত থপ থপ করে উঠল।

লালনীল আলো নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিপ্‌বিপ্‌ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তখন একলাফে গিয়ে ড্রয়ারের হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলুম।

ড্রয়ারে একটা শিশি রয়েছে কালো রঙের। তার মুখ দ্রুত খুলতেই দেখি, অগুনতি লালরঙের ক্যাপসুল ভরা আছে। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বললুম, এমা! এমা! শিগগির সেই কফিনের ঘরে নিয়ে চলো আমাকে।

এমা আমার হাত ধরে চলতে থাকল।

কফিনের ঘরে ঢুকে প্রথমে এমার কফিনের ডালা খুলে একটা ক্যাপসুল এমার মুখে গুঁজে দিলুম। এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল চোখের সামনে। এমার ছায়ামূর্তি স্যাৎ করে শূন্যে ভেসে গিয়ে তার রক্তমাংসের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল। তারপর সে চোখ খুলল। তার গায়ে হাত রেখে ডাকলুম, এমা! এমা!

এমা কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ধুড়মুড় করে উঠে বসল। তারপর পা বাড়িয়ে নামল। ফিসফিস করে বলল, আমার শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে টিটো! কী করব?

একটু বিশ্রাম নাও। ঠিক হয়ে যাবে। বলে আমি অন্য কফিনগুলোর কাছে গেলুম। একটার পর একটার ডালা খুলে ক্যাপসুল গুঁজে দিতে থাকলুম প্রত্যেকের মুখে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরের ভেতর একদল পুরুষ ও মহিলার ভিড় জমে গেল। কিন্তু সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। কেউ কথা বলতে পারছে না যেন।

হঠাৎ দেখি ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এল মোটাসোটা হোঁৎকা চেহারার কাঁচা-পাকা গোঁফওয়ালা একটা লোক। পরনে আঁটো প্যান্ট, গায়ে জ্যাকেট। সে ফিক করে হেসে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলল, চিনতে পারছ না তো মাস্টার টিটো? পারবে না। আমি মিরান্দো! তারপর সে হাত বাড়িয়ে আচ্ছাসে হ্যাণ্ডশেক করল।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম আর কী—হ্যাল্লো মিরান্দো! কিন্তু ততক্ষণে অন্য ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। বাইরে আবছা কী সব শব্দ হচ্ছে। কোথায় ঠংঠং করে দমকলের মতো ঘণ্টা বাজছে। তারপর দেখি, ওদিকের দরজা ঠেলে চারটে ছায়ামানুষ এসে ভিড়ের সামনে দাঁড়াল। রিভলবার বাগিয়ে গুলি করতে গিয়ে মনে পড়ল, ওদের ধ্বংস করা যাবে না। কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না ওদের। ভয়ে কাঠ হয়ে দেখতে থাকলুম; ওরা কী করে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলুম, ওই ভৌতিক ছায়ামানুষরা সবার ঘাড় মটকে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

কিন্তু তারা তেমন কিছুই করল না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর বাতাসের মতো শব্দে কিছু বলে উঠল। মিরান্দো হাসিমুখে মাকাসিকো ভাষায় কিছু বলল একজনকে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়জন এমা ও আমার সামনে এসে ইংরেজিতে বলল, আমাদের কী হবে তাহলে? আমাদের যে শরীর নেই।

এমা বলল, শয়তান আলবার্টোর কাছে গিয়ে বলো সেকথা।

তৃতীয়জন সম্ভবত জার্মান ভাষায় ভিড় লক্ষ্য করে কী বললো। ভিড়ের মধ্য থেকে এক মেমসাহেব তার জবাব দিলেন। চতুর্থ ছায়ামানুষ কিন্তু কাকেও কিছু বলল না। ছিটকে বেরিয়ে গেল। তার পেছন-পেছন বাকি তিনটে ছায়ামানুষ ঝড়ের মতো গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গেল।

মিরান্দো নির্ভয়ে হোহো করে অট্টহাসি হেসে বলল, বুড়ো শয়তান এবার বেঘোরে মারা পড়বে। চলো, চলো ভাইসব! আমরা শয়তানটার মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করি গিয়ে।

মানুষগুলো হইহই করে বেরিয়ে গেল।

এমা ও আমি সবার শেষে বেরুলুম। সব ঘরের কাঁচের দরজা ভাঙচুর করে ওরা চলেছে। হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে। কোথায় ঘন্টা বেজেই চলেছে। আসবাবপত্র চুরমার করে ফেলছে একদল সত্যিকার মানুষ। আলবার্টোর পাতালপুরীতে দক্ষযজ্ঞ চলেছে বুঝি। সবখানে দুমদাম ঝমঝম শব্দ।

আগের সেই ঘরে গিয়ে ঢুকে দেখি, ডঃ হেলমুথ, আর ডঃ বারগুচি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন মেঝেতে। তাহলে ওঁরা ধরা পড়ে গেছেন বুড়োর কাছে। ওদিকে হিরণমামা আর আলবার্টো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে মেঝের ওপর জব্বর লড়াই করছেন। চার ছায়াপ্রহরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন মজা দেখছে একপাশে।

মিরান্দো হাততালি দিয়ে চেঁচাল মাকাসিকো ভাষায়। মনে হল, লড়ে যেতে বলছে। হিরণমামা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারলেন আলবার্টোকে। আলবার্টোর আশ্চর্য দক্ষতা আর গায়ের জোর এবয়সে—হিরণমামার ঘুঁষিছোড়া হাতটা ধরে চিৎকার করে উঠল ইংরেজিতে—ওরে পুঁচকে বাঙালীবাবু! আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পাতালপুরী ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি গোপন সুইচ অন করে দিয়েছি। কাজেই তড়পানি বন্ধ করে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ!

তারপর চোখ পড়ল আমাদের দিকে।

তারপর দেখল চার ছায়াপ্রহরীকে।

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত। তারপর হিরণমামাকে ছেড়ে দিল। হিরণমামা তাকে ফের ধরতে যাচ্ছিলেন, আমি চেঁচিয়ে বললুম—হিরণমামা! বুড়ো মরুক! আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।

টেবিলে মেলারের দেহ দেখা যাচ্ছিল। নিজের দেহের কাছে মেলারের ছায়ামূর্তি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে একটা ক্যাপসুল গুঁজে দিলুম মুখে।

মেলার উঠে বসলেন। হিরণমামা তাকে নামতে সাহায্য করলেন।

ওদিকে আলবার্টো ছায়াপ্রহরীদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাল চোখে কটমট করে তাকিয়ে আছে। ছায়া প্রহরীরাও চুপ করে রয়েছে। ওদের সঙ্গে ছায়াভাষায় কি কথা বলছে আলবার্টো?

এইসময় এমা বলে উঠল, বাবা! আমার বাবা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে যে।

আমি এমার হাত ধরে বললুম, চলো খুঁজে দেখি!

মিরান্দো ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, আমি জানি কোথায় আছেন তোমার বাবা। চলো, দেখাচ্ছি! বলে সে ভিড় লক্ষ্য করে বলল, বেরিয়ে যান সবাই! এক্ষুনি পাতালপুরী থেকে চলে যান! ওই শুনুন বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে।

কোথায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। তারপর সাদা আগুনের ছটা ঝলকিত হল। ঘর যেন বিদ্যুতের আলোয় ভরে গেল। সবাই হুড়মুড় করে বেরুতে থাকল।

ঘুরে দেখলুম, আলবার্টোকে ঘিরে ধরেছে চার ছায়াপ্রহরী। বেরিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে কানে এল আলবার্টোর চেরা গলার আর্তনাদ।

বড় বীভৎস আর্তনাদ! ছায়াপ্রহরীরা বুঝি ওকে গলা টিপে ধরেছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে আলবার্টো। সাপের মুখে ব্যাঙ পড়ার মতো আর্তনাদ করছে সে।

আমার কষ্ট হল। একজন মহাপ্রতিভাশালী বিজ্ঞানী আলবার্টো। নিজের দোষেই এই ভয়ংকর পরিণাম তার।

মিরান্দো সামনের দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরের কোণায় মেঝেয় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ডঃ মেনহার্স্ট পড়ে আছেন। বুঝলুম, অজ্ঞান অবস্থা। এমা চেঁচিয়ে উঠল, বাবা! বাবা!

মিরান্দো দুহাতে মেনহার্স্টকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, আর দেরি নয়! চলে এস আমার সঙ্গে! এখুনি যে কোনো মুহূর্তে ছাদ ধসে পড়বে। অবশ্য আমরা পুড়ে ছাই হয়েও যেতে পারি!

ততক্ষণে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটছে আশেপাশে। ধোঁয়ায় দম আটকে যাচ্ছে। আমরা তিনজনে কীভাবে যে পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে গুহার ভেতর পৌঁছলুম, জানি না। সবই মিরান্দোর সাহস আর তৎপরতা। পাতালপুরীর অন্ধিসন্ধি তার চেনা বলেই বেরিয়ে আসতে পারলুম।

গুহার দরজার কাছে যখন এসেছি, তখন পেছনে দাউদাউ আগুনের শিখা ইঞ্জিনের চুল্লীর মতো উপচে বেরুচ্ছে।...

এগার ঃ বিদেহীদের জন্য দুঃখ রইল

ঝর্ণার ধারে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি। এখন সকাল সাড়ে দশটা। উজ্জ্বল রোদ কাম্বো পাহাড়ের উত্তর দিকটায় সোনার পোশাক পরিয়ে রেখেছে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা প্রায় জনাচল্লিশ পুরুষ ও মহিলা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর আমাদের মধ্যে একজনও ছায়ামানুষ নেই। আমরা উঁচুতে গুহার দিকে তাকিয়ে আছি। আগুনের হলকা বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

দেখতে দেখতে উত্তর পাহাড়ের সোনার পোশাক কালো হয়ে গেল। তারপর নীল হয়ে গেল ধোঁয়ায়। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একটা বিশাল পাথরের টুকরো কয়েকশো ফুট উঁচুতে উঠে গেল। তখন আমরা পালাতে শুরু করলুম। পাথরটা দূরে কোথায় পড়ল। সেদিকে জঙ্গলে আগুন ধরে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে ইয়ারা হ্রদের ধারে পিচের রাস্তায় পৌঁছে দেখি, চারদিকে অসংখ্য জন্তুজানোয়ার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখ উত্তরের পাহাড়ের দিকে। পাখিরাও চুপ করে আছে। এমা আমার একটা হাত ধরে আস্তে বলল, যারা আর মানুষ হতে পারল না, তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে টিটো। আমি বললুম আর দুঃখ করে কী হবে এমা? ওরা এখন কাম্বো পাহাড়ের প্রেত হয়ে রয়ে গেল।

আবার একটা প্রকাণ্ড জ্বলন্ত পাথর ছিটকে গেল আকাশে। সেটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে হ্রদের জলে প্রচণ্ড শব্দ করে পড়ল। অমনি পাখিরা তুমুল চিৎকার করে উড়ল। জন্তুরা গর্জন করে পালাতে থাকল। হ্রদের জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করল।

ট্যুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে দৌড়ে আমরা গিরিপথে পৌঁছে আবার দাঁড়ালুম। উত্তরের পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এতদূরে আঁচ এসে লাগছে। মিরান্দো চেঁচিয়ে উঠল, আর এখানে নয়!···
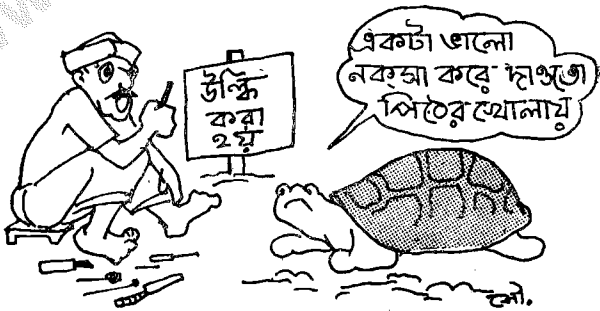
প্রতুল লাহিড়ীর বাবা

আনন্দ বাগচী

সেই কিশোর বয়সেই অন্তত হাজারখানেক গা-ভারী করা, লোমখাড়া করা রহস্য-রোমাঞ্চ বিভীষিকা-অ্যাডভেঞ্চারের কমসেকম লাখখানেক রগরগে পাতা ছাগলের মত চিবিয়ে,

গোয়া'র মত জাবর কেটে গিলে, উইপোকার মত বিলকুল হজম করে ফেলে আমরা তখন রীতিমত শখের গোয়েন্দা বনে গেছি। আমাদের তিনবন্ধুর ইস্কুলের পড়াশোনা শিকেয় উঠে গেছে। পড়ার বইয়ের মলাট আড়াল দিয়ে রাতদিন অপরাধ বিজ্ঞান মক্সো করছি, পথে বেরিয়ে হাতে-কলমে প্র্যাকটিশ করছি। নিজেদের মধ্যে সব সময় বিখ্যাত শখের গোয়েন্দাদের স্টাইলে কথাবার্তা চালাই, তাদের কায়দায় চলাফেরা করি। যে কোনো সন্দেহজনক ঘটনার দিকে নজর রাখি, খটকা লাগলেই যে কোনো রহস্যময় মানুষকে গোপনে অনুসরণ করি। মোটকথা, আমরা যেন এক আলাদা জগতের বাসিন্দা, একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটছিল।

এরকম সময়ে একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল। আমাদের পাড়ার একপ্রান্তে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা মাঠ ছিল। মাঠের জমিটা ছিল পাড়ার রাস্তার লেভেল থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। চারপাশ পাঁচিল ঘিরে বন্ধ করে দেওয়া হলেও, আমাদের মাঠে ঢোকার কোন অসুবিধে ছিল না। পাঁচিলের এক জায়গায় খানকয়েক ইট খসিয়ে আমরা একটা সুড়ঙ্গ বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেই গর্ত দিয়ে আমরা অনায়াসে গলে যেতাম, খুশী মত ঢুকতাম, বেরোতাম।

মাঠের পেছন দিকের পাঁচিলের ওপর একটা বিরাট নিমগাছের মাথা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল। সেই নিমগাছের ঝুপসী ছাতার নীচে আমাদের দুপুরবেলার আড্ডা ছিল। পাঁচিলের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে আমরা তিনবন্ধু অনেক গোপন সলাপরামর্শ করতাম। জায়গাটা সত্যিই রোমাঞ্চকর আর ভীষণ নিরিবিলি ছিল। আরও মজা এই ওপাশের পাড়াটা মাঠের জমি থেকে অনেক বেশী নীচুতে। পাঁচিল থেকে হাত দুই তফাতে গোটা দুই প্রায় নির্জন জীর্ণ চেহারার দোতলা বাড়ি, মাঝখানে সরু গলি, গলিটা প্রায় দেড়তলা সমান গভীর। বাড়ি দুটোর পেছন দিকে এই পাঁচিল বলে কিনা জানি না, দরজা জানালাগুলো সব সময়েই বন্ধ থাকতো।

সেদিন আমরা তিনজন পাঁচিলের ওপর বসে একখণ্ড কাগজে একটা নতুন সাংকেতিক ভাষার ফরমুলা কষছিলাম। এমন সময় কি করে আমার হাত ফসকে কাগজখানা নাচে গলির মধ্যে পড়ে গেল। আমরা যেহেতু শখের গোয়েন্দা, মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র না হলেও রেনপাইপ কিংবা পলেস্তারা খসা দেওয়াল বেয়ে ওঠা-নামা করা আমাদের প্র্যাকটিসের অঙ্গ ছিল। আমি কাগজখানা কুড়িয়ে আনবার জন্যে মাঠের পাঁচিল আর বাড়ির দেওয়ালে সমান্তরাল ভর রেখে তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। ওপরে শেষ বিকেলের মরা আলো থাকলেও নীচের গলিটা তখন কুয়োতলার মত ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

নীচে তো নামলাম, কিন্তু কাগজের টুকরোটা বেমালুম হাওয়া। এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও সেটার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। খুঁজতে খুঁজতে খানিকটা এগিয়েছি,

হঠাৎ ঘাড়ের পিঠে কিসের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগতেই ভীষণ চমকে গেলাম। তারপর পিছন ফিরে তাকাতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোলো কিনা সন্দেহ।

আমার পেছনেই আধপাল্লা খোলা একটা খিড়কির দরজার ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আ.ছ এক দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি, সারা গা কালো বোরখার মত আলখাল্লায় ঢাকা, মুখে বীভৎস মুখোশ। তার হাতের রিভলভারের নলটা আমার কপালের দিকে তাক করা। গোয়েন্দা-কাহিনীর কল্যাণে দৃশ্যটা আমার অপরিচিত ছিল না, কিন্তু এরকম ব্যাপার যে আমার নিজের জীবনেই এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা কখনো কল্পনাও করিনি।

এই ধরনের আকস্মিক বিপদ বা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন লোপ পেয়ে যায়। আমিও মগজহীন পুতুল বনে গিয়েছিলাম। মূর্তিটার হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ইশারায় আমাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে বলল। ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়িয়ে দরজার অন্য পাল্লাটাও খুলে ধরে অত্যন্ত চাপা খসখসে গলায় বলল, 'মাথার ওপরে হাত তুলে সুড়সুড় করে চলে এসো। কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করো না।'

গায়ে কাঁটা দিল। মাথার ওপরে দুহাত তুলে ভারী, অনিচ্ছুক পায়ে আমি দরজা পেরিয়ে ভেতরের আলো আঁধারি প্যাসেজে পা দিলাম। পাঁচিলের ওপরে বসে থাকা সুনীল আর কানাইকে আমি এক অক্ষরও কিছু জানিয়ে যেতে পারলাম না। হয়তো এই শেষ! এটাই আমার চিরবিদায় নেওয়া ওদের কাছ থেকে, অবশ্য মনে মনে।

আমি ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা আমার পেছনে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। মনটা খাঁচায় ঝাপটে বেড়ানো পাখির মত হাহাকার করে উঠল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই বোধ হয় আমার শেষ দেখা। তবু একটা ক্ষীণ ভরসা মনের কোণে উঁকি মেরে রইল। আমার বন্ধুরা যদি এই আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ঘটনাটা দেখে থাকে এবং বুদ্ধি করে এক্ষুনি কানাই ছুটে যায় তা হলে হয়তো আমার উদ্ধারের একটা আশা আছে।

খুট্ করে একটা শব্দ হতেই আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু তাকে কি আমি আলো বলবো? জিরো কিংবা পাঁচ ওয়াটের একটা বহু ঘোলাটে জ্যোৎস্নার মত একটু আলোর আভা ছড়ানো। ঘাড়ের মাঝখানে আবার ঠাণ্ডা ইস্পাতের নলের খোঁচা লাগল, 'চলো।'

চলতে শুরু করলাম। আঁকাবাঁকা সরু প্যাসেজ দিয়ে। আমার কয়েক ইঞ্চি পেছনেই সে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে। হয়তো মাটির তলার কোন গোপন কুঠুরিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন একটা ব্যাপার শুধু আশা করা যায়, অপরাধ জগতের নিয়ম অনুসারে এক্ষুনি হয়ত আমাকে হত্যা করা হবে না। ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে, নয়তো হাত-পা মুখ বেঁধে আপাতত কয়েক ঘণ্টা কোন অন্ধ কুঠুরিতে ফেলে রাখা হবে।

কিন্তু ঘটনাটা তেমন ঘটল না। সরু প্যাসেজের গলি ঘুরে যে ঘরটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ঘরের মাঝখানে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার।

পেছন থেকে গুরুগম্ভীর গলায় নির্দেশ এলো, 'দাঁড়াও!'

দাঁড়ালাম। আমার হাফপ্যান্টের দুটি পকেট সার্চ করা হলো। সম্ভবত সেখানে কোনরকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়ায় নিশ্চিন্ত হয়ে মুখোশধারী আমার মুখোমুখী তার চেয়ারটিতে গিয়ে বসল। আমি তখনও ঊর্ধ্ববাহু হয়েই আছি দেখে বলল, 'এবার হাত নামান যেতে পারে। কিন্তু চালাকির চেষ্টা করলে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।'

রিভলভারটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে মুখোশধারী প্রশ্ন করল, কি উদ্দেশ্যে আগমন হয়েছে? পাঁচিলের ওপরে বসে কি করা হচ্ছিল, হে ছোকরা?'

সামান্য জোর ফিরে পেয়েছি মনের মধ্যে। মিনমিনে গলায় বললাম, 'আড্ডা দিচ্ছিলাম।'

'হুঁম্!' আলখাল্লার পকেট থেকে আমার হারানো কাগজখানা বের করে শূন্যে নাচিয়ে বলল, 'তা হলে এসবের মানে কি? কিসের গুপ্ত সংকেত আছে এর মধ্যে? ভেবো না এর রহস্য ভেদ করতে আমার খুব বেশী সময় লাগবে! কে তোমরা?'

ভেতরে ভেতরে ভয় পেলেও আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। বললাম, 'ওটা একটা সাংকেতিক ভাষা, তবে ওতে কোন সংকেত নেই। আমরা শখের গোয়েন্দা কিনা, তাই ওসব আমাদের প্র্যাকটিস করতে হয়।

'শখের···কি বললে?' মনে হল মুখোশের তলায় লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

এবার গর্বের সঙ্গেই বললাম, 'শখের গোয়েন্দা! আমাদের তিনজনের দল কিনা তাই ডাকনাম ত্রিশূল।'

কোথা থেকে সাহস পেয়েছিলাম জানি না, শুধু মনে হয়েছিল, আমরা জাত ডিটেকটিভ, মৃত্যুকে ভয় করলে আমাদের চলবে না।

'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!' ঘর কাঁপিয়ে মুখোশধারী অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপরে একটানে মুখোশখানা খুলে ফেলে বলল, 'ইউ ফুলস! চেনো আমাকে?'

দেখলাম দাড়িগোঁফ সমাচ্ছন্ন একখানা মুখ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। বয়স যতদূর অনুমান করা যায় তিরিশের মধ্যে।

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। আপনাকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'দেখোনি? তবে হয়ত আমার নাম শুনেছ।' লোকটি এবার সজোরে এক টান মেরে তার দাড়িগোঁফ উপড়ে ফেলল। গাম জাতীয় সলিউশন দিয়ে ওদুটো তার মুখের সঙ্গে জম্পেশ করে সাঁটা ছিল। খুলতে গিয়ে মুখখানা কিছুটা বিকৃত হল, চোখে বোধ করি জলের আভাস ফুটল। আমার কাছে বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। ছদ্মবেশের তলায়

ছদ্মবেশ ছিল তাহলে! এখন দাঁড়াল বছর চব্বিশ পঁচিশের এক সুশ্রী যুবক। বলল, 'আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করো লিলিপুট ডিটেকটিভ! আমি গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী!'

বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক আমার মুখ তখন ইঞ্চি দেড়েকের মত হাঁ হয়ে গেছে। এ আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমাদের স্বপ্ন-জগতের সেই মহানায়ক জলজ্যান্ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে!

প্রতুল লাহিড়ী আমার অবস্থা দেখে মুচকি হেসে তাঁর জোব্বার পকেট থেকে একখানা সুদৃশ্য কার্ড বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আর সন্দেহ থাকল না। ছাপার হরফে স্পষ্ট লেখা আছে: গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী, রহস্যভেদী।

কতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। ওঁর গলা শুনে সংবিত ফিরল। 'তোমার বন্ধুরা তোমাকে ডাকছে। যাও ওদের এখানে নিয়ে এসো।'

সত্যিই কারা যেন দূরে বাইরে আমার নাম ধরে ডাকছিল। আর কান পেতে সুনীল আর কানাইয়ের গলা শুনতে পেলাম।

এর পর মাস দুয়েক কেমন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝেই আমরা ওঁর নির্দেশ মত লুকিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। পাঁচিল বেয়ে নেমে খিড়কির দরজায় ওঁর শিখিয়ে দেওয়া সঙ্কেত করতাম। তিনি হাসিমুখে আমাদের ভেতরে নিয়ে যেতেন। মাঝে মধ্যে ফাইফরমাশও খাটতাম। সেগুলোকে ছোটখাট গোয়েন্দাগিরিই বলা যায়। আমাদের যে কী আনন্দ! আমরা ধন্য হয়ে যেতাম। কখনও ওঁর কোন জরুরী চিঠি গুপ্ত স্থানে রেখে আসতে হত। কখনও বা কোন বিশেষ পাড়ায় কোন বিশেষ বাড়ির সামনে যে গাড়িগুলো এসে থামতো তাদের রং এবং নম্বর, কোনটা কোন জাতের গাড়ি, কি রকম চেহারার কতজন লোক তা থেকে নেমেছিল এবং ফের গাড়িতে চেপেছিল সব বিবরণ অক্ষরে অক্ষরে নোট করে আনতে হত। মায় তাদের টুকরো কথা পর্যন্ত।

তবে প্রতুল লাহিড়ীর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত দেখা হওয়া শক্ত ছিল কারণ নানা জটিল কেসের তদন্তের জন্যে প্রায়ই তাঁকে দূরপাল্লার রেলগাড়িতে কিংবা প্লেনে চেপে বাইরে যেতে হত। কখনও বম্বে দিল্লী, কখনো হংকং, সিঙ্গাপুর। আবার কোন কোন দিন দেখা হলেও তাঁর সঙ্গে একটিও কথা হত না। দেখতাম কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তিনি আপনমনে কি সব হিজিবিজি বিড়বিড় করে চলেছেন। হয়ত এইভাবে কোন গভীর রহস্যের জট ছাড়াচ্ছেন। তখন আমরা তাঁকে বিরক্ত করে ধ্যান ভাঙাতাম না, পা টিপে টিপে চুপি চুপি চলে আসতাম। দুটি মাস এইভাবে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কেটে গেল।

তারপর কি হল, অনেকদিন আর প্রতুল লাহিড়ীর দেখা পাই না। যখনই যাই দেখি খিড়কির দরজায় তালা ঝুলছে। ক্রমে আমরা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম।

কি জানি এবার হয়ত প্রতুল লাহিড়ীর সত্যি সত্যিই কোন বিপদ হয়েছে। হয়ত কোন আন্তর্জাতিক দুষ্ট চক্রের হাতে তিনি এখন বন্দী। আমরা তিনটি অসহায় প্রাণী, ভীষণ রকম মনমরা। অথচ কিছুই আমাদের করার নেই। শেষে একদিন মরীয়া হয়ে গিয়ে তাঁর নিষেধ অমান্য করে বাড়িটার সামনের দিকের সদর দরজায় হানা দিলাম। ওদিকে যাওয়াই আমাদের বারণ ছিল। তবু গেলাম, যদি কোন লোকের মুখে তাঁর কোন হদিস পাই।

বাড়িটার সামনের দিক পড়েছে অন্য পাড়ায়, অর্থাৎ অন্য এক রাস্তার ওপর। পুরোনো আমলের বিরাট বিরাট থামওয়ালা বাড়ি। এক ভদ্রলোক তখন উকিলের পোশাক পরে কোর্টে বেরোচ্ছিলেন। সামনে জুড়িগাড়ি আর কচোয়ান দাঁড়িয়ে। আশুতোষী গোঁফওয়ালা, ব্রীভ বগলে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনলেন, তারপর পাগলের মত হাঃ হাঃ করে একটানা খানিকক্ষণ অট্টহাস্য করে নিয়ে বললেন, ওঃ তোমরা আমার ছেলে ভোলানাথ, আই মীন, ভুলুর কথা বলছ··· প্রতুল লাহিড়ী, রহস্যভেদী, হাঃ হাঃ হাঃ। তাঁর হাসি শুনে ঘোড়াগুলো চমকে লাফিয়ে উঠে চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল।

প্রতুল লাহিড়ীরও যে বাবা থাকতে পারে এবং সে বাবা এরকম অট্টহাসির বাবা, তা ছিল আমাদের কল্পনারও বাইরে। এবং তার থেকেও মর্মস্পর্শী খবর—আমাদের প্রতুল লাহিড়ীর ডাকনাম ভুলু—ওরফে ভোলানাথ মিত্তির নাকি রাঁচীতে গিয়েছেন। না, কেসের তদন্ত করতে নয়, নিজেই কেস হয়ে রাঁচীর খোদ পাগলা গারদে। তাও এবারই নাকি প্রথমবার নয়, এর আগেও একবার কিছুদিনের জন্যে তিনি সেখানকার অতিথি হয়েছিলেন। ইদানীং আবার খুব বাড়াবাড়ি হওয়ায় তাঁর বাবা নিজে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে রেখে এসেছেন।

এরপর আমরা কোনদিন আর প্রতুল লাহিড়ীর বাড়িমুখো হইনি। নিমগাছতলায় পর্যন্ত না।

মজার স্কুল

শেখর বসু

রাজার অনেক বন্ধু, তবে বন্ধুরা সবাই রাজার চাইতে বয়সে একটু বড়। রাজা তাদের সঙ্গে খেলে, গল্প করে, তারা যা-যা করে রাজাও তাই-তাই করে। কিন্তু তারা সবাই স্কুলে যায়, রাজা যায় না। স্কুলে যেতে না পারার জন্যে রাজার মনে খুব দুঃখ। রাজা প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে বলে, "মা, আমাকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দাও।"

এ-কথা বললেই মা ওকে আদর করে বলেন, "রাজা-মশাই, এখন তো তোমার সাড়ে তিন বছর বয়েস, চার হলেই স্কুলে ভর্তি করে দেব।"

"চার কবে হবে মা?"

"ঠিক ছ'মাস বাদে।"

ছ'মাসের হিসেবটা রাজার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু ও বড়দের মতো গম্ভীর হয়ে এমন ভান করে যেন সব বুঝে গেছে।

বন্ধুদের সঙ্গে রাজা বল খেলে, ক্রিকেট খেলে, তিন-চাকা সাইকেল চড়ে, বাঘ-ভাল্লুকের গল্প করে, কিন্তু বন্ধুরা যেই স্কুলের গল্প করে ও চুপ করে যায়।

সবাই নিজের নিজের স্কুলের গল্প বলে, স্কুলে কত মজা! স্কুলে মাঠ আছে, মাঠে দোলনা আছে, একটা ঘরে কত খেলার জিনিস আছে। সবাই বাড়ি থেকে টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে যায়। বাক্সে

থাকে কলা, কমলালেবু, পাউরুটি, সন্দেশ—আরও কত কি। প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা জলের বোতল আছে। স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা বাজলে সবাই একসঙ্গে টিফিন খায়।

এইসব শুনতে শুনতে রাজার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ওর ইচ্ছে করে স্কুলে ভর্তি হতে। ও যদি স্কুলে পড়ত তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন স্কুলের গল্প করতে পারত!

বাড়ি ফিরে ও আবার মাকে বলল, "মা, আমাকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দাও।"

মা ওকে আদর করে বললেন, "রাজামশাই, এখন তো তোমার সাড়ে-তিন বছর বয়েস, চার হলেই স্কুলে ভর্তি করে দেব তোমাকে।"

"চার কবে হবে মা?"

"ঠিক ছ'মাস বাদে।"

ছ'মাসের হিসেব শুনে রাজা অন্যান্য দিন বড়দের মতো গম্ভীর হয়ে এমন ভান করত যেন সব বুঝে গেছে। আজ কিন্তু ওর আর সেরকম করতে ইচ্ছে করল না। ও জিজ্ঞেস করল, "মা, ছ'মাস কবে শেষ হবে।"

মা বললেন, "ছ'মাস শেষ হবে ঠিক ছ'মাস পরে। তুমি তো এক-দুই গুনতে শিখে গেছ, গোনো তো এক-দুই-তিন….।"

রাজা সঙ্গে সঙ্গে গুনতে শুরু করে দিল, "চার, পাঁচ, ছয়, এগারো, সতেরো….।"

মা বললেন, "খুব সুন্দর গুনেছ রাজামশাই, তবে একটু ভুল হয়ে গেছে যে। ছয়ের পরে হবে সাত, তারপরে আট।"

থামিয়ে দিয়ে রাজা বলল, "দুপুরেকেউ পড়ে বুঝি, পড়তে হয় সকালে আর সন্ধ্যের।"

মা বললেন, "ও তাই তো, তাই তো, তুমি তাহলে সন্ধ্যেবেলায় পড়বে, কেমন?"

রাজা উত্তর দিল, "আচ্ছা।"

কয়েকদিন পরে রাজাদের বাড়িতে তুয়ারা বেড়াতে এল। তুয়া, তুয়ার বাবা আর মা। তুয়া রাজার মামাতো বোন। ওরা দার্জিলিংয়ে থাকে, সাতদিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে কলকাতায়। তুয়া রাজার চেয়ে এক বছরের বড়, ও সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাই আসার পর থেকেই জুড়ে দিয়েছে স্কুলের গল্প।

ওদের স্কুলটা কী সুন্দর, সামনে ফুলের বাগান, বাগানে দোলনা। ওরা রোজ সেই দোলনায় চড়ে।

তুয়ার মুখে এত স্কুলের গল্প শুনতে শুনতে রাজার কেমন যেন রাগ হয়ে গেল। তাই ও বলে ফেলল, "আমাদের স্কুলটা আরও ভাল। স্কুলে বাগান আছে, দোলনা আছে, খেলার মাঠ আছে। আমরা রোজ সেখানে বল খেলি, ক্রিকেট খেলি, ব্যাডমিন্টন খেলি, ক্যারম খেলি, তারপর, তারপর•••তাস খেলি।"

তাস খেলার কথা শুনে তুয়া অবাক হয়ে বলল, "এমা! স্কুলে আবার তাস খেলে নাকি! তাস তো বড়রা খেলে।"

তাস খেলার কথা রাজা বলতে চায়নি। অন্য খেলার কথা মনে না পড়ায় মুখ দিয়ে তাস খেলার কথা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তুয়ার কাছে হেরে যেতে ইচ্ছে করছিল না একটুও। তাই বলল, "আমরা স্কুলে তাসও খেলি, আমরা বড় হয়ে গেছি তো। তাস খেলার পরে আমরা আইসক্রিম খাই।"

আইসক্রিমের কথা শুনে তুয়ার জিভে জল এসে গেল। ইস্! আইসক্রিম খেতে ওর কী ভালই না লাগে! কিন্তু বাবা-মা ওকে একটুও আইসক্রিম খেতে দেয় না! ওর গলার টনসিল না কী যেন ফুলেছে।

তুয়া খুব ভাল মেয়ে, একটুও বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলতে পারে না। ও রাজার সব কথা বিশ্বাস করে জিজ্ঞেস করল, "স্কুলে তুই আর কী কী খাস রে?"

রাজা বলল, "অনেক কিছু। কলা, ডিম, পাউরুটি, সন্দেশ, আম, লিচু, জাম, ক্যাডবেরি, মাংস, তারপর, তারপর···খিচুড়ি।"

পরশু দিন রাজার মা খিচুড়ি রেঁধেছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল তো, সেই জন্যে। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। গরম-গরম খিচুড়ি, মাখন আর ডিমভাজা দিয়ে খেতে খুব ভাল লেগেছিল রাজার; ও তাই টিফিনের মধ্যে খিচুড়িও ঢুকিয়ে দিল।

এতএব খাবারের নাম শুনে তুয়ার খুব রাগ হয়ে গেল ওর মায়ের ওপর। ও খুব দুঃখী দুঃখী মুখে বলল, "আমার মা এত টিফিন দেয় না রে। দেয় শুধু ডিম আর স্যাণ্ডুইচ।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলল, "আমার মাও আমাকে 'স্যাণ্ডিচ' দেয়। রোজ রোজ দেয়।"

রাজা এরপর থেকে যা যা ভাল জিনিস দেখে সব ওর স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেয়। একদিন ওরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল। ফিরে এসে তুয়াকে বলল, "জানো আমাদের স্কুলে চিড়িয়াখানাও আছে। সেখানে কত বাঘ, কত সিংহ, কত হাতি।"

শুনে ভালমানুষ তুয়া অবাক হয়ে বলল, "ওমা! বাঘ-সিংহ কামড়ে দেয় না?"

রাজা বলল, "কামড়াবে কেন? ওরা তো সব আমাদের কথা শোনে। খেলতে বললে খেলে, খেতে বললে খায়, ঘুমোতে বললে ঘুমোয়।"

দার্জিলিংয়ে ফিরে যাবার আগের দিন তুয়ার বাবা তুয়া আর রাজার জন্যে দুটো তিন-চাকার সাইকেল কিনে নিয়ে এল। সাইকেল পেয়ে ওরা খুব খুশি। সাইকেলে দু'চক্কর ঘুরে এসে বলল, "জানো, আমাদের স্কুলে না সাইকেলও আছে, আমরা রোজ চড়ি।"

রাজার কথা শুনে তুয়া অবাক হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় তুয়ারা দার্জিলিং চলে যাবে। রাজা, রাজার বাবা আর মা ওদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিল।

ট্রেন দেখে রাজার খুব মজা লাগল, কিন্তু তুয়াদের নিয়ে যেই না ট্রেনটা ছেড়ে দিল অমনি রাজার জল এসে গেল চোখে। তুয়ার জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছিল সব চাইতে বেশি। দেখতে দেখতে ট্রেন চলে গেল অনেক দূরে, কিন্তু রাজার চোখের জল থামছিল না।

ওর মা চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ছিঃ ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি তো এখন বড় হয়ে গেছ, বড়রা কাঁদে বুঝি! আর কিছুদিন পরেই তুয়াদের স্কুলে ছুটি হয়ে যাবে, তখন ওরা আবার আমাদের বাড়িতে আসবে।"

মায়ের কথা শুনে কান্না থামল রাজার, কিন্তু ওর চোখমুখ থমথম করতে লাগল। বাড়ি ফিরে এসে লম্বা টানা বারান্দায় কয়েকবার সাইকেল চালাবার পরে আবার আগের মতো মন ভাল হয়ে গেল রাজার।

তুয়ারা চলে যাবার পরেও রাজার স্কুলের গল্প বলা থামল না। বাড়িতে যে আসে তার কাছেই রাজা বানিয়ে বানিয়ে স্কুলের গল্প বলে। সবটা অবশ্য বানানো নয়, বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা গল্পগুলোও নিজের বলে চালিয়ে দেয় দিব্যি।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পরে ওর মা ওকে একদিন সত্যি সত্যি স্কুলে ভর্তি করার জন্যে নিয়ে গেলেন। সেদিন রাজার সে কি আনন্দ! অন্যান্য দিন ও কিছুতেই দুধ খেতে চায় না, সেদিন ও স্কুলে ভর্তি হওয়ার নামে এক চুমুকেই দুধের গ্লাস শেষ করে দিল। অন্যান্য দিন ও সকালবেলাতেই লুকিয়ে-লুকিয়ে খেলতে চলে যায়, সেদিন ও আর কোথাও গেল না, ভাল ছেলের মতো মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল।

পথে বেরিয়ে রাজার খুশি আর ধরে না। স্কুল নিয়ে হাজার রকমের প্রশ্ন শুরু করে দিল। মা একটার উত্তর দিতে না দিতেই রাজা আর একটা প্রশ্ন করে বসে।

স্কুলটা ওদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। বাসে ওঠার একটু পরেই মা বললেন, "এবার নামতে হবে।"

বাস থেকে নামার পরে রাজার আর তর সইছিল না। বার বার জিজ্ঞেস করছিল, "মা, কোথায় স্কুল? মা, কোথায় স্কুল?"

কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, "রাজা, ওই দেখ তোমাদের স্কুল।"

স্কুল দেখে রাজার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ও বলল, "এ কেমন স্কুল মা? এ তো একটা ছোট্ট লাল বাড়ি।"

মা তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "স্কুল নিয়ে এসব কথা বলতে নেই রাজা। ছোট স্কুল, তাতে কী হয়েছে? স্কুলটা কী সুন্দর দেখতে, তাই না?

এক চিলতে বাগানটা দেখে রাজার বলতে ইচ্ছে করছিল, এমা! এটাকে আবার বাগান বলে নাকি! কিন্তু রাজা মুখ ফুটে কিছু বলল না।

স্কুলের ঘরগুলো কী ছোট্ট-ছোট্ট, অন্ধকার, দিনের বেলাতেও আলো জ্বলে। বড় আন্টিকে কী গম্ভীর দেখতে। রাজার সঙ্গে গম্ভীর মুখে দু'একটা মোটে কথা বলল।

স্কুলে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরে এল রাজা। সারা রাস্তা ও মায়ের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি, আসলে ওর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভীষণ। অ্যাদ্দিন ধরে স্কুলের গল্প বানাতে বানাতে ওর মনে হয়েছিল, স্কুলটা বুঝি সত্যিই ওইরকম। বিরাট স্কুল, বিশাল মাঠ,

সামনে খুব বড় বাগান, বাগানে দোলনা। মাঠে ছেলেরা বল খেলছে, ব্যাডমিণ্টন খেলছে, সাইকেল চড়ছে, আরও কত কি! চারদিকে শুধু মজা আর মজা। এই ছোট্ট স্কুলটাতে ওসব কিচ্ছু নেই দেখে ও কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে দু'চারদিন স্কুল করার পরে একদিন সকালে হৈ-হৈ করতে করতে তুয়ারা ওদের বাড়িতে এসে হাজির হল।

দার্জিলিংয়ে শীতকালে লম্বা ছুটি দেয়, সেই ছুটিতে তুয়ারা কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। তুয়াকে দেখে রাজার খুব আনন্দ, রাজাকে দেখে তুয়ারও আর খুশি ধরে না।

রাজাদের স্কুল বসে সকালে। রাজা যখন খেতে বসেছে তখন তুয়ারা এল। রাজাকে স্কুলে পৌঁছে দেয় ওর মা, নিয়ে আসে বেলাদি।

রাজাকে স্কুলে যেতে দেখে তুয়া বায়না ধরল, ও রাজার সঙ্গে স্কুল দেখতে যাবে। রাজা ওকে স্কুলের যে গল্পগুলো বলেছিল সেগুলো ওর সব মনে আছে। তুয়া বলল, "রাজা তোমাদের স্কুলটা কত বড়। কত বড় বাগান আছে সেখানে, বাগানে দোলনা আছে। স্কুলের মাঠটা কত বড়, সেখানে কত খেলা হয়। তোমাদের স্কুলে পোষা বাঘ-হাতি-সিংহ আছে। আমি দেখতে যাব, আমি দেখতে যাব।"

শুনে রাজা খুব বিপদে পড়ল। ওতো স্কুলের ওইসব গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলেছে, ওগুলো তো আর সত্যি নয়। তাই রাজা বলল, "আজ নয়, আর একদিন যেয়ো তুয়া।"

"না, আজই যাব।" তুয়া বলল।

"ছেলেদের স্কুলে মেয়েরা যায় নাকি! আমাদের স্কুলে শুধু ছেলেরা যায়।"

তুয়া তাতেও দমল না। বলল, "আহা! আমি তো আর স্কুলে পড়তে যাচ্ছি না, আমি শুধু দেখব।"

তাই না শুনে রাজা বলল, "আমাদের স্কুলে নিয়ে যাব কেন? তুমি তোমাদের স্কুলে আমাকে নিয়ে গেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে তুয়া উত্তর দিল, "আমাদের স্কুলে নিয়ে যাব কী করে? আমাদের স্কুলে তো এখন ছুটি।"

"আমাদেরও ছুটি।"

"ছুটি! তাহলে তুমি যাচ্ছ কেন?"

"আমাদের তো আর ছুটি হয়নি।"

"তাহলে কাদের হয়েছে?"

"মাঠের, বাগানের, দোলনার আর বাঘ-সিংহ-হাতির।"

রাজার উত্তর শুনে তুয়া এতই অবাক হয়ে গেল যে, ওর মুখ থেকে আর একটাও কথা বেরুলো না।

ইজ্জৎ

সুমথনাথ ঘোষ

মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলে গেছে সোজা। সেটা দিয়ে গেলে স্টেশনটা কাছে হয় কিন্তু কোনদিন সেপথে ভুলেও হাঁটে না সাহেবজান! পাকা রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে, বস্তিপাড়া হয়ে, চৌধুরীদের বাড়ির কাছ দিয়ে ঘুরে যায়। এপথ দিয়ে সে যাবেই যাবে! কোনদিন তার ব্যতিক্রম ঘটে না। এর জন্যে যদি ট্রেন ফেল্ করতে হয়, তাতেও প্রস্তুত।

এই নিয়ে স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে কত রাগারাগি, মন কষাকষি, গালাগালমন্দ হয়ে গেছে তবুও সে এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না, কিছুতেই।

এইজন্যে কোনদিন গাড়ি ফেল করে বাড়িতে ফিরতে দেখলে ফতেমা অগ্নিমূর্তি ধরে। বলে, কুড়ের ধাড়ী, আজ আবার কাজ কামাই করলি, কাল খাবি কি? ঘরে যে একদানা চাল নেই জানিস না?

সাহেবজান রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। খাটলে তবে রোজ, তবে পয়সা তা সে জানে। তাই কৈফিয়ৎ দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে।

—ট্রেন যে চলে গেল, তা আমি কি করবো!

ফতেমার কণ্ঠস্বর এবার দ্বিগুণ চড়ে যায়। বলে, মাঠের পথে গেলেই ত গাড়ি

পেতিস—কেন ঘুরো পথে মরতে গেলি? একদিন কি ওই দিক দিয়ে না গেলে চলে না? রাগে গরগর করতে থাকে, বলি তোর কবরের মাটি কি কিনে রেখেছিস ওখানে? না অন্য কোন পিয়ারের লোক আছে, শুনি?

সাহেবজান জবাবদিহি করতে পারে না। নীরবে চেয়ে থাকে ফতেমার মুখের পানে।

—বলি চুপ করে রইলি যে! জবাব দে আগে, নইলে আজ অনর্থক করবো।

এরকম উগ্রমূর্তি কোনদিন সাহেবজান ফতেমার দেখেনি, তাই সে রীতিমত ঘাবড়ে যায়। সে জানে ভাল করেই যে অর্ধেক দিন ফতেমা লোকের বাড়ি ধান ভেনে, গতর খাটিয়ে তার সংসার চালায়। তাই চুপ করে সব গালাগাল হজম করে। তবু ভয়ে ভয়ে বলে, আজ আমার ওপর তুই এত গোঁসা হচ্ছিস কেন?

—লজ্জা করে না মুখ নাড়তে? আজ ছ'মাস ধরে ধান ভেনে লোকের বাড়ি মজুরী করে তোর সংসার চালাচ্ছি—এখনো গা-গতরের ব্যথা মরে নি, আর তুই কিনা কুড়েমী করে, এমনিভাবে কাজ কামাই করছিস?

—আল্লার কিরে! ট্রেন ফেল্ করেছি আজ!

কেন ফেল্ করলি? ফতেমার কণ্ঠস্বরে আগুন ঝরে—এ পাড়া থেকে কত লোক ত ওই গাড়ি ধরে শহরে চাকরি করতে গেল, কে তোর মত ঘরে ফিরে এসেছে বল্? তুই কেন ওই ঘুরোপথটা দিয়ে স্টেশনে যাস আজ আমায় বলতে হবে!

আসল কথাটা চেপে গিয়ে সাহেবজান শুধু বলে, ওই পথেই তো আমার যা কিছু কাজ-কাম! স্টেশনের ওই পথে যতগুলো বড় বাড়ি দেখিস সব তো আমার হাতেই তৈরি!

—ওঃ কবে ঘি খেয়েছিলি আজো তার হাতে গন্ধ! টিটকিরি দিয়ে বলে ফতেমা, আমি তো আজ দশবছর তোকে নিকে করেছি, কোনদিন তো দেখিনি যে একটা লোক ডাকতে এসেছে, কাজের জন্যে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাহেবজান। বলে, দেশের সব পুরনো লোকজন মরে গেল, তারা বেঁচে থাকলে কি আজ আমার কাজের জন্যে শহরে ছুটতে হত! কাজের ভালমন্দ এখন কে বোঝে যে তার দাম দেবে? যতসব আজেবাজে লোক দিয়ে এখন সস্তার কাজ খোঁজে! সেই কথাই আজ মতি মিঞার বিড়ির দোকানে হচ্ছিল!—বলে একটু চুপ করে আবার সাহেবজান তার স্ত্রীকে বলে, আজকাল এই যে সব বাবুরা বাড়ি তৈরি করাচ্ছে, ওকে কি কাজ বলে! একটা ইটের ওপর আর একটা ইট সোজা করে যারা বসাতে জানে না, তারা কিনা এখন রাজমিস্ত্রী? ছোঃ কর্ণিক হাতে নিলেই হল? চায়ের দোকান হয়েছে, ওই যে নতুন বাড়িটায় তার এ পাশের দেওয়াল বসে গেছে! আর ওই দত্তবাবুদের বাড়ি এখনো তিনটে বছর হয়নি, এরি মধ্যে ঢালাইয়ের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে ঘরে।

—বেশ হয়েছে? তাতে তোর কেন গায়ের জ্বালা! কেবল অন্যের কাজের খুঁত ধরতে মজবুত। বলি তুই যা কাজ করেছিস্, সব একেবারে নিখুঁত! এই বলে স্বামীকে খোঁচা মারে ফতেমা!

—নিশ্চয়ই। বলুক দেখি কেউ যে একখানা বাড়িতে কাজের ভুল করেছে সাহেবজান মিস্ত্রী! সেরকম ওস্তাদের কাছে কাজকাম শিখিনি। বলে সগর্বে একবার ফতেমার মুখের দিকে তাকিয়ে অহঙ্কারে ফেটে পড়ে।—যেদিন প্রথম কর্ণিক হাতে তুলে

দিয়েছিল ওস্তাদ, সেইদিনই সে বলেছিল—খোদার কসম্, ইজ্জত যাবে, তবু বেইমানি কাম করবি না কখনো? এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে সাহেবজান আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। চল্লিশ বছর তারপরে চলে গেছে, কিন্তু আল্লা জানে, কোনদিন ফাঁকির কাজ করিনি কোথাও, কেউ বলতে পারবে না—ব্যাটা জোচ্চোর, ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে গেছে!

ফতেমা মুখটা তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, যার কাজের এত জাঁক, সে তাই কাজের অভাবে উপোস করে মরে বেকার বসে থাকে, মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বেশী। বেশি দেমাক আমার কাছে দেখাসনি বলছি! তোর মুরোদ কত আমার জানতে বাকী নেই! মাথার ওপর চুলগুলোকে টিপি করে জড়াতে জড়াতে ফতেমা বলে, আমার বাপ্ কে বোকা পেয়েছিলি, তাই যা তাকে বুঝিয়েছিস সে বুঝেছিল—সাহেবজান কতবড় মিস্ত্রী, কত নাম কত কাম! বিয়ের আগে কত শুনেছিলুম, কিন্তু এসে দেখলুম সব 'ফোক্কা'। সব ঝুট্! আমাকে বিয়ের জন্যে আমার বাপকে এইভাবে ধোঁকাবাজি দিয়েছিলি তুই।

এতবড় অপবাদ সাহেবজান মিস্ত্রীকে, তার পাওনাদাররা পর্যন্ত কোনদিন দিতে সাহস করেনি। আর যাই হোক, ঝুট, ধোঁকাবাজ সে নয়। সাহেবজানের মুখচোখ তাই অপমানে কালো হয়ে ওঠে। কণ্ঠের সমস্ত রাগ দমন করতে করতে সে বলে, ফতেমা তুই আমার বৌ হয়ে এতবড় কথাটা বললি!

বেশ করেছি। আরো বলবো! কি সোনাদানা তুই আমায় এ পর্যন্ত দিয়েছিস? এতবড় ওস্তাদ মিস্ত্রীর ঘর করতে এসে দেখি, ওমা, একটা চালা আছে, তারও মটকা ফুটো, ঘর থেকে আকাশ দেখা যায়! এত ইমারত তৈরি করে যে খোদা তাকে একটা পাকাঘর করার হিম্মত দেয়নি! তাছাড়া নাম কাম সব তো শুনি তোর নিজের মুখে, দেশের লোক তো কাজকামের জন্যে কৈ তোকে ডাকে না, আর যদি বা কেউ কাজ করায় তো পুরো পয়সা দেয় না। এইতো তোর মুরদ! এইতো তোর কাজের কদর!

ষাট বছরের বৃদ্ধ সাহেবজান এই শুনে আর একবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার দেহের শিরায় উপশিরায় বুঝি তেজ আবার ফিরে আসে। খপ্ করে এগিয়ে এসে সে ফতেমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, চল তোকে এখুনি আমি দেখিয়ে আনব, কতগুলো বাড়ি আমার হাতে তৈরি। তাছাড়া চৌধুরীদের যে বিরাট তিনতলা ইমারত, তা দেখলে বুঝতে পারবি, তোর বাপকে আমি ফাঁকি দিয়েছি কিনা?

একটা ঝাপটা মেরে হাতটা ছিনিয়ে নেয় ফতেমা। তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে একবার সাহেবজানের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে, ওঃ কার কাজ কে করেছে, কে জানে! তুই মিথ্যা বলছিস না, কেমন করে বুঝবো?

শিল্পীর মনে এতে দারুণ আঘাত লাগে!

—জিজ্ঞেস করবি চল্! উত্তেজনায় সাহেবজানের সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—এখনও সাক্ষী আছে। তারা তোর মত অবিশ্বাসীনী নয়, এখনো চৌধুরী বাবুদের ছোট কর্তা বেঁচে আছে, শুনবি তাঁর মুখে সব। চল্। এখনো দত্তবাবুদের পুরনো নায়েব মরেনি, তার কাছে গেলে জানতে পারবি। একা আমি শুধু তাঁদের ওই পরিবারের কত ঘর-বাড়ি করেছি।

থাম্। বলে তার মুখের ওপর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ফতেমা।—সব তো করেছিস কোনকালে—কিন্তু আমি তো এখনো তেমন কিছু করতে দেখিনি!

নিমেষে থেমে যায় সাহেবজান। কথাটা মিথ্যা বলেনি ফতেমা—তার যৌবনকালে, প্রৌঢ়বয়সে যে সব কাজ সে করেছে, তারই গর্ব তো এখন সে করে! সত্যিই ত ফতেমা তার সংসারে এসেছে দশ কি এগারো বছর, তার স্বামীর কাজের কদর কিরকম ছিল, সে বুঝবে কি করে?

ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। যৌবনকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না! তার দেহ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়েছে। অথচ ফতেমা যৌবনের তেজে ফেটে পড়ছে, তাকে কি করে বোঝাবে কত বড় ওস্তাদ মিস্ত্রী সে!

পরের দিন থেকে দেশের ভেতরে কাজের খোঁজে বেরোয় সাহেবজান্। কিন্তু মুস্কিল, তার মজুরীর কথা শুনে সবাই পিছিয়ে যায়। বেশি চায় না সাহেবজান। বলে শহরে এখন চৌদ্দ টাকা রোজে কাজ করি, দেশে কাজ, না হয় আরো দু'টাকা কম দেবেন।

চোদ্দ টাকা! বারো টাকা! বলো কি হে? সাড়ে সাত, আট টাকায় এখনো ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী পাওয়া যায়। বলে সবাই ফিরিয়ে দেয় সাহেবজানকে, তার আত্মসম্মানে এতে আঘাত লাগে। দেশের মিস্ত্রীদের কাছে তার একটা ইজ্জৎ আছে, সম্মান আছে, এত কম টাকায় কাজ করলে ছোট হয়ে যাবে যে তাদের চোখে! তেমনি একথা ফতেমার কানে পৌছলে, সেও তাকে নানারকম টিট্‌কিরি দেবে! বলবে, এই তো তোমার কাজের ইজ্জত! না, স্ত্রীর মুখে এ অপমান শোনার চেয়ে মৃত্যু ভাল। তার শিল্পীর মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। শিল্পের ইজ্জতটাই তার কাছে সব চেয়ে বড়।

দেশে কাজের চেষ্টা আর না করে, সে আবার ছোটে শহরে কাজ করতে, বড় এক কনট্রাক্টরের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়। এবার তাঁর কাছে গিয়ে কাজ নিলে। এখানে কিছু কম রোজে কাজ করলেও দেশের মিস্ত্রীরা জানতে পারবে না। বরং শহরে কাজ করছে; কনট্রাক্টরের সঙ্গে শুনে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যাবে!

এরপর থেকে সাহেবজান আর একদিনও ট্রেন ফেল্ করত না। এখন মাঠের ওপরের সংক্ষিপ্ত পথেই স্টেশনে যায়। বড় রাস্তাটাকে এই প্রথম সে ত্যাগ করলে। এই পথের ধারে ধারে ছিল তার তৈরি কত ছোটবড় ইমারত, তাদের দু'চোখে দেখতে দেখতে আগে সে প্রতিদিন স্টেশনে ট্রেন ধরতে যেত। নিজের কীর্তিকে দেখতে নিজের ভাল লাগত তাই নয়, স্রষ্টার মনে তার শিল্পকর্মের প্রতি একটা যেন অপত্য স্নেহ প্রচ্ছন্ন

থাকে। তাই কেন ওই ঘুর পথে ট্রেন ধরতে যেত, আর কেনই বা সে এক- একদিন হঠাৎ ট্রেন মিস্ করত, ফতেমা তা বুঝতে পারত না। কোন বাড়ির কার্নিসে বট গাছ উঠেছে, কার জলের নালীর পথ বন্ধ হয়ে ছাদে জল বসছে, বাইরের দেওয়ালে নোনা লেগে গেছে— এইসব যেতে যেতে যেই চোখে পড়ত অমনি বাড়িওলাকে ডেকে মেরামত করার উপদেশ দিত। তার এই অযাচিত উপদেশের পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকত না। শুধু নিজের হাতেগড়া সৃষ্টিকে চোখে সুন্দর দেখার আনন্দ! যেমন নিজের ছেলেমেয়েকে ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে দিতে দেখলে, মাবাপের চোখে ভাল লাগে না তেমনি! শিল্পীর এ মনের কথা অন্য কেউ বোঝে না, বুঝতে পারে না।

এখন শহরে নিয়মিত কাজ করতে যায় বটে সাহেবজান, কিন্তু তার মনের মধ্যে সবদা একটা কাঁটা যেন কোথায় বিঁধে থাকে। ফতেমাকে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে না পারা পর্যন্ত যেন শান্তি পায় না।

একদিন হঠাৎ সাহেবজানের কানে এল, চৌধুরীদের বাড়ির সামনে ইঁট এসে পড়ছে গাড়িগাড়ি!

সাহেবজান তখনি ছুটল সেখানে! তার পুরনো মনিবের ঘর—একতালা, দোতালা, তিনতলা সবই তার নিজের হাতে তৈরি। সেই বড় মিস্ত্রী। সবই তার পরিকল্পনা! বাড়ির ভেতরে গিয়ে ছোটবাবুকে সেলাম করে দাঁড়ালো সাহেবজান। বললে, বাবু আপনার কাজ হবে, অথচ আমি যে সেকথা জানতে পারলুম না!

ছোটবাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বললেন, ওসব ছেলেরা জানে— তুমি তাদের কাছে যাও।

সাহেবজান মিনতি করে বলে, তবু আপনি যদি একটু বলে দেন—

ওরাই করছে। ওরাই বলবে! আমি ওসবের ভেতরে নেই। বলেই তিনি ডাক দিলেন, ছোট খোকা?

সঙ্গে সঙ্গে একটি পায়জামার ওপর আদ্দির পাঞ্জাবী পরা যুবক এসে হাজির হল। তাঁর নাম সুনীল। সাহেবজান একে কখনো দেখেনি। শহরে চাকরি করে। এরি হাতে মন্দির তৈরির যা কিছু খরচপত্তর সব তুলে দিয়েছেন। ছোটবাবুর এটি কনিষ্ঠ সন্তান। সাহেবজানকে দেখিয়ে তিনি বললেন, এ আমাদের পুরনো মিস্ত্রী। এ বাড়ির সব কাজ ওর হাতের। ও এসেছে, খবর পেয়ে মন্দিরের কাজটা নেবার জন্যে।

সুনীল বললে, কিন্তু কথাবার্তা তো একজনের সঙ্গে হয়েছে, তবে পাকাপাকি হয়নি। সে যা রেট দিয়েছে, আমি বাজারে আরো তিনজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি ওরটাই সবচেয়ে কম!

সাহেবজানের মনে রোখ চেপে যায়। বলে, চিরদিন আপনাদের নেমক্ খেয়ে মানুষ বাবু, আপনারা যদি গরীবের দিকে না চান!

সুনীল বলে, কিন্তু ওই রেট্ এ তুমি যদি কাজ করো, আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি যখন পুরনো মিস্ত্রী।

সাহেবজান বলে, কেউ তো ঘর থেকে লোকসান দিয়ে কাজ করবে না বাবু, একজন যদি পারে, আমিই বা পারব না কেন ?

কিন্তু মনে রেখো, যা রেট তার চেয়ে আর এক পয়সাও বেশি পাবে না। তোমাকে স্ট্যাম্পের ওপর সই করে কাজ নিতে হবে !

সাহেবজান বলে, বাবু এ বাড়িতে কখনো সইসাবুদ করে কাজ করিনি। মুখের কথা, আর ইজ্জৎ সাহেবজানের কাছে এক জানবেন। তবু আপনি যখন বলছেন আমি আগেই সই করে দেব ! তবে কাজ মিলিয়ে নেবেন বাবু।

সুনীল বলে, হাঁ, ঠাকুরের মন্দির। এর কাজ দেখে যেন সবাই খুশি হয় মনে রেখো।

লোকজন জোগাড় করে হপ্তাখানেক পরেই কাজ শুরু করে দেয় সাহেবজান। এক নতুন উদ্দীপনায় যেন মেতে ওঠে সে। সাহেবজান ভুলে যায় তার বয়েস, ভুলে যায় শ্রান্তি ক্লান্তি। ছোকরা কারিগররা হার মেনে যায় তার কাছে। হাতের কর্নিক যেন থামতে চায় না। ছুটির সময় হলে, সকলকে বিদায় দিয়ে একা কাজ করে চলে। শ্বেত পাথর বসায়, মোজ্যাকের ওপর পাথর ঘষে, সিমেন্ট জমিয়ে ফুল, লতাপাতার কারুকার্য করে।

মন্দির শেষ হতে আর অল্পই বাকী। ফতেমাকে রোজই বলে সাহেবজান মন্দিরটা দেখতে যাবার জন্যে।

ফতেমা কিছুতেই সময় করে উঠতে পারে না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সাহেবজান ফিরল না দেখে, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ফতেমা চৌধুরী বাড়ির দিকে চলল।

আলো জেলে একমনে তখন ঠাকুরের বসবার বেদীতে রঙিন পাথরের টুকরো দিয়ে মিনার কাজ করছিল। ফতেমা যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সাহেবজানের কাজ দেখতে দেখতে, ফতেমা শুধু একবার ডাকলে, মেরিজান ?

তাড়াতাড়ি হাতের কর্নিকটা ফেলে দিয়ে চমকে ওঠে—ফতেমা ?

ফতেমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুবার আগে, সাহেবজান, আলোটা উঁচু করে ধরে মন্দিরের ভেতর ও বাইরের সব কাজ যখন দেখালে, ফতেমার মুখচোখের চেহারা বদলে যায়। প্রেম শ্রদ্ধা ও গর্বমিশ্রিত এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই দেখে সাহেবজানের বুকের ভেতরে যেন আনন্দের তুফান ওঠে। বহুকাল যেন এ আনন্দের সাধ পায়নি। তবু মনের আবেগ গোপন করে ফতেমাকে জিজ্ঞেস করে, কেমন হয়েছে ?

খুব ভাল। বহুত্ আচ্ছা ! এত ভাল কাজ তুমি যে করতে পারো সত্যি চোখে না

দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না, তুমি কত বড় শিল্পী ! খোদা তোমায় বাঁচিয়ে রাখুক ! বলতে বলতে তার ছুচোখে আনন্দাশ্রু টলমল করে উঠলো।

মন্দিরের কাজ শেষ হতে হিসেব নিকেশ করে সকলের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে সাহেবজান দেখে তিনহাজার টাকা লোকসান হয়ে গেছে। কি করবে ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ! লোকজনের পাওনা চুকিয়ে না দিলে সবাই জোচ্চোর বলবে যে !

এদিকে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যে মন্দির দেখে, সাহেবজানকে বলে, ওস্তাদ আচ্ছা মন্দির বানিয়েছ। এমন সুক্ষ্ম কাজ একালে দেখা যায় না।

গর্বে বুকটা দশ হাত হয়ে ওঠে সাহেবজানের। ভুলে যায়, তার মাথায় এর জন্যে ঋণের বোঝা চাপানো। ওই চালা ঘর আর তার সঙ্গে দু'বিঘে বাগান সম্বল। আর কোন কিছু নেই। অনেক ভেবে শেষে বাড়ির পুরনো দলিলটা নিয়ে ছোটবাবুর কাছে হাজির হল। বললে, এই দলিল বাঁধা রেখে আমায় তিন হাজার টাকা না দিলে, আমার মান ইজ্জৎ রক্ষা হবে না।

দলিলটা নেড়েচেড়ে দেখে, ছোটবাবু বললেন, এত টাকা এতে হবে না। বড় জোর দেড়হাজার দিতে পারি।

ওতে হবে না হুজুর। তিনহাজার টাকাই চাই। বাজারে ওই আমার দেনা। এখনি না দিতে পারলে ইজ্জৎ থাকে না।

ছোটবাবু বললেন, তখনি বারণ করেছিল আমার ছেলে, তুমি পারবে না ওই রেটে কাজ করতে। কেন নিতে গেলে তবে ?

বাবু, যে কারিগর সে কি, মজুরীর দিকে চেয়ে কাজ করে। দেশে এতবড় একটা মন্দির, চিরকাল এর দিকে তাকিয়ে লোকেরা বলবে সাহেবজান একটা কাজ করেছে বটে। আমি যখন কবরে যাব, তার পরেও, কতদিন, কতযুগ ধরে মানুষ এই কাজ দেখবে ! আমি কি করে কাজ খারাপ করব। জান দিয়ে কাজ করেছি, আমার বিবি খুশি হয়েছে, আল্লা আমায় এই দয়া করেছে, তাতেই জীবন আমার ধন্য ! এই বলে একটু থেমে, সাহেবজান বললে, আচ্ছা ওটা আপনি কিনেই নিন। আমার তিন হাজার টাকা চাই-ই। ছোটবাবু লোহার সিন্ধুক খুলে, বাড়ির ভেতর থেকে তিন হাজার টাকা এনে সাহেবজানের হাতে দিলে সে সেলাম করে চলে গেল।

তারপর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে একদিন, ছেলেমেয়ে স্ত্রীর হাত ধরে চিরকালের মত দেশছেড়ে শহরের দিকে চলল। শুধু যাবার সময় আবার সেই পাকা রাস্তা দিয়ে স্টেশনের পথ ধরলো। একবার শেষ দেখা দেখে যাবে তার হাতেগড়া সেই মন্দিরটাকে।

হোয়াইট সাহেবের ব্যাট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দারুণ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। এই রকম যে একটা কাণ্ড হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। এও কি কখনো হয়? আস্ত একটা দরজার মতো চওড়া ব্যাট নিয়ে ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে নেমেছেন। বোলাররা থ। এতক্ষণ ওঁরা দাপটে বল করছিলেন। একটির পর একটি উইকেট দখল করে নিজেদের দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আর মাত্র দু তিনটি উইকেট ফেলতে পারলেই জয়ের আনন্দে ওঁরা মেতে উঠবেন। ওঁরা ভেবেছিলেন আর কয়েক বলের মধ্যেই খেলা শেষ করে দিতে পারবেন। সেই কথা ভেবে ওঁরা যখন আনন্দে আটখানা তখনই মস্ত চওড়া আস্ত দরজার মতো একটা ব্যাট নিয়ে এসে হাজির হলেন নতুন ব্যাটসম্যান। ব্যাটের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো উইকেট।

অসহায়ের মতো বোলাররা এ ওর দিকে তাকাচ্ছেন। কিছু করার নেই। আম্পায়ার নির্বিকার। যে বোলার এতক্ষণ দারুণ বল করছিলেন, একটির পর একটি উইকেট দখল করছিলেন—তাঁর মুখ শুকিয়ে চুন। কোন রকমে এসে একটা বল করলেন। ব্যাটসম্যান কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। নড়েনও না, চড়েন ও না। বলটা এসে তাঁর মস্ত ব্যাটের সামনে আছড়ে পড়লো। রান টান করার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই ব্যাটসম্যানের। তিনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন। যে কোন উপায়েই হোক হার বাঁচাবেন। একটার পর একটা বল করছেন বোলার। কিন্তু ব্যাটে লেগে ফিরে আসছে সেগুলি। এই ভাবে কেটে গেল খেলার বাকী সময়। জেতা খেলা হাতছাড়া হয়ে গেল।
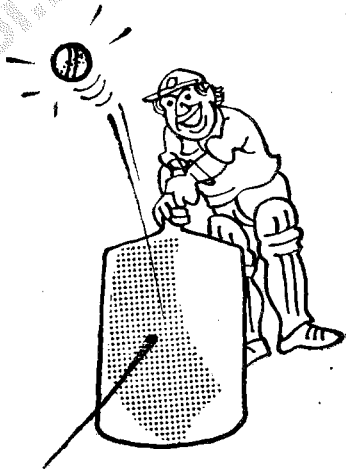
গল্প নয়: ঘটনাটা সত্যি। ঘটেছিল দু'শ বছরেরও বেশি আগে। ১৭৭১ সালে। বিলেতের হ্যাম্বলডন ক্লাব আর চারটেসী দলের মধ্যে সেদিন খেলা হচ্ছিল। ব্যাট করছিল চারটেসী। কিন্তু তাদের ব্যাটসম্যানরা কিছুতেই হ্যাম্বলডনের বোলারদের সঙ্গে

পেরে উঠছিলেন না। একটার পর একটা উইকেট পড়ছিল। নির্ঘাৎ হেরে যাবে চারটেসী। জয় যখন হ্যাম্বলডনের প্রায় মুঠোর মধ্যে তখনই ব্যাট করতে নামলেন হোয়াইট নামে একজন ব্যাটসম্যান। হাতে তাঁর দারুন চওড়া একটা ব্যাট। প্রায় দরজার মতো। চওড়া ব্যাটের আড়ালে উইকেট ঢাকা পড়ে গেছে। বোলাররা সারাদিন আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু হোয়াইট সাহেবকে কেউ আউট করতে পারলেন না। ঐ মস্ত চওড়া ব্যাট হাতে নিয়ে হোয়াইট উইকেটের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জেতা ম্যাচ হাত ছাড়া হয়ে গেল হ্যাম্বলডন ক্লাবের।

আজকালকার এম, সি, সির মতো হ্যাম্বলডন ক্লাব ছিল সেকালের ক্রিকেট খেলার কর্তা-কর্তা-বিধাতা। ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই ওরা ঠিক করে দিত। হোয়াইট সাহেবের ব্যাট দেখে তাঁরা তাজ্জব হয়ে গেলেন। ভাবলেন এর একটা ব্যবস্থা না করলে কোন দিন হয়তো সত্যি সত্যিই একটা দরজা ভেঙে নিয়ে এসে কেউ ব্যাট করতে দাঁড়াবে। তখন কি হবে? অনেক আলাপ আলোচনার পর তাঁরা ঠিক করলেন যে ব্যাট কোন মতেই সওয়া চার ইঞ্চির বেশি চওড়া করা যাবে না। তাঁরা ঐ মাপের লোহার একটা ফ্রেম বানালেন। নিয়ম হল, ঐ ফ্রেমে মাপা না হলে

সেই ব্যাটে কিছুতেই খেলতে দেওয়া হবে না। ঠিক হয়ে গেল ব্যাটের মাপ। এখনো সেই মাপই বজায় আছে। ক্রিকেট খেলার ব্যাট কোন মতেই ৪¼ ইঞ্চির বেশি চওড়া আর ৩৮ ইঞ্চির বেশি লম্বা হতে পারবে না। হোয়াইট সাহেবের দৌলতে ক্রিকেট খেলার আইন কানুনে ব্যাট অর্থাৎ ৬ নম্বর নিয়মটির সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ক্রিকেট খেলা যতদিন চলবে—ব্যাটের সঙ্গে ততোদিন বেঁচে থাকবেন হোয়াইট সাহেব। হোয়াইট সাহেবের ব্যাটের কথা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবেন না।

আর একদিন হলো এক কাণ্ড। হোয়াইট সাহেবের দরজার মতো চওড়া ব্যাট নিয়ে খেলতে আসার চার বছর পরের ঘটনা। সেদিন আর্টিলারী মাঠে হাম্বলডন ক্লাবের সঙ্গে কেন্টের খেলা হচ্ছে। কেন্টের সামনে তখন জেতার সুযোগ। হাম্বলডন ক্লাবের শেষ ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে এসেছেন। তখনো তারা ১৪ রানে পিছিয়ে। কেন্টের বোলারদের দাপটে হাম্বলডনের বাঘা বাঘা সব ব্যাটসম্যানরা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে ফিরে গেছেন। বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতেই পারেন নি। শেষ ব্যাটসম্যানও যে কিছুই করতে পারবেন না সে তো সকলেরই জানা। তার ওপর কেন্টের দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার স্টিভেন্স তখন বল করছেন। তাই সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, যে কোন মুহূর্তে খেলা শেষ হয়ে যাবে। স্টিভেন্সই আউট করে দেবেন হাম্বলডনের শেষ ব্যাটসম্যানকে।

স্টিভেন্সের বলে যেমন জোর তেমনি সোজা উইকেট লক্ষ্য করে ছোটে। ফসকালেই আর দেখতে হবে না। আউট। ব্যাটসম্যানকে ফিরে যেতে হবে প্যাভেলিয়নে। স্টিভেন্স জয়ের আনন্দে ছুটে এসে বল করলেন। বলটা দ্রুত ছুটে এলো। হাম্বলডনের ব্যাটসম্যান ব্যাট তুলতেই তলা দিয়ে গলে গেল বলটা। তারপর দু স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে। এখনকার মতো সে যুগে তিনটে স্টাম্প নিয়ে উইকেট হত না। দুটো স্টাম্পের ওপর একটা বেল থাকত। গোড়ার দিকে তো বেলও ছিলো না।

যাই হোক কেন্টের ফাস্ট বোলার স্টিভেন্সের মারাত্মক সোজা ফাস্ট বলগুলো পর পর ক'বার দু স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল। না ভাঙল স্টাম্প, না পড়ল বেল। ব্যাটসম্যানও আউট হলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে হাম্বলডনের শেষ দুই ব্যাটসম্যান জেতার জন্যে প্রয়োজনীয় ১৪টি রান তুলে নিলেন। জেতা খেলায় হেরে গেল কেন্ট।

তখনকার বোলার বেচারাদের দুঃখ দেখে টনক নড়লো ক্রিকেটের কর্তাদের। সত্যিই তো কি বিচ্ছিরি ব্যাপার। সব চেয়ে ভাল বলগুলোই দু স্টাম্পের মধ্যের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা উইকেট পাচ্ছে না। ব্যাটসম্যানরাও তার সুযোগ পুরোপুরি নিচ্ছেন। বোলারদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে হাম্বলডনের কর্তারা মিটিংয়ে বসলেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হল, ঐ দুটো স্টাম্পের মধ্যে আরো একটা স্টাম্প বসানো হবে। তার মানে উইকেট হবে তিন স্টাম্পের আর তার মাথায় থাকবে দুটি বেল। তাহলে ভাল বলগুলো আর স্টাম্পের মধ্যে দিয়ে গলে যেতে পারবে না। ব্যাটসম্যান ফস্কালেই উইকেট ভেঙে দেবে। আউট হয়ে যাবেন ব্যাটসম্যান।

তাই ঠিক হলো উইকেট হবে তিনটে করে স্টাম্প পুঁতে। তার মাথায় থাকবে দুটি বেল। উইকেট ৯ ইঞ্চি চওড়া হবে। স্টাম্পগুলো এমন ভাবে পুঁততে হবে যাতে বল কোনমতেই গলে যেতে না পারে।

সেই নিয়ম আজো চলছে। তিনটে স্টাম্প আর দুটো বেল দিয়ে তৈরি হচ্ছে উইকেট।

ঐ সময়ই তার মানে আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে ঘটেছিল একটা বিচ্ছিরি ঘটনা। সেদিনের সেই কাহিনী ক্রিকেটের ইতিহাসে ফলাও করে লেখা আছে। সেই ঘটনা যে কোন গল্পকেও হার মানাবে। সেই কাহিনী জানতে আমরা চলে যাচ্ছি লর্ডস মাঠে। সেখানে সেদিন কেন্টের সঙ্গে এম. সি. সি.র খেলা হচ্ছিল।

আম্পায়ার চিৎকার করে উঠলেন 'নো' বল।

বোলার উইলস থমকে দাঁড়ালেন। রাগ, দুঃখ, অভিমান মিলে মিশে এক হয়ে তাঁর মুখটাকে তখন অদ্ভুত করে তুললেন। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আম্পায়ারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন বিশ্বের প্রথম রাউণ্ড আর্ম বোলার উইলস। মাঠের পাশেই বাঁধা ছিল তাঁর ঘোড়া। ঘোড়া ছুটিয়ে চিরকালের জন্যে মাঠ ছেড়ে গেলেন তিনি। আর কোনদিন ক্রিকেট খেলতে নামেন নি। তখনকার দিনে
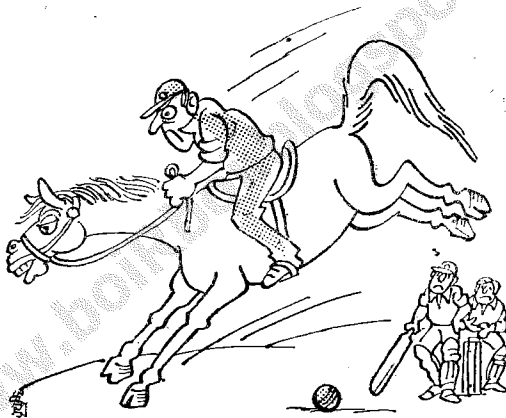
বোলাররা আণ্ডার আর্ম বল করতেন। হাত ঘুরিয়ে আজকালকার মতো রাউণ্ড আর্ম বোলিং করার কথা কেউ ভাবতেও পারতেন না। এম. সি. সি.র বিরুদ্ধে খেলায় উইলস হাত ঘুরিয়ে রাউণ্ড আর্ম বল করলেন। প্রথম বলটি করার সঙ্গে আম্পায়ার 'নো বল' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সেই রাগে উইলস চিরদিনের জন্যে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন। ক্রিকেট আর না খেললেও ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে উইলিস প্রথম রাউণ্ড আর্মবোলার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

জন উইলিস কিন্তু হাত ঘুরিয়ে বল করার কায়দা আবিষ্কার করেন নি। করেছিলেন তাঁর বোন। বাড়িতে উইলস আর তাঁর বোন রোজ ক্রিকেট খেলতেন। সে যুগে মেয়েদের পোশাক ছিলো কোমরের কাছটায় সরু কিন্তু পায়ের দিকটায় ছাতার মতো

ছড়ানো। তাই উইলসের বোনের আণ্ডার আর্ম বল করতে খুব অসুবিধে হত। বার বার হাত আটকে যেত তাঁর পোশাকে। কিছুতেই তিনি ঠিকমতো বল করতে পারতেন না। একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কাঁধের পাশ দিয়ে হাতটা ঘুরিয়ে তিনি বল করতে লাগলেন। আজকাল বোলাররা যেভাবে বল করেন ঠিক সেইভাবে।

উইলস তখন ব্যাট করছিলেন। তিনি দেখলেন, নতুন কায়দায় করা বলগুলো মারাত্মক। ঠিকভাবে খেলাই যায় না। বোনের কাছ থেকে কায়দাটা চটপট শিখে নিলেন তিনি। তারপর বন্ধুদের কাছে গিয়ে ঐ ভাবে বল করতে লাগলেন। নতুন কায়দায় বোলিং দেখে বন্ধুরা তো থ। তাঁরা উইলসের বলগুলো মোটেই খেলতে পারছিলেন না। সকলেই চটপট আউট হয়ে যেতে লাগলেন। তাই ব্যাপারটা কেউই ভাল চোখে দেখলেন না। উল্টে জন উইলসকে সকলে মিলে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। ব্যাটসম্যানরা তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধলেন। কেউ কেউ মারতে পর্যন্ত গেলেন। দর্শকরাও দুয়ো দিতে আরম্ভ করলেন। সকলে মিলে বাধা দিতে শুরু করলেন উইলসকে। কিছুতেই তাকে নতুন কায়দায় বল করতে দেবেন না।

সেই সময়ে লর্ডস মাঠে খেলা পড়ল এম. সি. সির সঙ্গে কেন্টের। এম. সি. সি. তখন ব্যাট করছে। কেন্টের অধিনায়ক জন উইলসের হাতে বল তুলে দিলেন। ছুটে এসে হাত ঘুরিয়ে যেই উইলস বল করলেন অমনি আম্পায়ার চিৎকার করে উঠলেন—নো বল।

রাগে দুঃখে সেই যে উইলস ঘোড়ায় চড়ে মাঠ ছেড়ে গেলেন—আর কোনদিন তিনি খেলতে নামেন নি। আজ সব বোলাররাই উইলসের মতো করেই বল করেন। উইলসের কথা তাই কেউ কোনদিনই ভুলতে পারবেন না।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সাগর থেকে ফেরা

শৈল চক্রবর্তী

"আমি এটুকু ঘরে থাকতে পারব না" বলল সোনালি। সোনালি মানে, সেই গোল্ডফিশটা, যেটা টুটুনের কাকা এনে দিয়েছিল বোম্বাই থেকে।

তখনই আমি শুরু করলুম সোনালির গল্প। সোনালি বলছে টুটুনকে, "এইটুকু ঘরে আমি থাকতে চাই না।"

সোমা বাধা দিয়ে বলল, "ওর ঘরটা ছোট বুঝি ?"

আমি বলি, "হ্যাঁ, মাছের ঘর ত, সে আর কত বড়। তোমার স্কুলে যাওয়ার যে বই রাখার বাক্সোটা, তার চেয়ে হয়ত একটু বড় হবে। সোনালি তার ভেতর ভাল করে খেলা করতে পারে না। সোনালির ল্যাজটা কেমন জান ? তোমাদের ঐ যে দরজার মিষ্টি রঙের গোলাপী পর্দা যখন হাওয়ায় ঢেউ খেলিয়ে দোল খায়, সোনালির ল্যাজটাও তেমনি ঢেউ খেলিয়ে যায় জলের মধ্যে দিয়ে।

"তুমি মাছের গল্প বলবে ?" আবার বাধা দেয় সোমা।

"হ্যাঁ। মাছের গল্প কি গল্প নয় ?
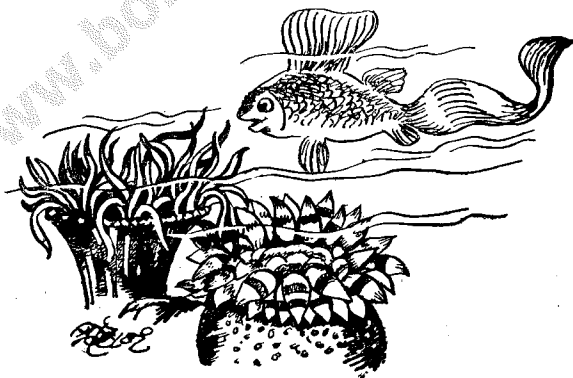
"আগে বল ত।" বলে ওঠে সোমা।

"তাহলে শুরু করি। একটি ছোট্ট নদীর ধারে ছিল একটি বাড়ি। বাড়ির আশপাশের গাছগাছালি সবুজে ভরা। রোদ উঠলে সেগুলো সবুজে সোনায় ঝলমল করে ওঠে।

ঐ বাড়িতে ছিল এক বুড়ো আর তার নাতি টুটুন। টুটুনের সখ মাছ পুষবে। তার কাকা কাজ করে জাহাজে। অনেকদিন পরে পরে বাড়িতে আসে। সেবারে আসার সময় বোম্বাই থেকে একটা কাচের জারে করে নিয়ে এল একটি সুন্দর গোল্ডফিশ আর একটা এঞ্জেল মাছ। বাড়িতে এসেই সেটি দিল টুটুনের হাতে। সেই মাছ পেয়ে টুটুনের কী আনন্দ !

ঐ জারের মধ্যে ত মাছ থাকতে পারে না, তাই দাদু শহর থেকে কিনে এনে দিল চৌকো এক বাক্সোর মত কাচ দেওয়া ঘর, যাকে বলে অ্যাকোয়ারিয়াম। তাতে জল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল মাছ দুটিকে।

টুটুন গোল্ডফিশের নাম রাখল সোনালি। সে বসে বসে ওদের খেলা দেখত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ওদের খেলা ফুরোয় না। সাঁতার কাটে, ঘোরাফেরা করে আর মাঝে মাঝে খাবার খায়।

এঞ্জেলটা কী পাতলা, যেন কাগজের মত। হলে হবে কি, তার বাহার কত ? পাখনাগুলো ওপর নীচে কী বড় বড়। যেন পালতোলা নৌকোর মত যায়। কিন্তু মাছটা বড় ভীতু। টুটুনকে দেখেও ভারি ভয়। কেউ যদি কাচের ওপর হাত রাখে অমনি ধড়ফড়িয়ে পালাবে ও। আর ভয় পেলেই ওর রং যায় বদলে। পিঠের মজাদার কালো ডোরাগুলো হয়ে যায় ফিকে, ফ্যাকাসে। বিশ্রী লাগে তখন।

সোনালি কিন্তু বড় মজার। তার ভয় ডর নেই। আবার খুব বুদ্ধিমান কিন্তু। তার গায়ের রং সোনার চেয়েও লালচে আর জলজ্বলে। পিঠের ডানা, পেটের কাছে পাখনা, আর সবচেয়ে মজার হল ল্যাজটা। নড়লেই অমনি ঢেউ খেলিয়ে যাবে ল্যাজে।

টুটুনের দাদু ছিল ডাক পিয়ন। সারাদিন তাকে ঘুরতে হত আর নানান জায়গায় চিঠি বিলি করতে হত। অনেক সময় টেলিগ্রাম ও মনিঅর্ডারও নিয়ে যেত আর কাগজে সই করিয়ে আনত।"

"মাছেদের কি হল তাই বলবে ত !" সোমা মাঝপথে তাড়া দিয়ে উঠল।

"ও, হ্যাঁ মাছেদের কথা বলছি এবার। তাদের খাবার এনে দেয় বুড়ো। ওরা ত ভাত ডাল খায় না আর টফি চিকলেটও খায় না। ওদের চাই কেঁচো। সরু সরু জ্যান্ত কেঁচো জলের মধ্যে নড়বে আর তাই ওরা গপ্ গপ্ গিলবে। বুড়ো তাই মাঝে মাঝে বাজার থেকে কেঁচো এনে দেয়।

এমনি করে এক বছর গেল। হঠাৎ একদিন এঞ্জেলকে দেখতে পেল না টুটুন। ওমা ! কি হল ? কোথা গেল মাছটা ?

তারপর দেখে কি, সে পড়ে আছে নীচে। ছোট ছোট নুড়ির ওপরে, চুপচাপ। নড়াচড়া নেই। দাদু বলল, "মাছটা মরে গেছে রে !"

টুটুন বুঝতে পারে না শুধু শুধু একটা মাছ মরে যায় কি করে ? তাকে কেউ ত

ধরেনি, মারেনি। তাহলে মরল কেন? আহা কেমন ছিল। বেচারা আর উঠবে না, খেলবে না, ভয় পেয়ে রং বদলাবে না—মরে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়।

সোনালি এখন একা। সে আরো বড় হয়েছে। তার পাখনা আর ল্যাজের বাহার আরো খোলতাই হয়েছে। তাকে দেখতে আসে কত লোক।

শুধু টুটুনকে একা পেলে সোনালি মুখ তুলে টুটুনের সঙ্গে কথা বলে। বলে ঐটুকু জায়গায় তার ভাল লাগছে না।

"কেন?" টুটুন অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

"এই দেখ না, এদিক থেকে তিনবার পাখনা নাড়লেই ওদিকের দেয়ালে গিয়ে ঠেকছি। আর নীচে থেকে ওপরে উঠতে এক সেকেণ্ডও লাগে না।" বলল সোনালি।

"কিন্তু আমাদের ত আর বড় বাক্সো নেই।"

"কেন? তোমাদের পুকুর নেই?"

"আমাদের পাশের গাঁয়ে আছে তাল-পুকুর। বাস্‌রে, সে ত মস্ত বড় পুকুর। সেখানে থাকলে আমি ত তোমায় দেখতেই পাব না।"

"তাহলে ঐ নদী বলে কি যেন আছে তাতে নাকি অনেক জল, সেখানে ছেড়ে দিতে পার না আমাকে?"

টুটুনের মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলল, "বারে, তাহলে তুমি যে হারিয়ে যাবে। তোমাকে পাব কোথায়?"

সোনালি মনের দুঃখে ঐটুকু ঘরের মধ্যেই সাঁতার কাটে আর সকাল সন্ধ্যে টুটুনের সঙ্গে গল্প করে।

গ্রীষ্ম গেল। এল বর্ষা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

একদিন দাওয়াতে মাছের জলঘরের কাছে বসেছিল টুটুন আর সোনালির সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল ওর কাকার কাছে শোনা জাহাজের গল্প, যে জাহাজ যায় সাগর মহাসাগরের ওপর দিয়ে। পৃথিবীতে কত কত যে সাগর আছে, নীল তার জল আর কী তার ঢেউ—সোনালি একমনে শুনছিল।

এমন সময় টাপুর টুপুর করে নামল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা। টুটুন জানে বড় ফোঁটা পড়লে নাকি ঝমঝম বৃষ্টি হয়। সে বাইরের দাওয়া থেকে ঘরের ভেতর গেল ছুটে। জানলা বন্ধ করতে হবে ত। দাদু ত বাড়ি নেই।

টুটুন যা ভেবেছিল তাই। ঝমাঝম করে জোর বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টি আর থামে না। সারারাত ধরে চলল একটানা।

এদিকে সোনালির জলঘরের কানা ছাপিয়ে জল ভরে উঠেছিল কখন। চারদিকে তখন জলের স্রোত বইছে। গাঁয়ের লোক আতঙ্কে আছে, নদীতে বান ডাকবে না ত! নদীর কানা ছাপিয়ে উঠলেই ত ডাঙা ডুবে যাবে, তাই লোকেরা ঘরের সব জিনিস তুলছে ওপরের তাকে। কেউ বা উঠছে মাচায়।

টুটুন মাছের বাক্স তুলতে গিয়ে দেখল, সোনালি নেই। সর্বনাশ!

বৃষ্টি আর থামে না। বিকাল থেকে চলল সারা রাত। রাতের পর সারাদিন। পথঘাট জলময়। টুটুনদের ঘরের মেঝে ত বেশি উঁচু নয়, তাই সেখানেও জল থৈথৈ। দুটো গাঁ নাকি ভেসে গেছে বানের জলে।

সোনালি উপচে-পড়া জলের সঙ্গে তার ঘর থেকে কখন যে বেরিয়েছে আর কখন যে ভেসে চলেছে স্রোতের টানে টুটুন কিছুই জানে না। আর সোনালি ভাবছে এবার বোধহয় নদীতে এলুম। শুধু খারাপ লাগছে জলটা বড় বেশি ঘোলা।

নদীর মধ্যে সত্যিই যখন সে এসে পড়ল তখন তাকে আর পায় কে? কী অগাধ জল! এত রাশি রাশি জল সে জীবনে দেখেনি।

বুঝিবা দুটো তিনটে দিনরাত্তির কেটে গেছে স্রোতে গা ভাসিয়ে। তারপর হঠাৎ সে দেখল স্রোতের টান আর নেই। কোথায় এলুম? নিজেকেই জিগ্যেস করে সে। স্রোতের সঙ্গে যেতে যেতে হঠাৎ একটা খাল দিয়ে সে যে একটা খাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে তা ত সে জানে না। সেখানটা একটা দীঘির মত। ছোটখাট হ্রদও বলা যায়।

আকাশ পরিষ্কার। এখানকার জলটা বেশ স্বচ্ছ লাগছে। সোনালি এখন দম নিয়ে সাঁতার কেটেও পাড় খুঁজে পায় না। যতই ঘোরে ততই অবাক হয়ে যায় কূল-কিনারা না পেয়ে। বাস্‌রে! কী বড়! তলাতেও মাটি ছোঁওয়া যায় না। কোথায় সেই ছোট্ট বাক্সে ছিলাম আর এ কোথা এলাম। এ না হলে সাঁতার দিয়ে মজা!

শুধু টুটুনের জন্যে মনটা তার টনটন করে ওঠে। মনে পড়ে তার বুড়ো দাদুর কথা। তারা হয়ত কত কি না ভাবছে। কি করবে সে? একটা চিঠি লিখলে হয় না? লোকে ত চিঠি লিখে খবর পাঠায়। দাদুর হাতে পড়লেই হল। ঠিক টুটুন পেয়ে যাবে। নাকি, একটা টেলি করে পাঠাবে?

নতুন জল পেয়ে কয়েকটা পুঁটি হাসতে হাসতে চলে গেল তার পাশ দিয়ে।

এমনি সময় কার যেন ছায়া পড়ল জলের মধ্যে। মানুষের ছায়া না? হ্যাঁ, তাই ত। সোনালি ওপরে ভেসে উঠে দেখল।

"আরে! কাচের বাক্সের মাছ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখি যে! আহা, কী বাহার ওর রঙের!" বলে উঠল লোকটা।

সোনালি পাড়ে দাড়ানো লোকটাকে ভাল করে দেখল। মাথায় একটা কাপড় জড়ানো। হয়ত চাষী বা পাহারাওয়ালা হবেও বা।

সে এসেছিল জল খেতে। পাড় থেকে জলে নামতেই সোনালির সঙ্গে দেখা। তাকিয়ে তাকিয়ে সে বলে, "কী সুন্দর সোনালি মাছ!"

সোনালি জলের ওপর মুখ তুলে বলল, "আমার একটা কাজ করে দেবে?"

"কি কাজ?"

"একটা টেলি করে দেবে আমার বাড়িতে?"

অ্যাঁ! বলে কি? লোকটা ত অবাক। সে বলল, "তুমি ত বেশ চালাক চতুর আছ হে, মাছের পো। তা, তোমার বাড়ি কোথায়?"

"সেই যে যেখানে টুটুনরা থাকে। সে হয়ত আমার জন্যে খুব ভাবছে। আমি বড় জায়গা খুঁজছিলাম···তাই ত নদী দিয়ে এখানে এলুম। তা, এটা কি সাগর?"

"আরে না না। এটা সাগর হবে কেন? সে ত আরো অনেক দূরে। ঐ নদীতে যদি আবার পড়তে পার তাহলে স্রোতের টানে সেই নিয়ে যাবে তোমায় সাগরে।"

"তাই যাব আমি। তার পরেও আছে নাকি মহাসাগর। সেখানে আরও অঢেল জল। টুটুনের কাকার কাছেই ত শুনেছি মহাসাগরের গল্প। তার ওপর দিয়ে জাহাজ ভেসে যায়। তুমি টুটুনকে লিখে দিও, আমি বেশ ভালই আছি। সাগরে গিয়ে আবার খবর পাঠাব।

হঠাৎ সোনালির চোখে পড়ল একটা পোকা জলের মধ্যে নড়ছে। ঠিক কেঁচোর মত, আহা, তার ত খিদেও পেয়েছে। খুব খেতে ইচ্ছে করছে। সে কাছে গেল। মুখ দিতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা কালো মত বাঁকানো কি যেন। ওটা ত লোহার হুক। সে দেখল একটা কালো রঙের দুষ্টু ছেলে বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলছে। ঐ ত একটা পুঁটি ওটা খাবার বলে গিলে ফেলল। আর অমনি সুড়ুৎ করে ওপরে উঠে গেল। লোভ করে ওটা খেলেই হত আর কি! না আর নয়।

একটা গলদা চিংড়ি ওকে দেখে বলে উঠল, "কিহে, সোনার বরণ, যাচ্ছ কোথা?"

সোনালি তার দিকে ফিরে বলল, "সাগরে।"

"বাব্বা!" সরল পুঁটিরা শুনতে পেয়ে বলল, "ঐটুকু মাছ, উনি যাচ্ছেন সাগরে। বড় বাড়াবাড়ি শখ না?"

চিংড়ি ওদের ধমকে বলল, "যাক না বাপু, ওর যদি ইচ্ছে হয় যাক না—"

কাতলা বলল, "যাক, তবে সেখানে নোনাজলের স্বাদ পেলে টের পাবে বাছাধন।"

সোনালির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওদের কথাবার্তায়। সে ভাবল, কেন? দেখতে দোষ কি? ছোট জায়গায় পড়ে থাকা যদি আমার ধাতে না সয়, আমি বড় জায়গায় যেতে

পারি না? সাগর শুনেছি, অনেক অ-নে-ক দরাজ জায়গা। প্রাণ খুলে যদ্দূর ইচ্ছে সাঁতার কাটা যায় সেখানে—"

বলতে বলতে একটা স্রোতের মুখে এসে পড়ল সে। একঝাঁক পায়রা চাঁদাও যাচ্ছিল ভেসে ভেসে। তাদের সঙ্গে সোনালিও গা ভাসিয়ে দিল।

"তোমরাও কি যাচ্ছ সাগরে?" বলল সোনালি।

"হ্যাঁ গো, ওখানে আমাদের স্বজাত আছে কি না। তাদের নাম হচ্ছে পমফ্রেট।"

ওরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সাঁতার কাটতে হয় না। স্রোতের ওপর যেন জাহাজ চড়া। কী মজা!

অনেক পরে নদীর স্রোত কমে এল। কাছেই মোহানা যে।

সাগরের জলে এসে সোনালি দেখে আর স্রোতের টান নেই। কিন্তু একি? জলটা এত নোনতা কেন? আর ঐ পাথরের আড়ালে দাড়া নাড়ছে কারা যেন। ও হরি! ও ত কাঁকড়া। কী বিদঘুটেই যে দেখতে ওদের।

একবার ওপরটা দেখব নাকি? সোনালি মুখ তুলল আকাশের দিকে। সুন্দর নীল আকাশ। আশেপাশে কিচ্ছু দেখবার নেই। কোথায় পাড়, কোথায় গাছপালা? এত ফাঁকা যে কি আর দেখবে? খালি জল আর জল। বাস্‌রে! এত জলও হয়! না, ওপরে দেখবার আছে। ঐ ত ডানা মেলে সাদা সাদা সমুদ্র-গাল কেমন ভেসে ভেসে যাচ্ছে। দেখলে চোখ জুড়োয়। হ্যাঁ, এই না হলে জায়গা। এদিক ওদিক যেদিকে চাও শেষ পাবে না। দম ফুরিয়ে যায় তবু কিনারা পাই না। পাড়ের কাছে কিন্তু দেখছি উথালি পাথাল ঢেউ। তাদের গর্জন কি! বাব্‌বা! ওধারে যাব না।

এই বলে সোনালি শোঁ করে গভীর জলে ডুব সাঁতার কেটে ডাইভ করে নেমে গেল।

সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কত কি যে চোখে পড়ল ওর। আহা, টুটুনটা থাকলে যা ভাল হত! ও ত দেখেনি জলের তলার এমন বাহার। এ যেন নতুন এক রাজত্ব!

এখান থেকে চিঠি দেওয়া যায় না? তাহলে সব কথা লিখে দিতুম। দাদু কি চিঠির ঝোলা নিয়ে এদ্দূর আসে? কে জানে?

"চিঠি দেওয়া যাবে না কেন? এদিকে এস।" এই বলে ওকে ডাক দিল একটা এনিমন। তার লাল কমলা অজস্র ডালপালায় কী ফুলই সব ফুটিয়েছে সে! হেলে হেলে দুলতে দুলতে কথা বলছে সে। জায়গাটা যেন আলো হয়ে আছে তাদের রঙের জেল্লায়। সোনালির ইচ্ছে হল ভাব করে ওর সঙ্গে।

"ভাব জমাও না ওর সঙ্গে, দেখবে তখন কি হয়।" কে যেন বলে উঠল।

"কি হবে?"

"ঈশ্‌! কী বোকা!" লালচে রঙের কার্প মাছটা বলল, "যাও ওর কাছে, দফারফা হবে তোমার। তাই সাবধান করে দিচ্ছি।"

"কি করবে ও?" তবুও সোনালির প্রশ্ন।

"ও কি করবে জান? প্রথমে ওর ডালপালা দিয়ে তোমাকে বন্দী করবে। তারপরে তোমার গায়ের আঁশ থেকে মাংস অবধি সব খেয়ে হজম করবে। বুঝলে?"

"ওমা! কি সর্বনেশে জীব ওরা! কিন্তু কিন্তু—" সোনালির সন্দেহ যায় না, "আমি ত জানতুম এমন সুন্দর চেহারা যার তার অমন রাক্ষুসে স্বভাব হয় না। যারা পাজি তাদেরই ত দেখতে খারাপ বিচ্ছিরি হয়। তাই না?"

"উঁহু, এটা একদম ভুল কথা," কার্প মাছ জোর দিয়ে বলে, "তবে শোনো, দুষ্টুরাই নানান রকম বাহার দিয়ে সেজে থাকে। কতরকম সাজই না সাজে তারা। আর সব সাজই চোখ ভোলানো। আমাদের বড় চেহারা বলে কিছু করতে পারে না আমাদের। ওদের শিকার হচ্ছে, তোমার মত ছোট ছোট মাছ। বুঝলে? কিছু মনে করলে নাকি?"

"না না, তুমি ত ভাল কথাই বলেছ—ছোট হওয়াটা তাহলে মোটেই ভাল নয় দেখছি—ওকি?"

সোনালি দেখে কার্পও যেন ভয় পেয়ে সরে সরে যাচ্ছে। লালচে অত বড় চেহারা কার্প, তার ভয় পাবার কি আছে?

দেহটাকে বেঁকিয়ে নিয়ে সোনালির কানের কাছে মুখ রেখে কার্প বলল, "ঐ, ঐ দূরে চেয়ে দেখ—একটা দুধ-সাদা রুপোলি জিনিস চোখে পড়ছে?"
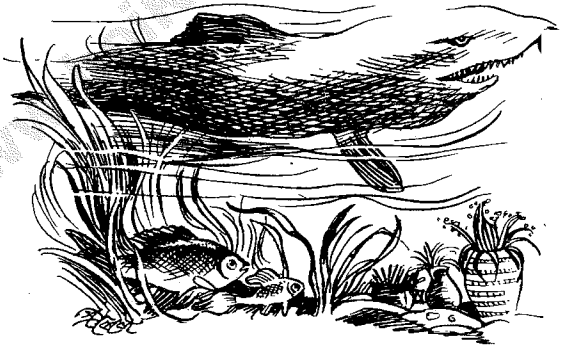
"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ত দূরে দেখতে পাচ্ছি বটে, আহা কী সুন্দর রুপোর মত বড়সড় চক্‌চকে একটা কি যেন……"

কার্প বলল, "কাছে গেলে দেখবে ওটা সাদা নয়, ওটা নীলচে। আরও আরও কাছে যাও মনে হবে কালো। রোদ লেগে ও রকম রং বদলায়!"

"কি ওটা, তা বলবে ত।"

"আরে ওটা হল আমাদের যম, বুঝলে ? যাকে বলে নীল হাঙর। ওর মুখজোড়া দুপাটি করকরে ধারালো দাঁত।"

বলতে বলতে সত্যিই একটা কালো ধূসর ছায়া যেন এগিয়ে এল ওদের মাথার ওপর।

কার্প বলল, "ঐ আসছে ও। লুকোও, শিগ্‌গির লুকোও। দেরি করো না..."

"কোথা লুকোব ?"

"ঐ যে সবুজ শ্যাওলার ঝোপ। টুপ করে ঢুকে পড় ওর ভেতরে। এইত আমিও যাচ্ছি, এসো আমার সঙ্গে..."

ভাগ্যিস ঘন শ্যাওলার ঝোপটা ছিল ঐখানে। তার মধ্যে ঢুকে ওরা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড চেহারার নীল হাঙর দানবের মত ছুটে এসেছিল ওদেরই দিকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ পরে কালো ছায়াটা সরে যেতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল সবুজ ঝোপ থেকে। ওরা শুনতে পেল হেরিং মাছের কান্না। আহা, হেরিং মা'টা কী কান্নাই কাঁদছে। তার তিন তিনটে শেয়ানা বাচ্চাকে এক গালে গিলে নিয়ে চলে গেছে ওই দত্যিটা।

সোনালি ভাবে, বাবা এখানেও এত ভয় ? সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে কি করে এখানকার জীবেরা ? না, আর না, এখানে। আমি মোহানার দিকেই চলে যাব। যাব সেই নদীর মধ্যে। জোয়ার হলে যখন সাগরের জল নিয়ে নদী ছুটবে ডাঙার দিকে, আমিও যাব সেই সঙ্গে।

আবার সেই স্বচ্ছ দীঘিতে এসে পড়েছে সোনালি।

এখানে সূর্যিদেব তাঁর সাদা রোদের আলো দরাজ হাতে ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই জলের গভীরে পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়।

পুঁটি মাছের দল ওকে দেখে খুব খুশি। চিংড়ি বলল, "কিগো, সাগর কেমন লাগল ?"

"ভাল না।"

কাৎলা বলল, "কেমন বলেছিলাম না, সাগরে তোমার বাপু পোষাবে না। ও বড় বদখৎ জায়গা।"

একদিন বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুর। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। কে যেন কি বলল না ? গলাটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হল সোনালির।

টুটুনের দাদু চিঠি বিলি করে ফিরছিল দূরের গাঁ থেকে। ঐ দীঘির পাড় দিয়েই ত পথ। কাঁধে তার চিঠির থলি। মুখটা ঘামে ভিজে গেছে। ঐ টলটলে জল দেখে গলাটা তার শুকিয়ে গেল। পাড় থেকে নামল সে জলে। এক আঁচলা ঠাণ্ডা জল মুখে দিয়েছে কি দেয়নি তার চোখ পড়ল সোনালির ওপর।

"আরে একে ত আমাদের সেই সোনালির মত দেখতে না? টুটুনের জন্যে নিয়ে যাব নাকি একে?"

সোনালিও থমকে দাঁড়িয়েছে। ধরা দেবে বলেই বুঝি।

বুড়ো অনেক কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে আঁচলা করে তুললো সোনালিকে। তারপর একটা কলসীর মধ্যে ভরে কাঁধে তুলে বাড়ি নিয়ে এল।

টুটুন ওকে দেখে আহ্লাদে আটখানা।

"দাদু, এ ত আমাদের সেই সোনালি গো! আবার পেলুম তোকে। কী মজা! হ্যাঁরে কোথা ছিলি? আমরা ভাবলুম আর তোকে পাব না। বানের জলে কোথায় হয়ত ভেসে ভেসে চলে গেছিস।"

"গেছলুমই ত," বলল সোনালি, "কতদূর গেলাম—"

"কত দূরে রে?"

"সেই সাগরে।"

"অ্যাঁ, সাগরে? কোন্ সাগর? সাগর, না মহাসাগর? সাগর কেমন লাগল রে?"

সোনালি বলল, "তোমায় যে চিঠি পাঠালুম, পাওনি?"

"না ত!"

"কত যে দেখে এলুম টুটুন, তা আর কি বলব।"

"বলনা, বলনা! আমি ত সাগর দেখিনি।"

তারপর সোনালি তার বেড়ানোর গল্প করতে লাগল। নদীর কথা। সাগরের কথা। কত মজার কথা কত ভয়ের কথা। শুনতে শুনতে টুটুনের চোখের পাতা ভারি হয়ে এল, তবু সে গল্প বুঝি আর ফুরোয় না—

আমার গল্প কিন্তু ফুরোল এইখানেই।

॥ উপন্যাস ॥

ডঃ বুচার ফোন পেয়ে গুম হয়ে গেলেন। শুধু মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, আবার!

ফোনের ও-প্রান্তে বোনের কান্না কান্না গলা।—বল আমি কী করি!

বুচার খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। কাল রাতে শহরের মাথায় পাহার শীর্ষে কে বা কারা ঘণ্টাধ্বনি করে গেছে আবার। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই পরিচারক টিকাকি খবরটা দিয়েছিল। এই খবরটা পাবার পর খুবই উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন বুচার। সাহস করে বোনের কাছে ফোনে খবরটাও নিতে পারছিলেন না। যদি সত্যি হয়ে যায়!

ফোন পেয়ে বুচার বুঝলেন, যা হবার হয়ে গেছে। তাহলে ভাগ্নি ম্যাঙ্গেলা যা ঠাট্টা

করে বলে মিছে কথা নয়। ছোট্ট একটা মেয়ে। তার কি সাহস! একটা ক্যাঙারুর বাচ্চাকে নিয়ে বাবাকে খুঁজতে বের হওয়া! পাগল ছাড়া কার আর এমন সাহস হতে পারে! প্রথমবার বিষয়টাতে কাকতালীয় কিছু ভেবেছিলেন। দুদিন ম্যাণ্ডেলা নিখোঁজ। পুলিশ থেকে পৌর প্রশাসক কেউ বাদ যায়নি, খবরটা সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। পাহাড়শীর্ষে কারা ঘণ্টাধ্বনি করে গেছে। কেউ কেউ জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল শিশুরা বলেছিল, ঐ ত যায়। আকাশে দু টুকরো সাদা রুমাল ভেসে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেছিল, রুমালের মেঘ। কোন কোন শিশু স্পষ্ট নাকি দেখেছে, এক ছোট্ট বালিকা ভেসে যাচ্ছে আকাশের নিচ দিয়ে। সঙ্গে ছোট্ট একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। গলায় রুপোর ঘণ্টা দুলছে।

এ শহরে একমাত্র ম্যাণ্ডেলারই একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা আছে। তার বাবা জিলঙ থেকে জাহাজে ফেরার সময় ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল। একটা বিষয়ে মিলে গেলেও অন্য বিষয়টা, অর্থাৎ ম্যাণ্ডেলা ভেসে যায় বাতাসে—এ কেমন কথা! তবু যাই হোক, এ-সব আজগুবি কথা নিয়ে পুলিশ কিংবা বুদ্ধিমান লোকেরা বসে থাকে না। সারা শহর তোলপাড়। না কোন খোঁজ নেই। তারপর এক সকালে ফোন, হ্যাঁ দাদা কং বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

বিষয়টা খুবই ভুতুড়ে। টিকাকি মাউরী উপজাতির মানুষ। তাদের মধ্যে অপদেবতা তাড়াবার লোককে ঝিকাকু বলে। সে একজন ঝিকাকু নিয়ে এসেছিল। পুলিশ বন-পাহাড়-বালিয়াড়ি তোলপাড় করেও যখন পায়নি, তখন ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসার পর পুলিশ একজন মনস্তত্ত্ববিদকে পাঠিয়েছিল। এইসব নিয়ে যখন ঝামেলা চলছে, তখন ম্যাণ্ডেলাকে তার মামা বুচার প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন, সে গেছিল, লায়ন রকে। কারণ ম্যাণ্ডেলার ধারণা, জাহাজডুবির পর, বাবা সেখানেই আটকা পড়ে আছে। আসতে পারছে না।

লায়ন রক্ সমুদ্রের গভীরে একটা পাহাড়। শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূর হবে। শীতকালে ওখানে এই শহর থেকে ছোট্ট ছোট্ট মোটর-বোটে পিকনিক করতে যায় মানুষেরা। সে নাকি সেখানেই গিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি বুচার আরও গুরুতর অন্যায় ভেবেছিলেন, কারণ সময় কালটা বড় খারাপ। সমুদ্রে ঝড় ঝঞ্ঝা লেগে আছে। এটা গ্রীষ্মকাল। তালগাছ প্রমাণ সব ঢেউ আকাশে হাত বাড়িয়ে শিশুদের মত খেলা করে বেড়াচ্ছে। মোটর-বোট নিয়ে যাওয়া যায় না। ম্যাণ্ডেলা আর এমন সব নিদর্শনের কথা বলেছে, যে সে সত্যি সেখানে গিয়েছিল— তার কোন সংশয় ছিল না। নানা রকম প্রশ্ন করে যেটা শেষ পর্যন্ত জানা গেছে, সেটি হচ্ছে, এক ভারতীয় জাদুকর এসেছিল এ-শহরে। কেউ বলছে তারই কীর্তি। ছোট্ট ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে সে ভীষণ ভাব করে গেছে। জাদুকরেরা সব পারে।

বুচার তখন বোনকে শুধু সান্ত্বনার স্বরে বললেন, কি করবে বল! যখন জাদুকরকে নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করছিলে আমাকে ত ডাকনি। এখন বোঝ। তবে দেখি, আমার সঙ্গে এখানকার হাইকমিশনের অফিসের একজন ভারত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ আছে। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, তার কাছ থেকে খবর নিই। সে কি বলে! আর ম্যাণ্ডেলা আবার এমনভাবে ভাগবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিকেলেই ফোনে বুচার সেই ভারত বিশেষজ্ঞ মানুষটিকে আমন্ত্রণ জানালেন। রাতে তিনি আসবেন। টিকাকি এইসব সময়ে তার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকে।

কারণ তার রান্নাবান্না নিখুঁত। তবে একটা বিষয়ে সে খুব একগুঁয়ে। কোন বিশেষ মানুষজন যখন আমন্ত্রিত হয়ে বুচারের বাড়িতে আসে তখন সে বয় বাবুর্চির পোশাক পরে না। সে তার উপজাতির পোশাক পরে। যেমন মাথায় থাকে পাখির পালক। গলায় লাল নীল পাথরের মালা থাকে। হাঁটু পর্যন্ত খাঁকি প্যান্ট, স্যাণ্ডো গেঞ্জি এবং কনুই থেকে হাতের পাঞ্জা পর্যন্ত যে কলকা আঁকা থাকে তা আরও রঙ-বেরঙ করে নেয়। উপজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই সে এটা করে থাকে।

সুতরাং বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকটি আসার আগে সে ঘরে ঢুকে, প্রথমেই পেটি খুলে তার উপজাতির পোশাক বের করে পরে নিল। এবং রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

বুচার গোলাপ বাগানে পায়চারি করছেন। আর ঘড়ি দেখছেন। ম্যাণ্ডেলার মা লুসি এসে বসে আছে। অবশ্য দুজন যখন মুখোমুখি বসে সমস্যার জটিলতা নিয়ে কথাবার্তা বলবে তখন সে অন্যঘর থেকে শুনবে। প্রথমে বুচারের ইচ্ছে ছিল না, লুসি আসে। কারণ তার বোনটা কথায় কথায় বড় প্যাক প্যাক করে কাঁদে। হয়ত হিমালয়ের সৌন্দর্য নিয়ে কথা হচ্ছে, লুসি তার সৌন্দর্যের কথা শুনে কেঁদে ফেলল। কখন কাঁদতে হয় বোনটা জানে না। সে-জন্যই সে তার বোনকে নানারকম জেরা করার সময় কাছে থাকতে দিতে রাজী না। আসতেই দিতে চায়নি, পরে ভেবেছে শত হলেও মা। ছোট্ট পাখির মতো মেয়েটাকে যদি জাদুকর সম্মোহন করে নিয়ে যায় কিংবা অদৃশ্য করে দেয়, এবং আবার যখন খুশি দিয়ে যায় তখন আর বেচারাকে না করে কি করে।

সামনে সিম্যান মিশান। মিশনের পাশেই ডুনেদিন পাহাড়। পাহাড় কেটে পথ। দু-পাশে আপেলের বাগান। নিচ থেকে এখন সবই আবছা। কেবল, পাহাড়ের মাথার ঘরবাড়িগুলিতে আলো জ্বলে উঠেছে। এবং ওপরে দুটো একটা গাড়ির হেড-লাইট দেখা যাচ্ছে। একটাও এদিকটায় ঘুরছে না। ঘুরলেই বুঝতে পারবেন বুচার, ভারত বিশেষজ্ঞ জিনস্ সাহেবের গাড়ি। এবং একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। কথার ঠিক-ঠাক নেই। ছটা বেজে গেছে। বেশ অন্ধকার নেমে আসছে সমুদ্রে। জাহাজের আলোগুলো পরীদের স্বপ্নরাজ্য—কারণ সেখানে সমুদ্রের নীল জলরাশি খেলা করে বেড়ায়। একজন

ভারত বিশেষজ্ঞ কথা ঠিক রাখবে না সেটা খুব বেশি দোষের না। ভারতের মানুষজন এ বিষয়ে নাকি খুব ধার্মিক।

বুচার দেখলেন পাইনের বনভূমি থেকে একটা আলো উঠে আসছে। তাঁর বাড়িতে আসার ওটাও একটা পথ। বাঁকের মুখে গাড়িটা হারিয়ে গেল। এতক্ষণ যে বনভূমির ওপরে আলোর ঝলকানি ছিল, তা নেই। এই আলো ফুটে উঠলেই, বনভূমিটাকে একটা মায়াবী দেশ মনে হয়। তখন মনেই হয় না, পৃথিবীতে এ-সব থাকে। গভীর গহন পাইনের সবুজ পাতা ভেদ করে আলো, কেমন এক রূপকথার মতো জগত। ম্যাণ্ডেলাদের বাড়ি তারই উৎরাইয়ে। এমন একটা রূপকথার দেশ পাশে থাকলে ম্যাণ্ডেলা বাতাসে ভেসে যেতেও পারে। প্রায় সাঁতার কেটে, কিংবা এত হালকা হয়ে যায়, হাত দুটো নাড়লেই আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু যেটা সব চেয়ে বিস্ময়, দরজা বন্ধ থাকে। অবশ্য গ্রীষ্মকাল বলে, জানালা খোলা থাকে। গ্রীলের ছোট ফাঁক দিয়ে মেয়েটা গলে যায় তাও ভাবলে অবাক লাগে। বুচার এমন সব ভৌতিক বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে যখন বাগানে অপেক্ষা করছিলেন, তখনই দেখা গেল,

জিনস্‌ের গাড়ি বাগানের গেটে। এবং মনে হল মাথার মধ্যে একটা বিষয় ঢুকে গেলে পরে তা যতই আজগুবি হোক কেমন সত্য মনে হয়। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিলেন। অস্বাভাবিক চিন্তা মাথাটাকে ভার করে রেখেছে।

জিনস্‌ নেমেই করমর্দন করলেন। অতিরিক্ত ঝাঁকুনির ফলে বুচার হাতটা তেমন জোরে চেপে ধরতে পারছিলেন না। জিনস্‌ লক্ষ্য করছেন সেটা। যেতে যেতে বললেন, ডঃ বুচারের কি শরীরটা ভাল যাচ্ছে না?

ভাল না যাবারই কথা। জিনস্‌ সব খবরই রাখে। কাগজগুলিত বসে থাকে না। অনাহারী বেড়ালের মতো পাঁচিলে ঘুরে বেড়ায়। তারপর যা হয়ে থাকে—হ্যাঁ শোনা গেছে শহরশীর্ষে আকাশের মাথায় অলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি। আরও খবর, ম্যাণ্ডেলা বলে একটি মেয়ে সেই রাজ্যেই নিখোঁজ। সুতরাং জিনস্‌ সব ঘটনা না জানলেও ভাষা ভাষা অনেকটা জানে।

ম্যাঙেলা বুচারের ভাগ্নি। বুচার নিজে আবার অকৃতদার। ভগ্নিপতি নিখোঁজ হবার পর ম্যাঙেলার অভিভাবক। শরীর খারাপ থাকারই কথা! তবে জিনস্ বুঝতে পারছেন না, হঠাৎ তাকে রাতে যেতে বলল কেন আজ! মানুষের যখন শোকতাপ থাকে তখন যেতে বলাটা কেমন বেমানান।

জিনস্ এই আমন্ত্রণের জন্য সামান্য কুণ্ঠিতও বটে।

ঘরে ঢুকে বোনকে বুচার ডেকে বললেন, লুসি এদিকে এস।

লুসি পরে এসেছে লম্বা কালো রঙের গাউন। খুব সাদামাটা পোশাক। চোখে অনিদ্রার ছায়া। এই প্রথম লুসির সঙ্গে আলাপ জিনসের। ভারি সুন্দর লুসি। ম্যাঙেলা না জানি আরও কত সুন্দর হয়।

জিনস্ বসতে বসতে লুসিকে বললেন, সবই বুচার বলেছেন। একবার যখন ফিরে এসেছে, আবার ফিরে আসবে। ভাববেন না। লুসির ঠোঁট বেঁকে গেল। কোনরকমে কান্না সামলাচ্ছে। বুচার এ-সময় খুব বেশি একটা ক্ষিপ্ত হলেন না। এ কথায় কান্না গলা বেয়ে উঠতেই পারে। তবু তিনি বললেন, তুমি ও-ঘরে যাও লুসি। তারপর ঠাণ্ডা পানীয় ট্রেতে নিয়ে এল টিকাকি, জিনস্ কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। একজন সভ্য মানুষের পাচক এমন অসভ্য পোশাক পরে আছে দেখে মুখটা গোমড়া করে ফেললেন। টিকাকি চলে গেলে বললেন, লোকটা কি ইণ্ডিয়ান!

বুচার যখন গভীর চিন্তাভাবনায় বুঁদ হয়ে যান তখন দুহাত জড়ো করে বুকের কাছে রাখেন। ইণ্ডিয়ান কথাটাতে তাঁর মনোসংযোগ ক্ষুণ্ণ হল। তিনি চেয়ারে ভড় দিয়ে বসলেন দু-হাতের ওপর। বললেন, না না ইণ্ডিয়ান নয়। মাউরি উপজাতির মানুষ। ইণ্ডিয়ানরা কি এরকম দেখতে?

—ঐ একইরকম আর কি।

জিনস্ বেশ রোগা মানুষ। খিটখিটে মেজাজের। হাতের রগফগ ভেসে আছে। কালো বাটারফ্লাই গোঁফের মত গলায় টাই বাঁধা। ডিনার স্যুট পরনে। তার আগে সামান্য কোল-ড্রিংক মন্দ না। তাঁর এই হালে পরিচিত বন্ধুটির কাছে আজই প্রথম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসা! অবশ্য একবার মাঝে গিয়ে বুচার বলেছিলেন, আমন্ত্রণ করলে তিনি আসবেন কি না! ভারত সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ বুচারের।

বুচারই বললেন, ভারতে আপনি কতদিন ছিলেন?

জিনস্ বললেন, মাস পাঁচেক।

পাঁচ মাসে ভারত বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় কিনা সংশয় হতেই বুচার বললেন, ভারত তো শুনেছি বিরাট দেশ।

গ্লাসটি টেবিলে রেখে হাই তুললেন জিনস্।—তা বিরাট।

ভারতের কোথায় কোথায় গেছেন!

কাশী বৃন্দাবন গয়া মথুরা।

বুচার এ-সব নাম জানে না। শোনেনি। কলকাত্তা, বোম্বাই, দিল্লি, এই মোট তিনটে জায়গার নাম তার জানা আছে। ভারত সম্পর্কে একটা বই এনে সে পড়েছিল। ইংরাজী কবিতা সেগুলো। গিবেল লরিয়েট কবি। ট্যাগোর এবং গান্ধী নেহরু এই পর্যন্ত। তারপর অধীত বিদ্যার দৌড় খুবই সামান্য। একটা বইয়ে কিছু সাধু-সন্ন্যাসীর খবরও পড়েছে। কিন্তু যেটা তার জানা দরকার, তা হচ্ছে ভারতীয়রা সম্মোহন জানে কিনা? ভারতীয় জাদুকররা কোন ছোট্ট মেয়েকে সত্যি পাখি বানিয়ে দিতে পারে কিনা। এমন কোন ঘটনা জিনস্ স্বচক্ষে দেখে থাকলে, ভাই বোন মিলে দু'জনেই তাহলে কি করা যায় ভাবতে পারে।

বুচার উঠে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলো খুলে দিলেন। এটাও টিকাকির কাজ। বাইরের ধূলোবালি আসবে ভয়ে সব সময় জানালা বন্ধ করে রাখে। তাকে বার বার বলেও বোঝাতে পারে নি, মানুষজন এলে জানালাগুলি খুলে দিতে হয়। জরুরী বিষয় নিয়ে মানুষ আলোচনার সময় প্রকৃতির গাছপালা দেখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। এ-ছাড়া বুচার আগেই শুনেছে জিনস্ খিটখিটে মেজাজের মানুষ। প্রকৃতির গাছপালা সহায়কের কাজ করবে মূর্খটা যদি তার এক বিন্দু বুঝতে পারে! তারপর ফিরে এসে বললেন, এটা কি সম্ভব জিনস্?

কি সম্ভব?

এই ধরুন আপনি একটা ফুল-ফল প্রজাপতি আঁকা লম্বা আলখাল্লা পরে আছেন?

ওরকম পোশাক আমি পরি না।

ঠিক আছে পরেন না। অন্য কেউ যদি পরে?

পরলে ক্ষতিটা কি?

ক্ষতি না! কিন্তু সে যদি আলখাল্লা থেকে প্রজাপতিটা খুটে নিয়ে বলে, এই নাও প্রজাপতি ধরে দিলাম!

তা বললে ক্ষতির কি আছে?

আর তখন যদি দেখা যায়, সত্যি ওটা প্রজাপতি। উড়ে গিয়ে সিমোগা ফুলে বসছে।

তা বসতেই পারে। প্রজাপতি ফুলে বসবে না ত আমার মাথায় বসবে!

বুচার দেখলেন, একেবারে মোমের মত পালিশ করা টাকে জিনস্ হাত বুলাচ্ছে।

বুচার বললেন, আমার কথায় কি রাগ করছেন মিঃ জিনস্!

না রাগ করছি না। আমাদের সবার বয়স হয়েছে. এখন যদি এ-সব কথা বলি, ধরুন, আমি এসেছি আপনার বাড়িতে, এখন আমি জানি আপনার সঙ্গে আমার আলাপ বেশি দিনের নয়, আপনি ইণ্ডিয়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তা না, আপনি পড়েছেন প্রজাপতি নিয়ে। মেজাজ একটু খাট্টা হয়েই যেতে পারে। মনে কিছু করবেন না!

বুচার দেখলেন, লুসি একবার ডাক দিয়ে গেল! কারণ জিনস্ খুব চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন। লুসির সব সময় ভয়, তার বড় দুঃসময় যাচ্ছে। তাকে নিয়ে কোন জটিলতার যেন সৃষ্টি না হয়। দাদা কি না কি বলেছে! জিনসের কথাবার্তা খ্যাসখ্যাসে। অস্পষ্ট। আর মাঝে মাঝেই হাম করে একটা ঢেকুর তোলেন।

বুচার ডাক্তার মানুষ। সে জিনস্কে মাঝে মাঝে হাম করে ঢেকুর তুলতে দেখে বুঝেছে অম্বলের রুগী। সে কিছু না বলে একটা মোক্ষম পুরিয়া সামনে রেখে দিয়ে বলল, খেয়ে ফেলুন।

জিনস্ হেসে দিল।—আপনি দেখি ঠিক ধরেছেন। ইণ্ডিয়া থেকে ইমপোর্ট করা। ধন্যবাদ।

ওষুধটা খাওয়ার পর মেজাজ সুপ্রসন্ন হয়ে গেল। জিনস্ বেশ স্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না। আমি জানি, বাড়ির একটা ছোট মেয়ে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে গেলে কি লাগে! আমার মেয়েকেও অফিস থেকে বাড়ি গিয়ে না দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়। কবে যেন অদৃশ্য হল!

গত রাতে।

এর আগেও তো দু' তিন দিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল।

বুচার আবার আগের কথায় ফিরে এলেন। তাহলে যা ছবি থাকে, তা জাদুকর জ্যান্ত করে দিতে পারে।

পারে।

বেড়ালকে বাঘও বানিয়ে দিতে পারে?

কোথাকার জাদুকর?

ইণ্ডিয়ার।

ইণ্ডিয়ার? বলে হাই তুলল। বলে যান।

এই ওখানে গত শীতে, মানে পাইন-ফেস্টিভ্যালের সময়, বুঝলেন একজন জাদুকর হাজির।

কাগজে পাইন ফেস্টিভ্যালের একটা মিছিলের ছবি বের হয়েছিল।

ঠিক ধরেছেন। বুচার সোজা হয়ে বসলেন। চশমার কাচ মুছে পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন। আসলে কিন্তু লোকটা পাগল।

পাগল আবার জাদুকর হয় কি করে?

কিন্তু আমি লোকটার চিকিৎসা করেছি জিনস্। সে প্রথমে আমার সঙ্গেই এসেছিল। শরীরে সব বিজবিজে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় পাগল। জাহাজে কাজ করলে ও-সব রোগ হয়। তারপর কিছু সূঁই ফুঁড়ে দিতেই ভাল। ঘা সব ঠিক।

জিনস্ বললেন, এটাও এক জাদু!

তার মানে ?

সাধারণের কাছে আপনার এই বিদ্যাবুদ্ধি জাদু।

তার মানে এমন সব উচ্চমার্গের বিষয় আছে যা আমরা বুঝি না! বুচার নিরাশ হল। কারণ জিনস্ তার কথা একদম শেষ করতে দিচ্ছে না। তবু এই মাত্র অম্বলের চিকিৎসা করায় জিনস্ তার আর দশটা রুগীর মতো একজন রুগী। সে প্রথম থেকেই কথা বলল, আগে সব শুনুন। মাঝখানে কথা বলবেন না জিনস্।

জিনসের মনে হল এই মাত্র সে অম্বলের ওষুধ খেয়েছে। যতই সে ভারত বিশেষজ্ঞ হোক, সে এখন একজন রুগী। সে খুবই মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বলল, আপনি বলুন। কথা শেষ না হলে আমি কিছু বলছি না।

বুচার বললেন, কফি দেবে আপনাকে ?

জিনস্ শুনে যাচ্ছে মত তাকিয়ে হাসলেন।

বুচারের মনে হল, ঠাণ্ডা কফি হতে পারে। সে ফের বলল, টিকাকি কফি দাও।

টিকাকি কফি সার্ভ করে গেল।

জিনস্ বসে আছে।

বুচার বললেন, যা শুনতে পাচ্ছি ম্যাণ্ডেলা নাকি সেটা পেয়েছে জাদুকরের কাছ থেকে। ওটা পরলেই সে হালকা হয়ে যায়। যেমন খুশি উড়তে পারে। সেটা কি কখনও সম্ভব!

জিনসের আবার হাই উঠছে। কোন জবাব দিচ্ছেন না। সামান্য গোঁফ আছে নাকের নিচে। তার লোম বসে বসে টানছেন।

বুচার আবার বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি কিছু বলতে পারছেন না ?

জিনসের তেমনি হাই উঠছে।

বুচার সবেগে শেষ কফিটুকু খেয়ে ফেললেন। জিনসের কফি পড়েই আছে। নাকের নিচে গোঁফ, গোঁফ কাঁচা পাকা হলে সুড়সুড়ি দেয়। জিনস্ সুড়সুড়ি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। তার কথার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না। বুচার বাধ্য হয়ে বললেন, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না ?

জিনস্ এবার মাথার পেছনে হাত দিয়ে বলল, আপনার কথা শেষ হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না ?

শেষ হয়েছে বলুন।

পাগল কখনও জাদুকর হয় না। আর আপনি শুনুন, আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। আপনার কথার আমি কোন প্রতিবাদ করছি না। এটা আমার ধারণা পাগল কখনও জাদুকর হয় না। যেমন ধরুন ভারতবর্ষে এক কালের ধারণা ছিল সতীলক্ষ্মী হলে স্বামীর মৃত্যু হয় না। মৃত্যু হলেও রেখে দেওয়া যেত। তারা হাড়

কঙ্কাল ধুয়ে-পাকলে তুলে রাখত। শেষে যোগ করতে বসত। যোগ বুঝতে পারছেন, এতে নাভির ক্রিয়াকার্য আছে। শ্বাস টেনে নেওয়া, আবার ছেড়ে দেওয়া। ঠিক এই ভাবে বসতে হয়। বলেই সে লাফিয়ে টেবিলটার উপর চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঠাণ্ডা কফি জিনসে্র উল্টে পড়ে গেছে। তবু তিনি যখন বিশেষজ্ঞ, তাঁকে অন্যদিকে মন দিলে হয় না। জিনস্ পদ্মাসন হয়ে বসে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকলেন এবং ফেলতে থাকলেন। বুচারের দিকে তাঁকালেন পিটপিট করে। তারপর বললেন, এ-ভাবে শরীর হালকা হয়ে যায়। আর হালকা হয়ে গেলে বাতাসে উড়ে যাওয়া খুবই সহজ।

বুচার বড় তাজ্জব। লুসি আর একবার ছুটে এসেছিল, মেঝের সুন্দর কার্পেটটি নষ্ট হয়েছে কফি পড়ে। লুসির কান্না পাচ্ছিল। এমন সুন্দর কার্পেটটা! ম্যাণ্ডেলাকে নিয়ে দাদাকে যে কত লোকের কাছে হেনস্থা হতে হচ্ছে। অন্য সময় হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হত। টিকাকি এ-কাজে বড়ই পারঙ্গম। সে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কখন সেই দৈববাণী হবে বুচারের। কিন্তু তারপর নিজেই হতভম্ব। যা জানতে চাইছেন, তার কোন হদিস নেই। যোগ, নরকঙ্কাল তারপর টেবিলের উপর উঠে বসা সবটাই বিভ্রান্তিকর।

লুসি নিজের ঘরে গিয়ে বসল। এর আগে এসেছিল পুলিশের তরফ থেকে একজন মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ হাসিমারা। সেও কত ভাবে যে দাদাকে ধমকে গেছে। দাদা তার গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। নামী ডাক্তার। ম্যাণ্ডেলা আর কত যে ভোগাবে। সে যতবারই যাচ্ছে, দাদা ইশারায় তাকে ঘরে গিয়ে বসতে বলছে। কারণ সে জানে দাদার ধারণা, জিনসে্র প্রতিটি আচরণে সে একবার করে কাঁদবে। একজন বিভ্রাট করছে, দুজন হলে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে উঠবে। সুতরাং সে আর হেনস্থা বাড়াতে চায় না। চুপচাপ, পাহাড়ের নিচের বাড়িঘর দেখতে দেখতে ভাবল, ম্যাণ্ডেলা খুলে কিছু বলছে না কেন! কেবল কিছু বললেই বলে, বাবাকে খুঁজতে যাই। কিন্তু তুমি যাও বাবাকে খুঁজতে, আর আমরা ভেবে মরি। অমন খোঁজায় আমার দরকার নেই।

বুচার আর না পেরে বললেন, দেখুন জিনস্ আমার অপরাধ হলে ক্ষমা করবেন। আপনি একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ। আপনার কাছে গম্ভীর আচরণ আশা করছি। জিনস্ খুবই কাহিল হয়ে গেছে বুচারের কথায়। কি ভেবে জিনস্ বললেন, এবারে আপনার আর কি জানার আছে বলুন!

কি বলবেন বুচার। জটিল বিষয়কে সহজ করার জন্য জিনস্‌কে ডেকে এনেছিলেন, এখন তিনিই বিষয়টিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছেন। এরপর কি প্রশ্ন করতে হবে বুচার তাও ভুলে গেছেন।

বলুন আপনি কি জানতে চান?

নরকঙ্কাল! নরকঙ্কাল কি যেন বলছিলেন।

হ্যাঁ। ও দেশে যমরাজ বলে একজন দেবতা আছে। ও-দেশে সবই দেবতা। গাছপালাপাখি পাহাড় সব দেবতা। যত মানুষ তত দেবতা। সাপ দেখেছেন? সেও দেবতা। মনসা লক্ষীন্দর বেহুলা সব দেবতা!

এত দেবতা!

হ্যাঁ বুচার, এত দেবতা। এত দেবতা যখন বুঝতেই পারছেন, সব মানুষই সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গ পায়। ঈশ্বরের সঙ্গ পেলে কি না হয়! আপনি বলুন আমাদের যীশু কত মিরাকল ঘটিয়েছেন। এক দেবতা এত পারে, তেত্রিশ কোটি দেবতা, একটা মেয়েকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না সে হয়!

বুচার মরিয়া হয়ে বলল, আপনি স্বচক্ষে এমন কোন ঘটনা দেখেছেন?

দেখেছি। এই যেমন ধরুন, একটা মানুষ আস্ত একটা সাপ গিলে ফেলল।

তখনই ও-ঘরে প্রচণ্ড বিলাপ।

কে কাঁদছে?

কাঁদতে দিন। মনে হচ্ছে লুসি।

কাঁদছে কেন?

মেয়ের কথা মনে হচ্ছে বোধ হয়। আসলে মানুষ সাপ গিলে ফেলতে পারে যে দেশে, সে দেশের জাদুকর ম্যাণ্ডেলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বেশি কি! লুসির কান্নায় যথার্থতা খুঁজে বের করতে পারায় বুচার আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলেন।—আপনি সত্যি দেখেছেন।

আমি দেখব কেন? ও-দেশে গেলে সবাই দেখতে পায়।

এবার বুচার লুসিকে ডেকে পাঠালেন। লুসি এই মাত্র যে চোখের জল মুছে এসেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। জিনস্ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছেন। তিনি ঘড়ি দেখছিলেন। টিকাকি একটা নীল আলো জেলে দিয়ে গেল সাদা আলোটা আর নেই। ঘরে কেমন সব রহস্যময় মানুষের ছবি এখন। কেউ কথা বলছে না। লুসি মাথা নিচু করে বসে আছে।

বুচারই প্রথম কথা বললেন, শোন, তুমি আবার কাঁদবে না। আমার যা মনে হচ্ছে ম্যাণ্ডেলাকে জাদুকর এমন কিছু দিয়ে গেছে যার দৌলতে সে সত্যি পাখি হয়ে যেতে পারে। কিংবা হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু শিশুরা সেটা দেখতে পায়। সুতরাং আমাদের কাজ হবে, ম্যাণ্ডেলা ফিরে এলে তার কাছে প্রশ্ন করে জানা, তাকে জাদুকর কি দিয়ে গেছে!

লুসি অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল। খুব শক্তভাবে। বলল, জিজ্ঞেস করেছি। কিছু বলে না। ওয়াকা বলল, ওটা বললে জাদুকরের মন্ত্রগুণ নাকি নষ্ট হয়ে যাবে।

জিন স্‌বললেন, ওয়াকাটা কে ?

ওয়াকা আমাদের ভেড়ার পাল চড়ায়, আপেল বাগান দেখে। মোষগুলোকে পাহাড়ের উপত্যকা থেকে নিয়ে আসে।

বুচার বললেন, চলুন আমাদের খাবার রেডি।

নীল আলো জ্বেলে দেওয়ার অর্থ জিনস্‌ ধরতে পারলেন। এ-বাড়িতে কথা কম বলতে হয়। বুচার সকালে তিনঘণ্টা আর বিকেলে ঘণ্টা দুই রুগীপত্তর দেখেন। বাকি সময়টা তিনি বাগানে কাজ করেন। সারা বাগান সব ঋতুতে সাদা লাল হলুদ গোলাপে ছেয়ে থাকে। ফলে সারা বাড়িটায় আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ। সামনেই পিচের রাস্তা। তারপর নিচে পাইন বন শুরু হয়েছে। বনটা ম্যাণ্ডেলাদের বাড়ির নিচ দিয়ে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে নেমে গেছে। গাছগুলি ঠিক পাইন নয়। এ-দেশে এদের কৌরিপাইন বলে। আশ্চর্য সরল বৃক্ষ। সব সময় আকাশ ছুঁতে চায়। যত গাছগুলো বুচার দেখেন তত তার এমন মনে হয়। মনে হয় এক এক রাতে, যখন ডাক্তারী বই জার্নাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে তন্দ্রার মতো আসে তখন দেখতে পান পাইনগাছগুলি সত্যি যেন আকাশ ছুঁয়ে দিয়েছে। এই বাড়িতে এমন তন্দ্রার যাতে বিঘ্ন না হয়, সে-জন্য কথা কম বলা দরকার। খাবার সময় হলে এ-বাড়িতে নীল আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। খাওয়া শেষ হলে সবুজ আলো। ঘুমিয়ে পড়ার সংকেত। আগে এ-সব দিকে বুচারেরই নজর থাকত। কিন্তু দু মাস যাবৎ সংসারে জাদুকরের উপদ্রব দেখা দেওয়ায় সব কাজ টিকাকি রুটিনমাফিক করে থাকে। কাজে তার একদম কোন ভুলচুক হয় না।

খেতে বসে বুচার বললেন,—জিনস্‌ আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের প্রিয় বেলা-ভূমিতে জাদুকরের একটা পাথরের মূর্তি বসানো হয়েছে। শহরের ছেলেপিলেরা ফাঁক পেলেই সেখানে চলে যায়।

জিনস ভেড়ার বাচ্চার একটা আস্ত রোস্ট নিয়ে বসেছেন। গ্রিন পিজ, সামান্য স্যালাড এবং ঝিনুকের স্যুপ। তিনি স্যুপ খেতে গিয়ে বললেন, হজমি বড়ি দেবেন একটা। রান্না খুবই গুরুপাক মনে হচ্ছে।

বুচার বললেন, তা না হয় দেব। কিন্তু আপনি বলতে পারেন, ভারতীয় জাদুকর এ-দেশ ছেড়ে জাহাজে চলে না যেতেই কেন একজন জাদুকরের মূর্তি বেলাভূমিতে পড়েছিল ? আর আশ্চর্য আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, সেই পাগলা জাদুকরের মতো হুবহু দেখতে। সে যেমন আলখাল্লা পরত তেমনি লতা পাতা ফুল ফল প্রজাপতি মিনা করা পোশাক। সে পালকের টুপি পরত। মূর্তিটার পালকের টুপি দেখতে হুবহু এক। নাগরাই জুতা পরত, তাও এক। মাথায় ওর পাখিরা উড়ত, মূর্তিটার উপরেও নাকি সারাদিন অ্যালবাট্রস পাখিরা ওড়ে। জ্যোৎস্না রাতে বন থেকে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি।

জিনস বললেন, মূর্তিটা শ্বেতপাথরের। আমার এখনও দেখা হয়নি, দেখতে যাব।

বুচার প্রশ্নের জবাব পেলেন না। আবার বললেন, এটাও কি কোন কাকতালীয় ঘটনা।

জিনস কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে পর সংবিৎ ফিরে পাবার পর বললেন, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তার কি জবাব দেব বলুন। ইণ্ডিয়া ঘুরে এটা আমার আরও বেশি মনে হয়েছে। যেন গোটা দেশটা ঈশ্বরের। গোটা দেশটা জাদুকরের। এখন ম্যাণ্ডেলাই ঠিক সব বলতে পারবে। আমাদের উচিত হবে, সতর্ক পাহারা রাখা। সে কখন ফিরে আসে, কি-ভাবে ফিরে আসে দেখতে হবে। পালা করে বাড়িটাতে আপনারা জেগে থাকুন। দরকার হয় আমাকেও ডাকতে পারেন।

বুচার বুঝতে পারলেন এ-সব নিয়ে আর হৈহৈ করা ঠিক নয়। লোকজন কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না। পরামর্শ নিয়েও দেখেছেন, কোন সুরাহা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে জিনসের শেষ পরামর্শটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। দেখতে হবে ম্যাণ্ডেলা এবং ক্যাঙারুর বাচ্চাটা বাড়িতে কোন পথ ধরে ফিরে আসে। নিজের লোক বলতে মাত্র সে আর টিকাকি। লুসির বাড়িতে ওয়াকা এবং ওয়াকার মা। সুতরাং ওই পাঁচজন। রাতে টিকাকি আর সে, দিনের বেলা ওয়াকা এবং লুসি। ওয়াকার মাকে জড়িয়ে লাভ নেই। সংসারের কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া বাজার এ-সব ত আর না করে বাঁচা যায় না। ওয়াকার মার ওপর সেই ভারটা থাকবে।

যা-ভাবা তাই কাজ। জিনস্ চলে গেলে টিকাকিকে সবুজ সংকেত দিতে বারণ করলেন বুচার। বললেন, দিলেই ঘুম চলে আসবে। সারাজীবন ত ঘুমিয়েছেন। এক দু-রাত না ঘুমালে কিছু হবে না। ম্যাণ্ডেলা আজই ফিরে আসতে পারে। কালও। গতবার রাতে ফিরে এসেছিল, এবারেও তাই হতে পারে। গতবার দু'দিন নিখোঁজ ছিল। এবারে দুদিন না হয় তিনদিন হবে। বাতাসে ভেসে গেলেও খিদে তেষ্টা থাকে। বাচ্চা মেয়ে ভয় থাকে। বেশিদূর যেতে সাহস পাবে না। ওই হয়ত গেলে খুব বেশি দূর কোন শস্যক্ষেত্র পার হয়ে যাবে। অবশ্য গতবার ওই মোক্ষম প্রশ্নটা করতেই সবাই ভুলে গেছে। দু'দিন সে কি খেয়েছে, কোথায় থেকেছে? গাড়িতে লুসিকে বললেন, ও তখন কি খেত?

লুসি বলল, সেটাও জিজ্ঞেস করা হয়নি দাদা। বুচার বিরক্ত হতে পারতেন। কিন্তু এখন সে-সময় তাঁর হাতে নেই। তিনি জানেন, তার বোনটা একটু নির্বোধ-টাইপের। বুদ্ধিমতী হলে নিজের মেয়ের কখনও পাখা গজাতে পারে।

একটা পাহাড়ী চড়াই পার হয়ে সামান্য উৎরাইয়ের মুখে ম্যাণ্ডেলাদের বাড়ি। সামনের উপত্যকায় ঘরবাড়িগুলোতে মানুষজন জেগে। এমন কি, দুটো মেয়ে টেনিসও খেলছে। সাদা বলটা বাতাসে উড়ছিল। কি জানি কবে সেই বলটাও না বাতাসে পাখা ভর করে উড়ে যায়। পাখা গজাতে শুরু করলে সব কিছুরই পাখা গজাতে পারে।

বাড়ি ঢুকেই লুসি দেখল ওয়াকা দাঁড়িয়ে আছে। লাল নীল রঙের কাঠের বাড়িটা

নিঝুম। লুসি ওয়াকাকে বলল, ম্যাগুেলা এসেছে? ওয়াকা বলল, না। ম্যাগুেলা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে এটা হয়েছে। বাড়ি ঢুকেই যেন খবরটা পাবে, এসে গেছে। সে গির্জায় রোজ প্রার্থনার সময় বাড়িয়ে দিয়েছে এ-জন্য। যেন যীশু তাকে পরিত্রাণ করে। এ-ছাড়া মানুষের ত আর কোন সম্বল নেই।

বুচারকে দেখেই ওয়াকা একটা নীল রঙের বেতের চেয়ার এগিয়ে আনল। খুব অসময়ে কর্তা হাজির। ঠিক কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। ওয়াকার মাও ছুটে এল। ছুটে এসেই দেখল একজন পালক-পরা লাল নীল পাথরের মালা গলায় লোক অন্ধকার থেকে উঠে আসছে। ওয়াকার মা ভেবেছিল, আবার বোধ হয় কোন ঝিকাকুকে ধরে আনা হয়েছে। কিন্তু কাছে আসতেই বুঝল, তার নিজের জাত-ভাই টিকাকি। সে এমন সেজে আসায় ওয়াকা এবং তার মা কিছুটা হতভম্বই হয়ে গেছে।

আসলে টিকাকি সব শুনে ভেবেছে তার বাপ দাদার পোশাক পরেই যাওয়া ঠিক। কারণ পরীদের লোভ বড় বেশি। তার ধারণা এ-পোশাকে থাকলে ভূত পরী দানো দৈত্য যা কিছুই হক না ছুঁতে পারবে না। সে মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে। কে-জানে পাহারায় আছে, তখন চুলের মুঠি ধরে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়, তখন আর কে তাকে খুঁজে পাবে। এ পোশাক তাকে রক্ষা করবে ভেবেই সে আর বাপ দাদার পোশাক পাল্টায়নি। সোজা একজন ঝিকাকু প্রায় বলতে গেলে সে আজ নিজেই। এবং বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরেও এল। বিড়বিড় করে তার বাপ দাদার কাছে শেখা মন্ত্রটা আওড়াল। ওটা আওড়ালে কোন অশুভ প্রভাব তার ওপর পড়তে পারে না। সে প্রথমে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তার নিজের কাজটুকু সেরে নিল।

বুচার বললেন, আমরা রাতে কিছু খাব না। সবাই খেয়ে বের হয়েছি। লুসি, ওয়াকা তোমরা শুতে যাও। ওয়াকার মাকেও বললেন, তুমিও যাও। তারপর টিকাকিকে ডেকে বললেন, ম্যাগুেলার ঘরে চল। ম্যাগুেলার ঘরে ঢুকেই দেখলেন সাদা বিছানা তেমনি অগোছালো। অর্থাৎ ম্যাগুেলার শোওয়া খুব খারাপ বিছানাটা দেখলেই বোঝা যায়। চাদর বালিশ কোনটাই ঠিক নেই। যে-ভাবে ছিল, ঠিক সে-ভাবেই আছে। লুসি হাত না দিয়ে ভালই করেছে। গ্রীলটা দেখলেন। তার ফাঁক ফোকর দেখলেন। ঘরের চারপাশটা দেখলেন। শুধু নানারকমের খেলনা। কোনটা মানুষের কোনটা রেলগাড়ির। কাচের আলমারিতে সাজানো। আর আছে ছোট্ট ম্যাগুেলার মতো একটা সাদা বেতের চেয়ার। একটা সেণ্টার টেবিল। একজন শিশুর উপযোগী করে ঘরটা সাজানো। আর একটা কাঁচের আলমারিতে দেশী বিদেশী শিশুদের বই। দেয়ালে নানারকম মুখোশ। আলমারির পেছনে লুকিয়ে নেই ত। যা একখানা মেয়ে! তিনি উঁকি দিলেন। না নেই। কি দুঃসাহস। এই রাত, ঝড় বৃষ্টি হতে পারে, বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত তা ছাড়া কত বড় পৃথিবী, আর কত ভুল ভালাইয়া পথ—কোন পথে কোথায় গিয়ে পড়বে ভাবতেই তিনি শিউরে উঠলেন।

টিকাকি ভীতু চোখে সব লক্ষ্য করছে। সে যে ভীতু খুব, এতদিন তার কোন প্রমাণ সে দিতে পারেনি। এখন বাড়িটাতে ঢুকেই কেমন তার গা ছমছম করছে। পাহাড়ের মাথায় বাড়িটা। সামনে ছোট্ট এক খণ্ড উপত্যকা পার হয়ে গেলে সেন্ট জনসের কটেজ। নিচের দিকটায় অবশ্য আছে অসংখ্য ঘরবাড়ি। সবই লাল নীল রঙের। সবই কাঠের। কারণ শহরটার অদূরেই আছে এক বড় আগ্নেয়গিরি। তার গুহার মুখ থেকে ধোঁয়া বের হয়। বাড়িটায় বসে বায়নাকুলার দিয়ে দেখলে চোখেও পড়ে। এ-হেন একটা বাড়ি থেকে ছোট্ট মেয়ে উধাও হয়ে যায়! সুন্দর মেয়েদের পরীরা খুব ভালবাসে। আসলে জাদুকর না ছাই। আসলে ম্যাগুেলা পরীদের নজরে পড়ে গেছে। তারাই এসে নিয়ে যায়। তারাই আবার পুতুলখেলা শেষ হলে রেখে যায় ম্যাগুেলাকে। কিন্তু সঙ্গে থাকে নাকি হাইতিতি। ক্যাঙারু বাচ্চাটাকে এ-বাড়িতে সবাই হাইতিতি বলে। আর তখনই সে দেখল সেই বিরাট পাইনবনটার মাথার ওপর কুয়াশার মতো কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে। দু টুকুরো কুয়াশা। তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। সমুদ্র এবং পাইনবনটা মিলে এত অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা যে আকাশের নক্ষত্র বাদে আর কিছু নজরে পড়ে না। সে চোখ কচলাল। তারপর দেখল ফাঁকা। কিছু নেই। সে শুনেছে ভয় পেলে এমন হয়। ইণ্ডিয়ানরা একে সরষে ফুল দেখা বলে। সে আজ জীবনে প্রথম চোখে সরষে ফুল দেখল।

তবু যা হোক সরষে ফুল দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, এর পরে আর কি দেখার সৌভাগ্য হবে সে জানে না। কারণ এই মাত্র কর্তা বললেন, টিকাকি, তুমি এই

ঘরটায় থাক। জানালা খোলা আছে। তাই থাকল। জানালা দিয়ে ঢুকলেই খপ করে ধরে ফেলবে। ও কতটা বাড় বাড়তে পারে আমরা তখন দেখব।

টিকাকির পাশেই লুসি। সে ঘুমাতে যায় নি। খুব কাঁচুমাচু গলায় বলল, দাদা আমি থাকি। ঘুম আসছে না।

বুচার বললেন, তোমরা আমাকে আর কত জ্বালাবে। আমি কি তোমাদের চেয়ে কম বুঝি! থাকবার দরকার হলে আগেই বলতাম। তুমি এখন শুতে গেলে নিজেকে খুব নিরাপদ ভাবব।

লুসি দাদার ধমকে কেঁদে ফেলল। বুচারের এই হয়েছে মুশকিল। কখন কি করতে হবে লুসি এই বয়সেও শিখল না। কবে আর শিখবে! থাকগে আর ক'দিন। যখন থাকব না বুঝতে পারবে। এত করে বলেছি একটু বুদ্ধিমতী হও, বুদ্ধিমতী হলে মেয়ের পাখা গজাত না। এতদিন তোমাকে নিয়ে জ্বলেছি। এখন তোমার মেয়ে শুরু করেছে।

লুসি জানে সে কখনও দাদাকে জ্বালায় নি। তার অপরাধের মধ্যে সে একজন বাউণ্ডুলে জাহাজীকে বিয়ে করেছিল। দাদার অমতে বিয়ে করেছে। সেই মানুষও নিরুদ্দেশ। দাদার ধারণা, আসলে ব্যাটা পালিয়েছে। কিন্তু মুখে বলতে পারেন না। জাহাজডুবী খবর কতটা সত্য সে বিষয়ে এখনও তাঁর মনে সংশয় আছে। তার মুখও নেই যে দাদার দ্বিতীয় আর কোন কথার জবাব দেয়। সে রুমালে চোখ মুখ ঢেকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বালক ওয়াকা সারাক্ষণই ম্যাণ্ডেলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাতে উধাও হয়েছে। সারা সকাল সে সব উপত্যকার বাড়িঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। সে অবশ্য জানে, খুঁজে লাভ নেই। কারণ ছোট্ট দিদিমণি বলেছে, সে হাইতিতিকে নিয়ে যায়। জাদুকর যদি আর একটা পালক দেয়, সে তবে তাকেও নিয়ে যাবে। একমাত্র সব কথা ম্যাণ্ডেলা তাকেই বলে। আকাশের নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া আর ভাবা যায় না। সব নাকি তখন দেখতে শতরঞ্জের মতো লাগে। লাল নীল সবুজ গালিচা, পাহাড়ী নদী, জলরেখা, ফুলের উপত্যকা, গোচারণভূমি, মানুষের ঘরবাড়ি নাকি সব এক দাবাখেলার ছকের মতো। সেই ছকটা যে দেখে না সে জানবে কি করে পৃথিবী কত বড়। জাদুকর তাকেও খুব ভালবাসত। সে যদি তখন বুদ্ধি করে ম্যাণ্ডেলার মতো একটা পালক চেয়ে নিত! যাই হোক সে রোজই বেলাভূমিতে গিয়ে একবার জাদুকরের মূর্তিটার সামনে দাঁড়ায়। বলে, কি গো মনে আছে, আমরা তোমাকে নিয়ে পাইন ফেস্টিভালে মিছিল বের করেছিলাম। তুমি লম্বা পাতার বাঁশি বাজিয়েছিলে। তোমার জাহাজের ছোটবাবু এসে মাঝে মাঝেই তোমাকে ধমকে নিয়ে যেত। মনে পড়ে। আমি তোমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম। পিকাকোরা পার্কে নিয়ে গেছি। যাবার সময় যদি একটা পালক

আমাকে দিয়ে যেতে তবে তোমার কাছে কত সহজে চলে যেতে পারতাম। তুমি চলে যাওয়ার পরই ত শহরটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। সব বাপ মারা আতঙ্কে আছে। ওরা ভাবছে তুমি তাদের বাচ্চাদেরও পালক দেবে। বেচারা! ওরা জানেও না একটা পালক পেতে হলে কত সরল মনের মানুষ হতে হয়। পালক পাওয়া সোজা কথা না!

আর যাই হোক ওয়াকা বুচারকে অমান্য করে না। ভয়ও পায়। সে একবার বলবে ভাবছিল, সেও থাকে তাদের সঙ্গে। তবে তিনি খুব জেদী মানুষ। সে তার মার কাছ থেকেই শুনেছে লুসি মাসি মেসোমশাইকে বিয়ে করার পর মুখ দেখাদেখি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাগে অভিমানে নিজেও বিয়ে করেন নি। তারপর যেই নিখোঁজ হল মানুষটা তখনই বুচার সাহেব পাগলের মতো ছুটে এসেছিলেন। সেই থেকে এ-বাড়ির ভাল-মন্দ বুচার মামাই ভাবেন। সুতরাং এখন তার উপরে কথা নেই।

তবু কি যে হয় মানুষের, কৌতূহল বড় দায়। ওয়াকা ভাবল, যদি রাতেই ফিরে আসে তবে সে দেখতে পাবে না, কি-ভাবে যে কখন বাতাসে ভেসে চলে আসবে হাইতিতি আর ম্যাণ্ডেলা। গেল রাতে যখন আকাশে মৃদুমন্দ ঘণ্টা বাজছিল সে তখন ঘুমিয়ে। তার আগেরবারও সে দৌড়ে দৌড়ে সারা উপত্যকায় ছুটে মরেছে রাতে, কিন্তু দুখণ্ড ছোট্ট রুপালী মেঘ ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। অথচ উপত্যকার ঘরবাড়িগুলির ছোট ছোট শিশুরা বলেছে, এই ওয়াকা দেখেছিস, কেমন একটা ছোট মেয়ে ভেসে গেল আকাশের নিচ দিয়ে। সঙ্গে ছোট্ট একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। গলায় রুপোর ঘণ্টা। বাতাসে দুলছে আর ঢনঢন করে বাজছে। ওয়াকার মনে হল, সে কিছুটা বড় হয়ে গেছে বলেই এমন আশ্চর্য ছবি দেখতে পায়নি। ভগবানের ওপর তার তখন ভারি অভিমান হয়েছিল, কেন যে ভগবান তাকে এত বড় করে দিল! এই যখন অবস্থা, তখন ওয়াকারের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। আসলে খুব উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল বলেই সে ঠিক দেখতে পায়নি। বাড়িতে নেমে আসার সময় নিচে নেমে আসবে। পাইনের বনটার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে আসবে। জ্যোৎস্না রাত যখন, এবং আকাশে নক্ষত্রের আলো আছে যখন তা-ছাড়া লাইট হাউসটাও মাঝে মাঝেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে যায় চারপাশটায়—তখন সে বাড়ির ছাদে বসে থাকলে ঠিক সব দেখতে পাবে।

বুচার বলল, তাহলে এই কথাই থাকল।

টিকাকি খুব মুষড়ে পড়েছে। গা ছমছম করছে। তারপর আবার একা! সে কখনও প্রশ্ন করে না। কিন্তু আজ মরিয়া হয়ে বলল, স্যার আমি একা?

একা কেন? আমি আছি। সিলভার ওকের নিচে বসে থাকব। আর তখনই দেখলেন ওয়াকা দরজায় উঁকি দিয়ে আছে। বললেন, এই ওয়াকা, গাছটার নিচে একটা চেয়ার রেখে দে। টেবিল। চুরুটের বাক্স। এই নে। সব সাজিয়ে রাখ। আমি যাচ্ছি। তারপর তুই ঘুমোতে যা। সকালে অনেক কাজ আছে তোর।

ওয়াকা সব সময় লাফায়। যখন খামারবাড়ি থেকে গরু মোষ নিয়ে যায় তখনও লাফায়। যখন আপেল বাগান পাহারা দেয় তখনও লাফায়। পাহাড়, বনজঙ্গল, আর উপত্যকার এই ছোট্ট শহরটা যেন তার একটা মস্ত লাফাবার জায়গা। প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য সে আর কোথাও আছে জানে না। দূরে এগমণ্ট হিলের চূড়োয় বরফ ভেসে থাকে। পালকটা পেলে সে একবার সেখানটায় কি আছে দেখে আসবে ভাবল। সে এই কথায়ও লাফিয়ে বের হয়ে গেল।

বুচার ফের বললেন, টিকাকি মনে রাখবে এই জানালা দিয়ে ঢুকবে। পাখি হয়ে উড়তে পারে। প্রজাপতির রূপ ধরে ঢুকতে পারে। ম্যাণ্ডেলার কাজকর্ম দেখে আমার এখন আর কিছুই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

টিকাকি বুঝতে পারল বিষম বিপদ। এই ঘরে একা। হাঁটু কাঁপছিল। কর্তা দেখলে রাগ করবে। সে কোনরকমে নিজেকে ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করছে। আর কর্তা বের হয়ে যেতেই সে হিহি করে কাঁপতে থাকল। জ্বর আসছে। এমন একটা দুঃসময় তার জীবনে আসেনি। ভূত-প্রেতের প্রভাব পড়েছে বাড়িটাতে। আর এই সময় সে একা থাকে কি করে। রাত বাড়ছে। সে মেঝেতে এখন উবু হয়ে বসে আছে। জানালার দিকে তাকাতে পারছে না ভয়ে। সেখানে কে না কে ছায়ার মত এসে দাঁড়াবে। তাছাড়া যদি একটা লম্বা হাত ঢুকিয়ে কেউ তাকে তুলে নিয়ে যায়। আলো জ্বালা আছে তবু রক্ষা। বড় বিপদ। বইগুলো কাঁচের আলমারিতে নড়াচড়া শুরু করেছে কেন। একটা উদ্‌বেড়াল আলমারি থেকে ওর দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। সে ভয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ঐত ছোট্ট বেড়ালছানাটা ডেকে উঠল। সে এইসব দেখতে দেখতে ভাবছিল নির্ঘাত ভিরমি খাবে। রাত বেশ গড়িয়ে যাচ্ছে। দূরের জেটিতে জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে। একবার চোখ খুলে দেখছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলছে। কারণ যেদিকে তাকায় দেখতে পায় সবই নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। মুখোশগুলো পর্যন্ত একবার দেয়ালে হাঁ করছে আবার মুখ বন্ধ করছে। এইরকম যখন অবস্থা তখন সে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বের হবার চেষ্টা করতেই জানালায় কে ডাকছে।—এই এই। এইরে এসে গেছে! টিকাকি হুড়মুড় করে দরজায় গিয়ে পড়ল এবং ছুটে পালাবে ভেবে দরজা টানতেই বুঝল যাবার সময় বুচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। আবার ডাক, এই টিকাকি।

টিকাকি তাকাচ্ছে না। চোখ বুজে হুঁ হুঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি টিকাকি না?

তবে তুমি কে?

চোখ ঢেকেই জবাব দিল, আমি কেউ না।

ধুস, তুমি আস্ত একটা গাধা। গলায় ওগুলো পরেছ কেন?

কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না।

ম্যাঙেলা এয়েছে ?

কেউ আসে নি।

ওয়াকা আর পারল না। বেটা ভয়ে জমে গেছে। সে বলল, আরে আমি ওয়াকা।

মিছে কথা। তুমি ওয়াকা নও বাপু। আমি তোমাকে চিনি। ঝিকাকোকে সব বলে দেব। দেখব তখন তোমার কি গতি হয়।

সে না হয় বলে দিও। কিন্তু ওদিকে যে দুটো কি ভেসে এদিকে আসছে।

এ্যাঁ! সঙ্গে সঙ্গে টিকাকি ভিরমি খেয়ে শুয়ে পড়ল।

হ্যাঁ তাই। আমি কর্তার কাছে যেতে পারছি না। জেগে আছি জানলে রাগ করতে পারে। তুমি গিয়ে খবরটা দাও।

আর খবর। কোন সাড়া নেই। বেটা নিজেই ভূত হয়ে গেছে। ওয়াকা যে এখন কি করে। সে ছাদে বসেছিল, এইমাত্র দেখে এসেছে ভেসে আসছে দুটো সাদা রুপালী মেঘ।

ওয়াকা চুপি চুপি লুসি মাসির ঘরে ঢুকে গেল। ঐ ঘর দিয়েই যেতে হয়। দরজা ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। ওদিকে কর্তা বসে আছে সিলভার ওকের নিচে। ওখানে হাইতিতিকে বেঁধে রাখা হয়। কর্তা সব সময় ওপরের দিকে তাকিয়েছিল বলে ঘাড় ধরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে লক্ষ্য করেছে, হাত দিয়ে ঘাড় মালিশ করছে। কতক্ষণ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। ছাদ থেকে সুবিধা। অতটা ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয় না। সে জানে ও দুটো ম্যাঙেলা আর হাইতিতি ঠিক। কাছে এলেই টের পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগেই যদি ম্যাঙেলা ভাবে অত রাত করে বাড়ি ফিরে কাজ নেই। মামাটা যা! বকা-ঝকা করতে পারে। সকালটাই ভাল। তখন মানুষের মেজাজ প্রসন্ন থাকে। তাছাড়া অত উপর থেকে পথ ভুলভাল করতে কতক্ষণ! তার আগে ওরা যদি নিচ থেকে হাত নাড়তে থাকে কিংবা বেলুন উড়িয়ে দেয়—অবশ্য জ্যোৎস্না রাতে কতটা কি দেখতে পাবে সে বিষয়েও সংশয় থেকে যাচ্ছে—ওয়াকা এই সব সাতপাঁচ চিন্তায় কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, তখনই দেখল টুকরো মেঘের ছায়া ক্রমশ নিচে নেমে আসছে। পাইন বনটায় এসে একেবারে নেমে গেল। উঁচু পাইনগাছের আড়ালে পড়ে যেতেই সে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

এখন জেগে গেছে সবাই। টিকাকির কেবল সাড়া নেই। কি হল কি হল বলছে সবাই। লুসি ওয়াকার মা ছুটে বের হয়ে আসছে। বুচার ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ছোকরাটার বেয়াদপি দেখে। মুখ গোমড়া করে উঠে গিয়ে বলল, কি হয়েছে বলবে ত!

ওয়াকা বলল, ওরা এসেছে।

কোথায় ?

ঐ ত পাইন বনটায় ঢুকে গেল।

বুচার বলল, মিছে কথা!

না, আমি দেখলাম।

তুমি দেখলে আর আমি দেখলাম না।

ওক গাছটার নিচ থেকে দেখা যায় না।

তুমি ঠিক দেখেছ ?

হঁ্যা। প্রথমে হালকা টুকরো মেঘের মতো ভেসে আসছিল।

তারপর ?

ঠিক বনটার উপরে আসতেই মনে হল ম্যাগেলা আর হাইতিতি।

লুসি বলল, তবে সত্যি ম্যাগেলা হাওয়ায় ভাসতে পারে!

বুচার এক ধমক লাগালেন। তুমি থাম ত। টিকাকি কোথায় ? টিকাকি, টিকাকি!

ওয়াকা বলল, ও গ্যাছে!

অঃ আর পারছি না!

গ্যাছে বলতে, ওয়াকা বোঝাতে চাইল ভিরমি গ্যাছে। কিন্তু এত উত্তেজনা সে ঠিকমত কথা পর্যন্ত শেষ করতে পারছে না। সে ছুটে পাইন বনটার দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল। বুচার দরজা ঠেলে তখন টিকাকিকে ডাকছে। সত্যি তবে ভুতুড়ে ব্যাপার। তিনি টিকাকিকে এ-সময় সঙ্গে রাখতে চান। ওর শরীরে মালা তাবিজ আছে। সঙ্গে থাকলে ভূতের ছোঁয়াচ থেকে অনেকটা রক্ষা! লুসিও নেমে যাচ্ছে। ওয়াকার মা এমন বিস্ময়কর কাণ্ড হয় সত্যি ভাবতে পারেনি। সেও অনেকটা নেমে গেছে। কেবল বুচার তখন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে টিকাকিকে। চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে বলছে, নাও ওঠো, অনেক হয়েছে। ওরা নাকি এসে গেছে।

টিকাকি আবার ভিরমি খেতে যাচ্ছিল। তিনি চুল ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি দিতেই চোখ উল্টে দেখল, কর্তা নিজে তার চুল টানছে। সে তাড়াতাড়ি ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে দাঁড়াল। —কোনদিকে স্যার ?

পাইনের বনটায়। ওরা সবাই গেছে। আমিও যাচ্ছি। দেখি কি ব্যাপার।

স্যার আমি যাব।

না, তুমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাক।

স্যার!

বুচার বলতে পারত, ঠিক আছে তবে তুমি নিচে যাও। আমি থাকি। কিন্তু বিষয়টা খুব ভাল ঠেকছে না। জাদুকর না পরী, না অন্য এক অশরীরীর কাজ কে

জানে। মানুষের এমনটা হয় কবে কে শুনেছে। তিনি একা থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। চারপাশে অস্পষ্ট সাদা জ্যোৎস্নায় দুটো একটা জোনাকি উইলোর ঝোপে—বড়ই ভয়ের উদ্রেক করছে। কাছেভিতে একটা বাড়ি নেই, যে ডাকাডাকি করে মানুষজন জড় করবেন। তিনি অগত্যা বললেন, চল দেখি তবে ওরা কতদূর গেল দেখি। ভাগ্নিটা এমন একটা অশুভ প্রভাবে পড়ে গেল! স্বচক্ষে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। বিশ্বাস করতেও মন চায় না। ওয়াকা যা একখানা ফেরেব্বাজ ছেলে। ঠিক বলেছে কিনা তাই বা কে জানে। তবু কেমন এই উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁরও গা ছমছম করছিল। শুধু গাছপালা নয়, গোটা বাড়িটা একটা ভূতের আবাস মনে হচ্ছে। তিনি আর রিস্ক নিতে সাহস পাচ্ছেন না। পাশে তাকিয়ে দেখেন টিকাকিও নেই। সে চো দৌড় লাগিয়েছে।

না আর যাই করুক একা এই নিঝুম পরিত্যক্ত আবাসে এমন গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কারণ মানুষেরা মরে যায়, মরে গিয়ে শেষ হয়ে যায় না, ঘোরাফেরা করে সর্বত্র। জাদুকরটা মরে যায়নি ত আবার! তার প্রেতাত্মার কাজ যদি হয়ে থাকে এটা! তিনি অগত্যা নিজেও চো দৌড়। নিচে নেমে সবার সঙ্গে মিশে যেতেই আবার আগের বুচার। ওয়াকা টর্চ জ্বেলে দেখছে বনের মধ্যে। যদি মামার ভয়ে পালিয়ে থাকে। আর ডাকছে ম্যাণ্ডেলা। ম্যাণ্ডেলা, মামাবাবু তোমাকে কিছু বলবে না। বের হয়ে এস।

বুচার এবার বেশ কড়া গলায় বললেন, তুমি ওয়াকা মিছে কথা বলেছ।

না স্যার। দু টুকরো হালকা মেঘ আমি সত্যি দেখেছি।

আকাশে কত মেঘ উড়ে যায়। তারা সবাই কি ম্যাণ্ডেলা। ঐ ত যাচ্ছে।

ও না স্যার। ওরকম নয়।

তবে কেমন?

সিল্কের ফ্রক গায়। স্পষ্ট দেখেছি। তাছাড়া বনটা কত বড়। কোথায় নেমেছে বুঝব কি করে! ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেল না তখন আর কি করা যায়। অন্য সময় হলে বুচার ওয়াকাকে জবাব দিয়ে দিত। কিন্তু সংসারে এখন বড় অসময়, তাকে বিদায় করলে আর কেউ কাজে আসবে কিনা তাও ঠিক নেই। একটা ভুতুরে বাড়িতে কে আর সেধে মরতে আসে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আর খুঁজতে হবে না। সকালে এসে দেখা যাবে। এখন তোমরা বাড়ি এস।

আর বাড়ি এসেই সবাই অবাক। সিলভার ওকের নিচে পায়ের মধ্যে হাইতিতি মুখ গুঁজে আছে। যেন কত অপরাধ করে ফেলেছে এমন চোখমুখ। ওয়াকা ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা, ম্যাণ্ডেলা।

ঘর থেকে ম্যাণ্ডেলা বলল, তোমরা সব কোথায় গেছিলে!

টিকাকি সবার অলক্ষ্যে তখন জোরে এক লাথি কসাল হাইতিতিকে। যত নষ্টের

মূলে আছে এই হতচ্ছারাটা। ম্যাণ্ডেলাকে নিয়ে ভেগে যায়। সঙ্গে না থাকলে, ম্যাণ্ডেলার সাহসই হত না।

হাইতিতি কুঁই কুঁই করছে কুকুরের মত। ম্যাণ্ডেলা খুব সাবালিকার মত বলছে, কে মারছেরে ওকে!

বুচার লুসি চেয়ারে এখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। এত বেশি ক্লান্তি গেছে, এত বেশি উত্তেজনা গেছে যে একটা প্রশ্ন করতে পারছে না তারা। কেমন বিমূঢ়।

ম্যাণ্ডেলা যেন এইমাত্র এক স্বপ্নের দেশ থেকে উঠে এসেছে। তার কত কথা!

ওয়াকা বলল, তুমি আবার কোথায় গেছিলে!

ম্যাণ্ডেলা অবাক হল, বারে বাবাকে খুঁজতে গেছিলাম। রোজ রোজ তোমাদের এক কথা কত বলা যায়!

বুচার আপাতত রক্ষা পাবার মত বললেন, যাই হক এবার গেলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ম্যাণ্ডেলা বুঝতে পারছে মামার রাগ পড়েনি। মামাটা যে কি! তার অবশ্য মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মামাকে পালকটা পরিয়ে দেয়। মামা হাওয়ায় উড়ে গেলে বুঝতে পারবে —যত যাওয়া যায় তত মনে হয় অসীম রহস্য পৃথিবীতে। উঁচু থেকে সে এবারে দেখতে পেয়েছে কত সব ফুলের উপত্যকা, পাহাড়ী ঝর্ণা, লাল ধূসর প্রান্তর, এবং যত যায় তত এক বনরাজীনীলা। তারপর সমুদ্র থাকে তার জলরাশি নিয়ে। একটা তিমি মাছের পিঠে বসে সে আর হাইতিতি দুপুরের খাবার খেয়েছে। তারপর ডুবে গেল মাছটা, ওরা উড়ে গিয়ে একটা জাহাজের মাস্তলে বসে থাকল। কাপ্তান যখন খাচ্ছিল, তখন সে মাত্র একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে পড়ি মরি করে ছুটোছুটি। তাত হবেই। স্যাণ্ডউইচটা যদি চোখের সামনে বাতাসে ভেসে যায় তবে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে। সে যত বড় জঁাদরেল কাপ্তানই হউক ভিরমি খাবেই।

গল্পের আড্ডায় রামখুড়ো

হিমানীশ গোস্বামী

তোমরা রামখুড়োকে কেউ দেখেছ কি? না, তা দেখবে কেমন করে—তোমরা এই পৃথিবীতে আসার অনেক আগেই তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা যখন খুব ছোট তখনই তাঁর বয়স ছিল নব্বুই। নব্বুই কিংবা আশি, আবার একশোও হতে পারে। তিনি তাঁর বয়স নিজেই জানতেন না। এক একজনকে এক এক রকম বলতেন। তবে, মানুষ ছিলেন তিনি চমৎকার। তাঁর গায়ে ঐ বয়সেও ছিল বেশ জোর। আর ছিল সাদা লম্বা দাড়ি। মাথা ছিল পরিষ্কার—পরিষ্কার মানে এই নয় যে তিনি অঙ্ক টঙ্ক ভাল করতে পারতেন। আবার অঙ্ক টঙ্ক করতে পারতেন না তাই বা বলি কেমন করে? যাই হক—পরিষ্কার মাথা, মানে মাথায় একটাও চুল ছিল না। কথাটা একেবারে সত্যি অবশ্য নয়—মাথার উপর দিকটা ছিল টাকে ভরা, আর ঘাড়ের দিকে সামান্য কিছু চুল ছিল। তাও সাদা ধবধবে চুল। লোকেরা বলত মাথায় চুল ছিল না—আমরা ও তাই বলতাম। তাঁর গায়ের জোরের কথা একটু বলি। রামখুড়োর বাড়ির সামনেই ছিল একটা নদী—সে নদী শীতকালে যেমন নিরীহ ছিল, বর্ষাকালে দেখা যেত তার প্রচণ্ড তাণ্ডব। ছোট্ট এক রত্তি একটা নদী দিয়ে বর্ষাকালে যে কত জল হু হু করে বয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই। রামখুড়ো সেই প্রবল বর্ষার মধ্যে যখন কেউ নদীতে সাঁতার দেওয়ার কথা ভাবতে পারত না—সেই নদী সাঁতরে পারাপার করতেন। কেউ আপত্তি করলে বলতেন পারাপার করতে করতে পরপারে চলে যেতে যদি পারি তবে মন্দ কি। একদিন ত যেতেই হবে!

এই রামখুড়ো যেমন গল্প বলতে ভালবাসতেন, তেমন ভালবাসতেন শুনতে। তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় গল্পের আসর বসত মাঝে মাঝে। জায়গাটা ছিল গ্রাম। শহরেই থাকতেন চাকুরেরা। অনেকে গরমের সময় ছুটি নিয়ে আসতেন, অনেকে আসতেন পুজোর সময়। আর ঐ সময়ে রামখুড়োর বাড়িতে একেবারে হৈচৈ পড়ে যেত। কেউ গান গাইত, একদল আবার নাটক করত, কেউ বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরুত। রামখুড়োরা ছিলেন চার ভাই—তাঁদের সন্তান সন্ততির সংখ্যাও কম ছিল না। এক বাড়িতেই প্রায় ষাট সত্তর লোক। বড়রা তাঁকে ডাকতেন রামখুড়ো বলে, আর তিনি খুব মাইডিয়ার গোছের লোক হওয়াতে আমরাও রামখুড়োই বলতাম। রাম-দাদু বলতে হলে আমরা

রামদাদু না বলে দুষ্টুমি করে বলতাম রামদা! রামদা কি জানো ত—পাঁঠা বলি দেওয়ার বিরাট আকারের দায়ের নাম ছিল রামদা। তাই রামদা বলতেন, ওরে আমাকে তোরা দয়া করে রামখুড়োই বলিস, আমি কিছু মনে করব না। আর আমরাও তাঁকে তাই রামখুড়োই বলতাম।

তা এই রামখুড়ো মাঝে মাঝে আফিঙ খেতেন। কবে একবার তাঁর পেটে ব্যথা হয়েছিল—সেই সময় তাঁকে একজন বলে সাতদিন একটু একটু করে আফিঙ খেতে তাহলেই নাকি পেট ব্যথা সেরে যাবে। রামখুড়ো সাতদিন আফিঙ খেলেন কিন্তু পেট ব্যথা সারল না তাতে। পরে পেট কেটে পাথর বার করতে হয়। কিন্তু আফিঙের অভেসটা তাঁর রয়েই গেল।

একদিনের কথা বলি। সেদিন রামখুড়ো বললেন, আজ গল্প হক—কিন্তু গল্প আমি বলব না। গল্প বলবে শ্যামানন্দ। কলকাতায় থাকেন—রামখুড়োরই মাসতুতো না পিসতুতো ভাই। শ্যামানন্দ বললেন, না-না—আমি কেন গল্প বলব। আমি তো গল্পটল্প কিছু পড়িনি, জানিও না। আমি পুলিস কোর্টের উকিল, খাওয়ার সময় থাকে না। রামখুড়ো তা শুনে বললেন, ঠিক আছে—আজ তাহলে গল্প কেউ বলবে না, গল্প হবে।

—মানে? কে যেন প্রশ্ন করেছিল।

রামখুড়ো শতরঞ্জির উপর উবু হয়ে শুয়েছিলেন। পাশে ছিল আফিঙের কৌটো। তিনি বললেন, গল্প হচ্ছে গল্প—যার শুরু আছে, যার নায়ক আছে, যার মাঝের ভাগ আছে, যার শেষ আছে, শেষে যার চমক আছে। চমক না হলে গল্প জমে না, গল্প হয়—কিন্তু সে-গল্প আমার ভাল লাগে না। এই গল্পই লোকে বলে, এবং লেখে। কিন্তু আর একরকম গল্প আছে, যা হয়। এর ঠিক শুরু নেই। যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করা যায়। যে কোনো লোক তা শুরু করতে পারে। সেই গল্প শেষ না হতেই অন্য একজন তা থেকে অন্য ডালপালা বানাতে পারে—গল্পের ডালপালা, যে কোনো লোক সে-গল্প-

শেষ করতে পারে। সে গল্পের শেষ নাও থাকতে পারে। এরই নাম আড্ডার গল্প।

শ্যামানন্দ বললেন, আমি যা বলব বলে মনে করছি সেটা গল্পও নয় আবার আড্ডার গল্পও নয়। এটা একটা সত্য ঘটনা।

রামখুড়ো বোধহয় একটু আগেই খানিক আফিঙ গিলেছিলেন। তিনি বললেন, সত্য ঘটনা? সেটা তো খবরের কাগজের রিপোর্টিং-এর মতই জলো। না না, শ্যামানন্দ—তুমি সত্যি ঘটনা একেবারেই বলো না। সত্যি ঘটনা শুনলেই আমারও চোখে জল আসে, আনন্দ উবে যায়।

শ্যামানন্দ বললেন, দাদা একটা কথা বলি। আমি ওসব বুঝি না। আমি একটা ছোট গল্প বলব। গল্পও বলতে পারো, আড্ডাও বলতে পারো। আমার এক মক্কেল ছিল, তারই গল্প। গল্পটা সত্যিই। এক করুণ কাহিনী।

করুণ কাহিনী শুনেই রামখুড়োর চোখ দুটো জলে ভরে এল। রামখুড়ো বললেন, করুণ কাহিনী? তা হক—আজ করুণ কাহিনীই হক।

এরপর শ্যামানন্দ বললেন, আমার মক্কেলের নাম ছিল বীরেশ্বর।

একথা শুনেই রামখুড়ো একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, বীরেশ্বর ছিল। মানে এখন নেই? কী শোচনীয় ব্যাপার।

শ্যামানন্দ বললেন, আগে সবটা শুনুন না, তারপর কাঁদবেন। তা বীরেশ্বরের ছিল অঢেল টাকা। টাকার কুমীর বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে নিজের টাকা নয়—কাকার টাকা। কাকার মৃত্যুর পর কাকার সন্তানাদি না থাকায় তাঁর কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি আর নগদ টাকা তার হাতে এসে পড়ে।

এতো ভাল কথা। আনন্দের কথা। বললেন রামখুড়ো। চোখ মুছলেন তিনি।

শ্যামানন্দ বললেন, টাকা পেয়েই বীরেশ্বর কলকাতায় একটা বাড়ি কিনে ফেলল।

—বাঃ—চমৎকার! খুশি হয়ে উঠলেন রামখুড়ো।

খুব সুখে থাকতে লাগল তারা।

—চমৎকার! চমৎকার!!

শ্যামানন্দ বললেন, দিন কাটতে লাগল আনন্দের সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিন পরই ইয়ার বন্ধু তার জুটে গেল। তারা তাকে সু-পরামর্শের নামে কু-পরামর্শ দিতে লাগল।

—খুব খারাপ ব্যাপার! মন্তব্য করলেন রামখুড়ো।

—কিন্তু বীরেশ্বর বুঝতে পারল সব। সে সঙ্গে সঙ্গে তাদের হটিয়ে দিল।

—চমৎকার! রামখুড়ো বললেন।

শ্যামানন্দ যা বলেন, রামখুড়ো তার উপর মন্তব্য করেনই। কিছুতেই তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। শ্যামানন্দর তাতে গল্প বলতে অবশ্য দেরি হতে থাকে। কিন্তু শ্যামানন্দ তা মেনে নেন। না মেনে উপায়ই বা কি?

শ্যামানন্দ বলতে থাকেন, কয়েক মাস এ ভাবে যাওয়ার পর বীরেশ্বরের স্ত্রী রমলা একদিন বলল, দেখ—আমাদের এত জিনিস, এত টাকা—কিন্তু একটা গাড়ি না থাকলে চলছে না। একথা শুনে বীরেশ্বর বলল, ঠিক কথা—কিন্তু নতুন গাড়ির অর্ডার দেওয়ার পর পেতে পেতে দু বছর লেগে যায়। রমলা তা শুনে বলল, পুরনো গাড়িও তো পাওয়া যায় বাজারে। বীরেশ্বর বলল, তা ঠিক। আচ্ছা ভেবে দেখি।

—ভাল কথা। মন্তব্য করলেন রামখুড়ো।

—তারপর খোঁজখবর করতে লাগলেন গাড়ির।

—চমৎকার!

—খুঁজতে খুঁজতে একটা গাড়ি পেয়েও গেলেন। তবে গাড়িটা দেখতে বিশ্রী। রঙ উঠে গেছে।

—বিশ্রী! বীরেশ্বর ঠকে গেল তো?

কিন্তু গাড়িটার ইনজিনটা ছিল খুবই দামী। গাড়ির বাইরেটা খারাপ দেখতে হলেও রঙ চটে গেলেও অমন ইনজিন পাওয়া ছিল একটা মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

—বাঃ বেশ কথা! মন্তব্য করলেন রামখুড়ো।

—কিন্তু বীরেশ্বর গাড়িটা কিনল না! বীরেশ্বরের বৌ রমলা বলল—ঐ গাড়িটা বিশ্রী, একটা দেখতে ভাল গাড়ি কিনতে হবে।

—খুব খারাপ ব্যাপার। বললেন রামখুড়ো।

—তারপর তারা একটা গাড়ি পেল। চমৎকার দেখতে। ঝকঝক করছে তার হালকা সবুজ রঙ। পুরোনো আমলের ফোর্ড গাড়ি।

—বাঃ বেশ ভাল কথা।

—কিন্তু ইনজিনটা ছিল খুব খারাপ। বাজে মেকানিকের হাতে পড়ে সেটার প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল।

—জঘন্য!

—তা সেই গাড়িটা খুব সস্তাতেই পেয়ে গেল বীরেশ্বর।

—খুব ভাল কথা, বেড়ে কথা।

—বীরেশ্বরের গাড়ি কেনার পরই রমলা বলল, চলো যাই গাড়ি করে অনেক দূরে কোথাও যাই। চলোনা যাই রাঁচীতে—সেখানে রয়েছে শ্যামলী। শ্যামলী হচ্ছে রমলার বোন। রাজিও হয়ে গেল বীরেশ্বর।

—বাঃ বেশ কথা! বললেন রামখুড়ো।

—তারপর একদিন পঞ্জিকা দেখে একটি শুভদিন দেখে সকাল পাঁচটা বেজে একচল্লিশ মিনিট একত্রিশ সেকেণ্ডের শুভ সময় দেখে ওরা গাড়িতে চড়ে বসল।

—চমৎকার।

—কিন্তু যে ড্রাইভার জুটল তাকে স্মার্ট দেখতে হলে হবে কি, এক আনাড়ি।

—খারাপ ব্যাপার।

—তবে ছেলেটির ব্যবহার ছিল ভাল।

—তা ভাল, তা ভাল।

—কিন্তু আসলে সে ছিল একটা ডাকাত দলের সভ্য।

—অসভ্য! বলে উঠলেন রামখুড়ো।—খুব খারাপ!

—তবে সে ভেবেছিল সে আর ডাকাতি করবে না। সৎপথে থাকবে।

—বাঃ ছেলেটা একেবারে সোনার টুকরো।

—তবে সে খুন-টুন করেছিল কয়েকটা।

—মহা বদমাশ! বললেন রামখুড়ো।

—তবে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল গঙ্গায় ডুব দিয়ে, গোবরজল খেয়ে।

—একেবারে হীরের টুকরো!

—কিন্তু মাঝে মাঝেই তার ইচ্ছে হত ব্যাংক ডাকাতি করতে।

—জঘন্য!

—তবে সে ইচ্ছেটাকে দমন করত মনের জোরে।

—বেশ ছেলেটা।

—তারপর তারা, বীরেশ্বর আর রমলা, রওয়ানা হয়ে পার হল উইলিংডন ব্রিজ।

উইলিংডন ব্রিজ তোমরা জানো না। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার উপর এখন যে সেতুর নাম বিবেকানন্দ সেতু, তারই নাম ছিল একদা উইলিংডন ব্রিজ। শ্যামানন্দ বললেন, সেতুর উপর দিয়ে গঙ্গা পার হতে হতে বীরেশ্বর গঙ্গাকে নমস্কার করল।

রামখুড়ো বললেন, চমৎকার। আজকালকার ছোকরাদের মধ্যে ভক্তি-টক্তি একেবারে চলে যাচ্ছে। তা বীরেশ্বর ছোকরাটি বেশ ভাল।

—কিন্তু রমলা নমস্কার জানাল না।

—আজকালকার বৌরা হয়েছে এক একটা উড়নচণ্ডী! খুব খারাপ।

—তবে তার মনে পড়ল নমস্কার জানানো হয়নি গঙ্গা পার হয়ে গিয়ে। তখন গাড়ি ঘুরিয়ে এনে সে গঙ্গাকে প্রণাম জানাল।

—খুব ভাল, খুব ভাল।

—গাড়ি চলল জোর কদমে। কিন্তু তখন তো রাস্তা দিয়ে বেশি গাড়ি-টাড়ি চলত না, সেজন্য রাস্তার লোকেরা হাঁ করে দেখতে লাগল ঐ গাড়িকে।

—অসভ্য সব!

—এমন সময় একজন লোক পথ চলতে চলতে হঠাৎ এসে পড়ল গাড়ির সামনে।

—ইঃ কী সাংঘাতিক!

—তবে ড্রাইভার গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিতে লোকটা বেঁচে গেল।

—তা ড্রাইভার আনাড়ি হলেও খারাপ তেমন ছিল না।

—কিন্তু চাপা দিল ফুটপাথে শুয়ে থাকা কুলিকে।

—বাজে ড্রাইভার।

—লোকেরা তখন হৈচৈ করে গাড়িটাকে থামাতে বলল, কিন্তু গাড়ি না থামিয়ে ড্রাইভার দিল ছুট।

—বাঃ বেশ। কিন্তু এবারে রমেখুড়ো কোনটাকে বাঃ বেশ বললেন বোঝা গেল না। লোকেদের তাড়া করাকে বেশ বললেন, না গাড়িটা জোর চালিয়ে দেওয়া তাঁর মতে বাহবার যোগ্য কেউ জানতে পারল না।

—গাড়ি চলেছে জোর। বর্ধমানের কাছে এসে গাড়ির ইনজিন খারাপ হয়ে গেল।

—বিশ্রী!

—কিন্তু দুমিনিটেই গাড়ির ইনজিন আবার সচল হল।

—চমৎকার!

—এমন সময় ধানবাদের দিক থেকে আসছিল একটা পেল্লায় লরি।

—বেশ।

—লরিটার সঙ্গে মুখোমুখি লাগল ধাক্কা গাড়িটার।

—খুব খারাপ।

—তবে গাড়িটার বিশেষ ক্ষতি হল না—সামনের দিকটা একটুখানি তুবড়ে গেল।

—বাঃ বেশ।

—তবে ড্রাইভারের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল।

—খুব বিশ্রী।

—বীরেশ্বর আর রমলা বেঁচে গেল।

—চমৎকার।

—বীরেশ্বরের মাথায় আঘাত লেগেছিল খুব।

—খারাপ।

—রমলার বিশেষ লাগেনি।

—ভাল।

—বীরেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

—বিশ্রী ব্যাপার।

—তবে কাছেই একজন ভাল ডাক্তার ছিলেন।

—ভালি, চমৎকার!

—কিন্তু তাঁর যন্ত্রপাতি সব ছিল না—তিনি সেখানে এমনি বেড়াতে গিয়েছিলেন।

—খুব খারাপ।

—তিনি একটা ইনজেকশন দিতে পারলেন না।

—বিশ্রী।

—কাছেই ছিল হাসপাতাল—।

—বাঃ বেশ।

—কিন্তু হাসপাতালে একটাও অ্যামবুলেনস্ ছিল না।

—বিশ্রী!

—শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা খাটিয়ায় করে নিয়ে যাওয়া হল।

—বাঃ বীরেশ্বরের ভাগ্য ভাল।

—কিন্তু পথেই মারা গেল বীরেশ্বর।

—খুব খারাপ।

—তাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল।

—ভাল।

—ওখানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি শুনে বললেন, মৃত্যু খুব পয়া সময়ে হয়েছে।

—বাঃ চমৎকার।

—বীরেশ্বরের স্থান স্বর্গেই হবে, একথাও জানালেন সন্ন্যাসী।

—বাঃ তারপর?

শ্যামানন্দ বললেন, তারপর আর কি হল আমি জানি না। একথা শুনে রামখুড়ো বললেন, তবে যে বললে এটা করুণ কাহিনী। কোথায় করুণ কাহিনী? কেউ স্বর্গে গেলে সেটাকে কী করে করুণ কাহিনী বলা যায়। মিথ্যেবাদী!

সেদিনকার মত গল্পের আসরই বল, আর আড্ডাই বল—শেষ হয়ে গেল।

॥ গল্প ॥
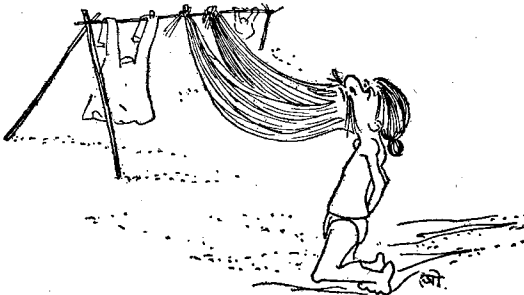
শোধবোধ

আশা দেবী

অনেকদিন আগে প্রাগ-এ এক বুড়ো বাস করত। তার ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। এত সুন্দরী আর এমন গুণের যে আশেপাশের অনেক ছেলে তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রায়ই বুড়ো কৃষকের বাড়িতে আসত। বুড়ো কিন্তু তাদের সবাইকেই বিদেয় করে দিত।

ছেলেরা যখন তারপরও নিয়মিত প্রস্তাব নিয়ে আসতে লাগল তখন বুড়ো তাদের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। এমন কি, তাদের সে বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না। তখন ছেলেরা সবাই মিলে ঠিক করল তারা চাকর সেজে বুড়োর বাড়িতে ঢুকবে।

কিন্তু বুড়োর চোখে ধুলো দেবে? বুড়ো তাদের ঠিকই চিনে ফেলত। কিন্তু এমনি করে আর কতদিন চলে। তাই বুড়ো ঠিক করল ছোকরাগুলোকে জব্দ করতে হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে বুড়ো একটা বুদ্ধি বের করল। সে ঠিক করল—এরপর তার বাড়িতে যেই চাকর হয়ে আসুক, তাকে সব রকম কাজ করতে হবে। এবং এক বছর পর বসন্তকালে কোকিল ডাকলেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর যদি মনিব বা চাকর ঐ সময়ের মধ্যে কেউ কারুর উপর অসন্তুষ্ট হয়, তবে—যে অসন্তুষ্ট হবে, অন্যে তার নাকের ডগাটা কেটে দেবে।

ফলে, তখন এই হল যে, যে সব ছেলেরা চাকর সেজে কাজ করতে আসত, বুড়ো, তাদের সঙ্গে এমনি দুর্ব্যবহার করত যে তারা রেগেমেগে চাকরি ছেড়ে পালাত, আর যাওয়ার আগে তাদের নাকের ডগাটা বিসর্জন দিয়ে যেতে হত।

শেষে কোরাণ্ডা নামে একটা বেপরোয়া ছেলে বুড়ো চাষার মেয়েকে বিয়ে করবার মতলবে চাকর সেজে এল। বুড়ো তাকে বলল : বেশ কাজ করো, কিন্তু শর্ত জানো ? বসন্তকালে যখন কোকিল ডাকবে তখনই কিন্তু চলে যেতে হবে : আর এই কাজের সময় কেউ কারোর ওপর রাগ করতে পারবে না। যদি করে—তবে যে রাগ করবে—অন্যে তার নাকের ডগাটি কুচ করে কেটে নেবে।

কোরাণ্ডা সব শুনেও কিন্তু বুড়োর এই শর্তে রাজি হল এবং কাজে লেগে গেল। কিন্তু বুড়ো কৃষক এমন সাংঘাতিক ধরনের লোক ছিল যে এই সব চাকরদের যত রকমে পারত নির্যাতন করত। না সকালে, না দুপুরে, না রাতে—সে কখনই তাকে খেতে দিত না। কিন্তু প্রতিদিনই তাকে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করত : কী হে, খুশি আছ তো ?

খুশি না থাকলেই নাকের ডগা কাটা যাবে, কাজেই প্রত্যেকবার কোরাণ্ডা হাসিমুখে জবাব দিত, বেশ আছি কর্তা। তাই বলে তো আর সে খিদেয় মরতে পারে না। কাজেই ফাঁক পেলেই রান্নাঘরে ঢুকে ভালো মাংস রুটি যা পেত খেয়ে নিত। তার এই কাণ্ড দেখে চাষার গিন্নী ভারি চটে গিয়ে একদিন কর্তার কাছে নালিশ করে দিল।

কর্তা রেগে আগুন হয়ে কোরাণ্ডার কাছে কৈফিয়ত চাইল। কোরাণ্ডা বললে : বারে, সারাদিন খেটেখুটে বুঝি আমার খিদে পায় না ? বেশ তো, তা কর্তা, যদি আমার উপর রাগ করে থাকেন তাহলে বরং আপনার নাকের ডগাটা কেটে দিন, আমিও এখান থেকে বিদেয় হব।

এখন কর্তার নাকের ডগা খোয়াবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কাজেই ব্যাজার মুখেও তাকে একগাল হেসে বলতে হল : না-না, আমি আদৌ চটিনি। তুমি বেশ করেছ।

কিন্তু তারপর থেকে তারা আর কোরাণ্ডাকে খাবার দিতে ভুলত না।

একদিন এক রবিবারে বুড়ো তার স্ত্রী ও মেয়েটাকে নিয়ে গির্জায় রওনা হল। যাবার আগে কোরাণ্ডাকে বলল, আমরা ফিরে আসবার আগে ভাল করে সুপ্ তৈরি করে রেখো। মাংস রইল, পেঁয়াজ রইল গাজর রইল।—আর ওতে গোটাকতক গুগ্‌লিও ছেড়ে দিও।

কোরাণ্ডা হুকুম মাফিক সব করল। মাংস, গাজর, পেঁয়াজ সব এক সঙ্গে মিশিয়ে চাপিয়ে দিল। আর সে সময় তার চোখে পড়ল কর্তার শখের ছোট্ট কুকুরটাকে—যাকে সবাই আদর করে গুগলি বলে ডাকে।

কোরাণ্ডা আসল গুগ্‌লির বদলে তাকেই বেশ করে কেটে কুটে সুপের মধ্যে দিল।

গির্জা থেকে ফিরে এসে বুড়ো কৃষক তো সুপ খেতে বসল। খেতে অত্যন্ত খারাপ

লাগছিল। কিন্তু বিরক্ত হবার তো জো নেই, তাহলেই নাক কাটা যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই হাসি হাসি মুখে খানিকটা জোর করে গিলে বাকিটা কুকুরটাকে খাওয়াবার জন্যে সে—"গুগ্‌লি"—"গুগ্‌লি"—বলে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু কোথায় গুগ্‌লি! সে তো ততক্ষণে বুড়োর পেটের ভেতরে। বুড়ো কুকুরটাকে খুঁজতে বার হল। কোথাও না পেয়ে তার মনে যেন সন্দেহ হল। তারপর কোরাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল: এই হতভাগা, গুগ্‌লি কুকুরটা কোথায় রে?—

—কেন? আপনিই তো স্যুপে গুগ্‌লি দিতে বলেছিলেন। আমি আপনার হুকুম মাফিক তাকে স্যুপে দিয়েছি। —কোরাণ্ডা ভালোমানুষের মত জবাব দিল।

রাগে দুঃখে বুড়োর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হল। কিন্তু গুগলি বললে তো শুধু জলের গুগলিই বোঝায় না, বাড়ির কুকুরটাকেও বোঝাতে পারে। ওদিকে কোরাণ্ডার ওপর চটবারও জো নেই, তাহলেই নাক যাবে। বেকায়দায় পড়ে বুড়োকে কিল খেয়ে কিল হজম—মানে কুকুর খেয়ে কুকুর হজম করতে হল।

কদিন পরে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে চাষা শহরে গেল কিছু কেনাকাটা করতে। যাবার আগে কোরাণ্ডাকে বলে গেল, ঘরটরগুলো খুলে রেখো, যেন আলো বাতাস ঢোকে।

ওদেরও বেরিয়ে যাওয়া আর অমনি কোরাণ্ডা একটা মই লাগিয়ে বাড়ির চালে গিয়ে উঠল। আর বুড়োর শোবার ঘরের চাল থেকে টালিগুলো টেনে নিচে ফেলে দিল। মাথার ওপর এখন খোলা আকাশ। আলো হাওয়ার একেবারে ঢালাও বন্দোবস্ত।

ফিরে এসে বাড়ির অবস্থা দেখে বুড়োর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ক্ষেপে চিৎকার করে উঠলো, একি কাণ্ড!

—আজ্ঞে, আপনিই তো ঘরে আলো হাওয়া ঢোকাবার কথা বলেছিলেন। তারই তো ব্যবস্থা করে রেখেছি। কী কর্তা, আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন বুঝি?

—না-না। আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।—বলে বুড়ো রাগে গরগর করতে করতে কোরাণ্ডার সামনে থেকে সরে গেল।

কিন্তু কোরাণ্ডাকে নিয়ে তো আর পারা যায় না। এমন একটা শয়তান চাকর আর কিছুদিন থাকলে তো ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যাবে। কিন্তু এক বছর না হলে, কোকিল না ডাকলে, তাড়ানো বা যায় কী করে। তাহলে যে সঙ্গে সঙ্গে নাকটিও কাটা যাবে।

বুড়ো তার গিন্নী আর মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটি বলল, বাবা, কাল বিকেলে ওকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে যেও। আর আমি আগে থেকে গাছে উঠে বসে থাকব আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোকিলের মত কুহু-কুহু করে ডাকব। তাহলেই তারও চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। আর আমরাও রেহাই পাব।

ফন্দিটা বুড়োর ভাল লাগল। পরদিন বিকেলে সে কোরাণ্ডাকে বলল: চল হে একটু বাগানে বেড়িয়ে আসা যাক্। কী সুন্দর বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে আজ।

কনকনে শীত কাল এমন সময় বসন্তের হাওয়া। কোরাঙ্গা বুঝতে পারল বুড়োর একটা মতলব আছে। কিন্তু মুখে কিছু না বলে না বোঝার ভান করে সে বাগানে গেল। আর বাগানে পা দিতে না-দিতেই গাছ থেকে ডাক উঠল কুহু—কুহু—কুউ—কুউ।

দারুণ খুশি হয়ে বুড়ো বললে, : ওহে বসন্তের কোকিল ডাকছে, এবারে সরে পড়ো।

কোকিলের ডাক শুনেই চালাক কোরাঙ্গা সব বুঝতে পেরেছিল। সে বললে, আহা, কোকিল ডাকছে নাকি ? বড় সুখের কথা। আমি কখনও কোকিল দেখিনি, পাখিটাকে তো একবার দেখতে হবে। বলেই সে এগিয়ে গেল গাছটার কাছে। তারপর গাছটা ধরে গোটাকতক ভীষণ ঝাঁকুনি দিল। আর যাবে কোথায় বুড়োর মেয়ে গাছ থেকে কাটা কুমড়োর মত ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

তাই দেখে বুড়ো ভাবল তার মেয়েটা বুঝি মরেই গেছে। আসলে মেয়েটির মোটেই লাগেনি। ভয়েতেই সে ভিরমি খেয়ে পড়েছিল মরার মত। বুড়ো রাগে দুঃখে চিৎকার করতে লাগল : বেরো হতচ্ছাড়া, আমার বাড়ি থেকে এখুনি দূর—হ।

কোরাঙ্গা ভালমানুষের মত বললে, আপনি তাহলে আমার ওপর চটে গেছেন হুজুর।

—ভীষণ চটেছি। আর এততেও যদি না চটি তবে চটব কীসে।

—তাই নাকি ? তাহলে এবার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। বলেই ফস্ করে পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে বলল—আপনার নাকের ডগাটা কুচ করে কেটে নি।

বুড়োর ততক্ষণে আক্কেল ফিরে এসেছে। সে—হাঁ—হাঁ করে উঠল।

না—না। নাক কাটা কী সহজ কথা তার চেয়ে আমি তোমাকে দশটা ভেড়া দিচ্ছি।

—না—আমার নাকটাই চাই। কোরাঙ্গা বললে।

—দশটা গরু !

—উঁহু ! নাক।

বুড়ো মাটিতে বসে পড়ল। আর মেয়েটি সামলে উঠে বাবার মাথায় হাওয়া করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বুড়ো বলল, তুমি কি কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না।

এইবার কোরাঙ্গা বললে, ছাড়তে পারি একটি শর্তে যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন।

কী আর করে বুড়ো ! অগত্যা দায়ে পড়ে বুড়োকে রাজি হতে হল। ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা ঘটেছিল হেলাসে। মানে প্রাচীন গ্রীকভূমিতে। ঠিক কবে যে এই অনুষ্ঠানের শুরু তা বলা যায় না। আরম্ভ প্রাগৈতিহাসিক আমলে। তাই ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম পর্বের অনেক তথ্য কালের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে।

তবে ইতিহাসের পাতায় ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম বিজয়ী হিসেবে যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন এলিসের করইবস। খ্রীস্টজন্মের ৭৭৬ বছর আগে করইবস দৌড়ে জিতেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিক ক্রীড়ার আদিপর্বে শুধু দৌড় প্রতিযোগিতাই

হোত। যতো সময় এগিয়েছে ততোই বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার আয়োজন ঘটেছে। যেমন ডিসকাস নিক্ষেপ, রথ-দৌড়, কুস্তি-বক্সিংয়ের সংমিশ্রণে একজাতীয় খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রীড়াসূচী ব্যাপকতর হতে হতে আজ ব্যাপ্তিতে কতোখানি যে হয়েছে তা ভাববার বিষয়। মস্কোয় আধুনিক ওলিম্পিকের দ্বাবিংশতিতম অনুষ্ঠানে তো একুশ রকম বিভাগীয় ক্রীড়ার আসর বসেছিল।

তবে ইতিহাস স্বীকৃত মতে করইবস প্রাচীন ওলিম্পিকের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হলেও তার অনেক আগেই ওলিম্পিকের আসর পাতা হয়েছিল। করইবস তো চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পেয়েছিলেন খ্রীস্টজন্মের ৭৭৬ বছর আগে। কিন্তু অনেকের অনুমান, খ্রীস্টপূর্ব ১২৫৩ ও ৮৮৪ অব্দের অন্তর্বর্তী কালেই ওলিম্পিক ক্রীড়ার আরম্ভ। কথিত আছে টানা বারশ' বছর ধরে চার বছর অন্তর এই অনুষ্ঠান হোত।

গ্রীক সভ্যতার উষালগ্নে এবং গ্রীক সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে কেবলমাত্র গ্রীকেরাই ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দিকে পারত। রোমানরা এসে গ্রীকভূমি জয় করে নেবার পর রোমানরাও ওলিম্পিকে অংশ নিতে থাকে। দেহে যাঁদের অবিমিশ্র হেলেনিক রক্তস্রোত বইত না, অর্থাৎ যাঁরা খাঁটি গ্রীক ছিলেন না তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ওলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান পান আর্মেনীয় তরুণ ভারাসডেট। ভারাসডেট মল্লক্রীড়ায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৫ অব্দে।

জবরদস্ত রোমান সম্রাট নিরোও ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তবে সম্রাট নিরোর সাফল্য একেবারে ভেজালবিহীন বা যথার্থই কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না। কি করে তিনি বিজয়ীর বেশ ধরেছিলেন তা জানলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। রোম সম্রাট নিরো ছিলেন খামখেয়ালী এবং অত্যাচারী। তাঁর শাসনকালে তাঁর ভয়ে অনেকেরই বুক কাঁপতো। ওলিম্পিক অনুষ্ঠান দেখে তাঁরও এই প্রতিযোগিতা জয়ের সাধ জাগে। অতএব সম্রাট স্থির করেন যে তিনি রথ-দৌড়ে অংশ নেবেন।

খ্রীস্টজন্মের ৬৭ বছর আগে প্রাচীন ওলিম্পিকের ২১১তম অনুষ্ঠানে সম্রাট নিরো রথ-দৌড়ে যোগ দেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারুর সাহসে কুলোয় নি। তাই একমাত্র প্রতিযোগী হিসেবেই তিনি সেবার রথ-দৌড়ে শীর্ষস্থান পান। তবে অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও অনেক ধকল সহ্য করে তবেই নিরোকে বিজয়ীর সম্মান পেতে হয়েছিল।

বেয়াদপ ঘোড়াগুলো এমন জোরে দৌড় শুরু করে দিয়েছিল যে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর সম্রাট নিরো পর্যন্ত দৌড়ের টানে বেসামাল। এক ফাঁকে স্বয়ং সম্রাট রথ থেকে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বাধ্য হন। সাহায্যকারীরা এসে ধরে তাঁকে আবার রথে তুলে দেন। পুরো দৌড় পথটি তিনি রথে চড়ে অতিক্রম করেছিলেন কিনা কে জানে। তবু সেই প্রতিযোগিতায় সম্রাট নিরোকেই বিজয়ী বলে অভিনন্দিত করা

হয়েছিল। না করে উপায়ও বা কি ছিল! সম্রাটকে বিজয়ীর সম্মান না জানালে সম্রাটের কোপেই যে বিচারকদের গর্দান ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

সেকালে রথ-দৌড়ে যোগ দিতেন বিত্তশালী অভিজাতরা। চার ঘোড়ায় টানা রথ তো আর সাধারণ মানুষ যোগাড় করতে পারতো না। তাতে যেমন তেমন ঘোড়া হলে চলতো না। ঝড়ের বেগে ছুটতে পারতো যে সব ঘোড়া সেগুলি সংগ্রহ করতে বিত্তবানদের মোটা অঙ্কের গাঁটের কড়ি ফেলতে হোত।

এমনি তেজী ও দ্রুতগামী ঘোড়া ছিল কিমনের। তারা পরপর তিনটি ওলিম্পিকে কিমনকে জেতালে কিমন নিজেও পোষা প্রাণীগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে চান। ঘোড়াগুলি মারা গেলে কিমনদের পারিবারিক কবরখানাতেই তাদের সমাধিস্থ করা হয় এবং রাজধানী এথেন্সে তাদের স্মরণে ব্রোঞ্জে গড়া একটি অশ্বের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়।

আধুনিক কালে ওলিম্পিক ক্রীড়ায় রথ-দৌড় অবশ্য হয় না। তবে অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। দামী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে অনেকে সেই প্রতিযোগিতা মাৎ করে দিয়েছেনও। কিন্তু বাহনের প্রতি ঋণ স্বীকারে কেউ কি এমনভাবে প্রকাশ্যে এগিয়ে এসেছেন?

প্রাচীন গ্রীসে নিরাপত্তার প্রশ্নে শহরগুলিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হোত। এক-এক শহরের কেউ ওলিম্পিকে জিতে ফিরলে বাইরের পাঁচিলে গর্ত করে ওলিম্পিক
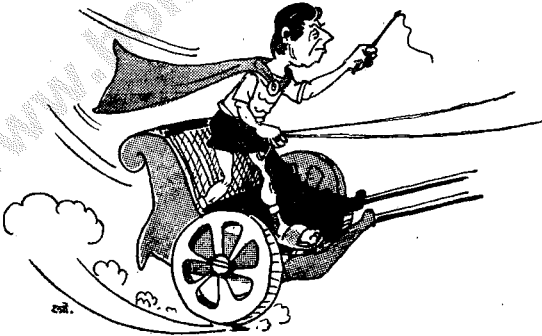
চ্যাম্পিয়নকে গর্তের ভেতর দিয়ে নিজের শহরের অভ্যন্তরে আনানো হোত। প্রত্যাবর্তনের এই দৃষ্টান্ত ছিল এক অনুষ্ঠান বিশেষ এবং বিজয়ীর পক্ষে বিশেষ সম্মানজনক। এক শহরের কতোজন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দেওয়ালের গর্ত দেখে ও গুণে তার সংখ্যা জেনে নেওয়া যেতো। যে শহরের দেওয়ালে গর্তের সংখ্যা বেশি জনসাধারণের দৃষ্টিতে তার মর্যাদাও ছিল তেমনি। দেওয়ালের গর্তের সংখ্যা নিয়েই এক এক শহরের গর্ব বাড়তো।

ওলিম্পিক বিজয়ীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা উঠলেই মুষ্টিযোদ্ধা স্ট্র্যাটোফেনের করুণ কাহিনী আপনা হতেই মনে পড়ে যায়। বেচারী স্ট্র্যাটোফেন ওলিম্পিকে বক্সিং লড়ে নিজের শহরে ফিরলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব, কেউ তাঁকে চিনতে পারেন নি। চিনবে কী করে? প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘুঁষির ঘায়ে তাঁর গোটা মুখমণ্ডল এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ফলে চেনার আর কোনো রাস্তাই ছিল না। তুলোভরা দস্তানা এঁটে বক্সিং লড়ার রীতি তখন চালু হয় নি। খালি হাতে লড়াই চলার পরিণাম রক্তক্ষরণ তো হোতই। মুখের হাড়গোড় ভাঙচুর হয়ে যেতো। সময় সময় প্রাণহানিও ঘটতো। তা বক্সিংয়ে কি একালেও প্রাণহানি ঘটছে না? নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা সত্ত্বেও? আসলে মুষ্টিযুদ্ধ এক বিপজ্জনক খেলা। কি সেকাল কি একাল, সব কালেই মুষ্টিযুদ্ধে বিপদের গন্ধ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন গ্রীসে মেয়েদের ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া তো দূরে থাক, দর্শক হিসেবে অনুষ্ঠান কেন্দ্রে হাজির থাকার অধিকারই ছিল না, মেয়েদের সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী করে হুমকি তোলা হয়েছিল যে মেয়েরা কৌতূহলবশে ওলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্রে হাজির হলে তাদের মৃত্যুদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করা হতে পারে।

নিষেধাজ্ঞার ভয়ে মেয়েরা ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমির দিকে উঁকি দিতে চাইতেন না। তবে কেউ যে কখনও লুকিয়ে চুরিয়ে এসে পড়েন নি, এমনও নয়। শোনা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব ৩৯৬ অব্দে ৯৬তম ওলিম্পিকে মুষ্টিযোদ্ধা পিসিভোরাসের জননী ছেলের লড়াই দেখতে শ্রমিকদের ছদ্মবেশ ধরে অনুষ্ঠানকেন্দ্রে এসেছিলেন। কিন্তু ছেলে যেই ওলিম্পিক মুষ্টি-যুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পান অমনি তথাকথিত শ্রমিক আনন্দে ও আবেগে এমনই অস্থির হয়ে পড়েন যে শ্রমিকের ছদ্মবেশে থাকা পিঁসিভোরাস জননীর আসল পরিচয় তখুনি ধরা পড়ে যায়।

ধরা পড়ার পর পিসিভোরাস জননীর প্রাণদণ্ড হয় আর কি! তবে অনেক অনুনয়, আবেদন নিবেদনের পর তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত মকুব হয়ে যায় যেহেতু তিনি একজন ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের শুধু জননীই নন, বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ ভায়গেরাসের কন্যাও বটে। ভায়গেরাস খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৪ অব্দে ৭৯ তম ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

সেই থেকে স্থির হয় যে প্রতিযোগীদের মতো শ্রমিকদেরও সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ক্রীড়াকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধরার পথ এইভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রাচীন গ্রীক প্রতিযোগীরা সম্পূর্ণ নিরাবন অবস্থায় খেলাধূলায় যোগ দিতেন কেন? সম্পূর্ণ নিরাবরণ থাকায় তারা বাধ্য থাকতেন কি কোনো নিয়মের বলে? না, তেমন কোনো নিয়ম গোড়ার পর্বে ছিল না। তবে ব্যাপারটা প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়ে যায় খ্রীস্টপূর্ব ৭২০ অব্দের পর।

খ্রীস্টপূর্ব ৭২০ অব্দে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিক ক্রীড়ায় প্রতিযোগী অরসিপাস যখন সাধ্যমত জোরে দৌড়েছিলেন তখন তাঁর কটিবন্ধন শিথিল ও খুলে পড়ে যায়। অরসিপাস কটি-বন্ধনটিকে আর জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন নি। ভারমুক্ত অবস্থায় আরও দ্রুতপদে দৌড়ে তিনি সেই প্রতিযোগিতা জয় করে ফেলেন। তার আগে পর্যন্ত প্রতিযোগীদের কোমরে থাকতো বহির্বাস জড়ানো। কিন্তু সেটুকু ঝেড়ে ফেললে ভারশূন্য হওয়া যায় বুঝেই উত্তর-পর্বে প্রতিযোগীরা নিরাবরণ করার রীতিই অনুসরণ করে।

সম্পূর্ণ নিরাবরণ পুরুষ প্রতিযোগীদের দৌড়ঝাঁপ দেখতে রুচিকর নয়, হয়তো এই উপলব্ধি থেকেই সেকালে মেয়েদের প্রতিযোগিতা ভূমিতে আসতে দেওয়া হোত না। তবে কোনো বিত্তশালিনীর রথ রথ-দৌড়ে যোগ দিতে পারতো।
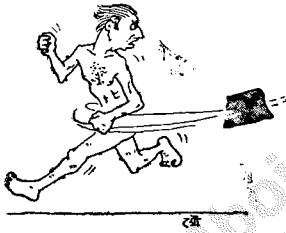
আধুনিক ওলিম্পিকের প্রথম পর্বেও মেয়েরা আসরে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের আবির্ভাব ঘটে ১৯২২ সালে স্টকহোমে, আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার পঞ্চম অনুষ্ঠানে। সেবার ওলিম্পিক আসরে মহিলারা আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন সাঁতারু হিসেবে। তারপর ধীরে ধীরে নানান বিভাগীয় খেলায় মেয়েরা অংশ নিতে থাকেন। ১৯৬৮ সালে মশাল হাতে স্টেডিয়ামে দৌড়ে পূতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন মেক্সিকান সুন্দরী এনরিকোয়েটা ব্যাসিলিও। তিনিই প্রথমা। ইতিহাসের নবনায়িকা।

ওলিম্পিক সর্বজনীন ক্রীড়া, এই আসরে শ্রেণী, সম্প্রদায়গত বৈষম্য প্রশ্রয় পায় না। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন সবাই একত্রে যোগ দিতে পারে। প্রতিযোগীরা একত্রে বসবাস করে শ্রেণী বৈষম্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে। ওলিম্পিক উপলক্ষে শ্রেণী বৈষম্যের বাঁধ ভেঙে একই ঘরে বাস করেছেন অস্ট্রিয়ার রাজকুমার ফার্ডিন্যাণ্ড তাঁর দেশের এক চর্মকার, একজন পুলিস ও এক মোটর চালকের সঙ্গে। ফ্যার্ডিন্যাণ্ডের মত তারাও ছিলেন ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলসে ওলিম্পিক গ্রামে প্রতিযোগী, উত্তরপর্বে গ্রীসের রাজকুমার ও ইংলণ্ডের রাজকুমারী ওলিম্পিক গ্রীস সাধারণ প্রতিযোগীদের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন ওলিম্পিক চলা কালে। রাজকুমারী অ্যানি অশ্বারোহণ এবং গ্রীক রাজকুমার কনস্টানটাইন ওলিম্পিকে নৌবাইচে যোগ দিয়েছিলেন।

ওলিম্পিকের সবচেয়ে দূরপাল্লার দৌড় হলো ম্যারাথন রেস। প্রতিযোগীদের দৌড়ে ছাব্বিশ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। ম্যারাথন রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি এই রকম :

খ্রীস্টজন্মের ৪৯০ বছর আগে এথেন্সের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ম্যারাথন রণাঙ্গনে পারস্য

ও এথেন্সের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শেষোক্ত পক্ষের জয় হতে গ্রীক সেনানী ফিডিপিডেস ম্যারাথন থেকে এথেন্স, দীর্ঘ বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ দৌড়ে এথেন্স-বাসীদের বিজয়বার্তা শুনিয়েছিলেন কিন্তু দীর্ঘ পথ দৌড়ানোর পরিশ্রমে ক্লান্ত তিনি 'আমরা জিতেছি, আপনারা আনন্দ করুন' মাত্র এই কটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাহিনীটির সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে গেলেও এই কিংবদন্তী অমর হয়ে আছে। এই কাহিনীই স্মরণ করে আধুনিক ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন ঘটানো হয়।

শ্রমসাধ্য ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিতে গিয়ে অনেক প্রতিযোগীকেই শারীরিক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। অত্যধিক পরিশ্রমে অনেকের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম ঘটিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯১২ সালে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ম্যারাথন দৌড়তে গিয়ে পোর্তুগীজ প্রতিযোগী লাজারো প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। তবে শরীরের এসব দুর্ভোগ নস্যাৎ জ্ঞান করে যিনি মজার স্বাদে মজে থাকতে ম্যারাথন রেসে দৌড়েছিলেন তিনি হলেন কিউবার তরুণ ফেলিক্স কারাজল। ১৯০৪ সালে সেণ্ট লুইতে ম্যারাথন দৌড়বার সময় কারাজল যখন তখন পথিপার্শ্বের বাগানে ঢুকে পড়ে পাকা ফল পেড়ে তা মুখে পুরে নিচ্ছিলেন। কখনও বা পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠছিলেন। এমনি করে হালকা মেজাজে ছুটেই কারাজল সেবার ওলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকার করেন। কে জানে প্রতিযোগিতা জয়ের প্রতি আরও গুরুত্ব দিতে চাইলে কারাজল সেণ্ট লুইতে ম্যারাথনে হয়তো সোনাই পেয়ে বসতেন।

পর পর দুটি ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে কেউ শীর্ষস্থান পেয়েছেন কি ? হ্যাঁ পেয়েছেন ! এই শ্রুতকীর্তি অ্যাথালিটের নাম আবেবে বিকিলা। নিবাস ইথিওপিয়া। ১৯৬০ সালে রোমে এবং ১৯৬৪তে টোকিওতে তিনি সোনা পান। রোমে দৌড়েছিলেন খালি পায়ে। একেই আফ্রিকার মানুষ, তার ওপর নগ্নপদ। দেখে প্রথম প্রথম দর্শকরা তো আবিবের দিকে ফিরেও তাকাতে চান নি। কিন্তু এক এক করে সবাইকে পেছনে ফেলে রেখে নগ্ন পদ আফ্রিকার তরুণ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যান তখন কিন্তু সকলের দৃষ্টি ছিল তাঁরই দিকে কেন্দ্রীভূত। সবাই সোচ্চার তারই জয়ধ্বনিতে। আবেবে বিকিলা ছাড়া আর কেউই পর পর ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে শীর্ষস্থান পান নি। দীর্ঘ দৌড়ের ইতিহাসে তাঁর কীর্তি অবিস্মরণীয়।

প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিক ক্রীড়াকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভের মুখে দেবরাজ জিউসের এবং অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা করা হোত। লোকান্তরিত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হোত।

আধুনিক ওলিম্পিক অবশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা পায় নি। তবে সময় সময়

কোনো কোনো প্রতিযোগী এই আসরে উপস্থিত থেকেও প্রকৃতিতে তিনি যে একান্তই ধর্মভীরু তার পরিচয় রাখতে ভোলেন নি।

বিষয়টি উঠলেই স্কটিশ অ্যাথালিট লিডেলের নাম মনে পড়ে যায়। লিডেল ছিলেন এক ধর্মভীরু মানুষ। ১৯২৪ সালে প্যারিসে শত মিটার দৌড়ের হিট্ টপকে তিনি সহজেই ফাইন্যালে উঠে যান। এক একটি হিটে তিনি এতো কম সময়ে শত মিটার দৌড়েছিলেন যে সবাই ধরে নিয়েছিল যে ফাইন্যালে তাঁকে হারায় কে! সেখানেও তিনি জিতবেন। কিন্তু ফাইন্যালের দিন দেখা গেল যে দৌড়ের আসরে লিডেল অনুপস্থিত। কেন? বলছি;

প্যারিসে শতমিটার দৌড়ের ফাইন্যাল হয়েছিল রবিবারে। রবিবার খ্রীস্টানদের উপাসনার দিন। খেলাধুলার মত হালকা জিনিস নিয়ে মেতে থাকার দিন নয়। লিডেল তাই সাপ্তাহিক উপাসনার দিনটি অতিবাহিত করেন প্যারিসের এক গির্জায়। ট্র্যাকের ধারে প্রতিযোগী লিডেলের যখন ডাক পড়ে তখন তিনি ছিলেন গির্জার অভ্যন্তরে প্রভু যীশুর আশীর্বাদ পাওয়ার আশায়।

আর এক ধর্মপ্রাণ আথ্যালিট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এফ সি স্মিথসন। ১৯০৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে তিনি ১১০ মিটার হার্ডল দৌড়ে সোনা পেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে ফাইন্যালে যোগ দেওয়ার বিষয় ঘিরে তাঁকে এক নিদারুণ মানসিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এই ফাইন্যালও হয় রবিবারে, উপাসনার দিন। স্মিথসন প্রথমে স্থির করেন যে রবিবার তিনি খেলাধুলায় যোগ দেবেন না। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, মার্কিন দলের কর্মকর্তাদের অনুরোধ, উপরোধের চাপে তাঁকে আবার সিদ্ধান্ত পালটে হার্ডল দৌড়ের ফাইন্যালে যোগ দিতে হয়। তবে দৌড়ে যোগ দিলেও ধর্মপুস্তক বাইবেল সঙ্গে নিতে তিনি ভোলেন নি। বাইবেল হাতে নিয়েই স্মিথসন দৌড়ান এবং সবার আগে প্রতিযোগিতার পথ উৎরে যান।

লিডেল বা স্মিথসনের কাহিনী কারুর বিচারে মজার হলেও ধর্মভীরুদের কাছে তা খুবই অর্থবহ ব্যাপার। এমন অভিনব দৃষ্টান্ত ওলিম্পিক তথা খেলাধুলার আসরে খুব বেশি নজরে পড়ে না। পড়ে কি?
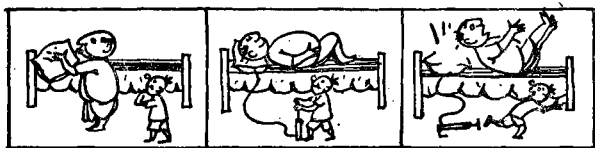
মা ভুষোকালীর মহিমা

শক্তিপদ রাজগুরু

রেজাল্ট বের হবার দিন ইস্কুলে এসে দেখি কম্পা কপালে বিরাট এক সিঁদুরের মাড়ুলি এঁকে এসেছে—মাড়ুলি গোলাকারই হয়, এটা ঠিক তেমন নয়, লম্বা সড়কের মত—নাক থেকে চুলের গোড়া অবধি !

অন্যবার কম্পা রেজাল্ট বের হবার দিনটিতে গরহাজির থাকে। কারণ সে জানে প্রমোশন নির্ঘাৎ পাবে না। আর এ খবরটা সে আগেই পেয়ে যায় স্যারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে। আজ তাকে হাসিমুখে স্কুলে হাজির থাকতে দেখে শুধাই—প্রমোশন পাবি তাহলে। কম্পা বলে—তোর মত ফার্স্ট সেকেণ্ড না হতে পারি, পাস করবো না বলিস কি রে ? তালে ভুষোকালীমাকে এত জাগ্রত বলবি কেন ?

আরও অবাক হই কম্পা এবার একচান্সেই প্রমোশন পেয়েছে। স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন সে, খেলাধুলায় ভলেনটিয়ারিতে—নানা কর্মে চৌকস। কিন্তু গোল বাধে বই পড়ার ব্যাপারে। শুধু সেকেণ্ড স্যার গেমটিচার ওকে ভালোবাসেন, কম্পা এখানে প্রমোশন না পেলে দক্ষিণপাড়া হাইস্কুল ওকে লুফে নেবে, তাই বোধহয় কম্পা ক্লাসের বেড়াটা টপকায় ওদের ঠেলাতে।

ও এবার প্রমোশন পেতে আমরাও অবাক হই—কি করে পাশ করলি ?

কম্পাই বলে—মনে নেই। ভুষোকালী মাকে ক্যামন পেন্নামী দিলাম—মা দয়া করবে না ?

ব্যাপারটা মনে করে অবাক হই—সে কি রে !

গ্রামের বাইরে আমবাগান— একটা ছোটখাটো দীঘির ধারে মা ভুষোকালীর মন্দির। ঘটা করে মেলা বসে সেখানে পুজোর পরই। দূর দূরান্তর থেকে যাত্রীরা আসে।

কম্পাই এতকাল আমাদের ঘাড় ভেঙে খেয়েছে। ও ব্যাটা যেন ছিনে জোঁক। যতক্ষণ না কিছু খসাবে ততক্ষণ সে ছাড়বে না। আর ওকে না খাওয়ালে ফুটবল টিমে চান্স দেবে না। পাড়ার যাত্রার আসর ম্যানেজ করার দায়িত্ব ওর উপর, এবার পুজোর সময় জায়গা তো পাই নি ! যাত্রার মাঠ ভরে গেছে লোকের ভিড়ে, তিলধারণের ঠাঁই নেই। অথচ আসরের কাছে না বসলে যুদ্ধটা ভালো দেখা যাবে না।

কম্পা ওদিকে ব্যস্ত। আমরা জায়গার কথা বলতেই ও বলে—মাংসের কারি আর পাঁউরুটি খাওয়াবি বল—ব্যবস্থা করছি।

চারজনে চাঁদা করে খাওয়ালাম ওকে যাত্রাতলায়। তাগাদা দিই—কইরে কম্পা, জায়গা কই!

মাঝে মাঝে সরু পথ, চারিদিকে জনসমুদ্র। কম্পা কি ভেবে আমাদের দলের কালীপদ আর যতীনকে বুদ্ধিটা বাতলে দিয়ে বলে—চল!

ওই সরু পথটা যাতায়াতের জন্য, বসার ঠাঁই নেই। হুঁড়ি পথ ধরে আসরের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ যতীন লাফ দিয়ে পড়ল কালীপদর উপর। চীৎকার করছে কালীপদ ফাটাগলায়—মেরে ফেলল! খুন করে দেবে—

যতীনও গর্জায়—মুণ্ডু নেব তোর! খবরদার—কেউ এগোবে না?

দুজনে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যায়, লোকজন লাফ দিয়ে ওঠে। কলরব উঠছে কম্পা ইশারা করে—বসে পড়, জায়গা দখল কর।

আমরা বসে পড়েছি। ভলেনটিয়ার কম্পা—আরও দুচারজন ছুটে আসে! সব সুমসাম হয়, আমরাও বসে পড়েছি ততক্ষণে! যাত্রা দেখার কোন অসুবিধাই হয় না।

এহেন কম্পা সেদিন ভুষোকালির মেলায় বলে।—তোদের খাওয়াব আজ। চল!

বেশ জাঁকালো মেলা। সারবন্দী মিষ্টির দোকান—মনোহারী দোকান—চা-চপের দোকান বসে। নাগরদোলা—সার্কাসও আসে। কম্পা নিয়ে গিয়ে ভেলুর দোকানে বসালো। ভেলু কেত্তন গায় অন্যসময়ে, মেলার মরসুমে তক্তা পেতে টেবিল বানিয়ে কদিন চা-চপ-কাটলেট ভাজে। বিক্রিও হয় এন্তার।

চা-কাটলেট খাইয়ে কম্পাই দামটা দেয় পকেট থেকে। বললে—চল, এবার। সার্কাস দেখাতে হবে কিন্তু। দুআনা করে টিকিট!

দীঘির ওদিকে চলেছি মনোহারী পাটির পাশ দিয়ে, চা-কাটলেট খাবার পর মেজাজটা খুশি খুশিই হয়েছে। হঠাৎ ভেলুকে হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসতে দেখে চাইলাম! আর কিছু বলার আগেই ভেলু এসে লাফ দিয়ে কম্পাকে ধরেছে। গর্জাচ্ছে সে।

—অচল টাকা চালিয়ে আসার আর জায়গা পাসনি! এই নে তোর টাকা—

তখন রুপোর টাকারই চলতি ছিল বাজারে। একটাকার নোট ছিল না। বেশ টং করে আওয়াজ হতো সেই টাকার, ওই আওয়াজ শুনেই বোঝা যেতো আসল না নকল! এ টাকাটা নকলই—বাজে না। ঢ্যাবঢেবে আওয়াজ ওঠে।

কম্পাও তোড়ে জবাব দেয়—না! ও টাকা দিই নি। আমার কি নাম লেখা আছে ওতে। তখন তো দেখে নিয়েছো?

ভেলু বেশ মোটা খদ্দেরের নামে টাকাটা দেখে নেয়নি! সেও ছাড়বে না। লোকজন জুটে যায়। মেলার দোকানদারও সমর্থন করে ভেলুকে। কম্পার পকেটে ওইটিই ছিল সম্বল। ফলে দৃশ্যটা বেশ জমে ওঠে। কে বলে—

দল বেঁধে অচল টাকা চালাতে বের হয়েছো?

কালীপদ চটে গিয়ে বলে—দাও ও টাকা! দ্যাখো এটা চলে কিনা?

ভেলু কালীপদর দেওয়া টাকাটা বাজিয়ে খুশী হয়ে সেটা নিয়ে কম্পার টাকাটা ফেরত দিয়ে চলে গেল।

কম্পা বলে—বাইরে এসে—ভাবলাম চলে যাবে, তা ধরে ফেললে ব্যাটা। ঠিক আছে—সার্কাসে চল দেখি!

তার আগে একবার ট্রাই নিল কম্পা মনোহারী দোকানে কি কেনার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই দোকানদার একনজরেই টাকাটা দেখে ফেরত দিয়ে বলে,

—এটা বদলে দাও বাবু!

অর্থাৎ মনোহারী দোকানদারের মনহরণ করাও গেল না।

কম্পাও নাছোড়-বান্দা। দু'একবার এদিক ওদিকে ট্রাই করে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বলে—সন্ধ্যা হলে ঠিক চলবে।

অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে নাকি অচল টাকা সচল হয়ে ওঠে। তাই কম্পার টানেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে চলেছি। বিরাট লাইন সেখানে। ভিড়ও বেশ। ব্যাণ্ড বাজছে।

কম্পা খুশী হয়। বলে সে—এখানে নির্ঘাত চলবে এটা।

লাইনএর মুখটা টিকিটঘরের খোপের কাছে আসতে কম্পাও হাত বাড়িয়ে টাকাটা দিয়ে গম্ভীর মেজাজে বলে—চারটা গ্যালারির টিকিট!

মনে মনে তাবৎ দেব-দেবীকে ডাকছি। আমাদের পকেটে শেষ সঞ্চয়ও আর নেই। কচুরি ডালপুরিতে চলে গেছে। আধঘণ্টা লাইনে দাঁড়াবার পর টিকিটঘরের মুখে

এসেছি, ওদিকে লাল পর্দার ফাঁক দিয়ে সার্কাসের গোল রিংটা দেখা যাচ্ছে। লোকজন ঢুকছে বাঘের খেলা, হাতির খেলা শুরু হবে।

হঠাৎ খোপের ওদিক থেকে বাঁজখাই গলায় কে বলে—এটাকা বদলে দাও। চলবে না।

কম্পা তবু প্রতিবাদ করে—কেন চলবে না? আমি তো নিইছি।

—বদলে দাও!

কম্পা কি বলার চেষ্টা করতে পিছন থেকে লোকজন তাগাদা দেয়—ভাই বদলে দাও না? না হলে সরে পড়ো।

আধ ঘণ্টা—পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর লাইন ছেড়ে এসে মাঠের আলের উপরই বসে পড়লাম। সার্কাসের তাঁবুতে তখন ব্যাণ্ড বাজছে—খেলা শুরু হয়ে গেছে। চটে উঠি কম্পার উপরই—ওই অচল টাকা দেখিয়ে তুই আমাদের পয়সা খেলি আর সার্কাস দেখাও হ'ল না। তোর জন্যই এই ভোগান্তি!

কম্পা চুপ করে থাকে। ওটা ওর গুণই। কথা কম বলে। হঠাৎ কি ভেবে বলে সে—চল ভুষোকালীর মন্দির। ওখানে খাসা কালীকেত্তন শুনবি! পয়সা লাগবে না। হয়তো খিচুড়ি মাংস প্রসাদও পেয়ে যাবি।

মা ভুষোকালী জাগ্রত দেবী। তার নামে কিছু বলতে পারি না। তবু বলি—আর কালীকেত্তন শুনে কাজ নাই।

তবু যেতেই হয়।

মেলায় এলে মা কালীকে প্রণাম করে যাবো না—এ হয় না।

তাই চললাম মুখ বুজে।

চত্বরের ওদিকে বাধান নাটমন্দিরে তখন কয়েকজন লোক গেরুয়া আলখাল্লা পরে মাথায় গেরুয়া পাগড়ী জড়িয়ে বেদম চীৎকার করে চলেছে। গান না আর্তনাদ কিছু বোঝার উপায় নেই, আর পূবপাড়ার ফটিক চাটুয্যে টাক মাথা নেড়ে একটা পাখোয়াজ বাজিয়ে চলেছে গুরুগুরু শব্দে। বিকট আওয়াজ, শুনলে বুক কাঁপে।

কম্পা ওখানে ভক্তিযুক্ত হয়ে নাটমন্দিরে বসেছে—সামনের বড় পরাতে-ভক্তরা প্রণামী দিচ্ছে, টাকা আনি দুআনিতে ভরে উঠেছে।

বড় পূজারী চক্ষু নিমীলিত করে ভাবস্থ হয়ে বসে, ওপাশে অন্যজন নজর রাখছে কে কেমন প্রণামী দিচ্ছে।

অবাক হই।

হঠাৎ কম্পা ভক্তিভরে মা কালীকে প্রণাম করে সেই একমাত্র সম্বল অচল টাকাটাই বেশ জোর করে পরাতের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গদ্গদ কণ্ঠে চীৎকার করে—মা! মাগো!

আবার প্রণাম করে বসলো চোখ বুজে।

রাত হয়ে আসছে।

অবশ্য কালীকীর্তন তখনও সগর্জনে সহুঙ্কারে চলেছে। আমরা উঠছি।

ছোট পূজারী বলে—প্রসাদ নিয়ে যাও বাবা সকলে।

তখনকার দিনে এক টাকার মূল্য অনেক। বেশ জব্বর ভক্ত না হলে কেউ ষোল আনা প্রণামী দেয় না। কম্পা যেন অসাধ্যসাধন করেছে। পূজারীর সঙ্গে ভোগমন্দিরে গিয়ে শালপাতা পেতে বসলাম খিচুড়ি বেগুন ভাজা আর এক টুকরো মাংসও খুঁজে পেলাম ঝোলের মধ্যে, তবু প্রসাদ বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে বের হয়ে এলাম। কোথায় যেন কুণ্ঠা বোধহয়।

বলি—একি করলি কম্পা? অচল টাকাটা এখানে দিয়ে ভরপেট প্রসাদ সেঁটে গেলি?

কম্পা বলে ওঠে—এই না হলে জাগ্রত মা কালী! এখানেই ওই অচল টাকা চলে গেল দেখলি! সবই মায়ের দয়া রে।

অচল মালও সচল হয়ে ওঠে।

আজ কম্পা সকালেই মা ভুষোকালীর সিঁদুর কপালে লেপে এসে বলে—বলেছিলাম না—মায়ের কাছে সব চলে। সব অচল মাল সচল হয়ে ওঠে! মা খুব জাগ্রত রে!

কালীপদ বলে—পড়েছিলি না স্রেফ টুকেই-উৎরে গেলি। ফাইন্যালে কি করবি?

কম্পা সিঁদুর রঞ্জিত কপাল কুচকে গর্জে ওঠে,

এ্যাই। খবরদার আন্‌সান্ কথা বলবি নে?
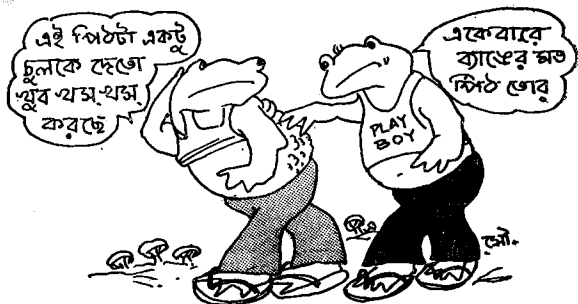
হিরণ মিনার

নারায়ণ সান্যাল

সম্রাট আকবর যখন তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা হয়ে বসেন তখন তিনি এই তোমাদেরই বয়সী—তের চৌদ্দ। মাত্র পাঁচ বছরের ভিতরেই অভিভাবক বৈরাম খাঁকে তীর্থ করতে পাঠিয়ে দিয়ে সেই কিশোর বয়সেই তিনি শাসনদণ্ড নিজের হাতে তুলে নেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি নদীপথে একবার দিল্লী থেকে আগ্রায় আসেন এবং তখনই যমুনার ধার ঘেঁষে আগ্রাতে একটি কেল্লা বানাবেন বলে স্থির করেন। সে সময়ে আকবরের বিমাতা হাজী বানু বেগম দিল্লীতে একটি অপরূপ স্মৃতিসৌধ বানাচ্ছিলেন—তাঁর স্বর্গত স্বামীর, অর্থাৎ আকবরের পিতৃদেব হুমায়ুনের। তোমরা, যারা দিল্লী গিয়েছ তারা নিশ্চয়ই দেখেছ সেটা—'হুমায়ুনস টুম্ব্'! অসাধারণ সে স্মৃতিসৌধ! সেটি পরিকল্পনা করেছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাধর স্থপতিবিদ্—উস্তাদ্ মীরক মির্জ গিয়াস। তিনি পারস্যের লোক; অনেক মোহর ব্যয় করে হাজী বেগম-সাহেবা ঐ বিশ্রুত-কীর্তি পারসিক স্থপতিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে এসে তাঁর স্বামীর স্মৃতিসৌধটি বানাবার দায়িত্ব দেন।

কিশোর আকবর যখন আগ্রা-কিল্লা বানানোর পরিকল্পনা করছেন তখন অনেক আমীর ওমরাহই তাঁকে পরামর্শ দিলেন উস্তাদ্ মির্জা গিয়াস্‌কে দিল্লী থেকে নিয়ে এসে এ
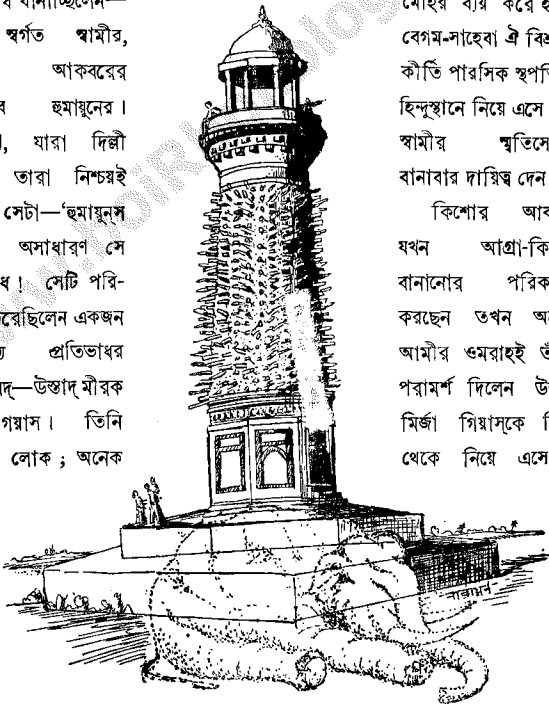
কাজের দায়িত্ব দিতে। আকবর রাজী হলেন না—উস্তাদ্ গিয়াসের প্রাপ্য পাই পয়সা মিটিয়ে বিদায় দিলেন তিনি! কেন জানো? সেই কিশোর-বয়সী বাদশা বুঝতে পেরেছিলেন—ভারতবর্ষ একা মুসলমানের নয়, একা হিন্দুর নয়—এ পুণ্যভূমি মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। মির্জা গিয়াস্ নিছক পারসিক ঢঙে—মুসলমানী কায়দায় বাড়ির নক্শা বানাতে জানেন। সেটা সম্রাটের পছন্দ নয়। তাই তিনি আগ্রা কিল্লা তৈরি করার জন্য তামাম হিন্দুস্থানের নামকরা বাস্তুবিদ্দের রাজধানীতে সমবেত করলেন। তোমরা আগ্রা-কিল্লা দেখেছ? সেখানে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ আছে, তার নাম 'জাহাঙ্গীরী মহল'। আকবরের তৈরি। সম্রাটের সমসময়ে রচিত আবুল ফজলের লেখা ইতিহাস 'আকবর-নামায়' যে মোকামের উল্লেখ করা হয়েছে 'বাংগালী মহল্' বলে! কেন জানো? বাঙলাদেশ থেকে এলেমদার মিস্ত্রি নিয়ে গিয়ে সম্রাট আকবর সেই সৌধটি নির্মাণ করান।

তিনশ বছর ধরে বিজয়ী মুসলমান সম্রাটেরা যে কথাটা খেয়াল করেননি, তোমাদেরই বয়সী সম্রাট আকবর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর স্থাপত্যে হিন্দু-মুসলমান শৈলীর প্রথম মিলন হল!

আমি ইস্লামী-স্থাপত্যের উপর একটা বই লিখছি; তাই গত বছর আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিটাকে নিবিড়ভাবে দেখবার জন্য রওনা হয়েছিলাম।

ফতেপুর সিক্রি আগ্রা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে। এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। সকালের বাসে টুরিস্টদের দল আসে, সারাদিন হৈহৈ করে, ক্লিক-ক্লিক ফটো তোলে আর সন্ধ্যা-নাগাদ ফিরে যায়—তখন সেটা শেয়াল-পেঁচার রাজত্ব। আমাকে অবশ্য মাপজোপ নিতে হবে, স্কেচ আঁকতে হবে, তাই দিন-তিনেকের জন্য তখনকার ডাক বাঙ্লো 'বুক' করে রওনা হয়েছিলাম।

ফতেপুর সিক্রিতে কী দেখেছিলাম সে-কথা বল্তে লোভ হচ্ছে—বুলন্দ্ দরওয়াজা সেলিম চিস্তির কবর, অনুপ তালাও, বীরবল বা তানসেনের প্রাসাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাহলে মহাভারত লিখতে হয়। তাই শুধু একটি মাত্র স্থাপত্য-কীর্তির কথা তোমাদের জানাচ্ছি: হিরণ মিনার!

পরিত্যক্ত প্রাসাদ-চত্বরের বাহিরে, অনুপ-তালাও—সেই যেখানে তানসেন দীপক গেয়ে আগুন জ্বালতেন, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামাতেন তাকে বাঁয়ে রেখে, নওরোজ-বাজার—সেই যেখানে কিশোর সেলিম (ভবিষ্যৎ জাহাঙ্গীর) প্রথম নূরজাহানকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই বাজারটা ছাড়িয়ে ঝিলের দিকে এগিয়ে যাও; মাঠের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একাকিত্বে দাঁড়িয়ে আছে এই 'হিরণ-মিনার'। কলকাতার শহীদ-মিনার (অক্টার-লোনি মনুমেণ্ট)-এর মতো তার ভিতরেও আছে ঘোরানো সিঁড়ি; তা বেয়ে ছাদে ওঠা যায়! সবচেয়ে অদ্ভুত—ঐ মিনারের গায়ে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া-হয়ে-ওঠা

অসংখ্য কাঁটা! এমন কাঁটা-তোলা অদ্ভুত মিনার আমি ভূ-ভারতে কখনো দেখিনি। গাইডকে প্রশ্ন করলাম, এ মিনারের অর্থ কী? কার স্মৃতি? ওর সর্বাঙ্গে অমন কাঁটাই বা কেন?

গাইড বললে, কাঁটা কেন আছে জানি না বাবুজি; তবে শুনেছি এ মিনার একটি হাতীর স্মৃতিচিহ্ন!

—হাতী! হাতী কেন? কার হাতী?

—শুনেছি, আকবর বাদশার অনেকগুলি পোষা হাতী ছিল। হাতী জন্তুটাকে উনি খুব ভালবাসতেন। এই মিনারের নিচে তাঁর একটি প্রিয় রাজহস্তী 'গজমাক্তা'-কে কবর দেওয়া হয়েছে। কবরের উপরেই গেঁথে তোলা হয়েছে এই মিনার।

—'গজমাক্তা' না 'গজমাতা'?—আমি প্রশ্ন করি।

গাইড বলে, আজ্ঞে না 'মাতা' নয় 'মাক্তা'—কিতাবে তাই নাকি লেখা আছে।

খোদায় মালুম কোন্ কেতাবের কথা ও বলছে! 'মাক্তা' শব্দটার অর্থ হয় না, 'মাতা'ই হবে—দীর্ঘদিন অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে শব্দটা হয়তো বিকৃত হয়ে গেছে। সে যাই হোক, বসে বসে হিরণ-মিনারের একটি স্কেচ এঁকে নিয়ে এলাম।

* * *

সে রাত্রে নির্জন ডাক-বাঙ্‌লোয় ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

আমি যেন একটা জঙ্গলে শিকার করতে গেছি, আর প্রকাণ্ড একটা হাতী আমাকে তাড়া করেছে! হাতীটার গায়ে অসংখ্য তীর বেঁধা—যন্ত্রণায় সে বৃংহিত-ধ্বনি করতে করতে ছুটে আসছে আমার দিকে! আমি বন্দুকটা তুলে গুলি করতে গেলাম, 'খট্' করে শব্দ হল—গুলি বার হল না। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত! কিন্তু আশ্চর্য! ঐ 'খট্' শব্দটা শুনেই হাতীটা দাঁড়িয়ে পড়ল। পরিষ্কার মানুষের ভাষায় হাতীটা বলল, ছিঃ! তুমিও আমাকে মারতে চাইছ? তোমরা সবাই সমান!

আমি কী বলব? আতঙ্কে কণ্ঠনালী আমার শুকিয়ে গেছে!

গজরাজ বললে, তুমি গল্প-টল্প লেখ, তাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম আমার দুঃখের কথা! কিন্তু তুমিও দেখছি ওদের দলে! আমার বরাত!

হেল্‌তে দুল্‌তে হাতীটা জঙ্গলে ফিরে গেল। তখন তার গা বেয়ে রক্ত ঝরছে!

...ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। দেখি, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে!

দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নই! তার কোনো মাথা মুণ্ডু হয় না। তবে নাকি মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন চেষ্টা করলে বোঝা যায় কোন্ স্বপ্ন আমরা কেন দেখি! এক্ষেত্রেও যথেষ্ট হেতু ছিল। এক নম্বর, নৈশ আহারটা গুরুতর হয়েছে—অর্থাৎ পেট-গরম হয়েছে, দু-নম্বর ঐ হিরণ-মিনারে গাইডের সেই গল্পটা, আর তীর-বিদ্ধ মিনার। তৃতীয় আরও একটা হেতু ছিল: 'গজমুক্তা' নামে আমার একটা উপন্যাস আছে; কলকাতা থেকে রওনা হবার

আগেই পাবলিশার রবিনবাবু একখণ্ড 'গজমুক্তা' হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'নতুন এডিশান ছাপতে হবে, এই কপিটায় কাটা-কুটি করে দেবেন।' রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেই বই-খানাই পড়ছিলাম। ফলে রাত্রে যে আমাকে হাতীতে তাড়া করবে এ আর বিচিত্র কী?

...কিন্তু না! পাগলা হাতীর ঐ কথাটা আমাকে ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে: ঐ যে স্বপ্নের মধ্যে সে বলেছিল—'তুমি না গল্প-টল্প লেখ? তাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম!' কী বল্‌তে এসেছিল হাতীটা? পরিবারস্থ সকলকে, বন্ধু-বান্ধবকে ঘটনাটা বললাম। তারা পাত্তাই দিল না—স্বপ্ন স্বপ্নই। বললে, এসব তোমার পাগলামি।

তোমাদের চুপি-চুপি বলি, আমার কিন্তু মন মানেনি। হাতীটা নিশ্চয়ই স্বপ্নের মধ্যে আমাকে কিছু বলতে এসেছিল! এ আমার 'গজমুক্তা' উপন্যাসের কোনো হাতী নয়, এ আকবর-বাদ্‌শার সেই প্রিয় হাতী—যার মরদেহের উপর বাদ্‌শা ঐ মিনারটি তৈরি করান, সেই যার নাম: 'গজমাক্তা' অথবা 'গজমাতা।'

কলকাতায় ফিরে এসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে খুঁজে বার করলাম আকবর-জমানার প্রামাণিক ইতিহাস; 'আকবর-নামা' এবং 'আইন্-ই-আকবরীর' ইংরাজী অনুবাদ, আর ডক্টর শ্রীবাস্তবের লেখা ঐ সম্রাটের চারখণ্ডে সমাপ্ত প্রামাণিক জীবনী। আকবর-বাদ্‌শার কটা প্রিয় হাতী ছিল, 'গজমাক্তা' নামে কেউ ছিল কিনা এটা আমাকে খুঁজে দেখতেই হবে। পেয়েছিলাম। সে-কথাই এবার লিখব—তবে এর পর যা লিখেছি তা আমার গল্প নয়, মনগড়া কাহিনী নয়—নিছক ইতিহাস!

* * * *

আবুল ফজল বলছেন, আকবর হাতী জন্তুটাকে খুব ভালবাসতেন, মাঝে মাঝে পিল-খানায় নিজেই গিয়ে দেখে আসতেন তাঁর পোষা হাতীদের ঠিকমতো পরিচর্যা হচ্ছে কিনা। চারটি হাতীর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে—গিরনবর, অপূর্ব, রণথম্ভোর এবং গজমুক্তা!

গজমুক্তা! আশ্চর্য! শব্দটা তো অপভ্রংশে 'গজমাক্তা' হয়ে যেতে পারে!

আমি অতঃপর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি গজমুক্তার ইতিহাস!

আকারে গজমুক্তা ছিল বৃহত্তম। দুর্জয় তার সাহসও। আকবর বাদ্‌শা শোভাযাত্রা করে পথে বার হলে সচরাচর গজমুক্তার পিঠেই সওয়ার হতেন। অনেক যুদ্ধে সে আকবরের বাহন ছিল—জীবনের শেষ যুদ্ধ করেছে হল্‌দিঘাটে! মনে আছে সে ইতিহাস?

: ১৮ই জুন' ১৫৭৬। হল্‌দিঘাটি (হল্‌দিঘাট নয়) একটি সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম। এখানেই চিতোর দুর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই দুঃসাহসী নওজোয়ান—তামাম হিন্দুস্থানের মধ্যে সেই একমাত্র মানুষটি যে, সারাজীবনে ভারতসম্রাট আকবরের বশ্যতা মানেনি! একদিকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্মিলিত রাজশক্তি, অপরদিকে জোয়ার আর বজ্‌রা সম্বল ক্ষুদ্র চিতোর রাজ্যের সেই শিশোদীয় বংশের একটি মাত্র মানুষের দুরন্ত

সাহস, অনমনীয় বীর্য আর অপরিসীম স্বাধীনতাস্পৃহা। আকবর-বাদশা নাকি শেষ পর্যন্ত বলে পাঠিয়েছিলেন—খেসারত চাই না, রাজস্ব চাই না, একটিমাত্র স্বর্ণমুদ্রা প্রতীক-রাজস্ব দিয়ে রানাপ্রতাপ স্বীকার করে নি যে, তিনি তামাম হিন্দুস্থানের মালিক শাহ্-ওন শাহ্ আকবরের করদ নৃপতি। প্রতাপ স্বীকৃত হলেন না! আকবর মানসিংহকে সেনাপতি করে পাঠিয়ে দিলেন চিতোর জয় করতে।

আবুল ফজলের হিসাবে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা আশী হাজার, অপর পক্ষে রানাপ্রতাপের সৈন্যসংখ্যা বিশ হাজার। এ অসমযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ, তার ফলাফল তোমাদের অজানা নয়। টডের ভাষায় 'হল্‌দিঘাট' হচ্ছে ভারতবর্ষের থার্মপলি! Rajput Chivalry অথবা অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনীতে' তার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। আমি সেসব কথা বলতে বসিনি—আমি শুধু বলব গজমুক্তার কথা।

ফতেপুর সিক্রি থেকে আকবর-বদ্‌শার প্রিয়তম হাতী ঐ 'গজমুক্তা'র পিঠেই সওয়ার হয়ে হল্‌দিঘাটে উপস্থিত হয়েছেন মুঘল-সেনাপতি মানসিংহ। রানাপ্রতাপ যে হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে এলেন তার নাম: লোনা। দুজনেই নাকি প্রায় তুল্যমূল্য! দৈহিক ক্ষমতায়, সাহসে আর রণকুশলতায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লোনার মাহুত হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ল। লোনা ছিল সেই মাহুত-এরই একান্তভাবে পোষ মানা; অন্য কোনো মাহুত এই যুগান্তকারী রণক্ষেত্রে লোনাকে পরিচালনা করতে সাহসী হল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রতাপ তাঁর বাহনকে বদল করলেন। প্রতাপের অতি প্রিয় বাহন—তোমরা নিশ্চয়ই জান তার নাম, চৈতক এতক্ষণ রণক্ষেত্রের একান্তে অভিমানে দগ্ধ হচ্ছিল। প্রভু তাকে ফেলে যে একটা হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে গেলেন এটাতে সে বোধকরি অপমান বোধ করেছিল। প্রতাপের অবশ্য গত্যন্তর ছিল না—চিরকাল তিনি চৈতকের পিঠে চেপেই লড়াই করেছেন; কিন্তু আজ তাঁকে যাঁর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে সেই রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহ গজারূঢ়! হাতীর পিঠে-সওয়ার যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করতে হলে হাতীর পিঠেই যে চাপতে হবে! কিন্তু এখন উপায় নেই! বাধ্য হয়ে প্রতাপ চৈতকের পিঠে সওয়ার হলেন। চৈতক এতক্ষণ ছটফট করছিল, ক্রমাগত মাটিতে পা ঠুকছিল—এতক্ষণে প্রভুকে পিঠের উপর পেয়ে সে উত্তেজিত হয়ে একটি হ্রেষাধ্বনি করল।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ অশ্বের মুখ ঘোরালেন।

তরবারি সঞ্চালনে পথ করে তিনি এগিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। যেখানে গজমুক্তার পিঠে আসীন মানসিংহ যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। হায় হায় করে উঠল শিশোদীয় সৈন্যদল! এ কী অসম্ভব কথা! অশ্বারোহী কখনও গজারূঢ়ের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে প্রবৃত্ত হতে পারে—আর সেই গজ যদি হয়, ভারতশ্রেষ্ঠ হস্তিদানব: গজমুক্তা!

কিন্তু বেপরোয়া নওজোয়ান রানা প্রতাপকে সেইকথা কে বোঝাবে?

সেনাপতিরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল! যেমন করেই হ'ক এ দ্বৈরথ সমর ঠেকাতে হবে। প্রতাপ যেন কিছুতেই মানসিংহের কাছাকাছি না যেতে পারেন! কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? একমাত্র সমাধান—গজমুক্তাকে রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা! ওরা তাই উপর্যুপরি শরসন্ধানে জর্জরিত করে দিল গজমুক্তাকে। যাতে সে রণে ভঙ্গ দিয়ে যন্ত্রণায় ছুটে পালায়! কিন্তু আশ্চর্য! গজমুক্তা তবু মুখ ঘোরালো না! তীরবিদ্ধ দানবটা অপরিসীম দৈহিক যন্ত্রণায় বৃংহিত-ধ্বনিতে রণক্ষেত্র মুখর করে তুলল; কিন্তু পিছু হটল না! রক্তস্নাত দানবটা মানসিংহকে পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলল তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৈতকের দিকে!

অশ্বারূঢ় স্বাধীনতাকামী সম্মুখীন হলেন গজারূঢ় মুঘল সেনাপতির!

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে চৈতক যে কাণ্ডটা করে বসেছিল তা মধ্যযুগের সমর-ইতিহাসে অবিস্মরণীয়! সেই খণ্ড-মুহূর্তে চৈতক: উচ্চৈশ্রবা! পিছনের পায়ে ভর দিয়ে অসীম সাহসে সামনের দুটি পা যে তুলে দিল ঐরাবতের করিকুম্ভে। খণ্ডমুহূর্তের দুর্লভ-সুযোগ! প্রতাপ তৎক্ষণাৎ রেকাবের উপর দেহভার রেখে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন! ভীমবেগে আঘাত করলেন তাঁর তীক্ষ্ণাগ্র শূলটা ঐ গজারূঢ় সেনাপতির কপাটবক্ষে! মানসিংহ টাল সামলাতে পারলেন না—কিন্তু তিনিও অভিজ্ঞ যোদ্ধা—হাওদা থেকে উল্টে পড়লেও হাতীর পিঠ থেকে ভূতলশায়ী হলেন না। ইতিমধ্যে মানসিংহের দেহরক্ষী বিদ্যুদ্‌গতিতে বসিয়ে দিয়েছে চৈতকের সামনের পায়ে এক মর্মান্তিক কোপ!

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল! তবু চৈতক রণক্ষেত্র ত্যাগ করল না! সে আবার চেষ্টা করছিল হাতীর মাথায় ঐ ভাঙা পা-খানা তুলতে; প্রভুকে আর একবার সুযোগ করে দিতে। কিন্তু প্রতাপ বিচক্ষণ যোদ্ধা! বুঝেছেন, চৈতকের আঘাত মারাত্মক—তার মৃত্যু আসন্ন। তিনি লাগাম টেনে চৈতকের মুখ ঘোরালেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই সেই ঐতিহাসিক ঘটনা: হো নীলা ঘোড়াকা সওয়ার!

অনুতপ্ত ছোটভাই দাদার বিক্রম দেখে ছুটে এসেছে প্রতাপের কাছে ক্ষমা চাইতে!

এবং তার পরেই চৈতকের মৃত্যু!

হল্‌দিঘাটের অনতিদূরে, সেই যেখানে অন্তিম শয়ানে শুয়ে পড়েছিল প্রভুভক্ত চৈতক, ঠিক সেইখানে রাজপুতেরা বানিয়ে দিয়েছে অসীমসাহসী চৈতকের এক মর্মরমূর্তি।

কিন্তু না! চৈতক নয়, আমি যে বলছি গজমুক্তার কথা। তার কি হল?

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধাবসানে শরবিদ্ধ গজদানবও ভূতলশায়ী হয়েছিল—যেন ভীষ্মপর্বের শেষদৃশ্য! হস্তিচিকিৎসক তার দেহ থেকে একটি-একটি করে শর-মোচন করলেন; ঔষধ প্রয়োগ করলেন। অতিকষ্টে গজমুক্তা আবার উঠে দাঁড়ালো। বিজয়ী মানসিংহকে নিয়ে সে ফিরেও এসেছিল ফতেপুর সিক্রিতে! কিন্তু ক্ষতস্থানগুলি তার নিরাময় হল না। তার প্রভু আকবর বাদ্‌শাকে শেষ প্রণাম জানাতেই যেন সে ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত দেহটা টানতে টানতে সুদূর রাজপুতানা থেকে ফিরে এসেছিল ফতেপুর সিক্রিতে!

ইতিহাস এইটুকুই। বাকিটা আমার কল্পনা। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বল্‌তে পারেন নি 'হিরণ-মিনার' কেন বানানো হয়েছিল। অনেকেই বলেছেন, এটি একটি বিজয়স্তম্ভ! কিন্তু কোন রাজ্য জয়ের? তা তাঁরা বলেন নি। দু'একজন—কোনসূত্র থেকে বলেছেন জানি না, লিপিবদ্ধ করেছেন হিরণ-মিনার একটি হস্তিদানবের মরদেহের উপর নির্মিত! ওর গায়ে অমন অসংখ্য কাঁটা কেন বেঁধা আছে সে বিষয়ে কোনো পণ্ডিতও কিছু বলতে পারেন নি।

তবে তোমরা তো পণ্ডিত নও, আমারই মতো সাধারণ দর্শক। তাই তোমাদের বল্‌ছি—ফতেপুর-সিক্রিতে যদি যাও তাহলে ঐ হিরণ-মিনারকে ভালো করে লক্ষ্য কর।

মিনারের রঙ গেরুয়া—হলুদ ও লালরঙের সংমিশ্রণ; যেন হল্‌দিঘাটের হলুদরঙের ধূসর ধুলায় লেগেছে রক্তের ছোপ! চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর অষ্টভুজাকৃতি মিনার কিছুটা উঠেছে দ্বারদেশের মাথা পর্যন্ত। তার উপরকার অংশটা গোলাকৃতি—মোটা থেকে সরু হয়েছে সামান্য। আর আগেই বলেছি, তার গায়ে অসংখ্য কাঁটা বেঁধা!

তোমাদের কানে কানে বলি, বড়দের কাউকে ব'ল না,—তারা ভাববে এ আমাদের পাগলামি—আমার মনে হয়, আকবর-বাদ্‌শা মনে মনে হল্‌দিঘাটের সেই যুদ্ধদৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিলেন! মিনারটা দেখলে মনে হয়—ভূতলশায়ী মরণাহত এক হস্তিদানব আকাশের দিকে পা তুলে অন্তিম-বৃংহতি ধ্বনি করছে!
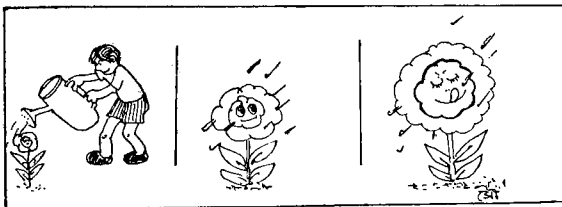
নিউটন আপেল পড়তে দেখেছিলেন

অরূপরতন ভট্টাচার্য

নিউটনের জীবনে গাছ থেকে আপেল খসে পড়ার ঘটনাটির কথা কে না জানে! বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী হলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু বিজ্ঞান যাদের কাছে বিভীষিকা, পদার্থ-বিদ্যায়, মহাকাশতত্ত্বে, গণিতে যাদের রুচি নেই, মহাবিজ্ঞানী নিউটনের নাম তারাও শুনেছে। আর নিউটন মানেই তো গাছ থেকে আপেল খসে পড়া, চিন্তার জগতে আলোড়ন, এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ফলে নিউটনের নামের সঙ্গে গাছ থেকে আপেল খসে পড়ার গল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

আপেল ফলের গল্পটা ভাল। মনে দোলা দেয়, উৎসাহ আনে। সেইজন্যে সাধারণ সকলেরই নিউটনের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীটির কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এ কাহিনী কি সত্য?

আপেল ফল কি প্রকৃতই গাছ থেকে পড়েছিল? নিউটন কি বাগানে বসে আপেল ফল পড়তে দেখে বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর নিয়ে এসেছিলেন?

বিজ্ঞান ঐতিহাসিকেরা নিউটনের এই কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা বা কতটা সত্য তা যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

ছোটদের অনেক বইয়ে আপেল ফলের কাহিনীটির উল্লেখ, আছে।

আপেল ফলের কাহিনীটি কি?

নিউটন একদিন বাড়ির পাশে, বাগানে এক আপেল গাছের তলায় বসে আপন মনে কি ভাবছিলেন, হঠাৎ টুপ করে একটি আপেল ওপর থেকে খসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। খসে পড়া আপেল—প্রাত্যহিক জীবনের অজস্র সামান্য ঘটনার একটি। কিন্তু নিউটনের কৌতূহলী মনে প্রচণ্ড নাড়া লাগল। খসে পড়া আপেল কেন ভাসমান অবস্থাতে রইল না, কেন তা ডানা মেলা পাখির মত আকাশে উড়ে গেল না, কেন তা সরাসরি নেমে এল মাটিতে? এই চিন্তা থেকেই

অনুপ্রাণিত হয়ে নিউটন আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ, যার ফলে সমস্ত ভারি বস্তুই সরাসরি ধরিত্রীর দিকে ধেয়ে আসছে।

অল্প কথায় মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের পিছনে আপেল ফলকে নিয়ে নিউটনের কাহিনী এইটুকু। কিন্তু বিজ্ঞানের যে মহৎ সত্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই কাহিনীটি সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, সে কাহিনীটি কি কল্পনায় গড়ে উঠেছে নাকি বাস্তবে ঘটেছে ? কেউ যদি বলেন, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগের এক মহাবিজ্ঞানীর জীবনের ঘটনার সঙ্গে এই কাহিনীটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে কি কেউ তা অস্বীকার করতে পারে ?

আশঙ্কাটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিউটন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কম লেখা বেরোয়নি। তার মধ্যে অনেকগুলিতেই আছে, নিউটনকে নিয়ে এটি একটি গল্প। কিন্তু গল্পও তো অনেক সময়ে সত্য হয় !

প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যাঁরা, দেখা যায়, যৌবন পার হওয়ার আগেই তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয় সবচেয়ে বেশি। জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় ওই সময়েই। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই।

নিউটনের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ হবে। কিন্তু ওই সময়টি ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে দামী। প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ হয় ওই সময়েই। বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে নতুন নতুন চিন্তা তাঁর মনকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে, নতুন সত্য ধরা পড়ছে।

কেমব্রিজ থেকে নিউটন স্নাতক হিসেবে পাস করলেন ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে। একটু বেশি বয়সেই বলতে হবে। নিউটনের জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে। তখন ছিল জুলিয়ান ক্যালেনডার। সেই জুলিয়ান ক্যালেনডারেই এই হিসেব। এখন যে গ্রেগরি পঞ্জিকা আছে, সেই পঞ্জিকা ধরে নিউটনের জন্ম ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে, জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে। অর্থাৎ হিসেব মত নিউটনের বয়স তখন ২৩। এ যুগে স্নাতক ডিগরি লাভের বয়স ২০ বলা যায়। সে যুগেও তাই। নিউটন ছোটবেলায় গুছিয়ে লেখাপড়া করতে পারেননি। পড়াশুনোয় তাঁর রীতিমত বাধা পড়েছিল।

নিউটনের জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা যান। মায়ের আদর-যত্নও তাঁর তেমন-ভাবে জোটেনি। মা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন অন্য জায়গায়। তাই নিউটনের শৈশব কাটল উল্‌সথর্পে, নিউটন যে গ্রামে জন্মেছিলেন সেইখানেই, নিজের দিদিমার কাছে। অবশ্য আবার তিনি মাকে কাছে পেয়েছিলেন। তখন নিউটনের বয়স হবে বছর চোদ্দ। মা ফিরে এলেন উল্‌সথর্পে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, স্বামী নেই সম্পত্তি যা আছে, তার দেখাশোনা করবে কে ? নিউটন বড় ছেলে। তাকেই সব কিছু দেখাশোনার ভার দেওয়া হবে। তিনি এসে নিউটনকে স্কুল থেকে সরিয়ে নিলেন। ভাগ্যের কি অদ্ভুত

পরিহাস ! যে ছেলে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী নিউটন হবেন, বিষয়-আশায় দেখাশোনায় তাঁর সময় কাটতে লাগল ।

নিউটনের মা চেষ্টাটা ভালভাবেই করেছিলেন । কিন্তু সফল হলেন না । তাঁর ইচ্ছে ছিল নিউটন তাঁর বাবা বা ঠাকুর্দার মতো কৃষিজীবী হবেন, চাষের কাজ দেখবেন । আর এই পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিউটন যে লেখাপড়া শিখেছেন তাতেই সব ঠিকমতো চলবে—চাষবাস দেখাশোনা, হিসেব-পত্তর রাখা ।

নিউটন মাকে খুশি করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চাষের কাজে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না । গরু, ভেড়া, ছাগলের মধ্যে তাঁর এতটুকু মন বসলো না ।

নিউটনের পুরোনো স্কুলের হেডমাস্টার আর তাঁর মামার চেষ্টায় নিউটন আবার পড়াশুনোয় ফিরে এলেন, কিন্তু পড়াশুনোয় ক্ষতি হয়ে গেল নিউটনের । যাই হোক, সে ক্ষতি চিরস্থায়ী নয় । নিউটনের স্কুলজীবন আবার শুরু হল । ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে নিউটন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেন । তখন তাঁর বয়স ১৯ । স্নাতক ডিগরি পেলেন এর চার বছর বাদে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে ।

ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে নিউটনের খুব ঝোঁক ছিল । তাছাড়া কেমব্রিজে আসার আগেই তিনি স্যানডারসনের লজিক পড়েন । কেপলারের অপটিক্‌সও তিনি পড়ে শেষ করেন । বাধার ভেতর দিয়ে হলেও পড়াশুনোয় তাঁর একটা ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছিল । আর ডিগরি প্রাপ্তির সময়কালে মননের যে জগতে তিনি বিচরণ করেন তা ছিল বিস্ময়কর । নিউটনের যে সব পাণ্ডুলিপি আছে, তাতে নিউটন ওই সময়ে তাঁর আবিষ্কারের কথা বলে গেছেন ।

১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় আমি গণিতের বাইনোমিয়াল থিয়োরেম বের করলাম । অবকল গণিতের প্রাথমিক ধারণা ওই বছরেরই নভেম্বরে । পরের বছরের জানুয়ারিতে বর্ণ সংক্রান্ততত্ত্ব, মে মাসে সমাকল গণিত !

বিধাতার আশীর্বাদ তখন তাঁর উপরে অবিশ্রান্ত ধারায় নেমে আসছে ।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার অঙ্কুরোদ্গম, ওই সময়ে । তাহলে গাছ থেকে আপেল পড়া তারই কিছু সময় আগে দেখার কথা ।

নিউটন এই সময়ে একরকম গৃহবন্দী । ডিগরি পাওয়ার বছরটিতে কেমব্রিজ ভয়াবহ প্লেগে আক্রান্ত হল । কিন্তু অক্‌সফোর্ডে রোগটি ছড়ালো না । অগাস্ট মাসের গোড়ায় কেমব্রিজের কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল । নিউটন বাধ্য হয়ে উল্‌সথর্পে নিজের ভিটেয় ফিরে এলেন । আর একরকম দুটো বছর, বলতে গেলে, তাঁর সেখানেই কেটে গেল । মাঝে অবশ্য ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে একবার কেমব্রিজ খোলার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা বলবার মত কিছু নয় । প্লেগের উপদ্রব কমে যেতেই নিউটন কেমব্রিজে ফিরে গেলেন ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে । কিন্তু এরই মধ্যে বিজ্ঞানের জগতের থিয়েটার হলের গ্রীনরুমে যা ঘটে গেছে

তার হিসেব করা কঠিন। নিউটন যে অনেক বেশি পড়েছেন বা লিখেছেন তা নয়। কিন্তু তাঁর অবসর সময়ে মনের ভেতর নানা চিন্তার আসা-যাওয়া চলেছিল। তার ফলেই কয়েকটি বিখ্যাত বা জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার।

নিউটনের জীবনে সেই অতি সাধারণ অথচ বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী ঘটনাটি এই সময়েই ঘটে।

উল্সথর্পে তিনি বাগানে বসেছিলেন। এই সময়ে আপেল গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে খসে পড়ে। বৈচিত্র্য কিছু নেই, সামান্য ব্যাপার এবং আর সকলের মতো তিনি নিশ্চয়ই এই ঘটনাও আগে দেখে থাকবেন। কিন্তু সৃষ্টির কোন মেজাজে তিনি সেদিন ছিলেন, তাঁর মনের জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। তাহলে পৃথিবীতে, তার গভীরে নিশ্চয় এমন কোনো শক্তি আছে, যে শক্তি সব বস্তুপিণ্ডকেই নিজের দিকে টেনে রাখছে। এই শক্তি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে? চাঁদ পর্যন্তও কি? ·

নিউটনের একটা ধারণা জন্মাল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যতদূরে যাই এবং যত উপরেই আমরা উঠি, মাটির টানের বিশেষ একটা তফাত হয় না। সবচেয়ে উঁচু বাড়ির মাথায় বা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়—যেখানেই চড়ি না কেন। তিনি ভাবলেন, এ ধারণা তাহলে অসঙ্গত হবে না, এ টান আছে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে, যতদূর পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পর্যন্তও। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তাহলে চাঁদের গতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। হয়তো চাঁদ যে তার কক্ষপথে আছে তা এই পৃথিবীর টানেই।

নিউটনের জীবনে আপেল পড়ার ঘটনাটি যে সত্যিই ঘটে নানা জনেই তা উল্লেখ করে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক ভলটেয়ার (জন্ম নভেম্বর ২১, ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ) 'নিউটনীয় দর্শন' শীর্ষক এক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেন। ঘটনাটি তিনি শোনেন নিউটনের স্নেহের ভাগনী মিসেস কনডুইটের কাছ থেকে।

নিউটনের মৃত্যুর পর ডঃ উইলিয়াম স্টাকলি নিউটন সম্পর্কে যে স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেন, তাতেও ঘটনাটি ঘটেছিল এমন উল্লেখ আছে।

মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত চিন্তার সূত্রপাত যে বাগানে বসেই এ বিষয়ে উল্লেখ করে গেছেন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁর নাম পেমবারটন। ইনি ছিলেন নিউটনের বেশি বয়সের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে নিউটনের প্রিনসিপিয়ার যে সংস্করন বেরোয়, তার তিনি সম্পাদনা করেন। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে নিউটনের দর্শন সম্পর্কে তিনি একটি বই লেখেন। তাতে পৃথিরীর সহজ আকর্ষণের দৃষ্টান্তকে সকল বস্তুর ভেতর দিয়ে কি ভাবে এই বিশ্বে ছড়িয়ে দেন নিউটন, সে বিষয়ে আলোচনা আছে।

পৃথিবীর যে আকর্ষণে আপেল গাছ থেকে খসে সরাসরি মাটিতে এসে পড়ে, সে আকর্ষণের সঙ্গে কি দূরত্বের কোনো সম্পর্ক আছে? দূরত্ব বাড়লে কি আকর্ষণ কমে?

বা দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে কি আকর্ষণ বেড়ে যায় ?

নিউটন প্রকৃতির কিছু কিছু সত্যের খবর রাখতেন। সূর্য থেকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে আলো এসে পড়ে, আমরা সবাই জানি। যতটুকু আলোকরশ্মি শুধু পৃথিবীর এক বর্গ-মাইলকেই আলোকিত করছে, ততটুকুর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর উপরের এই এক বর্গমাইল সূর্য থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে। যদি এই দূরত্ব দ্বিগুণ হোত, তাহলে যে পরিমাণ আলোকরশ্মি এসে পড়েছিল প্রথমে, তা হয়ে যেত সিকিভাগ, তিনগুণ দূরত্বে থাকলে আলোর পরিমাণ কমে হোতো $\frac{1}{8}$ ভাগ, চারগুণ দূরত্বের বেলায় $\frac{1}{16}$ ভাগ।

যে সূত্র এই হিসেবের মূল, নিউটন সেই সূত্রকে কাজে লাগালেন চাঁদের আকর্ষণের বেলায়। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠদেশের দূরত্ব যতটা অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যা, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের দূরত্ব তার প্রায় ৬০ গুণ। তাহলে চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের টানের ১/৬০ × ১/৬০ বা ১/৩৬০০ গুণ। এই হিসেব কি ঠিক ?

নিউটন অন্যভাবে তা যাচাই করার কথা ভাবলেন। চাঁদ তো পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরানো সুতোয় বাঁধা ইটের মতন। পৃথিবীর চারদিক দিয়ে চাঁদের ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, নিউটন তা জানতেন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বও তাঁর অজানা নয়। ফলে যে টান চাঁদকে তার ঘোরার পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না, তা নিউটনের পক্ষে গণনা করা কঠিন ছিল না। গণনা করলেন নিউটন। কিন্তু দুটো ফল মিলল না। আশাভঙ্গে খুব নিরাশ হলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, সৃষ্টির ইতিহাসে গ্রহদের গতিবেগকে এই প্রথম তিনি একটি সূত্র দিয়ে বাঁধতে পেরেছেন।

যাই হোক, তখনকার মতো এই বিষয়টি চাপা পড়ে গেল। প্লেগের উপদ্রব ততদিনে কমে এসেছে। ১৬৬৭-এর বসন্তকাল। নিউটন ফিরে গেলেন কেমব্রিজে।

আসলে কিন্তু নিউটনের গণনায় কোথাও ভুল ছিল না। তাঁর যুক্তি ঠিক। তাঁর বিশ্লেষণ না মেনে উপায় নেই। কিন্তু সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান নিয়ে। তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের একটা ভুল মান নিয়েছিলেন। অথচ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান সেযুগে অজানা ছিল না। তাহলে নিউটন ভুল করলেন কেন ? হয় তিনি এমন একটা বই নিয়েছিলেন যাতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মান ভুল ছিল। কেমব্রিজ বন্ধ, হাতের কাছে কোনো ভাল বই নেই, এমন হতে পারে। কিংবা তিনি স্মৃতির উপরে নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্মৃতি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

পরে অবশ্য নিউটন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং মহাবিশ্বের রহস্যও ধরে ফেলেন।

এইভাবে লিনকনশায়রের উল্‌সথর্প নামে এক গ্রামে গাছ থেকে খসে পড়া আপেল ফল থেকে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের আবিষ্কার হল। নিউটন মারা গেছেন ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স ৮৫। তাঁর মৃত্যুর পরের কথা। উল্‌সথর্পে সেই গাছকে দেখিয়ে বলা হোতো, এই সেই গাছ, যার খসে পড়া আপেল নিয়েই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূচনা।

রায়বাড়ির কালো চাঁদিয়াল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তপন বললো, চল্, নাজিরের দোকানে যাবি ?

শুনে আমার লোভও হলো আবার ভয়ও হলো। নজিরের দোকান সেই খড়েপুকুরে। অতদূরে যেতে হলে মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর জিজ্ঞেস করলেই মা বলবে, না।

তপন বললো, কীরে, যাবি তো বল্। নাহলে আমি একাই যাবো।

তপনের বাবা মা থাকেন জলপাইগুড়িতে আর ও থাকে এখানে মামাবাড়িতে। মামারা ওকে খুব আদর দেন বলে ও ইচ্ছে মতন ঘোরাঘুরি করতে পারে।

আমার বাবা বলে দিয়েছেন, স্কুলে যতদিন পড়বো, ততদিন বাড়ির পারমিশান ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। কলেজে গেলে তখন ইচ্ছে মতন ঘোরাঘুরি করা যাবে।

একদিন ইস্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম দেশবন্ধু পার্কে। ফিরেছিলাম সন্ধ্যের আগেই। তবু বাবা কী করে যেন জানতে পেরে গেলেন। আমার ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজই শাস্তি দেবো না আজ ছেড়ে দেবো? এরকম আর কোনোদিন করবি? তা হলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে মারবো, যাতে তোর মা এসে ছাড়িয়ে দিতে না পারে।

বাবা সেদিন মারেন নি বটে কিন্তু বাবাকে আমি সত্যিই ভয় পাই।

আমার আর তপনের এখন ক্লাস এইট। প্রত্যেকদিনই একবার করে ভাবি, ইস্ কবে যে আর তিনটে বছর কাটবে আর আমি কলেজে গিয়ে স্বাধীন হয়ে যাবো!

তপন বললো, তা হলে তুই থাক্। আমার বড় মামা আমায় দুটো টাকা দিয়েছেন, আমি আজই নাজিরের দোকান ঘুরে আসবো!

আমি বললুম, একটু দাঁড়া না, আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

বাবা অফিসের কাজে পরশু পাটনা গেছেন, ফিরবেন আজ বিকেলে। সুতরাং আজ রবিবার সকালটায় একটু ঘুরে আসা যায় যদি পারমিশান পাওয়া যায় মায়ের কাছ থেকে।

মার কাছে গিয়ে খুব নরম গলায় বললুম, মা, ভাস্করের বাড়িতে একটু ক্যারাম খেলতে যাবো?

মা চোখ কপালে তুলে বললো, ভাস্করের বাড়ি? সে কোথায়, সে তো অনেক দূর?

আমি বললুম, মোটেই দূর নয়, এই তো কাছেই, পদ্মনাথ লেনে। তপনও আমার সঙ্গে যাবে।

মা ফড়েপুকুর চেনেন কিন্তু পদ্মনাথ লেন চেনেন না, যদিও দুটো খুব কাছাকাছি। ফড়েপুকুরের নাম শুনলে নিশ্চয়ই রাজি হতেন না। আমারও ঠিক মিথ্যে কথা বলা হলো না, ফেরার পথে পদ্মনাথ লেনে ভাস্করের বাড়িটা একবার ঘুরে এলেই হবে।

মায়ের অনুমতি পেয়েই তপন আর আমি হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে বেরিয়ে পড়লুম।

আমাদের গ্রে স্ট্রিট পাড়াতেও ঘুড়ির দোকান আছে, কিন্তু নাজিরের দোকানের ব্যাপারই আলাদা। নাজিরের দোকান যেন ঘুড়ির রাজবাড়ি। মনে হয় যেন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘুড়ি আছে সেখানে। আর কয়েকখানা ঘুড়ি আছে মানুষের চেয়েও বড় সাইজের, সেগুলো সাজাবার জন্যে।

নাজিরের দোকানের মাঞ্জাও খুব বিখ্যাত। তবে আমরা তো মাঞ্জা কিংবা ঘুড়ি কিনতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু দেখতে যাচ্ছি।

নাজিরের দোকানের সামনে সব সময় ভিড় লেগে থাকে। রোববার সকালে আরও বেশী ভিড়। বিশ্বকর্মা পুজোর আর বেশী দিন দেরি নেই। ভিড় ঠেলেঠুলে আমি আর তপন একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দোকানের সামনেই বসে আছেন দোকানের মালিক নাজির সাহেব, ফর্সা গায়ের রং, কাঁচা-পাকা গোঁফ, মাথায় টাক। পরনে একটা সাদা সিল্কের গেঞ্জি আর নীল-হলদে চেক চেক লুঙ্গি। দু'তিন জন কর্মচারী কেনাবেচায় ব্যস্ত, ভেতর দিকে আট দশজন কারিগর চট্‌পট ঘুড়ি বানিয়ে যাচ্ছে।

দোকানের সামনে ঝুলছে সার সার লাটাই, তাতে নানা রঙের মাঞ্জা, লাটাইগুলোর খোঁচা লাগছে আমাদের মাথায়। অসংখ্য রকমের ঘুড়ির মধ্যে আমাদের দু'জনের চোখ খুঁজে চলেছে শুধু একটাই জিনিস।

তপন বললো, ঐ ছাখ!

তপন আঙুল তুলে দেখালো একটা কোণার দিকে। আমার শরীরটা কেঁপে উঠলো। সত্যিই তো, কালো চাঁদিয়াল! থাক্ থাক্ করে সাজানো, অন্তত একশো-দেড়শোখানা হবে!

আকাশে কত ঘুড়ি ওড়ে, কিন্তু ঐ রকম কালো চাঁদিয়াল শুধু এক জায়গাতেই দেখা যায়। এমনকি কালো চাঁদিয়ালও অনেক ওড়ে, কিন্তু এরকম ঠিক কালো চাঁদিয়াল আর কোথাও নেই।

আকাশে ছাড়া এই কালো চাঁদিয়াল এত কাছ থেকে আমি আর তপন আগে কখনো দেখিনি। ভেবেছিলাম এই কালো চাঁদিয়াল বুঝি দো তে ঘুড়ি, এখন দেখছি, দেড়-তে, কড়ি টানা তো বটেই। আমি দোতে ঘুড়ি ওড়াতে পারি না, বড্ড টান লাগে। দেড়তেই ভালো। কুচকুচে কালো গা। বুকের কাছে এক ফালি সাদা চাঁদ, ওপরের কাঁপের কাছে আর একটি লাল রঙের গোল চাঁদ, তাতেও সাদা বর্ডার দেওয়া। কেন জানি না, ঐ চাঁদটাকে দেখলে আমার মহাদেবের কপালের চোখটার কথা মনে পড়ে। ঐ ঘুড়ির ল্যাজটাও লাল।

আকাশে এই কালো চাঁদিয়াল ঠিক যেন রাজার মতন। দেখলেই আমরা ভয় পাই। আমাদের ছোটখাটো আধ-তে, এক-তে ঘুড়িগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেবার চেষ্টা করি। তার আগেই কালো চাদিয়াল গোঁৎ খেয়ে নেমে আসে।

নাজির সাহেব আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী চাই খোকা?

তপন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

নাজির সাহেব তবু জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌টা?

—ঐ যে কালো চাঁদিয়াল!

তপনের কাছে দু' টাকা আর আমার কাছে এক টাকা আছে। আমাদের ছেলেবেলার

কথা তো, তখন এক টাকাতেই পাঁচ-ছ' খানা বেশ ভালো ঘুড়ি পাওয়া যেত। কালো চাঁদিয়ালের দাম আর কত বেশী হবে ?

নাজির সাহেব আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ও ঘুড়ি বিক্রি হয় না !

উত্তরটা আমরা জানতুম। যে কেউ ইচ্ছে করলেই যদি ঐ কালো চাঁদিয়াল কিনতে পারতো তো তাহলে অনেক বাড়ি থেকেই ঐ ঘুড়ি উড়তো। কিন্তু ঐ কালো চাঁদিয়াল শুধু দর্জিপাড়ার রায়বাড়ি থেকেই ওড়ে।

তপন মিনতি করে বললো, অন্তত একটাও পাওয়া যাবে না ?

নাজির সাহেব বললেন, উঁহুঃ ! ওগুলো অর্ডারি মাল।

আমরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখে দেখে যেন আশ মিটছে না। নাজির সাহেব আমাদের চলে যেতেও বললেন না অবশ্য।

সেই সময় স্বয়ং মহাদেব এসে যদি বলতেন, তোমায় একটা বর দিতে চাই, কী নেবে বলো ! তা হলে আমি হাত জোড় করে কাতরভাবে বলতুম, প্রভু, একটা নয়, দয়া করে দুটো বর দিন ! আমার করুণ প্রার্থনা শুনে মহাদেব যদি বলত, ঠিক আছে দুটো করেই দেবো, কী চাই ? তাহলে আমি বলতুম, প্রভু, প্রথম বরে যেন তপন আর আমি দু'জনেই ভালোভাবে পাস করে যাই। আর দ্বিতীয় বরে আমাদের একটা করে ঐ কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি দিন !

মহাদেবও এলেন না, আমাদের কালো চাঁদিয়াল পাওয়াও হলো না।

আমরা চলে আসবো ভাবছি, ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি থামলো ঐ দোকানের সামনে।

নাজির সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে খাতির করে বললেন, আসুন রায়বাবু, আসুন !

গাড়ি থেকে নামলো একজন যুবক। ধপ্‌ধপে ফর্সা রং, বছর তেইশ চব্বিশ বয়েস, মাথায় বাবরি চুল, কোঁচানো ধুতি ও গিলে করা পাঞ্জাবি পরা।

আমি এতই অবাক হয়ে গেছি যে আমাদের চোখ যেন কপালে উঠে গেছে। এই রায়বাড়ির ছেলে ? আমরা যেন চোখের সামনে এক রাজপুত্রকে দেখছি !

আমাদের ছাদ থেকে দর্জিপাড়ার রায়েদের ছাদ অস্পষ্ট দেখা যায়। একদিন তপনের বড়মামার বায়নাকুলার এনে আমরা দেখেছিলুম ঘুড়ি ওড়াবার সময় ঐ রায়-বাড়ির ছাদে অনেক লোক থাকে। এমন কি ও বাড়ির মেয়েরাও ঘুড়ি ওড়ায়। আমরা মেয়েদের গলার আওয়াজও শুনেছি।

সেই রায়বাড়ির ছেলে আমাদের একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ! আমরা যেন ধন্য হয়ে গেলুম।

নাজির সাহেবের দু'জন কর্মচারী সবগুলো কালো চাঁদিয়াল তুলে দিলে গাড়িতে। যুবকটি টাকা পয়সা কিছুই দিল না, নাজির সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে আবার গাড়িতে উঠে পড়লো। বোধহয় ওরা সারা বছরের টাকা একসঙ্গে নেয়।

আর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চললুম বাড়ির দিকে। আজকের সকালটা আমাদের জীবনে একটা দারুণ সকাল। আমরা একসঙ্গে অতগুলো চাঁদিয়াল আর রায়বাড়ির একটি ছেলেকে এত কাছ থেকে দেখেছি।

এর আগে তপন আর আমি একদিন দেখতে গিয়েছিলুম ঐ রায়বাড়ি। আমাদের বাড়ির পেছনের একটা গলি দিয়ে গেলে বেশী দূর নয়। পুরোনো আমলের দু' মহল বাড়ি। সামনে লোহার গেট। সেই গেটের ওপাশে মস্ত বড় উঠোনে বাঁধা রয়েছে চারটে ঘোড়া। রায়েদের মোটরগাড়িও আছে। ঘোড়াও আছে, বাড়ির মধ্যে বড় বড় গোল গোল থাম। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও সে বাড়ির কোনো লোককে আমরা দেখতে পাইনি।

ঘুড়ি ওড়াবার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে ঘুড়ি ধরা। আমি আর তপন অনেক ঘুড়ি ধরেছি বটে, কিন্তু ঐ কালো চাঁদিয়াল ধরতে পারি নি কখনো। সেইজন্য যে আমাদের কত দুঃখ!

ধরবো কী করে, রায়েদের ঘুড়ি যে কাটেই না বলতে গেলে। যদি বা কাটে, তাও অনেক দূরে।

ঘুড়ি ওড়ানোটা যেন রায়বাড়ির একটা উৎসব। একসঙ্গে অনেকে ছাদে উঠে হৈহৈ করে। আমাদের পাড়ার সমস্ত ঘুড়ি না কেটে দিলে যেন ওদের আনন্দ নেই। আকাশের অনেক উঁচু থেকে সোজা একটা বাজপাখির মতন গোঁৎ মেরে নেমে আসে ওদের কালো চাঁদিয়াল। আমাদের ঘুড়ির তলায় পড়ে পড়পড়িয়ে টেনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুড়ি ভো-কাট্টা।

রায়রা সব সময় টেনে খেলে, লাটিয়ে খেলে না। যারা ভালো খেলতে জানে না, তারাই লাটিয়ে খেলে। যাদের হাতের কব্জির জোর আছে, তারা পড়পড়িয়ে টানে।

আমাদের বাড়ি থেকেও অনেক দূরে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের দিকে দু'একখানা বাড়ি থেকেও অনেক ঘুড়ি ওড়ে। রায়দের কালো চাঁদিয়াল আমাদের পাড়ায় সব ঘুড়ি কেটে শেষ করে তারপর সুতো বেড়ে বেড়ে নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের দিকে খেলতে যায়।

তখন আমরা লাটাই গুটিয়ে বসে দূরে ওদের প্যাঁচ খেলা দেখি। রায়দের কালো চাঁদিয়ালই বেশীর ভাগ দিন, জেতে, দু' একদিন হঠাৎ তাদেরটা কেটেও যায়। বেশী হাওয়া থাকলে জোরে টানার অসুবিধে, সেই রকম কোনো দিন।

রায়দের ঘুড়ি কেটে গেলে, ওদের হাত্তা ধরতে কেউ সাহস পায় না। ওদের ছাদের সবাই মিলে এই, এই বলে চিৎকার করে আর একজন লাটাই গুটোয়। বিদ্যুৎবেগে সুতোটা বেরিয়ে যায়।

তবু আমি একদিন ওদের হাত্তা ধরতে গিয়েছিলুম। আমাদের ছাদ দিয়ে সুতোটা যাচ্ছে দেখে আমি পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়ে খপ্ করে ধরে ফেলেছিলুম। সঙ্গে

সঙ্গে ছেড়ে দিতে হলো অবশ্য, সেই সুতোয় এমন ধার যে কুচ করে আমার হাত কেটে গেল।

তার মধ্যেই একটা জিনিস দেখে আমি অবাক হয়েছিলুম। রায়দের মাঞ্জা কী রঙের তা জানার খুব কৌতূহল ছিল আমার। ছাই ছাই রঙের মাঞ্জা নাকি সবচেয়ে ভালো হয়। কিন্তু রায়দের সুতোর রং ধপধপে সাদা। রায়দের সব কিছুতেই বৈশিষ্ট্য আছে, ওরা মাঞ্জায় কোনো রং মেশায় না।

রায়দের ঘুড়ি যদি একবার কাটে তা হলে প্রতিশোধ না নিয়ে ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। পর পর দু'খানা কালো চাঁদিয়াল যমদূতের মতন ছুটে গিয়ে শত্রুপক্ষকে শেষ করবেই।

পাড়ায় ছেলেদের মুখে রায়দের সম্পর্কে আর একটা অদ্ভুত কথা শুনেছিলুম। ওরা নাকি যে-ঘুড়ি একবার আকাশে ওড়ায়, তা আর নামায় না। পাড়ার সব কটা ঘুড়ি কেটে আকাশ জয় করবার পর রায়েরা হাতের কাছে সুতো ছিঁড়ে দেয় সন্ধেবেলা। তখন সেই কালো চাঁদিয়াল একলা একলা উড়তে উড়তে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ে। এই ভাবে ওরা গঙ্গাকে রোজ প্রণাম জানায়।

সন্ধে হতে না হতেই আমার মাস্টারমশাই এসে যান, সেইজন্য ওটা আমার কখনো দেখা হয়নি।

আমার আর তপনের শুধু এই দুঃখ ছিল যে আমরা একটাও কালো চাঁদিয়াল ধরতে পারলুম না কখনো।

সুযোগ এসেছিল মাত্র দু'বার।

তপনের মামাবাড়ির ছাদে অসুবিধে আছে বলে তপন আমাদের বাড়ির ছাদেই ঘুড়ি ওড়াতে আসে। এক ছাদ থেকে দুটো ঘুড়ি ওড়ানোর কোনো মানে হয় না বলে কখনো আমি লাটাই ধরি, তপন ওড়ায়। আবার কখনো তপন লাটাই ধরে।

মাঝে মাঝে তপনের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেলে অবশ্য আমরা দু'জনেই তখন আলাদা ঘুড়ি ওড়াই, প্যাচও খেলি। তপন আমার চেয়ে ভালো টানতে পারে। রায়-বাড়ির কালো চাঁদিয়াল দেখলে তপন ভয় পায় না। অবশ্য প্রত্যেকবারই তপনেরটাই কেটে যায়।

তপন তখন দাঁত কিড়মিড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, একদিন তোকে ধরবো, ঠিক ধরবোই!

সেইজন্য অন্য ঘুড়ি ধরলেও আমাদের আনন্দ হয় না। কালো চাঁদিয়াল প্রতেকবার আমাদের কেটে দিয়ে যায় বলেই একখানা অন্তত কালো চাঁদিয়াল ধরতে না পারলে আমাদের শান্তি নেই!

রায়বাড়ির ছাদ আমাদের বাড়ি থেকে তিরিশ-পঁয়তিরিশটা বাড়ি দূরে। বেণীর

ভাগ দিনই আমাদের বাড়ির দিকে হাওয়া থাকে। ও বাড়ির ঘুড়ি বাড়তে বাড়তেই তরতর করে এগিয়ে আসে, প্রায় চোখের নিমেষেই আমাদের ছাদ পেরিয়ে অনেক দূরে চলে যায়।

একদিন অন্যরকম হলো।

খুব ধারালো মাঞ্জা দেওয়া সুতো লাটাইতে ভুলভাবে গোটালে ভেতর থেকে আপনিই কেটে যায় অনেক সময়। তা টের পাওয়াও যায় না। তখন ঘুড়ি ওড়াতে গেলে প্যাঁচ না খেলেও নিজের ঘুড়ি ভো কাট্টা হয়ে যায়।

একদিন বিকেলবেলা রায়বাড়ির প্রথম কালো চাঁদিয়াল উড়ছে, একটু এগোতে না এগোতেই সেই শক্তিশালী ঘুড়ি হঠাৎ কেমন দুর্বলভাবে ঘুরতে লাগলো।

দেখলেই বোঝা যায় সুতো কেটে গেছে।

তপন দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, নীলু! নীলু!

আমিও বুঝতে পেরেছি ঘুড়িটা আমাদের ছাদের দিকেই আসছে।

তপন আমায় বললো, নীলু, তুই ওপাশে দাঁড়া, আমি এদিকটায় আছি।

ঘুড়িটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগলো। একেই বলে আশা নিরাশার দোলা। এক একবার মনে হচ্ছে আমাদের ছাদে পড়বেই, আবার এক একবার ডান দিকে কিংবা বাঁ দিকে বেঁকে যাচ্ছে।

আমি মনে মনে বলছি, হে ভগবান, হে ভগবান—

প্রায় আমাদের বাড়ির কাছে এসে দম্‌কা হাওয়ায় ঘুড়িটা ওপরে উঠে গেল।

আমি বুকে দু'হাত চেপে বললুম, যাঃ!

তপন আমার চেয়ে বেশী নজর রেখেছিল। আমি দেখছিলুম ঘুড়িটাকে, ও দেখছিল সুতো কোথায়।

কালো চাঁদিয়ালটা ওপরে উঠে গেলেও ওর সুতো গিয়ে পড়লো আমাদের পাশের বাড়িটার নিচু ছাদে।

তপন বললো, ঐ যে সুতো!

আর একটুও চিন্তা না করে তপন পাঁচিলের ওপর উঠে পাশের ছাদে দিল এক লাফ।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম করে একটা বিরাট শব্দ। আমি দৌড়ে এদিকে এসে দেখলুম, পাশের বাড়ির নিচু ছাদটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তপন, তার মাথা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

ভয়ে আমার এমন বুক শুকিয়ে গেল যে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলুম না।

অবশ্য ঐ শব্দ বাড়ির সবাই শুনতে পেয়েছে। আমার মা আর পাশের বাড়ির রতনদা, খোকনদা ছুটে এলো ছাদে।

কালো চাঁদিয়ালটা তখন দুলতে দুলতে দূরে চলে যাচ্ছে।

পাশের বাড়ির ঐ ছাদটায় তপন আর আমি দু'জনেই আগে অন্য ঘুড়ি ধরবার জন্য আস্তে করে লাফিয়ে নেমেছি। এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে তপনের পা পিছলে গিয়েছিল।

তপনকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো পাড়ার ডাক্তারখানায়। মাথার খানিকটা চুল কেটে ফেলে চারখানা সেলাই করতে হলো। তপনের মামাবাড়িতে খবর দিতে যেতে হলো আমাকেই।

পরদিন সকালে জানা গেল, তপনের মাথার চেয়েও পায়ে চোট লেগেছে বেশী। বাঁ পায়ের হাড়ে ফ্র্যাক্চার হয়ে গেছে। পায়ে প্লাসটার বেঁধে তপনকে শুয়ে থাকতে হলো বিছানায়।

ঘুড়ি ধরতে গিয়ে তপন মাথা ফাটালো, পা ভাঙলো, আর সে জন্য বকুনি আর মার খেলাম আমি। অনেকদিন বাদে সেদিন বাবা আমার কান ধরে দুটি থাপ্পড় মেরে বললেন, ঘুড়ির জন্য এত পাগলামি? আর কোনোদিন করবি?

আমি যত বলি, আমি তো কিছু করিনি, আমি পাঁচিলে উঠে লাফাই নি। সে কথা কে শোনে!

বাবা দারুণ রাগী, একবার রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেই রাত্রেই বাবা আমার সব ঘুড়ি লাটাই রাস্তার মোড়ে ফেলে দিয়ে এলেন। বস্তির ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলো।

বাবা হুকুম দিলেন, আমার আর ছাদে ওঠা চলবে না। ঘুড়ি ওড়ানো একদম নিষেধ।

তবু আমি লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য বন্ধুদের বাড়িতে ঘুড়ি ওড়াতুম।

তপন কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানো একেবারেই ছেড়ে দিল। পা ভালো হয়ে যাবার পরও বললো আমি আর কোনো দিন কালো চাঁদিয়ালের দিকে তাকাবো না। ও আমার শত্রু!

আমি কিন্তু না তাকিয়ে থাকতে পারতুম না! ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কিংবা ছাদে না উঠলেও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি লোভীর মতন চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে, কালো চাঁদিয়ালকে আমার শত্রু মনে হয় না। এখনো মনে হয়, ঐ কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ির আকাশে রাজা।

তারপর আমার জীবনে এলো সেই দিন। তখন আমি ক্লাস নাইনে উঠে গেছি। বি কে পাল এভিনিউতে একটা স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ফুটবল ম্যাচ ছিল। বি সেকশানের প্রশান্ত ভালো হাফ্ ব্যাক খেলে, ওর জ্বর হয়ে পড়ায় স্কুল টিম থেকে চান্স দিল আমাকে।

পাঁচ গোলে হেরে গেলুম আমরা। মোটেই আমার দোষে নয়, গোল কীপার জয়ন্তর

দোষে। গোল পোস্টের যে-দিক দিয়ে বল ঢুকছে, ও যদি তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে কি সেই টিম জিততে পারে?

সারা গায়ে জল কাদা মেখে দলবলের সঙ্গে আমি বাড়ি ফিরছি, প্রায় সন্ধে হবো হবো এমন সময়। আহিরীটোলার কাছে এসে হঠাৎ আকাশে চোখ চলে গেল। অমনি দেখতে পেলুম একটা কালো চাঁদিয়াল।

আনন্দের চেয়ে অবাক হলুম বেশী। আমাদের পাড়া থেকে কত দূরে, এখানে কালো চাঁদিয়াল এলো কী করে?

তখন মনে পড়লো, সেই যে পাড়ার ছেলেরা বলেছিল, রায়বাড়ির ছেলেরা ঘুড়ি আকাশে ওড়ার আর নামায় না। সন্ধের সময় ঘুড়িটা অনেক উঁচুতে তুলে হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে দেয়। তারপর সেই ঘুড়ি গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এই দিকেই তো গঙ্গা!

এই জন্যই রায়েদের মাঞ্জার রং সাদা। একটু অন্ধকার হলে আর কেউ সুতো দেখতে পাবে না।

আমার বুকের মধ্যে দুম্দুম্ শব্দ হতে লাগলো। আজ এই ঘুড়িটা ধরতেই হবে। দরকার হলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বো।

বন্ধুদের কিছু না বলে আমি সুট্ করে কেটে পড়লুম।

পাড়ায় পাড়ায় একদল বাজে ছেলে হাতে গাছের ডাল কিংবা বাঁথারি নিয়ে ঘুড়ি ধরবার জন্য ছোটে। আমি সেই রকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ির পেছনে ছোটার কথা ভাবতেই পারতুম না। কিন্তু এটা বে-পাড়া আমায় কেউ চিনবেই না। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এখানে পাড়ার ছেলের দল এই কালো চাঁদিয়ালটার পেছনে ছুটেছেও না।

বোধহয় সন্ধে হয়ে এসেছে বলে ঐ কালো রঙের ঘুড়িটাকে আর কেউ দেখতে পায় নি। আজকে ঐ ঘুড়িটা শুধু আমার জন্য!

কোন রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছি, তা কিছুই জানি না। আমার চোখ শুধু আকাশের দিকে। মনে মনে খালি ভাবছি, হে ভগবান, আজ ওকে পাবো না? হে ভগবান—

পরীক্ষার আগেও কখনো এত ভগবানকে ডাকিনি!

যদি ঘুড়িটা ধরে নিয়ে গিয়ে তপনকে দেখাতে পারি, তখন তপনের মুখটা কেমন হবে? তপনকে বলবো এই ত্যাখ, তোর শত্রুকে এনেছি।

সেই কথা ভেবেই আমার গায়ে বেশী করে জোর এসে গেল।

ঘুড়িটা ক্রমশ নিচু হতে লাগলো। তা হলে কি কাছেই গঙ্গা? আমি সাঁতার জানি, গঙ্গার ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমার আপত্তি নেই।

কিন্তু গঙ্গার অনেক আগেই ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে নিচে নেমে এলো। ঠিক যেন আমারই জন্য। কালো চাঁদিয়াল এতদিন বাদে বোধহয় বুঝেছে যে আমি কত করে ওকে চাই। সেইজন্যই আজ গঙ্গায় না গিয়ে আমার কাছে আসছে।

প্রায় আমার হাতের কাছে এসেও ঘুড়িটা সাঁ করে বেঁকে একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, যাঃ!

কিন্তু এত কাছে এসেও ফস্কে যাবে? এদিও ওদিক চেয়ে দেখলুম, পাঁচিলটার এক পাশে লোহার গেট। সেদিকে ছুটে গিয়ে সেই গেটের রেলিংএর ফাঁকে চোখ রাখতেই আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরটায় একটা বাগান। সেখানে কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছের ওপর আলতো ভাবে শুয়ে আছে কালো চাঁদিয়াল!

গেটটার ভেতর থেকে তালাবন্ধ। বাগানে কোনো লোক নেই, বাড়ির সব ঘর অন্ধকার, সেখানেও কোনো লোক আছে বলে মনে হলো না। গেটে দরোয়ানই বা নেই কেন?

ঐ তো পড়ে আছে আমার এত সাধের কালো চাঁদিয়াল, আমি এতদূর এসেও ওকে না নিয়ে চলে যাবো? তা কি হয়!

কোনো লোকজন থাকলেও না হয় তার কাছে আমি কাকুতি মিনতি করে বলতুম, আমার ঐ ঘুড়টা দিন না। কিন্তু কোনো লোকজনও যে নেই।

পরের বাড়িতে ঢোকা উচিত নয়। কিন্তু একবার যদি টপ্ করে লোহার গেটটা পেরিয়ে ঘুড়িটা নিয়ে ফিরে আসি, তাতে কি কোনো দোষ হবে? আমি তো এ বাড়ির কোনো জিনিস নিচ্ছি না! ঘুড়িটা বাড়ির বাইরেও তো পড়তে পারতো!

বেশীক্ষণ চিন্তা করার সময় নেই। যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে। লোহার গেটে রেলিং-এর ফাঁকে ফাঁকে আমি তরতর করে উঠে গেলুম। ওপরটায় বর্শা বর্শা দেওয়া সাবধানে পার হয়ে উলটো দিকে লাফিয়ে ছুটে গেলুম বাগানে।

কালো চাঁদিয়ালটার গায়ে হাত দিতে আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল। তা হলে সত্যি এতদিন পর এলো আমার হাতে?

ঘুড়িটা হাতে নিয়ে মুখ ফেরাবার আগেই কে যেন পেছন থেকে ধরলো আমার চুলের মুঠি। তারপরই আমার চোখের ওপর এক থাপ্পড়!

কোনোক্রমে চোখ মেলে দেখলুম কালো রঙের দৈত্যের মতন চেহারার একটা লোক চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

লোকটা বললো, তুই কে?

আমি বললুম, আমি, আমি, মানে—

—এখানে কী করে ঢুকলি?

—আমায় ছেড়ে দিন, আমি কোনো দোষ করিনি, দয়া করে ছেড়ে দিন।

লোকটা আমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা এক স্বার্থপর দৈত্যের বাগান সম্বন্ধে একটা অনুবাদ গল্প পড়েছিলুম, কয়েকদিন আগেই পড়েছিলুম, এত বিপদের মধ্যেও সেই গল্পটাই আমার মনে পড়লো। কিন্তু এ লোকটা তো দৈত্য হতে পারে না। পা-জামা আর গেঞ্জি পরা লোকটার গায়ে খুব জোর। ও ইচ্ছে করলেই আমার মাথার চুলগুলো পড়পড় করে উপড়ে ফেলতে পারে। এমন জোরে চেপে ধরেছে যে যন্ত্রণায় আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়।

আমি কোনো ক্রমে বলতে লাগলুম, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন, আর কখনো এরকম করবো না!

লোকটা আমায় টানতে টানতে নিয়ে এলো বাড়ির মধ্যে। তারপর একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে বললো, ওস্তাদ, এই ছেলেটা বাগানে ঘুরঘুর করছিল!

ঘরের মধ্যে একটা ছোট্ট মোম জ্বলছে। মেঝেতে বসে আছে আরও তিন চারজন লোক। তাদের মাঝখানে রয়েছে একটা লোহার বাক্স, একজন লোক ছুরি দিয়ে সেই বাক্সটা খোলার চেষ্টা করছে।

দেখলেই বোঝা যায় এরা ডাকাত।

দৈত্যের মতন চেহারার লোকটা যাকে ওস্তাদ বললো, তার চেহারা কিন্তু অত বড়-সড় নয়। রোগা ছিপছিপে লোকটি, ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা গলায় একটা সিল্কের রুমাল বাঁধা।

ওস্তাদ আমাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, বাগানে ঢুকেছিল? এর গলাটা কেটে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আয়!

আমি হাত জোড় করে বললুম, মারবেন না আমায় মারবেন না! আমার মা বাবা কিছু জানতে পারবেন না!

—তুই বাগানে ঢুকেছিলি কেন?

আমার এক হাতে তখনও সেই কালো চাঁদিয়াল।

আমি বললুম, এই ঘুড়িটা নিতে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম বাড়িতে কেউ নেই।

দৈত্যের মতন লোকটা ঘুড়িটাতে এক ঘুঁষি মারতেই সেটা ছিঁড়ে গেল।

এবার আর সামলাতে পারলুম না আমি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো টপটপ করে।

ওস্তাদ হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, ঘুড়িটা ছিঁড়লি কেন! এই হাবু, ঘুড়িটা কেন ছিঁড়লি?

দৈত্যের মতন লোকটার নাম হাবু। সে আমার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রোগা পাতলা চেহারার ওস্তাদ উঠে দাঁড়িয়ে দারুণ রাগের সঙ্গে বললো, এত কালো ঘুড়িটা তোকে কে ছিঁড়তে বলেছে, অ্যাঁ!

তারপরই ওস্তাদ হাবুর গালে প্রচণ্ড জোরে কষালো এক চড় !

হাবু গালে হাত বুলোতে বুলোতে নাকি নাকি গলায় বললো, বাঃ ওস্তাদ ! এই ছোঁড়া বাগানে ঢুকে পড়েছিল, আমি ওকে ধরে আনলুম আর তুমি আমায় মারছো ?

—আমায় না জিজ্ঞেস করে ঘুড়িটা তোকে কে ছিঁড়তে বলেছে ?

—ভারি তো একটা ঘুড়ি !

—তুই ঘুড়ি চিনিস ? ছাই চিনিস ! এরকম ভালো জাতের ঘুড়ি খুব কম দেখা যায়। এ আলাদা ভাবে তৈরি করা, এই ছ্যাখ !

যে-লোকটা ছুরি দিয়ে বাক্স খোলার চেষ্টা করছিল, সে এবার বললো, কিন্তু এ ছোঁড়াটা যে এ জায়গাটা দেখে ফেললে, এখন ওকে নিয়ে কী করা যায় ?

ওস্তাদ বললো, হাবুটার যেমন বুদ্ধি ! ছেলেটা ঘুড়ি নিতে এসেছিল, নিয়ে চলে যেত, ওকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসতে তোকে কে বললো ?

হাবু বললো, আমি যা-ই করি, তাতেই দোষ। যদি ছোঁড়াটাকে ছেড়ে দিতুম, তখন তোমরা বলতে, কেন ছাড়লি ?

ওস্তাদ তাকে আবার এক ধমক দিয়ে বললো, চুপ মেরে থাক।

তারপর আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওস্তাদ বললো, তাই তো হে খোকা, তোমাকে তো এখান থেকে আর জ্যান্ত বেরুতে দেওয়া যায় না ?

আমি বললুম, বিশ্বাস করুন। আমি এ পাড়ার ছেলে নই। এ বাড়িটাও আর কোনোদিন চিনতে পারবো না। ঘুড়ির পেছনে ছুটে এতদূর চলে এসেছি।

—তুমি ঘুড়ি ওড়াও?

—হ্যাঁ।

—টেনে খেলো না লেটে খেলো?

—টেনে।

—বলো তো তলায় পড়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে টানতে হয়, না বাঁ দিক থেকে ডান দিকে?

—ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

—মুখ পোড়া কাকে বলে?

—যে ঘুড়ির মাথার কাছে ঘোড়ার ক্ষুরের মতন একটা দাগ বা ঐটুকু আলাদা রং।

—হুঁ! একসময় আমিও ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালবাসতুম।

মাটিতে বসা ছুরি হাতে লোকটা বললো, ওস্তাদ, বাক্সটা খুলে গেছে।

ওস্তাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, যাও, ভাগো! ফের যদি কোনোদিন এ দিকে দেখি, কিংবা কোনো লোককে এখানে ডেকে আনো, তা হলে জিভ কেটে দেবো!

আমার পা এমন কাঁপছে যে আমি চলে যেতেও পারছি না।

ওস্তাদ বকুনি দিয়ে বললো, দাঁড়িয়ে আছো যে? দৌড়ে ও! নইলে—

কী করে যে ছুটে এলুম, গেট পেরিয়ে অচেনা রাস্তা দিয়েও ঠিক নিজের বাড়ি পৌঁছে গেলুম এক সময়, তা জানি না।

এর কিছুদিন পরই আমরা বাড়ি পাল্টে দর্জিপাড়া ছেড়ে চলে গেলুম দমদমে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আর কোনোদিন সেই কালো চাঁদিয়াল দেখতে পাই নি।
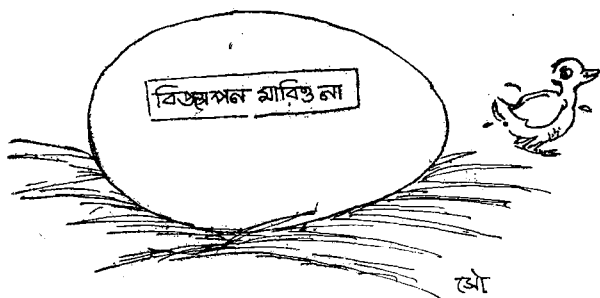
ভুতুড়ে কাণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, কিংবা যে কাজ আশ্চর্যজনকভাবে ঘটে যায়, তাকে আমরা বলি ভুতুড়ে কাণ্ড।

আবার ভূতেরা নিজে যে কাজ করে তাকে তো ভুতুড়ে কাণ্ড বলেই।

আমাদের পরিবারে এমনই এক ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছিল।

পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। দিদিমা আর মামাদের আদরের সঙ্গে প্রচুর আম জাম জামরুল খাচ্ছি। তোফা আনন্দে সময় কাটাচ্ছি।

তিন মামা। বড়মামা রেল অফিসে কাজ করতেন। বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের বাসাবাড়িতে থাকতেন। মাসে একবার বাড়িতে আসতেন।

তিনি মেজমামাকে তাঁরই অফিসে চাকরি করে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মেজমামা রাজী নন। ছেলেবেলার থেকে মেজমামা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সব ব্যাপারেই বেপরোয়া।

তিনি বলেছিলেন, চাকরি-বাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি স্বাধীন ব্যবসা করব।

তা মেজমামা স্বাধীন ব্যবসাই শুরু করেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরের মাছের ভেড়ি থেকে মাছ কিনে গঞ্জের হাটে ব্যাপারীদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করা। পরিশ্রমের কাজ কিন্তু ভাল টাকাই হাতে থাকত।

ছোটমামা কিছু করত না। মামাদের চাষবাসের জমি দেখত আর অবসর সময়ে জাল দিয়ে পাখি ধরত, কাঠি দিয়ে খাঁচা তৈরি করত আর তাতে পাখিগুলোকে রাখত। তবে বেশীদিন নয়। হঠাৎ একদিন খাঁচার দরজা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিত। এক নম্বরের খেয়ালী লোক।

আমাদের গল্প অবশ্য মেজমামাকে নিয়ে।

গল্পই বা বলি কেন, একেবারে আমার চোখে দেখা ঘটনা।

মেজমামা খুব ভোরে উঠে সাইকেলে রওনা হয়ে যেতেন। খুব ভোরে, তখন ভাল করে আলোও ফুটত না। রাস্তাটা অনেকটা পাকা নয়। মানুষের পায়ে পায়ে চলে সরু একটু রেখা। বেশ কিছুটা যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তা।

একদিন ভোরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই ঝড়জল শুরু হয়ে যাবে।

মেঘের ডাকে আমিও ভোর ভোর উঠে পড়েছি। উঠে মেজমামার যাওয়ার তোড় জোড় দেখছি।

দিদিমা বললেন, ওরে, এই আবহাওয়ায় আজ না হয় নাই বেরোলি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এখনই জোর তুফান উঠছে।

ঝড়কে দিদিমা তুফান বলতেন।

মেজমামা হাসলেন, তাহলে তো বর্ষাকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না। আমার কাছে বর্ষাতি আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

মেজমামা যখন বের হলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাতাসও বেশ জোর।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দারুণ ঝড় উঠল। চারদিক অন্ধকার। বাজের শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। এধারে ওধারে বড় বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কি বাড়ির চালা উড়ে গেল। ধসে পড়ল মাটির দেয়াল। দিদিমার কথাই ঠিক। তুফানই বটে।

আমি জানলার ধারে চুপচাপ বসে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছি। একটু পরেই দিদিমা এসে আমার পাশে বসলেন।

বসেই আক্ষেপ করতে লাগলেন, এই দুর্যোগে বাড়ির কুকুর বেড়াল বাইরে বের হয় না, আর এত বারণ করা সত্ত্বেও ছেলেটা রাস্তায় বের হ'ল।

সত্যিই চিন্তার কথা। এই ঝড়জলে বর্ষাতি আর মেজমামাকে কতটুকু বাঁচাতে পারবে। হাওয়ার দাপটে সাইকেল চালানোই মুশকিল। সাইকেল থেকে নেমে যে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন, তাও নিরাপদ নয়। মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লেই হ'ল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল। দিদিমা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে বিছানা নিলেন। মেজমামার নাম করে অঝোরে কান্না।

মেজমামা ফিরলেন রাত আটটা নাগাদ। সাইকেল নেই। হেঁটেই এসেছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পরনের জামা কাপড় ছিন্নভিন্ন। বর্ষাতির খোঁজ নেই।

দিদিমা মেজমামাকে জাপটে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। শুধু কি জাপটে ধরা, ভেউভেউ করে কান্না।

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ ছাড়। জাপটাজাপটি আমার ভাল লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মেজমামা তোমার সাইকেল?

বটগাছ চাপা পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বটগাছ চাপা?

হ্যাঁ, কাঞ্চনতলার কাছে দারুণ ঝড় উঠল। বটগাছের ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল আমার ওপর। সাইকেল চুরমার হয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম মাটির ওপর। এই দেখ না।

মেজমামা চুল সরিয়ে দেখালেন। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

তারপর থেকে মেজমামা কেমন বদলে গেলেন।

মাছের ব্যবসা বন্ধ। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। কখন ফিরতেন কে জানে।

দিদিমা অনেক বলতেন, কিন্তু মেজমামা নির্বিকার।

শেষকালে দিদিমার নির্দেশে আমি শুতাম মেজমামার সঙ্গে। অবশ্য আলাদা খাটে।

একদিন খুব ভোরে মেজমামার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

এই এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?

ঘরের কোণে স্টোভ ছিল। তাকের ওপর চা, চিনি কাপ ডিশ। আগে আগে ভোরে বের হবার সময় মেজমামা নিজে চা করে খেতেন।

ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, তুমি নিজে করে খাও না।

মেজমামা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, না আমি আগুনের কাছে যেতে পারব না। ভয় করে।

ভয় করে কথাটা মেজমামার মুখে নতুন শুনলাম। মেজমামা চিরকাল দুর্দান্ত প্রকৃতির। দারুণ সাহস।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মেজমামা যেন কুঁকড়ে গেছেন। কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। কেউ ডাকতে এলে বলে দেন, বল, আমি বাড়িতে নেই।

আরও আশ্চর্যের কাণ্ড মাথার একদিকের রক্ত জমে থাকাটা একই রকম রয়ে গেল। ওষুধপত্র মালিশ কিছুতে কিছু হ'ল না।

অগত্যা উঠে চা তৈরি করে দিলাম। নিজেও খেলাম এক কাপ।

আর এক রাতে এমন এক ব্যাপার ঘটল, তাতে একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। ক'দিন গুমোট গরম পড়েছে। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি।

বহুকষ্টে যাওবা একটু ঘুম এল, সেটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজে ভেঙে গেল।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

মেজমামার দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ির সবাই বেশ একটু খর্বকায়। মেজমামা আবার সব চেয়ে বেঁটে।

সেই মেজমামাকে দেখলাম, বিরাট চেহারা। দেহ খাটের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম একই দৃশ্য।

খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই দৃশ্য বদলে গেল। মেজমামা যেন নিজের সাইজে ফিরে এলেন।

মনকে বোঝালাম ঘুম চোখে নিশ্চয় ভুল দেখেছি। না হ'লে এমন ব্যাপার হতে পারে নাকি!

একথা কাউকে কোনদিন বলি নি, জানি কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু পরে যা ব্যাপার ঘটল, তাতে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, মেজমামা বিছানায় নেই। ভাবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন এখনই ফিরবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, মেজমামা ফিরলেন না।

উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেজমামা রোয়াকে বসে আছেন। জানলার দিকে পিছন ফিরে।

একটু দূরে গোটা কয়েক গাছ পার হয়ে একটা জাম গাছে ছোটমামা জাল পেতে রেখেছে পাখি ধরবার জন্যে। জালের একজায়গায় ফুটো ছিল, ছোটমামা বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। সেই ফুটো দিয়ে আটকে থাকা পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেজমামা বসে বসেই হাত বাড়ালেন। কি বিরাট হাত। রোয়াক থেকে জাম গাছটার দূরত্ব কম পক্ষে ত্রিশ গজ তো হবেই।

হাতটা সোজা গাছের ওপর চলে গেল। যেখানে জালের ফুটো সেখানে। মেজমামা আঙুল দিয়ে জালে গিঁট বেঁধে দিলেন। পাখিদের পালানো বন্ধ হ'ল।

আমি বুকের ওপর হাত চেপেও দুপদুপ শব্দ বন্ধ করতে পারলাম না। মনে হ'ল এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব। কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ভোরে উঠে দেখি মেজমামা খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে মেজমামা যখন রোয়াকে বসে তখন লক্ষ্য করেছি, দরজায় ছিটকানি।

তাহলে মেজমামা বাইরে গেলেন কি করে? বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বা কি করে ঢুকলেন?

ঠিক করে ফেললাম, আর মামার বাড়ি নয়। কোন একটা অছিলায় বাড়ি পালাব।

এটাও কি চোখের ভুল? দু' দুবার এরকম চোখের ভুল হ'তে পারে কখনও!

দুপুরবেলা কিন্তু মত বদলে গেল। ছোটমামা জালে আটকানো পাখিগুলো নিয়ে খাঁচায় পুরছিল। আমি বসে বসে দেখছিলাম। মেজমামাও বসেছিলেন।

বেশীর ভাগই মনুয়া আর টুনটুনি পাখি। একটা শুধু বড় আকারের টিয়া। গাঢ়

সবুজ রং। লাল চোখ। কিছুতেই ধরা দেবে না। ছোটমামার হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিল।

আমি তো তখন দেখছিলামই, আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম। আড়চোখে দেখছিলাম উঠানে মেজমামার ছায়া পড়েছে কিনা, আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো উল্টো দিকে কিনা!

দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠানের ওপর মেজমামার রীতিমত ছায়া পড়েছে আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো একেবারে স্বাভাবিক।

তার মানে রাত্রে নিশ্চয় আমি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। পেট গরম হ'লে যা হয়। পেট ঠাণ্ডা করার জন্য রোজ সকালে একটা করে ডাব খেতে হবে।

আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিপদও আছে। এখানে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, আর ওখানে বাবা রোজ পাঁচপাতা হাতের লেখা আর দশটা অঙ্ক কষাবে।

বেশ কিছুদিন অলৌকিক কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম নিজের ভয়ের বিকৃত রূপটাই দেখেছি।

মেজমামা সে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে দিদিমা খুব খুশি। তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবি মেজমামার চলবে কি করে।

একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

হ্যাঁ মেজমামা, তুমি যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলে? কি হবে?

মেজমামা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, ফিরে বললেন।

কেন, তোর অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

মুশকিলে পড়ে গেলাম। সামনে গিয়ে বললাম, না, অসুবিধা আর কি! আগে তুমি মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আনতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেজমামা বললেন, ও, এই কথা। তোকে আজই বড় মাছ খাওয়াচ্ছি।

মেজমামা বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন, হাতে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে।

আমি তো অবাক।

হাঁ৷ মেজমামা, তার মধ্যে এত বড় মাছ পেলে কোথায় ?

মেজমামা হাসলেন, একজন জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমার তো সবই চেনা। বলতেই দিয়ে দিল।

দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। বঁটি নিয়ে এসেই মাছ কুটতে বসলেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোজ ছাই রঙা একটা উটকো বেড়াল এ বাড়িতে আসত। আহারের সন্ধানে। সেদিনও সে এসে হাজির।

বঁটির পাশে আঁশের স্তূপ। বেড়ালটা এগিয়ে এসে আঁশে মুখ দিয়েই বিকট স্বরে ম্যাও করে উঠল। অস্বাভাবিক স্বর। কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর ল্যাজটা খাড়া করে সোজা পাঁচিলের ওপর গিয়ে উঠল। দিদিমাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন।

তিনি বললেন, বেড়ালটার কি হ'ল বলতো ? ওভাবে চেঁচিয়ে উঠল। গলায় কাঁটা ফুটল না কি ?

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি বেড়ালটা একটা আঁশও মুখে তোলে নি। খাওয়া তো দূরের কথা! কেবল শুঁকেই ওই রকম চিৎকার করে উঠল। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

এমন কি দিদিমা যখন একটা কলাপাতায় বড় মাছের টুকরো ভেঙে আমাকে খেতে ডাকলেন তখন একটু ইতস্তত করেছিলাম।

তারপর মনে সাহস এনে মাছের টুকরো মুখে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। না, কোন গোলমেলে ব্যাপার নেই। দিব্যি সুস্বাদু মাছ।

কত অল্পেতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। বেড়ালটার ওভাবে চিৎকার করে ওঠার হাজার কারণ থাকতে পারে।

তবে সেদিন থেকে বেড়ালটাকে আর ধারে কাছে দেখতে পাই না। বোধ হয় অন্য কোন বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।

এতদিন কথাটা দিদিমা কিংবা ছোটমামাকে বলি নি কারণ প্রথমত, সব ব্যাপারটা নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। হয়তো আমারই চোখের ভুল কিংবা ভয়ের ছায়াটা রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত প্রয়োজন হ'লে এই অলৌকিক কাণ্ড যে কাউকে দেখাতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম।

তাছাড়া দিদিমাকে নিজের ছেলের সম্বন্ধে কি করে এসব কথা বলি।

তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আর একবার এরকম বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লেই মামার বাড়ি থেকে পালাব। এখানে আদরযত্নের লোভে তো আর বেঘোরে প্রাণ দিতে পারি না।

বেশ কিছুদিন সব স্বাভাবিক। কোথাও কোন গোলমাল হ'ল না। মেজমামা অবশ্য মাছের ব্যবসায় আর গেলেন না। বাড়িতেও বিশেষ থাকতেন না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতেন কে জানে।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি। কতদিন আর চুপচাপ বসে থাকব।

তারপরই অঘটন ঘটল।

মাঝরাতে বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছোটমামা রোয়াকের এককোণে দাঁড়িয়ে। একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ, নিশ্চল।

আমি কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে বাগানের দিকে দেখাল। যা দেখালাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটা গাছের ডালে মেজমামা পা ঝুলিয়ে বসে। মেজমামা মানে মুখটা মেজমামার, কিন্তু দেহটা বিরাট। মাথাটা প্রায় গাছের মগডালে ঠেকেছে। পা দুটো মাটির অল্প ওপরে।

কি খেয়ে খেয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছেন। একটা ছিটকে এসে রোয়াকের ওপর পড়তে নিচু হয়ে দেখেই চমকে উঠলাম। রক্তমাখা হাড়ের টুকরো।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল এখনিই বুঝি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ব।

ছোটমামা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

তারপর দিন পনের কি হয়েছে আমি জানি না। দারুণ জ্বরে আমি প্রায় বেহুঁশ।

দিদিমা চেয়েছিলেন আমার বাবাকে খবর দিতে, কিন্তু ছোটমামা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিল। ছোটমামা বলেছিল, শুধু ভয় পেয়ে আমার এই জ্বর। ডাক্তারেরও তাই মত। এর মধ্যে বাবাকে টেনে নিয়ে এলে আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বাবা বিশ্বাস করবেন, এটা আশা করা যায় না।

অথচ তারপরের দিন সকালে দিদিমার পোষা ছাগলটা নিখোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে তার ছিন্নমুণ্ডটা পাওয়া গিয়েছিল। চারদিকে রক্তমাখা যে সব হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল সেগুলো যে ছাগলেরই হাড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন কথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে শহরের লোক।

মেজমামা নাকি আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে। হাজার ডাকে সাড়া দিতেন না। খেতে ডাকলে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিতেন, খিদে নেই। শরীর খারাপ।

দিদিমা যে মেজমামাকে এত ভালবাসতেন, সেই দিদিমা ছোটমামার কাছে সব শুনে মেজমামার ধারে কাছে ঘেঁষতে চাইলেন না।

আমি যখন সেরে উঠলাম, তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।

শোবার ব্যবস্থা পালটে গেছে। একঘরে আমরা তিনজন শুতাম। একপাশে দিদিমা, অন্যপাশে ছোটমামা মাঝখানে আমি। সারারাত ঘরে আলো জ্বলত।

ছোটমামা দরজায় ভিতর থেকে ডবল তালা লাগিয়ে দিত। আমরা সবাই জানতাম অলৌকিক শক্তির পক্ষে এ তালা কোন বাধাই নয়, কিন্তু তবু বারণ করতে পারিনি।

ছোটমামা আর আমি ওই দৃশ্য দেখার পর, আমি আগে যা দেখেছি সব দিদিমা আর ছোটমামাকে বলেছি।

ছোটমামা বলল, কথাটা আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, তাহলে আরও আগে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।

কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ছোটমামা বলল।

বদনপুর এখান থেকে আড়াই মাইল। সেখানকার ভৈরব রোজা খুবই বিখ্যাত। তার খড়মের আওয়াজে ভূতপ্রেত থরথর করে কাঁপে।

তাকে পাওয়া একটু মুশকিল। লোকের ডাকে প্রায়ই ভিনগাঁয়ে চলে যায় আর দক্ষিণাও এক মুঠো টাকা।

দিদিমাকে ছোটমামা অনেক কষ্টে রাজী করাল। দিদিমা সব বুঝেও একটু ইতস্তত করলেন। হাজার হোক ছেলে তো।

ছোটমামা বোঝাল, বেশ তো, ভৈরব রোজা এলেই সব বোঝা যাবে।

খুব ভোরে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। বদনপুরে ভৈরবকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য গাঁ থেকে তাকে ধরে আনতে হবে।

ছোটমামা যখন বের হয় তখন মেজমামা বাড়ি ছিলেন না। আধঘণ্টা পরে কোথা থেকে ফিরে এলেন।

চেহারা দেখে মনে হ'ল অনেক দূর থেকে যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ফতুয়াটা গাছের ডালে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

দিদিমা রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন, আমি পাশে বসেছিলাম।

মেজমামা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের দু পাশে ফেনা। লালচোখ পাকিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছোনে কোথায় গেছে?

ছোনে ছোটমামার ডাকনাম।

আমার বুকের দুপদাপ শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ভয় হ'ল অবশ হয়ে বঁটির ওপর না পড়ে যাই।

দিদিমা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, নিজের কি একটা দরকারে গেছে।

নিজের দরকার না ছাই। মেজমামা দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিলেন, ভাই তো নয়, শত্রুর, শত্রুর, আচ্ছা ঠিক আছে।

কথাগুলো বলেই মেজমামা জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, দুটো হাত পিছনে, কেবল মাথা নাড়ছেন, থুতু ফেলছেন আর ঘুরছেন।

ব্যাপার দেখে দিদিমা আর সাহস পেলেন না। আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

দিদিমার দিকে চেয়ে দেখি তাঁর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনের কষ্টটা বুঝতে পারলাম।

যতক্ষণ মেজমামা বাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি আর দিদিমা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেজমামাকে আর দেখা গেল না। দিদিমা উঠে জানলা দিয়ে দেখে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে মেজমামা ধারে কাছে কোথাও নেই, তখন আমাকে খেতে দিলেন।

নিজে কিছু খেলেন না। ছোটমামা এলে এক সঙ্গে খাবেন।

আমি খাব কি! তখনও শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোন রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাড়ি রওনা হব। এখানে এভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে শীঘ্রই শক্ত অসুখে পড়ে যাব।

ছোটমামা ফিরল বেলা আড়াইটে নাগাদ। সাইকেল রিকশায়। সঙ্গে ভৈরব রোজা।

আমি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভৈরবের পরনে লাল টকটকে কাপড়। গায়ে কোন জামা নেই। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। দু হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা।

লালচুটি চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঝাঁকড়া পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

ভৈরব নেমে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাতাসে কি যেন শুঁকল তারপর ছোটমামার দিকে ফিরে বলল, কেউ গৃহবন্ধন করেছে।

ছোটমামা অবাক।

গৃহবন্ধন কি ?

কেউ মন্ত্র পড়ে গৃহবন্ধন করে দেয়, তাতে এই গৃহের মধ্যে কোন কাজকর্ম করলে তা ফল দেয় না।

কে এ কাজ করবে ?

যাকে তাড়াতে চাও সেই করবে।

কিন্তু তার পক্ষে তো কিছু জানা সম্ভব নয়।

ছোটমামার কথায় ভৈরব খুব জোরে হেসে উঠল।

প্রেতাত্মার পক্ষে সব কিছু জানতে পারাই সম্ভব। মানুষের চেয়ে তারা অনেক বেশী শক্তির অধিকারী হয়।

তাহলে উপায় ?

উপায় আছে বই কি। তুমি আগে সাইকেল-রিকশাকে বিদায় কর।

ছোটমামা সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ভৈরব পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা মাটির সরা বের করল। তার ওপর চারটে পাকা লঙ্কা, একমুঠো সর্ষে, কতকগুলো কুশের ডগা রাখল। তারপর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লঙ্কা, সর্ষে আর কুশের ডগা আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়তে লাগল।

পিছনে নিশ্বাসের শব্দ হ'তে ফিরে দেখলাম দিদিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখে তখনও জল।

আধ ঘণ্টা পরে ভৈরব উঠে দাঁড়ালো।

ঠিক আছে। এবার বাড়ির মধ্যে চল।

ভৈরবের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর গাঁয়ের কিছু লোক জড় হয়েছিল। ভৈরবের পিছন পিছন তারা বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

উঠানে মাটি দিয়ে বেদী করা হ'ল। তাতে কাঠ, শুকনো ডালপালা নিয়ে আগুন জ্বালানো হ'ল। ভৈরব সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে মাঝে মাঝে কাঠি করে ঘি ছিটিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে লাগল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে আমি রোয়াকে গিয়ে বসেছি। দিদিমা আমার পাশে। ছোটমামা ভৈরবের কাছে। তার ফাইফরমাশ খাটছে।

আধ ঘণ্টা কিছু হ'ল না। সব নিস্তব্ধ। শুধু ভৈরবের রুক্ষ গলায় মন্ত্র পাঠের শব্দ শোনা গেল। হিং টিং ছট করে অদ্ভুত ভাষা।

আমি তখন ভাবতে শুরু করেছি যে সবটাই বুজরুকি, তখন হঠাৎ শোঁশোঁ আওয়াজ। ঠিক অনেক দূর থেকে ঝড় এলে যেমন হয়।

পশ্চিমদিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। গাছের ডালে বসা কাকের দল চিৎকার করে আকাশে পাক খেতে লাগল।

একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি। বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ঝটপট করছে। মেজমামার দু কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মেজমামার সেই মূর্তি দেখে আমি ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম উত্তেজনায় দিদিমাও ঠকঠক করে কাঁপছেন।

মেজমামা এসে দাঁড়াতে ভৈরবেরও চেহারা বদলে গেল। সে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। আগুনে মুঠো মুঠো কি ফেলল তাতে আগুন আরো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

মেজমামা এগোতে পারলেন না। গাবগাছের তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিশ্রীভাবে ভৈরবকে গালাগাল দিতে লাগলেন। আধখাওয়া মুরগিটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে। মুরগিটা এসে পড়ল আগুনের মধ্যে।

কে তুই? ভৈরব চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দয়াল বাঁড়ুজ্জে। মেজমামা আরও চিৎকার করে বললেন।

না, তুই দয়াল ন'স। ঠিক করে বল, কে তুই?

দয়াল বাঁড়ুজ্জে মেজমামার নাম। ডাকনাম টোনা।

বলব না।

মেজমামার সে কি গর্জন। ঠোঁটের দুপাশে ফেনা এসে জমল।

বলবি না? আচ্ছা দেখি বলিস কি না।

ভৈরব পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘটের ওপর মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেজমামা আর্তনাদ করে উঠলেন। মনে হ'ল ঝাঁটার প্রত্যেকটি ঘা যেন তাঁর দেহেই পড়ছে।

বলছি, বলছি, আর মারিস নি।

মেজমামা গাছতলায় বসে পড়লেন।

বল। ভৈরব ঝাঁটা আছড়ানো শব্দ করল।

আমি মহিন্দর ডোম।

ভৈরব দিদিমার দিকে চোখ ফেরাল, চেনেন মহিন্দর ডোমকে?

দিদিমা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি কখনও দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি মহিন্দর পুজোর সময় ঢাক বাজাত। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে তারা পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠি মেরে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।

মেজমামা আর বলব না। মহিন্দরই বলি।

মহিন্দর চুপচাপ সব শুনল। দিদিমার কথা শেষ হ'তে বলল, মাঠাকরুণ ঠিক বলেছেন। শিবে আমার মাথায় লাঠি মেরেছিল। আমিও শোধ নিয়েছি। শিবের গুষ্টির ঘাড় মটকে পগারে ফেলে দিয়েছি। ওর বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই।

তুই দয়ালের দেহে এলি কি করে?

সেদিন খুব ঝড়জলের সময় দয়াল সাইকেলে চেপে বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই আমার আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়ল দয়ালের মাথার ওপর। দয়াল খতম। তার সাইকেল চিঁড়েচ্যাপ্টা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া। অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম।

এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে। ভৈরব বলল।

মাথা খারাপ। আমি ছাড়ব না।

তবে রে।

আবার ঘটের ওপর ঝাঁটার আছড়ানি।

মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে মহিন্দর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

একটু পরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।

কি ক'রে বুঝব তুই গেছিস?

কি করতে হবে বল?

ভৈরব এদিক ওদিক দেখল। উঠানের একপাশে মরচে ধরা একটা বরগা পড়েছিল।

সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ভৈরব বলল, ওটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা কথা।

বল।

গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব। এদিকে আর আসব না।

যা তবে।

লোহার ভারী বরগা, যেটা তুলতে অন্তত জন চারেক লোকের দরকার, সেটা মহিন্দর অবলীলাক্রমে দাঁতে করে তুলে নিল।

আবার সেই ঝড়ো হাওয়া। গাছপালার মধ্য দিয়ে বরগা নক্ষত্রবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে নজর পড়তে দেখলাম মেজমামার প্রাণহীন দেহটা গাবগাছতলায় পড়ে আছে। দেহ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

ভৈরব বলল, এখনই দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা কর। অনেক দিনের বাসি মড়া।

দুম করে একটা শব্দ। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রোয়াকের ওপর ঢলে পড়লেন।

* * * *

এসব অনেক দিনের কথা।

দিদিমা কবে মারা গেছেন। মামারাও কেউ বেঁচে নেই। মামাতো ভাইবোনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, খবর রাখি না।

আমারও বেশ বয়স হয়েছে।

খুব ঝড়জল শুরু হ'লে সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই এসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল!

কিন্তু চোখের সামনে দেখা সব কিছু অস্বীকারই বা করি কি ক'রে!
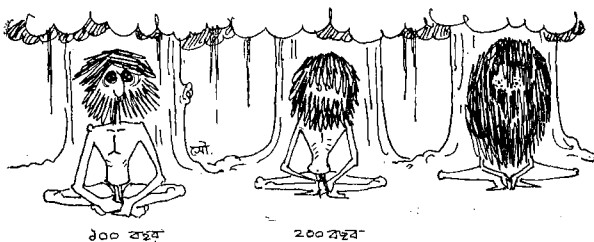
চাইনাকির জঙ্গলে

অরুণ বাগচী

'বাঁচাও বাঁচাও' আর্তরব শুনে বন্দুক হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এলে রূপময়। এই ভরদুপুরে বাঘ হাতি বা বুনো শূয়োর কাউকে তাড়া করেছে এটা ভাবা যায় না। তবে যা ঘন জঙ্গল চারদিকে, সবই সম্ভব। বোধ করি সাপ হবে। যদিও ঠাণ্ডা পড়ে এসেছে। তবু সাপ সেই সেপটেমবর অকটোবর পর্যন্ত যত্রতত্র। তাড়াতাড়িতে এক পাটি স্যানডেল পায়ে গলিয়েই বারান্দায় চলে এলো রূপময়।

মোলায়েম রোদ্দুরে ঝকঝক তকতক করছে সদ্যমাজা বাসনের মত গোটা দিনটা। উত্তর আকাশ জুড়ে হিমালয়ের তিনটে উঁচু, উঁচু, আরও উঁচু সবুজ কঠিন রেখাঙ্কন। যতটুকু ব্রহ্মপুত্র এখান থেকে দেখা যায় সবটাই একটা রুপোলি ফিতের মত। তারপর সবুজ মখমলের মত জঙ্গলে সব ঢাকা পড়ে গেছে। জঙ্গল চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়ে গেছে এই উলটে রাখা কড়াইয়ের মত ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে। যার উপর রূপময়ের বাংলো। স্থানীয় ভাষায় চাঙ্‌বাংলা। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হয় বারান্দায়, যার উপর দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে রূপময় লক্ষ করছিল, বাঁ দিকে জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পায়ে চলা পথ ধরে পড়িমরি করে ছুটে আসছে ঝোলা খাকি শার্ট পরা একটা লোক। আর তার পিছনে…

এক লহমা দেরি না করে চেঁচিয়ে উঠল রূপময়। "রুমনি, রুমনি, এই রুম্‌নি।"

শিঙ্‌ বাগিয়ে মাথা নীচু করে খাকি শার্টকে তাড়া করে আসছিল হরিণটা। রূপময়ের গলা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বাতাসে মুখ তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগল যেন। রূপময় আবার ডাক দিল, "রুমনি, রুমনি, শুনে যা"। এবার আর দ্বিধা করল না হরিণটা। গলায় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ তুলে ছুট দিল বাংলোর দিকে।

রাস্তা একটাই। চোখ কপালে তুলে খাকি শার্ট তখনও দৌড়ুচ্ছিল। পিছনে তাকাবার সাহসও হয়নি। একটা ক্যানেডিয়ান ইনজিনের মত স্পীড নিয়ে রুমনি তাকে অবহেলার সঙ্গে হারিয়ে দিয়ে ছুটে গেল সামনে। তার গায়ের ধাক্কায় খাকি শার্ট ছিটকে পড়ল পাশের বেতঝোপে। কয়েকবার 'আই বাপ্‌' আওয়াজ তুলে চোখ মুছে ফেলল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বেতের কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া জামাকাপড় আর ছড়ে যাওয়া শরীরটা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাকি শার্ট যখন বাংলোর হাতায় এসে পৌঁছল তখন

হরিণটা রূপময়ের কাছে আদর খাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই কর্কশ জিভ বুলিয়ে দিচ্ছে রূপময়ের গালে ঘাড়ে হাতে। পায়ের শব্দ শুনে হরিণটা একবার মুখ ফিরিয়ে আগন্তুককে দেখল। তারপর নির্বিকারভাবে রূপময়ের পিঠে গলা ঘষতে লাগল।

সিঁড়ির উপর বসেই রূপময় খাকি শার্টের কাদার ছোপলাগা শরীর আর ভয়ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। "আরে কানাইরাম, এসো এসো। রুমনিকে দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে। তোমাকে চেনে না তো, তাই! তারপর হঠাৎ এ তল্লাটে কী মতলবে? কার গলা কাটতে এলে?"

কানাইরাম কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু খুব যে নির্ভয় হতে পারছিল তা নয়। বাপরে, পোষা হরিণ তো কি! একটা ঘোড়ার মত উঁচু। এখন বাড়ির গরুর মত আহ্লাদ করে নুনের বাটি চাটছে, কিন্তু সত্য সত্য ওই শিঙ্ বাগিয়ে তেড়ে আসা—বাপ্‌রে সেকথা কানাইরাম চট করে ভোলে কী করে? দু একটা হিন্দী গান তার মনে পড়ে গেল যাতে হরিণের মায়াবী চোখ আর নরম মন নিয়ে কাব্য করা হয়েছে বিস্তর। ওই সব গীতিকাররা যে কেউ রুমনিকে দেখেনি তা বলাই বাহুল্য। দেখা হয়ে গেল কানাইরাম ঠিক তাদের কান মলে দেবে।

রূপময়ের কথাটা ঠাট্টা জেনেও কানাইরাম মৃদু প্রতিবাদ করল। "না হুজুর, কোনও মতলব নিয়ে আসিনি আমি। সাবরুঘাটের দিকে এসেছিলাম বিষণলালের খুঁটি (গরু-মোষের খাটাল) দেখতে। একটু হুজুর ব্যবসার কথাও ছিল ওর সঙ্গে। তা এসে শুনি ও গেছে তিনসুকিয়ায়। ফিরবে কাল বিকেলে। তাই ভাবলাম, পাঁচ সাত মাইল রাস্তা মাত্র। যাই একবার হুজুরকে সেলাম বাজিয়ে আসি।"

কানাইরামকে নিয়ে রূপময় উঠে এলো বারান্দায়। রুমনি নুনচাটা সাঙ্গ করে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে লোভে লোভে। রূপময়ের কমবাইনড হ্যানড নরপতি আগেই জল চড়িয়ে দিয়েছিল। এখন চাপাতা ভিজিয়ে উনুনের আঁচে মকাই পোড়াতে শুরু করল। নরপতি তাকিয়ে বললে, কীরে বোকা মেয়ে, বাড়ি ছেড়ে দুদিন কোন্ বনে বাদাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলি? একটা কালো বাঘ বেরিয়েছে এদিকে জানিস না। কোঁৎ করে গিলে খেয়ে নেবে। তখন বুঝবি মজা।

এমনভাবে ঘাড় কাৎ করে কথা শুনছিল রুমনি যেন সব বুঝতে পারছে। দেখে হেসে ফেলল নরপতি। তারপর একটা খোসাশুদ্ধ মকাই মুখে গুঁজে দিয়ে বলল—যা পালা এখান থেকে। লোভী কোথাকার। বলল, কিন্তু মনে মনে জানে রুমনি চায়ের মহাভক্ত। প্লেটে ঢেলে চা না দিলে ঠিক ঘুরে ঘুরে আসবে।

বারান্দায় বসে রূপময় বলছিল, বুঝলে কানাইরাম, ওই পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র, ডিহিং দিগারু—এই সব নদী, এমন রূপকথার জঙ্গল, উর্বরা জমি, আসাম রাজ্য ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও আর আছে কিনা জানি না। কিন্তু কেউ আমরা দেশটাকে ভালোবাসি না।

কেউ কাউকে ভালোবাসি না। শুধু টাকা আর টাকা। আমি ধান, আলু, মকাই, আখের চাষ করছি বড়লোক হবার জন্য। তুমি কানাইরাম ছোঁক ছোঁক করছ জলের দামে আমার আলু ধান কিনে তিনসুকিয়া বা ডিব্রুগড়ের বাজারে নিয়ে ফেলতে। এখানে একটা গোলা (মুদীর দোকান) খুলতে চাও জানি এখানকার সরল মানুষগুলোকে ঠকানোর জন্য। আগের বার আমি খুলতে দিইনি বলে খুব রাগ করেছ তোমরা। তোমার ভাই তো মিরিদের (স্থানীয় পার্বত্য উপজাতি মিরি বা মিসাং) গ্রামে গিয়ে তাদের ক্ষেপাতে চেয়েছে আমার বিরুদ্ধে। নেহাতই বন্যাটা না এসে গেলে হয়তো আমাকে বিপদেই পড়তে হত। মিরিরা সরল উপজাতির মানুষ। তোমার আমার মত শয়তানি এখনও ওরা শেখেনি। কিন্তু শিখবে। ওরা বুঝবে, ওদের বাইরের কাউকে আর দরকার নেই। তখন কী হবে কানাইরাম? তখন কোথায় থাকবে আমার খেতিবাড়ি আর তোমার ব্যবসা?
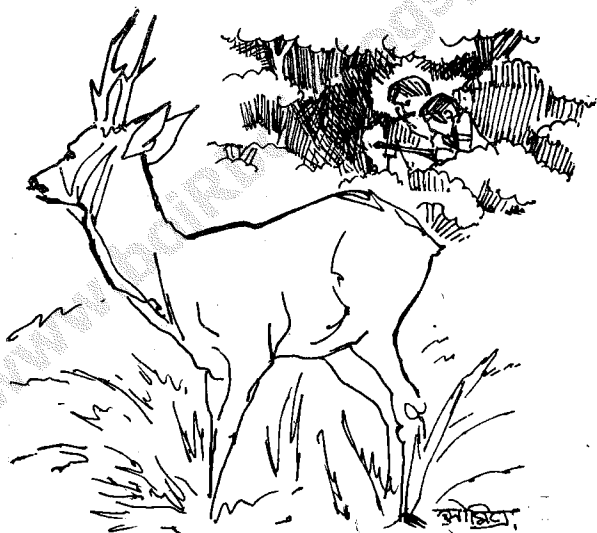
মাঝে মাঝেই মুখ খুলতে চেয়েছে কানাইরাম, পারেনি। এখন নরপতি চা আর মকাইপোড়া নিয়ে হাজির হতে তার ফুরসৎ মিলল। জোড়হাত করে বলল, না হুজুর না। আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। আমরা এখানকার আনাজপাতি দুধ এসব কিনে জিলাশহরে পাঠাই একথা ঠিক। কিন্তু ঠকাই না হুজুর। লাভ, সে তো ব্যবসাতে করবই। তবে দোকান করতে না দেওয়াটা হুজুর আপনার মত লোকের পক্ষে ঠিক

কাজ হয়নি। একটা গোলা করলে চাল ডাল তেল নুন—সাধারণ লোকের যা যা দরকার সব তারা সারা বছর ওখান থেকে পাবে। না হলে যে কোনও দামে দরকারের জিনিস ওদের কিনতে হয় যার তার কাছ থেকে। আপনি আমাকে দোকান বসাতে দিলেন না। লোকে কিন্তু ছ-সাত মাইল হেঁটে গিয়ে পুখ্‌রিজান থেকে জিনিস কিনছে। চলে যাচ্ছে সুরসুলা। তা সুখিয়া কাঞ্চা বা জগপৎবাবু কি আমার চেয়ে কম দামে জিনিস বেচেন?

রূপময় চুপ করে রইল। কানাইরাম যে একেবারে বাজে কথা বলছে তা নয়। তবে মুশকিল হল, চাল ডাল তেল নুন বেচাটা একেবারে গলাকাটা ব্যবসা। দামে সর্বদা বেশী, ওজনে সর্বদা কম। চুরি চলবে দুহাতে। যারা ঠকছে, তারা ঠকছে যদি সন্দেহও করে, তবু চুপ করে থাকে। কারণ নগদে তো দিতে হচ্ছে না। খাতায় টোকা থাকছে। হিসাব পরীক্ষা করার ক্ষমতাও কারও নেই। পরে খেসারৎ দিতে হবে পুরোমাত্রায়। দু সের নুনের দাম মেটাতে হবে আধমণ আলু ধরে দিয়ে। লোকগুলোর পরিশ্রমের ফসল গিয়ে ট্যাঁক ভারী করবে কানাইরামের।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নরপতি দেখল রুমনি নেই। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বুঝল, চলে গেছে ডাইনের জঙ্গলের দিকে। কাজটা ভালো করছে না রুমনি। ইদানীং খুব সাহস বেড়েছে। দিব্যি চলে যাচ্ছে জঙ্গলে। আগেও যেত। কিন্তু ঠিক ফিরে আসত বিকেল গড়ানোর আগেই। এখন মাঝে মাঝে দুরাত তিনরাত নিপাত্তা হয়ে যাচ্ছে হরিণটা। রূপময় বলে, বনের প্রাণী বনে তো যাবেই। ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। নরপতি কিছু মুখে আপত্তি জানায় না। কিন্তু ভরসাও পায় না মনে। বানের জলে ভেসে এসেছিল কুকুরের ছানার সাইজের হরিণশিশুটা। আগুনে সেঁকে সেঁকে নির্জীব প্রাণীটাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল নরপতির বউ সোমারি। রূপময় ফিডিং বটল কিনে এনেছিল পরে। তার আগে দুধে তুলো ভিজিয়ে সেটা মুখে ঢেলে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল ওই সোমারিই। বড় ন্যাওটা ছিল হরিণটা সোমারির। সেই সোমারি, রাত্রে, চাইনাকি খালে মাছ তুলতে গিয়ে মরে গেল। খালটা যেখানে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের খাঁড়িতে মিশেছে, সেইখানে আদ্দেক জল, আদ্দেক বালির চড়ায় পড়েছিল সোমারি। লোকে বলল, ভূতে মেরেছে। মিরিরা গিয়ে মুরগি বলি দিল নামঘরের কাছে প্রেত তাড়াতে। দাঁতে দাঁত চেপে নরপতি চুপ করে রইল। সোমারিকে কে মেরেছে সে ভালোই জানে। বুলন্দ্‌ সর্দার। ওই যে সাহেবের সঙ্গে এখন বারান্দায় বসে ধানাইপানাই করছে, ওই কানাইরামের ডানহাত বুলন্দ্‌ সর্দার। বেপরোয়া সাহসী ছিল সোমারি। একা একাই চলে যেত খালে বিলে জঙ্গলে, নরপতি যেতে না চাইলে। সেই রাতে নরপতি ম্যালেরিয়ায় কাঁপছিল হিহি করে। তার আপত্তি ঠেলে এককাঠের নৌকো দুলিয়ে চলে গেল সোমারি। যদি চ্যাপার খাঁচায় জীয়ল মাছ পড়ে থাকে!

তবে কাল বেঁধে দেবে নরপতিকে। বলল, "এই যাব আর আসব।" গেল, আর এলো না। সেই থেকে নরপতি মনে মনে মস্ত একটা ছোরায় শান দিচ্ছে। আইন আদালত এই অরণ্যে এসে খুনীকে গ্রেফতার করতে পারবে না। তাকে শায়েস্তা করবে ওই ছোরাটা।

খালের পাশে নরম কচি ঘাসে মুখ ডুবিয়ে ছিল রুমনি। হঠাৎ তার শরীর স্থির হয়ে গেল। বিপদ। বিপদের গন্ধ। খুব কাছাকাছি একটা ভয়ের বস্তু এসে ওঁৎ পেতে বসেছে। তাকে দেখতে পাচ্ছে না রুমনি। কিন্তু বনের প্রাণী যতটুকু দেখে, অনুভব করে তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রতিমুহূর্ত সেখানে মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করা। অন্য-মনস্ক হয়েছো, কি গেছ! খুব আস্তে রুমনি একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

খালের ঠিক ওপারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে কালো চিতাবাঘটা। মুখে রক্তের ছোপ। কোনও বানর বা খরগোশ ধরে খেয়েছে। তারপর এসেছে তেষ্টা মেটাতে। চকচক করে জল খেতে খেতে হঠাৎ খরদৃষ্টি মেলে মুখ তুলল চিতাটা। ঝোপের মধ্যে হিম হয়ে গেল রুমনির শরীর। গন্ধ পেয়ে গেছে বাঘ। ঠিক গন্ধ পেয়ে গেছে। পালাও পালাও। মাথাটা গোলমাল হয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ল রুমনি। লাফ দেবার জন্য তৈরি হল যমদূতের মত কালো চিতা।

কিন্তু লাফ দেওয়া হল না। সুঁড়িপথ ধরে হঠাৎ এসে হাজির হল দুটো লোক। শিকারীই হবে। একটা বেঁটে একটা বেশ লম্বা। কালো বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে নিমেষে আড়াল হয়ে গেল চিতাবাঘ। লোকদুটো তাকে দেখতেও পেল না। রুমনি পালাল না। মানুষ সে ছোটকাল থেকে দেখছে। মানুষকে সে ডরায় না।

বেঁটে শিকারীটা ঢ্যাঙাকে বললে, "গুলি করিস না গুলি করিস না। ওটা পোষা হরিণ"। ঢ্যাঙা বললে' "দুত্তোর, এলাম বাঘ শিকার করতে। বাঘের দেখাই নেই দুদিন ধরে। একটা হরিণ, তাও আবার পোষা। কী করে বুঝলি পোষা।" বেঁটে বললে, "পোষমানা হরিণ না হলে কবে পালিয়ে যেত। তোর গুলি খাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত? তা ছাড়া আমি চিনি ওটাকে।"

নিশ্চিন্ত মনে রুমনি আবার ঘাস খেতে শুরু করেছিল। একটা কাটাগাছের গুঁড়ির উপর বসে সিগারেট ধরালো দুই শিকারী বন্দুকটা পাশে হেলান দিয়ে রেখে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। জলের শব্দ, পাখির শব্দ, হাওয়ায় গাছের পাতার শিরশিরানি, রুমনির মসমসিয়ে ঘাস খাওয়া, দূরে বানরের কিচিরমিচির। হঠাৎ ঢ্যাঙা বললে, "শোন্, পোষা তো কী হয়েছে? আয় না মেরে সাবড়ে দি ব্যাটাকে। ঢের মাংস হবে। কিছু খাবার জন্য সরিয়ে রেখে বাকি মাংস বিক্রি করে দেব বালিজানের বাজারে।"

বেঁটে বললে, "না রে না, হরিণটা ওই বাংলোর সাহেবের। জানতে পারলে সাহেব জানে মেরে দেবে।"

ঢ্যাঙা বললে, "বাংলোর সাহেবের মানে? ওই বাঙালী বাবুটার? তবে তো আমি মারবই। ওই লোকটা আমাকে একদিন গ্রামের মধ্যে চড় মেরেছিল। আমার মালিকের ব্যবসার ক্ষতি করে দেয় লোকটা। ওর হরিণকে আমি ছাড়ব না। বন্দুকটা দেখি দে তো!"

পাংশুমুখে বেঁটে বললে, "বন্দুক দুটো তো এই গাছে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। কোথায় গেল, দেখছি না তো?"

পাশ থেকে নরপতির শান্ত গলা ভেসে এলো। "বন্দুক আমার হাতে। বুলন্দ্ সর্দার সাহেবের হরিণ তুই মারবি, তাই না? খুব বীর তো তুই। একলা মেয়েমানুষ, হরিণ—এদের মারতে খুব মজা, তাই না? এমন শিকারী, পাশ থেকে বন্দুক চলে গেল, হুঁশটাও নেই। এই তাকৎ নিয়ে এসেছিস জঙ্গলে। এখন যদি তোদের দুটোকে মেরে এখানে পুঁতে রেখে যাই, কেমন হয়?"

উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দুই বেকুব বনে যাওয়া জোয়ান মদ্দ। পাশ থেকে এত নিঃশব্দে বন্দুক সরিয়ে নিয়ে গেছে নরপতি, ওরা টেরও পায়নি। মতলব কী লোকটার?

হঠাৎ জোরে হেসে উঠল নরপতি। রুমনি তার গলার আওয়াজ শুনেই মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিল। হাসি শুনে দুপা সামনে এগিয়ে এলো। ছায়া ছায়া অরণ্যের আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়েছিল নরপতি। বিচিত্র তার মুখের চেহারা। বললে, "বুলন্দ্ সর্দার, তাহলে মার তুই হরিণটাকে। বন্দুক নেই তো কি! তোর কাছে ভোজালিটা তো আছে। এগিয়ে গিয়ে গলার শিরা কেটে দে হরিণটার। এখুনি দবদবিয়ে মরে যাবে। যা, এগিয়ে যা! অনেক মাংস হরিণটার!"

বুলন্দ্ সর্দার বললে, "তোর মতলব কী জানি না। তবে পরামর্শটা ভালোই দিয়েছিস।" কোমরের খাপ থেকে ভোজালি টেনে নিতে নিতে বললে সঙ্গীকে—"তুই সাক্ষী থাক। ও নিজেই আমাকে বলেছে হরিণটাকে মারতে।"

বেঁটে বললে, "যাস না যাস না, ও হরিণ বড় সাংঘাতিক।"

বুলন্দ্ বললে, "চুপ কর। ভীতুর ডিম। ওই ব্যাটা যদি আমার দিকে বন্দুক তাগ করে, চেঁচিয়ে জানিয়ে দিস। দেখছি আমি হরিণটাকে।"

ভোজালি হাতে বুলন্দ্ সর্দারকে এগোতে দেখে রুমনি ড্যাবড্যাব করে লক্ষ করতে লাগল তাকে! কী মতলব ওই দুপেয়েটার? একবার আড়চোখে নরপতিকেও দেখে নিল।

নরপতি আচমকা একটা শিস দিয়ে বলে উঠল, "আয় রুমনি আয়, চুঃ চুঃ। আয় রুমনি, চুঃ চুঃ, চুঃ চুঃ—"

শিস্ শুনেই শক্ত হয়ে উঠেছিল রুমনির সারা গায়ের শক্ত পেশী। এবার শিঙ্ উঁচিয়ে সামনের দু পা তুলে বিদ্যুদ্বেগে সে পড়ল বুলন্দ্ সর্দারের উপর। সামলাতে

পারল না বুলন্দ্। ছিটকে পড়ে গেল একটা গাছের ধারে। তার গাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছিল, ছিটকে যাওয়া ভোজালিটা তুলে নিয়ে হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় ক'রে সে কোনও মতে উঠে দাঁড়াল।

নরপতি তার সঙ্গীকে বললে, "এই বেঁটে শয়তান। চুপ করে দাঁড়া। রুমনি তোকে কিছু বলবে না। কিন্তু নড়াচড়া করিস না। সামনে তাকিয়ে গ্যাখ। এমন জিনিস পয়সা খরচ করে জিলাশহরে দেখতে পাওয়া যায় না। একটা পোষা হরিণ একটা বুনো মানুষের সঙ্গে লড়ছে। চুপচাপ দেখে যা।"

স্থির দাঁড়িয়ে দুটো মানুষ এক অসম লড়াই দেখতে লাগল। ভোজালি হাতে বীর-পুরুষ বুলন্দ্ সর্দার, আর নিতান্ত পোষমানা এক বনের হরিণী। বারবার বুলন্দ্ ভোজালি নিয়ে প্রতিহত করতে চাইছে রুমনির আক্রমণ। তাঁকে ছুঁতেও পারছে না। এরমধ্যে বার কয়েক আছড়ে পড়েছে নিজেই। তার শরীরের নানা জায়গা কেটে রক্ত ঝরছে। কপাল ফেটে রক্তের স্রোত থেকে থেকেই বাঁ চোখটাকে অন্ধ করে দিচ্ছে। আলোও কমে আসছে। হরিণের চেহারাও যেন ক্রমেই ফুলে যাচ্ছে। বাপরে, কত বড় শিঙ্-জোড়া তার। আর ওই পায়ের ধারালো খুর। ওতে মৃত্যুবান পুরে দিয়েছেন কোন্ অরণ্যদেবতা? তিনি কি নরপতির মূর্তি ধরে ওই দূরে দাঁড়িয়ে? যদি এখন বুলন্দ্ সর্দার চেঁচিয়ে ওঠে, বাঁচাও বাঁচাও—তিনি কি শুনবেন সে কথা?

চোখে এবার ভয়ের ছোপ ধরল বুলন্দ্ সর্দারের। কুয়াশার মধ্য দিয়ে সে দেখল, হতচ্ছাড়া হরিণটা একটা মাতাল ইনজিনের মত আবার তার দিকেই ছুটে আসছে।

॥ গোয়েন্দা গল্প ॥

মুখার্জী ভিলায় খুন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জটিলেশ্বর থাস্তগীর সবে ভোরবেলার প্রথম চায়ে চুমুক দিয়েছেন, টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। গতকাল গভীর রাত অবধি মুখার্জী ভিলার সেই খুনের ঘটনা নিয়ে ওঁকে অনেক দৌড় ঝাঁপ করতে হয়েছে, ভেবেছিলেন আজ সারাটি দিন একটু বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু ফোনটা বেজে উঠতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কে রে বাবা! এত সকালে আবার কে ফোন করে।—রিসিভার ধরলেন, হ্যালো!

উত্তর এলো, স্যার, আমি সাতকড়ি। পাখিটার খোঁজ পাওয়া গেছে স্যার।

পাখি! মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে, কেমন একটু আমতা আমতা করলেন জটিলশ্বের। পাখি? কেমন পাখি?

—সেই যে মুখার্জী ভিলায় খাঁচা থেকে উড়ে পালিয়ে ছিল স্যার। দুধরাজ পাখি! আপনি যার খোঁজ করতে বলেছিলেন।

এবার সব কিছু চোখের ওপর ভেসে উঠল জটিলেশ্বরের। হ্যাঁ, ওই পাখিটাকেই দরকার। মুখার্জী ভিলার ভেতরে যখন খুনের ঘটনা ঘটে, তখন ঐ পাখিটাই একমাত্র চাক্ষুষ সব ঘটনা দেখেছিল। ওকেই স্বাক্ষী মানতে হবে। জটিলেশ্বর এবার একটু উত্তেজিত বোধ করলেন। পেয়েছ! কোথায় পেলে?

সাতকড়ি বলল, এখনো স্যার ধরা পড়েনি। তবে চিড়িয়াখানার জঙ্গলে ওটা ঘোরাঘুরি করছে। এই মাত্র রামমূর্তি সাহেব খবর পাঠিয়েছেন স্যার।

—ঘোরাঘুরি করছে! ধরতে বলো নি?

—বলেছি স্যার। ওঁরা লোকও লাগিয়েছেন। ধরা পড়লেই আমাদের জানাবে স্যার।

জটিলেশ্বর এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। গতকাল রক্তমাখা ডেডবডিটার পাশে ঐ খাঁচাটা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল জটিলেশ্বরের।

মুখার্জীসাহেব তখন ডেডবডি থেকে খানিকটা দূরে একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসেছিলেন। জটিলেশ্বর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি পাখি পোষেন?

মুখার্জী সাহেব চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন খাঁচা রয়েছে।

—কি পাখি?

মুখার্জীসাহেব বলেছিলেন, রেয়ার ভ্যারাইটি। দুধরাজ।

—দুধরাজ! কি রকম পাখি? জটিলেশ্বর ও রকম কোন পাখির নাম কোনদিন শোনেন নি। প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখতে? একটু দেখাতে পারেন?

মুখার্জীসাহেব তেরছা চোখে একবার তাকালেন, কি করে দেখাব, দেখছেন তো খাঁচা শূন্য। পাখিটা উড়ে গেছে।

জটিলেশ্বর বুঝতে পারছিলেন, মুখার্জীসাহেব এমনিতেই খুব ভেঙে পড়েছেন, তার উপর পাখির কথাতে এখন বিরক্তই হচ্ছেন। কিন্তু জটিলেশ্বরের ঐ পাখিটাকেই দরকার।

বললেন, পাখিটা সম্পর্কে একটু কিছু বলুন না দয়া করে।

মুখার্জীসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, উত্তেজনায় একটু এপাশ ওপাশ করলেন, তারপর জটিলেশ্বরের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি জানতে চান, বলুন?

—পাখিটা কিনেছিলেন নিশ্চয়ই? কোথা থেকে কিনলেন?

মুখার্জীসাহেব বললেন, কিনি নি। লোক লাগিয়ে সুন্দরবন থেকে আনিয়েছিলাম। সুন্দরবনে এখনো ওরকম দুধরাজ, রক্তরাজ, ভীমরাজ পাখিদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেশ পয়সা খরচ হয়েছিল আমার ওরকম একটা পাখিকে আনাতে।

—নিশ্চয়ই পাখিটার কোন বিশেষত্ব আছে?

মুখার্জীসাহেব গম্ভীর হলেন, তা নিশ্চয়ই আছে, নইলে আর আনাব কেন? পাখিটা খুব অল্পতেই কথা শিখতে পারে। অনেক কথা শিখিয়েছিলাম ওকে।

জটিলেশ্বর খুব উৎসাহ পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, টেপ করেন নি?

—না।

—ওর কোন ছবি নেই আপনার?

মুখার্জীসাহেব বললেন, অ্যালবাম ঘাঁটলে পেতেও পারেন।

—কি কি কথা শিখিয়ে ছিলেন, দুটো একটা বলুন না মিস্টার মুখার্জী?

মুখার্জীসাহেব আবার টুলের ওপর গিয়ে বসলেন, কি শিখিয়েছিলাম, শুনবেন? এমন কিছুই না, সাধারণ কিছু কথা, 'মলিনা, কথা কও।' 'রাগ করে না, মলিনা।'

—মলিনা, মানে আপনার স্ত্রী। যিনি খুন হয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। মুখার্জীসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

জটিলেশ্বরের বুকের ভেতর উত্তেজনা থরথর করে উঠল, পাখিটাকে একবার হাতের কাছে পেলেই যেন অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। যে ভাবেই হোক পাখিটাকে চাইই।

মলিনাদেবীর দেহটাকে আর একবার পরীক্ষা করে নিলেন জটিলেশ্বর। দুটো গুলির চিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে। একটা বুকের বাঁ পাশে ঢুকে গেছে। আর একটা কাঁধের একপাশে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই এই গুলিটাই মলিনাদেবীর কাঁধ ছুঁয়ে সটান পেছনের ওই খাঁচাটাকে আঘাত করেছিল। আর তাইতে খাঁচার জাল কেটে গিয়ে খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দুধরাজ পালিয়েছে।

আততায়ী মলিনাদেবীকে খুন করার সময় ঐ পাখিটার কথা একদম খেয়াল করে নি। খেয়াল করার কথাও নয়। সামান্য তো একটা পাখি, সে কি ক্ষতি করবে।

মুখার্জীসাহেবের অ্যালবাম থেকে পাখির ছবিটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন জটিলেশ্বর। তারপর সেই ছবি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন জুলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। নাম করা জুলজিস্ট প্রতুলবাবুর সঙ্গে দুধরাজ সম্পর্কে অনেক আলোচনা সারলেন। প্রতুলবাবু যা বললেন, তাতে উৎসাহ পাওয়ারই কথা। দুধরাজ পাখির কথা শুনে প্রতুলবাবু খুব আশ্চর্যই হয়েছিলেন। সে কী মশাই, কলকাতা শহরে কেউ দুধরাজ পাখি পোষে জানতুম নাতো! যিনি পোষেন তিনি যে খুব পাখি রসিক তাতে সন্দেহ নেই। জানেন, এই পাখির স্মরণশক্তি খুব বেশি। তেমন কিছু উত্তেজক ঘটনা ঘটলে ও সাড়া দেবেই।

জটিলেশ্বর আর উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারেন নি, তার মানে, এই পাখিটার সামনেই যে হত্যাকাণ্ড হল, পাখিটা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারেও কোন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

—করাই তো স্বাভাবিক। হেসেছিলেন প্রতুলবাবু! সাধে আপনাকে সবাই নাম করা ডিটেকটিভ বলে, ঠিক পয়েন্টটা আপনি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কি জানেন, পাখিটা সত্যি সত্যি দুধরাজ কিনা, সেটা আগে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। কলকাতা শহরে কোন দুধরাজ পাখি আছে বলে কিন্তু আমাদের জানা নেই।

—চিড়িয়াখানায়?

—না, ওখানেও নেই। আমাদের এখানে অবশ্য দুটো স্পেসিমেন আছে, কিন্তু তা জীবন্ত নয়। একটু থেমে প্রতুলবাবু বলেছিলেন, দুধরাজ পাখিই যদি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য মনে তো হয় মার্ডারার খুঁজে বার করতে কিছুটা সাহায্য আপনি পেতেও পারেন। তবে হ্যাঁ, পাখিটার যদি সন্ধান পান, দয়া করে আমাদেরও একটু খবর দেবেন।

জটিলেশ্বর প্রতুলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন থানায়। থানা কি ভাবছে একটু জানা দরকার।

থানায় গিয়ে নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই নির্মলবাবু একগাল হাসলেন, আসুন জটিলদা। মুখার্জী ভিলা দেখে এলেন? চা না কফি?

খিদেও পেয়েছিল জটিলেশ্বরের। বললেন, শুধু চা কফিতে হবে না কিছু সলিড খেতে হবে। শিককাবাব বা স্যাণ্ডউইচ আনান দেখি।

—তথাস্তু! নির্মলবাবু রঘুকে খাবার আনতে পাঠিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝতে পারছেন কেসটা? আমার তো মনে হয়, সেই নেপালী দারোয়ানেরকীর্তি এটা।

—নেপালী দারোয়ান! মানে ভক্ত সিং? কিন্তু মুখার্জীসাহেবই তো বললেন, গতকাল সকালে লোকটা সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

—হ্যাঁ, ঐ তো চাল। দেশে যাওয়ার নাম করে হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। ওর দেশে ও গেছে কিনা তা আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।

নির্মলবাবুর কাছে পাখিটার কথা ভুলেও উচ্চারণ করলেন না জটিলেশ্বর। থানার লোকগুলি সব মোটা মাথায় চিন্তা করে। ওদের যদি আসল পথটা দেখিয়েও দেওয়া

যায়, তা হলেও ওরা সব কিছু ভণ্ডুল করে ফেলবে। মৃদু একটু হাসলেন জটিলেশ্বর।

—আপনিও কি জটিলদা, ওই ভক্ত সিংকেই সন্দেহ করছেন?

জটিলেশ্বর বললেন, এত সহজেই কি কালপ্রিটকে পাওয়া যায় মশাই। খুন যখন হয়, যে খুন করে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই করে।

—হঠাৎ মাথা গরম করেও তো কেউ খুন করতে পারে।

—তা পারে। তবে এ খুনের পেছনে অনেক কারসাজি আছে বলেই আমার ধারণা।

—কেন, কেন!

রঘু খাবার নিয়ে এল। জটিলেশ্বরের আর দেরি সইছিল না। স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন। প্রথম কথা বাড়িতে কে কে থাকেন?

নির্মলবাবু বললেন, মুখার্জীসাহেব আর গিন্নী। গিন্নীই তো খুন হলেন, এছাড়া মালি, চাকর দুটো, রাঁধুনি একজন। আর ওদের সেই নেপালী দারোয়ান ভক্ত সিং।

—ভক্ত সিং না হয় কাল থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। বাকি যারা তাদের স্টেটমেণ্ট নিয়েছেন?

—নিয়েছি বৈকি।

—তারা কি কাউকে সন্দেহের কথা জানিয়েছে?

নির্মলবাবু হাসলেন, অত সহজে কি কেউ এসব ব্যাপারে মুখ খোলে জটিলদা। সবাই এখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যই স্টেটমেণ্ট দেবে। তবে কালই ওদের থানায় এনে রুলের গুঁতো দিয়ে কথা বার করার চেষ্টা করব। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

—কাল কেন? আজই নয় কেন? জটিলেশ্বর প্রশ্ন করলেন।

—আজ আর সময় কোথায় বলুন। দশ ঝামেলায় দম বেরিয়ে যাচ্ছে জটিলদা। তা ছাড়া কাল দুপুরের মধ্যেই পোস্ট মর্টমের রিপোর্টটাও পেয়ে যাব।

কফির কাপটা সরিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। চলি আজ। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি। এবার সোজা বাড়ি ফিরব। চলি, গুড নাইট।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবার মুখে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন জটিলেশ্বর, ঐ ভক্ত সিংয়ের খবর পেলে কিন্তু দাদা, সঙ্গে সঙ্গে একটা রিং করবেন। লোকটা ছুটি নেওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যেই এরকম ঘটনা ঘটবে, সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

সকালে সাতকড়ি পাখিটার খবর জানাতে জটিলেশ্বর আবার তৈরি হয়ে নিলেন। সাতকড়িকে ফোনে চলে আসতে বলে উনি দুধরাজ পাখির ছবিটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলেন, পাখিটা খুনের সময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু খুনিকে সে শনাক্ত করবে কি ভাবে! একটু ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা। পাখি তো আর নিজের ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারবে না। ওকে মুখার্জী-

সাহেব বা বাড়ির লোকজন যা শিখিয়েছে তাই বড় জোর ও বলতে পারে। তাতে আততায়ীকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি ভাবে!

কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসারও সময় নেই। জটিলেশ্বর ঘরের ভেতর দুবার একবার উত্তেজনায় পায়চারি করলেন। এমন সময় গাড়ি নিয়ে হাজির হল সাতকড়ি। স্যার, চলুন পাখিটা নাকি ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে! বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন জটিলেশ্বর।

—হ্যাঁ স্যার। আমি ঠিক বেরুতে যাব, এমন সময় চিড়িয়াখানা থেকে রামমূর্তি জানাল, ধরা পড়েছে। ওকে একটা খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে।

—ঠিক বলছ সাতকড়ি? কি লাক আমাদের। চল চল। শিগগির চল।

সোজা চিড়িয়াখানার দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল ড্রাইভার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চিড়িয়াখানায় চলে এল ওরা।

রামমূর্তি গেটেই অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। গাড়িটা দেখেই এগিয়ে গেলেন, আসুন জটিলদা, আসুন, নিয়ে যান আপনার পাখি!

—খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে বুঝি? তা হোক। তবু আপনারা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হল। পাখিটার ভীষণ দরকার। আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

—আরে না, না, এ আবার ধন্যবাদ দেবার কি হল। আসুন, বহাল তবিয়তে পাখিটাকে রেখেছি।

ছোট্ট একটা খাঁচায় দুধরঙের ছোট্ট একটা পাখি। ভারী সুন্দর দেখতে। খাঁচার গায়ে হাত রাখলেন জটিলেশ্বর। পাখিটাকে আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওর। আদর করলে পাখি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, অন্তত প্রতুলবাবুর কথা মতো পাখিটার শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না জটিলেশ্বরের। ব্যাগ থেকে দুধরাজের ছবিটা বার করলেন, হ্যাঁ অবিকল মিল। এটা যে দুধরাজই সন্দেহ নেই!

সাতকড়ি বলল, স্যার, এটাই যে মুখার্জীসাহেব পুষতেন এমন তো নাও হতে পারে!

—কি রকম?

—হয়তো এটা অন্য কোন দুধরাজ। মুখার্জী ভিলারটা পালিয়ে গেছে কোথাও।

—অসম্ভব, হতেই পারে না। এ পাখি কদাচিৎ চোখে পড়ে। কি বলুন মিস্টার রামমূর্তি, কখনো দেখেছেন এ পাখি?

রামমূর্তি স্বীকার করলেন, পশুপাখি নিয়েই ওদের কারবার কিন্তু এই দুধরাজ ওর প্রথম দেখলেন।

জটিলেশ্বর বললেন, আসল হোক, নকল হোক, চল এবার সোজা মুখার্জী ভিলায় যেতে হবে! ও বাড়ির লোকেরাই বলতে পারবে এটা ওদেরই পাখি কি না।

গাড়ি মুখার্জী ভিলার দিকে ছুটল। পাখির খাঁচাটা যত্ন করে ধরে রাখলেন জটিলেশ্বর! দু' একবার পাখিটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, 'মলিনা, কথা কও!' নাহ্‌ পাখিটা যেন বোবা। কথা-ফথা কোনদিন ওকে শেখান হয়েছে বলেই মনে হয় না।

মুখার্জী ভিলার সামনে গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা।

দূর থেকে বাগানের মালি এগিয়ে এল। স্যার—

জটিলেশ্বর শুধোলেন, সাহেব কোথায়? তোমাদের দুধরাজ আমি নিয়ে এসেছি।

ততক্ষণে বাড়ির চাকর দুটোও এগিয়ে এসেছে। সাহেব তো বেরিয়েছেন হুজুর।

—বেরিয়েছেন? কোথায়?

—কিছু বলে যান নি স্যার। তবে এখনি ফিরে আসবেন বলে গেছেন!

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন জটিলেশ্বর। ঠিক আছে, চল, পাখিটা যেখানে থাকত সেখানে চল। পাখিটাকে চিনতে পারছ তো?

তিনজনেই এক সঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ স্যার। এটাই আমাদের খাঁচায় ছিল।

ওরা মুখার্জী ভিলায় এসে ঢুকে পড়ল। সেই হলঘরের মতো জায়গায়, যেখানে মলিনাদেবীর বডিটা পড়েছিল সেখানে চলে এল ওরা!

জটিলেশ্বর পাখিটাকে তার নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন! তারপর মালির দিকে তাকালেন, তোমাদের পাখি তো কথা বলতো?

—হ্যাঁ স্যার।

—দেখ না, আবার কথা বলতে পারে কিনা।

বুড়ো মালি খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল। ডাকল, দুধরাজ? পাখিটা কেমন পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে আছে। সত্যি সত্যি কথা বলা যেন ভুলেই গেছে।

—দুধরাজ! আবার ডাকল মালি।

—এবারও উত্তর এল না।

চাকরদের মধ্যে একজন টুসটুসে পাকা একটা লঙ্কা এনে পাখিটাকে খেতে দিল। ওকি রে? খাবি না? না, পাখিটার যেন রুচিও নেই।

হতাশ হয়ে পড়ছিলেন জটিলেশ্বর। এত করে পাখিটাকে ধরা হল, কিন্তু—

সাতকড়ি বলল, স্যার, সব বাজে কথা। পাখি কথা বলে না হাতি,

জটিলেশ্বর খাঁচা থেকে খানিকটা দূরে একটা টুলের ওপর বসলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন পাখিটার দিকে। কে বলবে, এই পাখিকেই কথা শেখান হয়েছিল।

ওদিকে দরজার পাশে তখন রাঁধুনীকে দেখা যেতেই জটিলেশ্বর ডাকলেন, কে ওখানে? এদিকে এস।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাঁধুনী এসে ঘরে ঢুকল।

—তুমি রান্না কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাদের এই পাখি কথা বলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলাও দেখি।

—মহিলাটি এগিয়ে গেল খাঁচার কাছে, দুধরাজ।

আশ্চর্য! চমকে উঠলেন জটিলেশ্বর। পাখিও উত্তর করল, দুধরাজ।

—কথা কও।

পাখিও আবৃত্তি করল, কথা কও।

অবিকল মানুষের গলা। পাখিটার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না জটিলেশ্বর।

রাঁধুনী এবার পিছিয়ে এল। জটিলেশ্বর বললেন, ঠিক আছে তুমি ওপাশে বস। আবার মালির দিকে তাকালেন, কি হল তুমি আবার চেষ্টা কর মালি? কথা বলাও।

মালি এগিয়ে যাচ্ছিল খাঁচার দিকে, এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া যেতেই সবাই চমকে উঠল, হ্যাঁ মুখার্জী সাহেবই ফিরলেন বোধহয়।

মালি এগিয়ে গিয়ে নরমভাবে ডাকল, দুধরাজ!

উত্তর এল, দুধরাজ।

—তবে যে তখন চুপ করে ছিলি? মালি আবার দু পা পিছিয়ে এল।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মুখার্জীসাহেব। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটে

গেল। তুধরাজ ছটফট করে লাফিয়ে উঠল খাঁচার মধ্যে, 'মেরো না, মেরো না, গুরুম।'

—হ্যাঁ পাখিটাই ককিয়ে উঠেছে, মেরো না মেরো না, গুরুম।'

—তুধরাজ! চিৎকার করে উঠলেন মুখার্জীসাহেব। জটিলেশ্বর লক্ষ্য করলেন, মুখার্জীসাহেবের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আর পাখিটাও ভয়ে খাঁচার ওপাশে গিয়ে এইটুকুন হয়ে গেছে। কী ভীষণ ভয় পেলে তবে ওরকম হতে পারে কেউ।

—কোথায় পেলেন এ পাখি! দাঁতে দাঁত চেপে জটিলেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন মুখার্জী-সাহেব।

জটিলেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন, এখন থানায় চলুন। সেখানেই জানতে পারবেন, কিভাবে তুধরাজকে আবার পাওয়া গেল।

—আপনি কি বলতে চান?

—না না, ওদিকে না। চলুন। বাইরে আমাদের গাড়ি রয়েছে, সে দিকে চলুন।

রিভালবারটা দু আঙুলে শক্ত করে চেপে মুখার্জীসাহেবের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। পালাবার চেষ্টা করলে কি হবে বুঝতে পারছেন, চলুন বলছি।

মাথা নিচু করে মুখার্জীসাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। জটিলেশ্বরের নির্দেশ মতো উঠে বসলেন গাড়িতে।

সর্বমঙ্গলা

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

পাড়াগাঁয়ের গরীব পূজারী বামুন! লোকের বাড়ি বাড়ি চণ্ডীপাঠ আর পুজো-আচ্চা করে কোনো মতে দিন চালায়। ঘরে আছেন গিন্নী। স্বামী যা উপার্জন করে আনেন তাতেই সুন্দর করে গুছিয়ে সংসার চালান। স্বামীকে কখনো অভাবের কথা বুঝতেই দেন না। আর আছে একমাত্র মেয়ে সর্বমঙ্গলা। রূপে গুণে এমন লক্ষ্মীমেয়ে আশপাশের গাঁয়ে আর কোথাও দেখা যায় না। মেয়েটিও প্রাণ ঢেলে বাবা মায়ের সেবা করে। তার শান্ত স্বভাবের কথা পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই বলাবলি করে।

ওদিকে পাশের গাঁয়ের জমিদার তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য মনে মনে পাত্রী খুঁজছেন। টাকা তাঁর অনেক আছে। কিন্তু তিনি জানেন টাকায় মানুষ হয় না। সত্যিকারের যে মানুষ, টাকা তারই দাস। তাই এমন মেয়ে তিনি ঘরে আনতে চান, যার স্বভাব চরিত্র সৌন্দর্য সব দিক থেকে দেশের মধ্যে সেরা হবে। ছেলেকেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছেন। যাতে তার স্বাস্থ্য ভালো হয়, যাতে সে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে এবং মানুষের সেবায় প্রাণ দিতে পারে—সেই আদর্শে মানুষ করেছেন। সুতরাং এমন ছেলের জন্য সত্যিকার ভালো মেয়েই তিনি খুঁজছিলেন।

আশ্বিন মাস। ভোরবেলা জমিদারবাবু রোজকার মতো বেড়াতে বেড়াতে গাঁয়ের একেবারে ধারে এসে পড়েছেন। মাঝখানে ধানক্ষেত পার হয়েই পাশের গাঁ শুরু। সেইখানে এক শিউলি গাছের তলায় একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

এ যেন কুমোরদের হাতে গড়া ছোট্ট একখানি দুর্গা ঠাকুরুণ! তফাতের মধ্যে এর দুটি হাত, আর সেই দুটি হাতে নিচু হয়ে একমনে ফুল তুলছে তো তুলছেই। জমিদারবাবু অনেকদিন এদিকে আসেন নি। তাই ঠিক চিনতে পারলেন না, কাদের বাড়ির মেয়ে।

বাড়ি ফিরে গিন্নীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুনলেন : ও গাঁয়ের ভট্চাজদের মেয়ে। ভট্চাজমশাই কাছাকাছি দু চারঘর গরীব যজমানের বাড়ি এসে থাকেন। পথে-ঘাটে জমিদারবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাও হয়। উৎসব-পার্বণে এ বাড়িতে আসা-যাওয়াও আছে। তবে তেমন আলাপ পরিচয় নেই। কিন্তু জমিদারবাবু জানেন, ভট্চাজ মানুষটি খাঁটি। জমিদার গিন্নী তো সর্বমঙ্গলার গুণগানে একেবারে গদ্গদ। সব শুনে জমিদার ভট্চাজমশায়কে ডেকে পাঠালেন।

অঘ্রাণমাস পড়তে না পড়তে দশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল জমিদারবাড়িতে। এত বড়ো উৎসব এ অঞ্চলে আর কখনো হয়নি। গরীব ভট্চাজের কপালজোর দেখে দেশের লোক তো অবাক। বিনা পণে বিনা চেষ্টায় বাড়ি বয়ে এসে জমিদার তাঁর মেয়েকে বাড়ির বৌ করে নিয়ে গেলেন। ভট্চাজ শুধু বললেন : এতো মায়েরই ইচ্ছা।

বেয়াই যত বড় ধনীই হোন, ভটচাজের কিন্তু তেমনি গরীবভাবেই দিন কাটতে লাগলো। কারণ, কারুর কাছে একটি পয়সা তিনি চাইতেন না। ধনী আত্মীয়ের কাছে তো নয়ই। ওদিকে জমিদারবাড়ির বৌ হয়ে সর্বমঙ্গলা সমস্ত বাড়ির ঘরকন্নার ভার নিল। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর সব সুখসুবিধা বুঝে সংসার চালাতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই জমিদারের পুত্রবধূকে দেশের লোকে মায়ের মতো সম্মান করতে শুরু করলো।

বছর ঘুরে আসায় আশ্বিন মাস দেখা দিল। মাঠের পর মাঠ কাশফুলে আর ধান ক্ষেতে সবুজে আর সাদায় মেশানো, ভরন্ত বিলের জলে শালুক আর পদ্মের ছড়াছড়ি। আকাশের নীল সাদা মেঘের ছোঁয়া পেয়ে আরো নীল হয়ে ওঠে। গৃহস্থবাড়িতে বড় বড় প্রতিমার কাঠামোয় একমেটে কাজ হয়ে গেছে। বাতাসে একটু একটু ঠাণ্ডা আমেজ মনে করিয়ে দেয়, পুজোর আর দেরি নেই। মা এলেন বলে।

সেদিন সকালবেলা। পুজোর ফুল তুলতে এসে হঠাৎ ভটচাজমশায়েরও মনে হলো : এবার আমিও মায়ের পুজো করবো। ভাবা যত সহজ, দুর্গাপুজা করা তত সোজা নয়। অনেক আয়োজন, অনেক টাকার ব্যাপার। সারা বছর যা দক্ষিণা মেলে তাতে পঞ্চাশটি টাকাও হয় কিনা সন্দেহ। কেমন করে মায়ের পুজো হবে!

মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ভটচাজ মা দুর্গাকে ডাকলেন : মা! তোমার ধনী ছেলেরা কত কিছু দিয়ে তোমার পুজো করে। আর আমি গরীব বলে কি আমার কাছে তুমি আসবে না? আমি তোমায় পুজো করতে পারবো না?

ভাবতে ভাবতে ভট্চাজ বাড়ি ফিরে এলেন। ভট্চাজের মুখ দেখেই তাঁর গিন্নী চম্‌কে উঠে শুধালেন, ব্যাপার কী! কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো? চাদরখানা

নিয়ে যাওনি কেন ? শরতের সকাল—ফস্ করে ঠাণ্ডা লাগিয়েছ বুঝি।

ভটচাজ হেসে বললেন, না গো না। আসলে আমার ইচ্ছে, এবারে মায়ের পুজো করি। কিন্তু এতো হল বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছে। কেমন করে পূরণ হবে?

ভটচাজ গিন্নী একথা শুনে দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, তা তোমার ইচ্ছে হয়েছে মানেই মাও আসতে চেয়েছেন। নইলে হঠাৎ তোমার মনেই বা একথা জাগবে কেন ? মা এমনি করেই আমাদের জানান দিলেন। দাঁড়াও আমি খুঁজে পেতে দেখি সংসার খরচ থেকে কোথাও কিছু রাখতে পেরেছি কিনা।

একটু পরে খুঁজে পেতে আধুলি, সিকি, পয়সা সব মিলিয়ে বারোটি টাকা এনে ভটচাজ-গিন্নী স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন : তোমার সঙ্গে কুড়ি বছর ঘর করেছি। তা এতোদিনে এই বারোটি টাকা আমার হাতে জমেছিল। মায়ের যখন ইচ্ছে, তখন এই টাকাটি দিয়ে তাঁর পুজোর আয়োজন কর।

ভটচাজ বললেন : মায়ের পুজো এতেই কুলিয়ে যাবে। আমাদের ভক্তির পুজো। লোকজন খাওয়ানো, বাদ্যি বাজানো, আলো জ্বালানো কি বাজী ফোটানোর ধুম নেই ! শুধু দু'জনে মিলে ভক্তি করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবো। আর সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে আসবো, সে পুজোর কাজ করবে। এই বলে ভটচাজ বেরিয়ে পড়লেন কুমোরপাড়ায় প্রতিমার কথা বলে আসতে।

একমেটের কাজ শেষ করে কুমোর তখন ভিতর বাড়ির দিকে যাচ্ছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করবে বলে। ভটচাজমশাইকে দেখে হাত জোড় করে বললে, পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই ! এমন অসময়ে যে।

ভটচাজ হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা ! এ গাঁয়ের ঘরে ঘরে তোমার গড়া প্রতিমা যেমন সুন্দর, তেমনি জ্যান্ত, দেখলেই ভক্তি আসে। তা বাবা, এবারে আমার একটু ইচ্ছে হয়েছে প্রতিমা এনে মায়ের পুজো করবো। আমার সাধ্য তো তুমি জানোই ! এই আট আনা পয়সা এনেছি, এতে যেমন হয় তেমনি ছোট্ট একখানি প্রতিমা করে দিতে হবে। না বললে শুনছি না।

ভটচাজের কথা শুনে কুমোর তো হেসেই ফেললে : আট আনায় কখনো প্রতিমা হয় ? আপনি পাগল হয়েছেন। আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন আমি এমনিতেই আপনাকে প্রতিমা গড়িয়ে দেবো। এক পয়সাও দিতে হবে না। আপনার মতো ভক্তকে প্রতিমা গড়ে দেওয়া তো অনেক ভাগ্যের কথা।

ভট্চাজ ব্যাকুল হয়ে কুমোরের হাত দুটি ধরে বললেন, অমন কথা বলো না বাবা, মা আমায় গরীব করেছেন। আমার সাধ্যমত আমি তাঁর পুজো করবো। এই আট আনা পয়সা তোমায় নিতেই হবে, তাইতে যত ছোট্টই হোক—আমায় প্রতিমা গড়িয়ে দাও, তাতেই আমি মায়ের পুজো করবো।

কুমোর আর কী করে। নেহাত অনিচ্ছায় আট আনা পয়সা তাকে রাখতেই হল। কিন্তু ঠাকুরমশায়ের ভক্তি দেখে সে ঠিক করলে ছোট হলেও সব চেয়ে সুন্দর প্রতিমা সে তাঁর জন্যই করে দেবে।

ষষ্ঠীর আগের দিন প্রতিমা নিতে এসে ভট্‌চাজ তো অবাক। কুমোরকে বললেন, এত সুন্দর প্রতিমা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। মাত্র আট আনায় তুমি কেমন করে করলে বাবা?

কুমোর হেসে বললে, ঠাকুরমশায়! মুখ্যুমানুষ আমরা— কীই বা জানি। মায়ের মূর্তি মা নিজেই গড়েছেন। ভট্‌চাজ বললেন, তুমিই ঠিক বুঝেছ বাবা। এতদিন পুজো আচ্চা করেও আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রতিমা নিয়ে বাড়ি আসতে গিন্নী এসে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। ভট্‌চাজ বললেন, হাঁ করে দেখছ কি? প্রণাম করো।

তাড়াতাড়ি প্রণাম করে গিন্নী বললেন, দেখছিলুম, যেন আমাদের সর্বমঙ্গলা—ঠিক ছেলেবেলায় যেমনটি দেখাতো। তোমার নজরে পড়েনি?

ভটচাজ মনে মনে কথাটা মেনে নিলেন। কর্তা গিন্নী দুজনেরই মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল, গিন্নী তাড়াতাড়ি বরণডালা সাজাতে চলে গেলেন। যাবার আগে কর্তাকে বললেন, মেয়েকে নিয়ে আসতে যাবে না? বাড়িতে তো লোক বলতে একলা আমি। পুজোর এতো কাজ করবে কে? ভটচাজ বললেন, হ্যাঁ, এখুনি যাচ্ছি।

জমিদারবাড়ি এসে ভটচাজমশাই দেখলেন সেখানেও পুজোর বিরাট আয়োজনে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। জমিদারবাবু তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, আসুন বেয়াইমশায়! তা বেয়ান ঠাকুরুণ কই? পুজোর ক'টা দিন এখানেই থাকবেন তো!

ভটচাজমশায় বিনীতভাবে জানালেন, এবারে তাঁর বাড়িতেই পুজো। তাই কটা দিনের জন্য যদি সর্বমঙ্গলাকে পাওয়া যায়!

জমিদারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, তা কি করে হয়? বাড়ির বৌ বছরকার দিনে চলে গেলে আত্মীয়স্বজনই বা কি বলবে, আর মায়ের পুজোর আয়োজন সামলাবেই বা কে! আপনার মেয়েকে ছেড়ে আমাদের যে একদণ্ডও চলে না।

কিছুতেই জমিদারবাবু রাজী হলেন না দেখে ভটচাজ মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বাড়িতে পুজো হবে শুনে সর্বমঙ্গলারও খুব ইচ্ছে হল যেতে। কিন্তু জমিদার-গিন্নী বললেন, না বাছা, এতো বড়ো পুজো বাড়িতে। এমন দিনে তোমায় আমরা যেতে দেবো কোন প্রাণে! অন্য সময় হলে বরং কথা ছিল।

সর্বমঙ্গলার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। ভটচাজ তখন মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আরে এখানেও যে মা, ওখানেও সেই মা, তুই এখানে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে ভাববি, বাড়িতে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছিস। তোর মা বলছিল, প্রতিমাখানি

নাকি দেখতে ঠিক তোর মতো হয়েছে। তা তোকে তো নিয়ে যেতে পারলাম না, আমি না হয় ধরে নেবো তুই-ই আমার বাড়িতে মা হয়ে পুজো নিতে গিয়েছিস।

বাপের কথায় মেঘ কেটে গিয়ে আলো ফুটলে যেমন দেখায় সর্বমঙ্গলার মুখখানি তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ভটচাজমশাই বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। মাঠ পার হয়ে ধানক্ষেতের কাছে এসে তাঁর দুচোখ ফেটে জল এলো। এমন দিনে সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে আসতে পারলেন না! অত বড়ো জমিদারবাড়িতে পুজো—বাড়ির একমাত্র ছেলের বৌ, তারাই বা কেমন করে ছাড়ে! কিন্তু তাঁরও যে এই প্রথম পুজো, এ পুজোয় সর্বমঙ্গলা আসবে না? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ধানক্ষেতের আল দিয়ে আসছেন, হঠাৎ পেছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর মেয়ে ছুটে আসছে আর ডাকছে, বাবা—বাবা—

কী রে, আবার পিছু পিছু দৌড়ে এলি?

বাবা,—সব বন্দোবস্ত করে এসেছি? আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

আনন্দে ব্রাহ্মণের চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো! কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো মা! পুজোর বাড়ি! কাউকে না বলে এসে শেষটায় বিপদে পড়বি না তো! সর্বমঙ্গলা বললে, না বাবা, সব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি. কোনো ভাবনা নেই।

বাড়ি ফিরে মেয়েকে মায়ের কাছে দিয়ে ভট্চাজ পুজোর উদ্যোগ আয়োজনে লেগে গেলেন। মেয়ে মাকে বাবাকে সব রকম সাহায্য করতে লাগলো।

সপ্তমীর সকালে দু'চারজন ভট্চাজবাড়িতে শঙ্খঘণ্টা শুনে উঁকি মেরে দেখতে এলো। প্রতিমা দেখে তারা সবাই অবাক। এত সুন্দর প্রতিমাও হয়! তাদের কথায় একে একে সবাই সে বাড়িতে প্রতিমা দেখতে এলো। ব্রাহ্মণের ভক্তি-বিশ্বাসে ভাঙা মাটির বাড়ি উজ্জ্বল আলো করে সেই ছোট্ট প্রতিমা বসে আছেন।

অষ্টমী কেটে গেলো। নবমীর দিন সকালবেলায় মেয়ে বললে, বাবা, পুজোয় ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে না?

বাবা হেসে বললেন, মা, ছিল তো মোটে বারোটি টাকা, পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে সে সবই খরচ হয়ে গেছে। কোনোমতে আজকে নৈবেদ্যটুকু মাকে ধরে দেওয়া। আমার সাধ্য তো জানো!

মেয়ে বললে সে হবে না বাবা। আমরা যা পারি তাই লোককে দেবো। তবু সকলকে প্রসাদ পেতে ডাকবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না। যে মা সারা জগৎকে খাওয়াচ্ছে, তিনিই আজ তোমার ঘরে উপস্থিত, মায়ের ইচ্ছে হলে সারা গাঁয়ের লোকই প্রসাদ পেতে পারবে!

এই বলে মেয়ে গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলো: আপনারা দয়া করে

আমাদের বাড়িতে এসে আজ মায়ের প্রসাদ পেয়ে যাবেন। আমার বাবা দীন দুঃখী। সামান্য আয়োজন, তবু আপনারা দয়া করে আসবেন।

একথা শুনে সকলেই আনন্দের সঙ্গে ভটচাজের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওদিকে ভটচাজ তো মেয়ের কাণ্ড দেখে ঘরের কোণে বসে দুর্গানাম জপ করছেন। আর ডাকছেন : মা! কী উপায় হবে, কেমন করে লোকের কাছে মুখ থাকবে।

ওদিকে বাড়ির আঙিনায় মেয়ে সকলকে যত্ন করে বসিয়ে একটু একটু প্রসাদ দিচ্ছে। প্রসাদের সুগন্ধে চারদিক মাতোয়ারা। একটুখানি খেয়েই সবার পেট ভরে যাচ্ছে। যাবার সময় সবাই মেয়েকে বলে যাচ্ছে : মাগো এমন প্রসাদ আমরা কোনোদিন পাইনি।

সবাই চলে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে ভট্চাজ বললেন, কী রে! সবাই আমায় অভিশাপ দিয়ে গেলো তো !মেয়ে বললে, তা কেন বাবা! সবাই খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে গেলো। দেখো, এখনো কত প্রসাদ রয়েছে! ভটচাজের গিন্নী বললেন, সবই মায়ের দয়া।

পরদিন দশমী। বিসর্জনের আগে দইকরমার আয়োজন হয়েছে। আসনে বসে মনে মনে মাকে দইকরমা নিবেদন করতে গিয়ে কুড়কুড় শব্দ শুনতে পেয়ে ভটচাজ চোখ মেলে দেখেন, মেয়ে সেই দইকরমা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলছে। দেখে তো তিনি অবাক! বামনীকে ডেকে বললেন, দেখ, মেয়ের আক্কেল! মায়ের নৈবেদ্য কিনা নিজেই খেতে শুরু করেছে। শিগ্গির ওকে নিয়ে যাও। নতুন করে নৈবদ্য সাজিয়ে আনো। কাল তো গাঁ-শুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে আমায় বিপদে ফেলেছিল, আজ আবার মায়ের ভোগ খেয়ে কী কাণ্ড বাধালে।

আবার নতুন করে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হলো। ভটচাজও পুজোয় বসলেন। কিন্তু যেই মন্ত্র পড়তে যাবেন, চোখ চেয়ে দেখেন সর্বমঙ্গলা সেইসব নৈবেদ্য খেয়ে ফেলছে। রাগে দুঃখে তিনি গিন্নীকে ডেকে আবার আয়োজন করতে বললেন। সর্বমঙ্গলা যেন সেখানে না আসে একথাও বলে দিলেন। তবু আবার যখন নৈবেদ্য এলো, আর তিনি পুজো দিতে যাবে, তখন সর্বমঙ্গলা কোথা থেকে এসে সেই নৈবেদ্য এঁটো করে ফেললো।

ভট্টচাজ রেগেমেগে বললেন, এক্ষুণি বেরো আমার বাড়ি থেকে! মায়ের পুজোর নৈবেদ্য তিন তিনবার নষ্ট করলি! যা এক্ষুণি যা!

মেয়ে বাড়ির ভিতর এসে কাঁদতে কাঁদতে মাকে গিয়ে বললে, মা, পুজোর তিনদিন আমার খাওয়া হয়নি। আজই শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে—তাই তাড়াতাড়ি একটু দইকরমা খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছিলাম। বাবা কিনা আমায় এক্ষুণি বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। তাহলে মা আমি এখুনি বিদায় নিচ্ছি।

ভট্টচাজ-গিন্নী নিজের মনে দইকরমার নৈবেদ্য সাজাচ্ছিলেন। পিছন থেকে মেয়ের কথা তাঁর কানে আসছিল। নৈবেদ্য সাজানো শেষ করে মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখেন কেউ নেই। ঘরে, দাওয়ায়, পুজোর মণ্ডপে কোথাও দেখা গেলো না মেয়েকে।

দেখতে না পেয়ে স্বামীকে এসে বকতে লাগলেন ; বছরকার দিন ! মেয়েকে এমন ধারা কথা বলবার আর সময় পেলে না ! যাও—পুজো শেষ করেই মেয়েকে নিয়ে এসো। সে নিশ্চয় অভিমানে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

ভট্টচাজ তাড়াতাড়ি দশমীর পুজো শেষ করে সেই দুপুরেই বেয়াইবাড়ি এসে হাজির। এসে দেখেন, দর্পণে মায়ের বিসর্জন শেষ করে সবাই মাথায় শান্তিজল নিচ্ছে। আর সবার সঙ্গে সর্বমঙ্গলাও সেখানে বসে। তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে এসে ভটচাজ বললেন : রাগের মাথায় কী বলতে কি বলেছি, তাই কি রাগ করে চলে আসতে হয় মা ! এ তিনটে দিন তুই না থাকলে তো পুজোই করা হত না আমার। তুই চল, মা, আমার সঙ্গে। ওদিকে তোর মা পথ চেয়ে বসে আছে। তোকে নিয়ে না গেলে আমার আর রক্ষা থাকবে না।

সর্বমঙ্গলা অবাক হয়ে বললে, সে কি বাবা ! আমি তো এই তিনদিন এখানেই রয়েছি। এত লোকজন প্রসাদ পেলো, এত হৈচৈ—আমার কি একটুও সময় ছিল ! আমি গেলুমই কখন আর রাগ করবোই বা কখন। ভটচাজ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, আজ সকালে তুই রাগ করে চলে আসিস নি ? জমিদারগিন্নী শুনতে পেয়ে হেসে বললেন, মেয়ে-অন্ত প্রাণ কি না ! দিনরাত মেয়ের কথা ভেবে ভেবে বেয়াইমশাইয়ের অমন হয়েছে। তা তুমি যাও না মা। কাল বাদ দিয়ে পরশু একবার বাপের বাড়ি ঘুরে এসো !

ওদিকে ভটচাজ মশায় তখন চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জমিদারবাড়ির প্রতিমার পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন, মা—মা, এমন করে ফাঁকি দিতে হয় ! আমি না হয় বুঝতে পারিনি. তুইও কি মা বাপের দুঃখ বুঝতে না পেরে অমন করে চলে গেলি, আমার দুঃখ রাখবার যে আর জায়গা রইলো না। ওরে সর্বমঙ্গলা ! মা যে এই তিন দিন তোর রূপ ধরে আমার বাড়িতে নিজের পুজোয় নিজেই যোগাড় করে দিয়ে গেলেন। মা গো—বাপের রাগের কথায় কিছু মনে করতে নেই। তুমি আবার বছর ঘুরে আমার ছোট্ট সর্বমঙ্গলার রূপটি ধরে বাড়িতে এসো মা—আমি আর কোনোদিন তোমায় যেতে বলবো না। ফিরে এসো মা, ফিরে এসো।

ওদিকে তখন সানাইয়ে বিসর্জনের করুণ সুরে আশ্বিনের আকাশ ভরে উঠেছে। হলুদসোনা জলের তলায় দর্পণে মায়ের মুখের ছায়া পড়েছে। ভালো করে চেয়ে দেখলে দেখা যায়, মায়ের চোখেও জল।

[এ গল্পটি রামকৃষ্ণদেবের বলা একটি গল্পের বিস্তৃত রূপ। গল্পের শেষে তিনি বলেছিলেন—এ সব সত্য।]

সামচিতে দুদিন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সীমান্ত চামুরচি। সেখানে চা বাগান আছে। ইস্কুল-পাঠশালা আছে। চামুরচিতে দোকানপাটও অজস্র। আমরা যে-জিপটায় চড়ে এসেছিলাম, সেটাকে চামুরচি হাটের মাঝখানে ছেড়ে দিলাম।

পাহাড়ি শহর সামচি থেকে আরেকটা গাড়ি নেমে আসার কথা। ভুটান সরকারের গাড়ি। ঝকঝকে বিদেশী ল্যাণ্ড-রোভার একটা ঐতো হাটের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে। পিত্তি-রঙা গাড়ি।

বাবা আমাদের পুরনো জিপে বসতে বলে ঐ পিত্তি-রঙা গাড়িটার দিকে গেলো।

জলপাইগুড়ি থেকে একটানা আসছি। মার কোমর ধরে গেছে বলে, নিচে নেমে দাঁড়াল। আমিও নিচে। তাতার ড্রাইভারের গা ঘেঁষে বসে আছে তো বসেই আছে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ। তবু, তাতারের যা কাজ, এটা টানছে ওটা টানছে, এটা ঠেলে ওটা ঠেলছে। এই ঘণ্টা দুয়েকের জার্নিতে তাতার বোধহয় ড্রাইভিংটাই শিখে নিল পাঁচ বছরের প্যাংলা, তার ঠাটঠমক পঁচিশ বছরের মদ্দর মতো! রিয়েল পাকু।

চামুরচি বাজার ভর্তি কমলালেবু। চারকোনা টুকরি ভরা ভুটিয়া মেয়েরা লাল-হলু টকটকে কমলা এনে পাহাড় করছে এখানে ওখানে। বাগান থেকে সোজা হাটে নামে মেয়েরা পাকদণ্ডী বেয়ে। মেয়েদের গালগুলোও কমলার মতো রাঙা, ফাটোফাটো জুতো মোজা একসাথে বানানো। মোজাগুলো দেখতে খেলোয়াড়দের হোসের মতন গায়ে মোটা পশমের জোব্বা। রুপোর গায়ে নানারঙ পাথর-বসানো গয়নায় গলা ভর্তি কানজোড়া কানপাশা। নাকে নোলক। বুড়িদের হাতে-পায়ে উলকি। হাসি, হা আর হল্লা। এরা যেন কাঁদতেই জানে না। ভুটিয়া পুরুষরাও আছে ইতস্তত। সমত থেকে ফড়েরা এসেছে কমলা কিনতে। দরদাম মেয়েরাই করছে। ছেলেরা বুড়োরা ইতস্ত বসে জটলা করছে রোদ্দুরে। রোদ্দুরে বেশ ঝাঁজ। বেলা দশটা-এগারটা হবে।

গয়েরকাটা ছাড়িয়ে বানারহাট পৌঁছতেই চোখে পড়েছিলো নীলচে কালো পাহাড়ে রেখা। পুব-পশ্চিম পুরো আকাশ জুড়ে এই ভুটান পাহাড়। ওদিকে চোখ পড়লে মনে হচ্ছিলো বৃষ্টি হচ্ছে ঐ সমস্ত পাহাড়ে। মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে কাশফুলের মতো— এদিক ওদিক। তারপর চামুরচি এসে আরো স্পষ্ট হলো। মেঘগুলো ভেড়ার পালে মতো খেলা করে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশ জুড়ে।

ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ওপর থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে। আমরা চামুরচি পার হা নো-ম্যানস-ল্যানডের শটিক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গুড়গুড়িয়ে এগুচ্ছি। বাবা বললেন দু দেশের দুই সীমান্তের মাঝখানে এরকম খানিকটা করে জমি পড়ে থাকে। এটা কোন দেশের সম্পত্তি নয়। ডলোমাইটের সাদা পাথরগুলো মুখে-চোখে এসে জমে যাচ্ছে ভিজে হাওয়ায়। রুমাল দিয়ে মুছলেও যাচ্ছে না। এ থেকে সাদা সিমেন্ট হয় ডলোমাইট খনি সার্মচিতে পয়সা আনে। যেতে যেতে দুবার আমাদের গাড়ি থামলো চেকপোস্ট। গাড়ির নম্বর টুকে রাখলো ওরা। সেই সঙ্গে আমাদের নামঠিকানা।

সমতলে কিছুটা পথ। পাহাড় এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। গাছপালার সবুজের মধ্যে লাল টালিখোলা এখানে-ওখানে উঁচু-নিচু। কখনো গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুঁচো মতো রঙিন গাড়ি। কোনটি নামছে, কোনটি উঠছে। আমরা পাহাড়ি পথের মুখে এসে হাজির। ঠাণ্ডা বাড়ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ এক পশলা করে বৃষ্টি নেমে গেছে গাড়ির ওপর। মাঠের চতুর্দিকে। এখানে-ওখানে জমা জল। সিঁ

কাটা ক্ষেত-খামার। বাবা বললো, এই ধাপ-চাষের নাম 'জুম'। আগে দেখেছো?

বললুম, বারে দেখবো না কেন? পাহাড়ে তো এরকম চাষই হয়। শুধু 'জুম' কথাটা মনে ছিলো না। এইসব জমিতে জোয়ার আর ভুট্টার চাষই হয়। কিছু কিছু মোটা ধানও হয়ে থাকে।

শীত বাড়ছে। হাওয়া আরো দামাল হচ্ছে। জল বেশি। মুখ চোখ ভিজে যাচ্ছে। গাড়ির সামনের কাচ পরিষ্কার করছে ওয়াইপার। মেঘের ভেতর দিয়ে পথ কেটে এগুচ্ছি। কালো পীচপথ এঁকেবেঁকে ক্রমাগত উপরে উঠছে। দুপাশে ঘন পাইন। কখনো একদিকে কাটাপাহাড়, অন্যদিকে খাদ। কখনো তার উলটো। ডানেরটা বাঁয়ে যাচ্ছে। বাঁয়েরটা ডাইনে। একভাবে, ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে চলেছি আমরা।

যতো উঠছি বাড়িঘরের ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে গাছপালার ভিড়। গাছ মানে ঐ পাইনই। পাইন আর উইলো। উইলো-পাইন এই দুধরনের গাছের মধ্যে দিয়ে শনশন হাওয়া কান্নার মতন কানে আসে। অতর্কিত রাতে মনে হবে কোনও বাচ্চা ছেলে এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। এখানে তো আর শকুন নেই! নইলে, এই একটানা কাতরানি শকুনের কান্নার মতো মনে হতো তিতির। তিতি জানে শকুন কীভাবে কাঁদে। কেমন করে কাঁদে। ইনিয়ে-বিনিয়ে সে-কান্না শুনে তিতি কষ্ট পায়। কষ্ট তার এখনো হচ্ছে। শীতের কষ্টও বড় কম নয়। শীত কামড়ে বসছে নাকে চোখে মুখের খোলা জায়গা-গুলোতে। তাতারের অবস্থা তো আর কহতব্য নয়। মার একটা গরম শাল আপাদ মস্তক মুড়ে ছোটখাট বস্তা বা পুঁটলির ভেতরে ঘুমুচ্ছে সে। এমনিতে তো বাঁধাকপি! গরম জামা গেঞ্জি কোটে—বলো তো, বাঁধাকপি ছাড়া ওকে আর কী বলা যায়? অবশ্য, এই শীতে জামা কাপড় ছাড়ার কোনও কথাই ওঠে না। চান-ফানতো শিকেয় উঠল এ-কদিন। তবে, হাত মুখ ধুতে হবে তো! নাহলে, মা টেবিলে বসতেই দেবে না।

মিনিট বিশেক হলো। ওপরের দিকে উঠছি তো উঠছিই। গাড়ি হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে একটা টেবিল পাহাড়ে এসে দাঁড়াল। চারদিকে বাঁধানো পাকা দোকানের ধারে। মাঝখানে একটা লম্বাটে টিনশেড। সেখানে আবার চামুরচির মতনই এক কমলাবাজার!

ড্রাইভার জানাল, বাজার সবে বসল। বিকেলের দিকে এলে বাজারের আসল চেহারা মালুম হবে। কতরকম সওদা আসবে। চমরীগাই-এর দুধ থেকে চকোলেট। ঘি, মধু, ভুটিয়া জুতো, জোব্বা—কতো কী! প্রধান সওদা হচ্ছে কমলা।

বেশ কিছুক্ষণ সামচিবাজারে আমাদের গাড়ি থেমে রইলো। বাবা একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে চা কফি বিস্কুট চীজ আরো কী কী সব সওদা করলেন। চললো গাড়ি। সরু সাপের মতন হিলহিলে পথ বেয়ে গাড়ি ক্রমাগত উপরে উঠছে।

সামচির যে-অঞ্চলে আমরা থাকবো সেখানটা ঠিক সিঁড়িভাঙা অঙ্কের চেহারায় একটা বড়ো জমি। থাকে-থাকে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। বৃষ্টি হলে জল হুড়মুড়িয়ে

নিচের দিকে নেমে আসে। বৃষ্টি দেখেছিলুম বলেই বললুম কথাটা। একটি চিঠিতে তিতি এ-সমস্ত জানিয়েছে বুম্বাকে, তার পাতিপুকুরের ঠিকানায়।

সামচির এই কলোনি জিওলজিক্যাল সারভের দখলে। অর্থাৎ ভারতের সারভে অফিস ভুটান সরকারের হয়ে এই প্রতিবেশী রাজ্যে মূল্যবান সব খনিজ পদার্থ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু ইতিমধ্যে পেয়েওছে। বহু পেতে বাকি। তাঁদের ধারণা, ভুটানে যে-খনিজ দ্রব্য লুকোনো আছে, তার যদি খোঁজ পাওয়া যায় এবং তা কাজে লাগান যায়—ভুটান, তাহলে, অন্যতম ধনী রাষ্ট্রের সারিতে এসে দাঁড়াবে একদিন। আর সে-ব্যাপারে সাহায্যের হাত, বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত।

কলোনির মতন সমস্ত ঘরবাড়িগুলো আট-নটি সারে সাজান। পর পর বাংলো ধরনের বাড়ি। একতলা। ওপরে টিনের চাল। বাড়িগুলো খুবই হালকা মালমশলা দিয়ে তৈরি। কেন? না, এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। জানা গেল।

আমরা যে-বাড়িতে আছি, সেটি সেই ঢালু হয়ে আসা অঞ্চলটার মটকায়। এবং তার পিছনেই বিপুল খাদ। খাদে যে-নদী থাকার কথা, তার নাম ডায়না। এখন জল নেই, মানে, নদীটি নেই। ডায়নার খাদের পরেই ভুটান পাহাড় শুরু। সেই যে শুরু তার শেষ কোথায় জানতে গরমকালে কেউ কেউ পাহাড় চড়তে যায়।

আমরা যাঁর কাছে উঠেছি, সেই দেবুজ্যেঠু, এই সারভে অফিসের একজন বড়কর্তা। বাবার বন্ধু। একা থাকেন। মুহুর্মুহু নেমতন্নে বাবা এবার সাড়া দিয়েছেন।

ডায়না থেকে হুহু করে হাওয়া আসে, দস্যু-ডাকাত হাওয়া আর আমরা হিমে জমে যেতে থাকি। রগড় মন্দ নয়। শুধু লেপের ভেতরে গলা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে থাকা। জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

অমন হুহু হাওয়া আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। ডায়নার জলহীন কোল জুড়ে নুড়িপাথরদের সঙ্গে খেলা করতে করতে কখন সেই হুহু গিয়ে আমাদের খোলা দরজা-জানলা পার হয়ে গড়াতে-গড়াতে নিচের দিকে নামতে থাকে, বারান্দায় বসে স্পষ্ট যেন দেখা যায়। এমন মেহেরবানী হাওয়ার কথা কেউ কখনো বাপের জন্মে শোনে নি!

আর বাড়িঘরগুলোরই বা কী চেহারা! খেলনাবাড়ির হাবে-ভাবে পর পর সাজানো। থাকে-থাকে, ওপর-নিচ—তা আগেই বলেছি। বড় কালো পাথরের ওপর বর্ষার জলপ্রপাত, যেমন হিরনিতে দেখেছিলাম, তেমনি মাথা ছাপিয়ে সুতোর মতো অজস্রধারে নামে এই আমাদের সামচির সরু কালো সুন্দর পথগুলি—সবুজ ভেদ করে ক্রমাগত নিচের দিকে, ক্রমাগতই নিচের দিকে। তারপর নদীর মতো আসল সড়কে পড়া। আর সড়ক পাক দিয়ে-দিয়ে সামচির বাইরে।

আমরা তো দুচারদিন থাকবো বলে এসেছি। প্রথম দিনটা তাই শুয়ে-বসেই কাটবে বলে মনে হচ্ছে। তবে বাবা মা দেবুজ্যেঠুর সঙ্গে সামনের লনে বেতের চেয়ারে বসে

যতই গল্প করুক, আমি পুঁচকে তাতারের হাত ধরে এদিক-ওদিক যাবোই। একটা কথা অবিশ্যি, মা-বাবার চোখে-চোখে থাকলে ওঁদের কারো আপত্তি নেই। আমি একটু নিচে নামবো, দৌড়ে ওপরে উঠবো। তবে, পথ দিয়ে। পরিষ্কার রাস্তা না হলে কোথায় কী কাঁটা-ফাঁটা থাকে, পায়ে বিঁধে যায়, রক্ত পড়ে আর বকুনি ঝরে।

যেমন হাওয়া, তেমন মেঘ। সর্বদাই শীত জুজু এখানে সর্বত্র বসে। মেঘগুলো মাথার ওপর দিয়ে শুধুই ঘুরে বেড়ায়। কাজ নেই কর্ম নেই হুটহাট করে একপশলা জল ঝরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। একপাল ধোঁয়া ধোঁয়া চমরী গাই যেন আকাশটাকে তৃণভূমি বানিয়ে দিনরাত্তির চরে বেড়াচ্ছে। অফুরন্ত, উধাও তৃণভূমি অজস্র অগুণতি চমরী। এখানকার কুকুরগুলোর গায়েও ঝুপসি লোম। ছাগল ভেড়ার তো কথাই নেই। লোমে লোমে চোখ পর্যন্ত ঢাকা। দেখাশোনা চলে কী করে বুঝতে পারি না। ব্যাপারটাই যেন একটা মেঘমুলুকে ঝাপসাভাবে চলে আসার মতন।

এটুকু জীবনে তো কতো জায়গাতেই ঘুরলাম, এমন অবাক-করা দেশ কিন্তু কোথাও দেখিনি। সব থেকে মজার ব্যাপার একটা তোমাদের বলি। পরদিন, তখন আর কটা হবে? এই সকাল সাড়ে নটা দশটার বেশি নয়। আকাশটা মুখ গোমড়া করেই ছিলো সকাল থেকে। মোটা লেপ এক চিলতে সরিয়ে জানালা দিয়ে ব্যাপারটি দেখে আবার ডুব। উঠতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুচকুচে কালো আর কেমন যেন ঘোরালো হয়ে উঠলো বাড়ির বাইরেটা। কিছু বুঝে উঠতে-না-উঠতেই গুড়গুড়িয়ে উঠল বাইরের দিক। ঐ দিনের বেলাতেই আকাশ কেটে-ছিঁড়ে তছনছ করতে লাগলো বিদ্যুৎ। থরথরিয়ে উঠতে লাগলো ঘরবাড়ি।

দেবুজ্যেঠু ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে বললেন, চলো ঘর ছেড়ে সবাই মিলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়াই। মা বা দুজনেই ওঁর দিকে এক লহমা তাকিয়ে কী যেন বুঝলেন।

বুঝে বললেন, তাতারের গায়ে তো গরম কোট আছেই। মাথার টুপিটা পরিয়ে দাও। আর তিতি, তুমি লেপ ছেড়ে এই কম্বলটা দিয়ে মাথা গা পুরোটা র‍্যাপ করে নাও। দুম করে ঠাণ্ডা না লাগে। চলো একটা নতুন জিনিস দেখি। কোনদিন তো আর দেখা হয়নি! চলো, চটপট করো।

এত তাড়া কিসের বুঝতে পারছি না। দেবুজ্যেঠু আর বাবার তো আপাদমস্তক মোড়া লংকোট। মাথায় বাঁদুরে টুপি। মার শীত এমনিতেই কম। কিন্তু, আমাদের?

দেবুজ্যেঠু দরজার দিকে ততক্ষণে। বাবা তাতারকে কোলে তুলে নিয়েছে। আমি খুঁজে পাচ্ছি না জুতো জোড়া। এমনিতে পায়ে মোজা আছে। মোজা পরেই শোয়ার নিয়ম। যাই হোক, ঐ মোজা পরেই বারান্দা থেকে লনে। বৃষ্টি হয়নি বলে লনের মাটি-ঘাস শুকনো। দেখলাম, শুধু আমরাই না, বাড়ি ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ ঠায় ঐ বরফে ঠাণ্ডার মধ্যে। মাথার ওপর হুড়মুড় চলছে তো চলছেই।

মজা? তা লাগছিলো। তবে কী যেন একটা ভয়ে বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠছিলো, থেকে থেকে। মা বাবা বিশেষ করে দেবুজ্যেঠু যাতে না টের পায়, আমি প্রাণপণে শব্দটা থামাবার চেষ্টা করছিলাম। অন্যমনস্ক হয়ে থাকছিলাম। আকাশের দিকে, মেঘের গুমগুমের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কী চিক্কুর দিচ্ছে। চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামলো।

হঠাৎই বুককাঁপানো বাঁশি, যার নাম সাইরেন উঠলো বেজে। দেবুজ্যেঠু এক পা এগিয়ে বলে উঠলেন, এবার চলো বারান্দায় উঠি। মনে হচ্ছে তিতি তাতারের জন্যে আরো একটা বড় ধরনের মজা অপেক্ষা করে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে।

আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলো টেনে বসেছি. দেবুজ্যেঠু শুরু করলেন, এইমাত্র সামচিতে একটুক্ষণের জন্যে মৃদু ভূকম্পন হয়ে গেলো। তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে তিতি?

মাথা নাড়লাম। তবে মাথা কেমন ঘুরছিলো একটু একটু।

তা তো ঘুরবেই। তবে আমাদের এই বাড়িগুলো এমন হালকা করে তৈরি যে, সামান্য ভূমিকম্পে কোনও ক্ষতি হবে না। ভারি বা দোতলা তিনতলা বাড়ি হলে, ক্ষতি হতে পারতো। তবু, বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সবাই। একটা অভ্যাসও বলতে পারো এটাকে। তবে, সাবধানের মার নেই। ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়তে থাকলো যেন। মনে হলো, টিনের চালাটাই বুঝি ফেটে যাবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেবুজ্যেঠু ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বললেন, বলেছিলুম না তিতি, এক্ষুনি আরেকটা মজা দেখবে। দ্যাখো দ্যাখো, সামনে তাকিয়ে দ্যাখো। আশ্চর্য! দেখলাম কী জানো? আধলা ইট আর রেলের ডুমো ডুমো খোয়ার মতন বরফ পড়ছে। ঐ আমরা যাকে 'শিল পড়া' বলি, সেই শিল পড়ছে চড়বড়িয়ে। একটুক্ষণের মধ্যেই গোটা লনটা সাদা বরফে ঢেকে গেলো। দুচার টুকরো যা ছিটকে বারান্দায় আসছিলো, তা কুড়োতে আমি আর তাতার এগিয়ে গেলে দেবুজ্যেঠু বললেন, হাতে রাখো। মুখে দিও না। ওগুলোর মধ্যে ময়লা খুব বেশি। বসে বসে দ্যাখো না।

আশ্চর্য, এই কথাবার্তার ফাঁকে, একসময় হঠাৎ দেখি, রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে। সেই রোদ্দুর মেঘের ফাঁক খুঁজে নেমেও এসেছে, ঢালাও বরফের চাদরের ওপর। সে যে কী সুন্দর ঝকমকে স্বর্গ—না দেখলে বিশ্বাস করবে না। আর ওপরে ঐ মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে গলে পড়ার সময়, মেঘ যেন শাড়ি, তার পাড় জ্বালিয়ে রোদ্দুর পড়ছে বরফে। স্বর্গ, ওপরে কি নিচে—বোঝা যাচ্ছে না।

মনে মনে ভেবে নিয়েছি, বাবাকে বলবো, দুদিনের বদলে দশ দিন থাকলেই তো ভালো। জ্যেঠুও তো বলছিলেন, এক্ষুনি কি যাবে? আরো দু দশদিন থাকো। আমি বদলি হলে এখানে এসে থাকবে কোথায়? এখানে তো আর হোটেল-ফোটেল নেই! সুতরাং, বাবাকে বলতেই হবে, কেঁদে-কেটে রাজী করাতেই হবে, কী বলো?

ছেনোভূতের ছবির বই

অদ্রীশ বর্ধন

"জয়, ও জয় !"

"উঁ।" ঘুম জড়ানো গলায় বললে জয়বাবু—বয়স যার মোট সাত। সামনের পাটির ওপরের দুটো দাঁত নেই। বুড়ো আঙুলটা সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে গুটিসুটি মেরে দিব্বি ঘুমোচ্ছিল বাবার কোলের কাছে।

"বাব্বা! কি ঘুম! ওঠো না! চোখ দুটো খোলো না!"

চোখ খুলল জয়। বাবা ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে। টেলিভিসনের ওপরে লিকপিকে ঠ্যাং দুলিয়ে কে যেন বসে আছে।

"কে ?"

"আমি···আমি ছেনোভূত।···"

"ছেনোভূত ? সে আবার কে ?"

"ছানা খাই কিনা—তাই ছেনো।"

"এত রাতে ডাকছো কেন ?"

"গপ্প করব বলে।"

"রাত্তিরে গপ্প করলে বাবা বকবে। কাল সকালে ইস্কুলে যেতে হবে না ?"

"দূর! সে তো কাল সকালে। এখন এসো ছবি দেখাবো।"

উঠে বসল জয়। টুপ করে টেলিভিসনের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামল ছেনোভূত। ধবধবে গায়ের রঙ। হাত-পা অবিকল প্যাঁকাটির মত সরু। মাথাটা তরমুজের মত গোল। খ্যাখন হাসি হাসছে সাদা দাঁত বার করে। দেখে শুনে ভালই লাগল জয়ের।

বলল—"ভূতেরা তো ভয় দেখায়। তুমি গপ্প করতে চাও কেন ?"

"এই ছ্যাখো ! শিশুবর্ষের জন্যের তো এমনটা হল। বিশ্বভূত সম্মেলনে ঠিক হয়েছে শিশুদের এখন থেকে আর একদম ভয় দেখানো চলবে না।"

"অ।—কি ছবি দেখাবে ?"

"খাট থেকে আগে নামো।" নেমে পড়ল জয়। বলল—"এবার দেখাও।"

কাঠির মত আঙুল বাজিয়ে তুড়ি মারল ছেনোভূত। অমনি একটা বিরাট বই চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে নেমে এল জানালা গলে—ভাসতে লাগল জয়ের নাকের সামনে।

"অ্যাতো মোটা বই ! এতো আমার চেয়েও বড়।"

সত্যিই পেল্লায় বই। ঠিক যেন একটা পাতলা বাক্স।

ছেনোভূত বললে—"বড় তো হবেই। জ্যান্ত ছবির বই যে।"

"কি মিথ্যুক ! ছবি আবার জ্যান্ত হয় ?"

"বেশ তো, মলাট খোলো !"

বাক্স-বই তখনো নাকের সামনে ভাসছে। জয় কাঠের মলাটটা দু'হাতে তুলে দিল।

প্রথম পাতায় একটা প্রজাপতি বসেছিল। সারা গায়ে সে কী রঙের বাহার। ছবি বলে মনেই হয় না। জয় হাত বুলোতে যেতেই ফুড়ৎ করে উড়ে গেল রঙিন প্রজাপতি।

চমকে উঠল জয়। হি-হি করে হেসে ভূত বললে—দেখলে তো ? "এমনি আরো মজার মজার ছবি আছে পাতায় পাতায়—ওলটাও, আর একটা পাতা ওলটাও।"

জয়ের সত্যিই মজা হচ্ছে। ফোঁকলা দাঁত বার করে হাসছে ছেনোভূতের সঙ্গে।

ওল্টালো আর একটা পাতা। পাতা জুড়ে একটা মরকত রঙের পাখি ল্যাজ ঝুলিয়ে বসেছিল নীল-হলুদ-কমলা রঙের গাছে। মাথায় সাদা ঝুটি। চোখ দুটো বেগনি।

বেগনি চোখে পিটপিট করে ঘাড় বেঁকিয়ে জয়ের দিকে তাকালো মরকত পাখি। পরক্ষণেই গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল আশ্চর্য মিষ্টি সুরে।

জয় তো হতভম্ব। হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই উড়ে গেল মরকত পাখি। জানলা গলে। গান ভেসে এল বাগান থেকে। ঠিক এই সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল।

ভাসন্ত বইয়ের পরের পাতাটা যেন তলা থেকে ফুলে উঠল। কি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তলা থেকে। ছেনোভূত জুলজুল করে চেয়ে দেখছিল—পিঁয়াজের মত চোখ দেখে মনে হল ভয় পেয়েছে।

ভূতেও ভয় পায়। কি আছে ? সাতপাঁচ না ভেবেই পাতা উলটে দিল জয়।

অমনি একটা ড্রাগন সড়াৎ করে পাতার ওপর থেকে পিছলে গিয়ে নামল মেঝেতে। সবুজ ড্রাগন। নাক দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেঝে থেকে আর এক লাফে গেল জানালার সামনে। ফস্ করে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের লকলকে শিখা। মিলিয়ে গেল শূন্যে। দেওয়ালের ফুটো দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল বিকট ড্রাগন।

জয়ের চমক ভাঙল ঠক্ঠক্ আওয়াজ শুনে। ফিরে দেখে ভয়ের চোটে কাঁপছে ছেনোভূত। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগেছে। ঠক্ঠক্ আওয়াজ হচ্ছে।

জয়ের কিন্তু একদম ভয় পায়নি। এক ধমক দিল ভূতকে।

"ভূতেদের কলঙ্ক তুমি। এত ভয় ড্রাগনকে ?"

ধমক খেয়ে কেঁদে ফেলল ছেনোভূত। ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদল কিছুক্ষণ। নাকে সিকনি গড়াচ্ছে দেখে আবার ধমক দিল জয়—"ন্যাস্টি! নাক মোছো!"

নাকের জল আর চোখের জল প্যাঁকাটি হাত দিয়ে মুছতে মুছতে ছেনো বললে—"সব্বোনাশ হল, জয়।"

"কিসের সব্বোনাশ ?"

"ঐ হল গিয়ে ভূত-খেকো ড্রাগন।...ঐ শোনো!"

নিস্তব্ধ রাত। কানপেতে শুনল জয়। অনেক দূরে কারা যেন কাঁই-মাই করে চেঁচাচ্ছে—নাকি স্বরে! ছেনো বললে—"ভূতদের ধরে খাচ্ছে। আমাকেও খেতো—তুমি ছিলে বলে কিছু বলল না। কি করি এখন ?"

জয় বলল—"একটা ড্রাগন আর কত ভূত খাবে বলো ? ভয় পেও না। আমি তো আছি।"

শোরগোল আরো বেড়ে উঠল। আকাশে-বাতাসে সাঁইসাঁই আওয়াজ শোনা গেল, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল জয়, পালে পালে শাকচুন্নি, ব্রেহ্মদত্যি, মামদো এবং আরো কত নাম-না-জানা ভূত উড়ে পালাচ্ছে আকাশ দিয়ে। পেছন পেছন কপ্ কপ্ করে ভূত খেতে খেতে ছুটতে সবুজ ড্রাগন—বিকট ডানার ঘায়ে কাহিল করছে এক-একটা ভূতকে—তারপরেই দাঁতালো মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে গিলে ফেলছে কোঁৎ করে।

আবার ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল ছেনো। দাঁতের বাদ্যি আরম্ভ হল নতুন করে। মুশকিল আসান হয়ে গেল পরের মুহূর্তেই।

ভাসন্ত বইয়ের পাতা আবার ঠেলে উঠল তলা থেকে। কে যেন ছটফট করছে পাতার তলায়। দেখল ছেনো। দেখেই তড়াক করে এমন একখানা লাফ দিল যে ঠকাং করে মাথা ঠুকে গেল কড়িকাঠে। টপ করে নেমে এল মেঝেতে।

আনন্দে আটখানা হয়ে বললে—"জয়...জয়...ওলটাও পাতা!"

"কেন ?" জয় অত কাঁচা ছেলে নয়। একবার পাতা উলটে ড্রাগন উড়িয়ে দিয়েছে—আর পাতা ওলটায় ?

ছেনো তখন তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে—ওলটাও পাতা···ওলটাও পাতা··· ড্রাগনের দুশমন আছে ওখানে—ছাড়ো তাকে!

"ড্রাগনের দুশমন!"

"হ্যাঁ···হ্যাঁ···পক্ষিরাজ! ওলটাও পাতা···ওলটাও পাতা!"

পক্ষিরাজ! তাহলে আর ভয় কিসের? পাতা ওলটালো জয়।

দুধের মত সাদা রঙের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া ডানা ঝটপটিয়ে নেমে এল মেঝেতে। কি সুন্দর ঘাড় বেঁকানোর কায়দা! ডানা দুটো বকের ডানার মত ছোট্ট, কিন্তু চমৎকার।

তাড়া লাগালো ছেনো—"উঠে পড়ো···পিঠে উঠে পড়ো!"

আর ভাববার সময় পেল না জয়। হঁাচড় পাঁচড় করে উঠে পড়ল ডানাওলা ঘোড়ার পিঠে। গড়ের মাঠে ঘোড়া চড়ে যার অভ্যেস—সে পক্ষিরাজ চড়তে ভয় পায় না।

সাঁ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল পক্ষিরাজ। পিঠে জয়। ভূতেদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতেই-"বাঁচাও···বাঁচাও" ডাক ছেড়ে ভূতের পাল উড়ে এল পেছনে পেছনে —সবার পেছনে ড্রাগন। পক্ষিরাজও উড়ে চলল ভীষণ বেগে। দেখতে দেখতে কলকাতা মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে একটা ধু-ধু মরুভূমি দেখা গেল। তখন সূর্য উঠছে পুবদিকে। আরো উড়ে গেল পক্ষিরাজ। পেছনে লাখ লাখ ভূত কাঁদতে কাঁদতে উড়ে এল আকাশ কালো করে।

সূর্য যখন মাথার ওপর, পক্ষিরাজ পৌছোলো মরুভূমির ঠিক মাঝখানে। রোদ্দুরে ভূতেদের দেখা যায় না। কিন্তু ড্রাগনকে দেখা যাচ্ছে। গরমে হাঁসফাঁস করছে। একে তো তার পেটের মধ্যে আগুন—তার ওপর মরুভূমির গন্‌গনে তাপ—কোথাও জল নেই —গাছের ছায়া নেই—খাবি খাচ্ছে তাই।

ঠিক এই সময়ে শূন্য দিয়ে উড়ে এল সেই বাক্স-বই। পাতাটা সেইভাবে খোলা। একটা গাছের ছবি আঁকা পাতায়—তলায় ছায়া।

দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেদম ড্রাগন। সোঁ করে নেমে গেল গাছের ছায়ায় —গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল গা ঠাণ্ডা করার জন্যে।

পক্ষিরাজ একপাক ঘুরে পৌছোলো বইটার পাশে। দমাস করে মলাট বন্ধ করে দিল জয়। ছবি হয়ে গিয়ে বন্দী হল বদমাশ ড্রাগন।

তারপর? বই আর জয়কে নিয়ে পক্ষিরাজ উড়ে এল জয়ের ঘরে। তখন আবার রাত হয়েছে ছেনো বসেছিল ঘরে। একগাল হেসে বইয়ের পাতা খুলে পক্ষিরাজকে ঢুকিয়ে দিল পাতার মধ্যে ছবি করে।

জয়কে বললে—"আবার কাল রাতে আসব। কেমন?"

যোগ ব্যায়াম

মনতোষ রায়

শরীরটাকে সুস্থ রাখতে যোগ ব্যায়ামের চেয়ে ভাল ওষুধ আর কী আছে! আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই তাদের শরীরের উপসর্গ ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত এবং প্রথামত সকালে বা সন্ধ্যেবেলায় ভরাপেটেও নয় বা খালি পেটেও নয়, যোগ ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারেন।

দেহকে নিরোগ ও ঋজু রাখার প্রথম সোপান খাদ্যে সংযম রক্ষা। রমণ মহর্ষি বলেন "Food discrimination is essential to still the restless mind" সুতরাং খাদ্য গ্রহণে মনের যে এক প্রকাণ্ড ভূমিকা নিহিত রয়েছে তা অনস্বীকার্য। যোগ ব্যায়ামে তার নিদান ও বিধান রয়েছে যথেষ্ট।

আমরা যা-ই খাই তা পাকস্থলীতে গিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রসের সাহায্যে হজম হতে থাকে, উপরন্তু খাদ্যে যদি কোন রোগবীজাণু থাকে তাকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের যকৃৎ হল খাদ্য পরীক্ষক। দেহের প্রবেশ জিহ্বা যেমন প্রহরী তেমনি দেহের ভেতর প্রহরী যকৃৎ। খাদ্যের সার বস্তু যেইমাত্র যকৃতে যেতে শুরু করে তৎক্ষণাৎ যকৃৎ তাকে বেশ ভালভাবে ছেঁকে মাত্র বিশুদ্ধ রসটুকু রক্তের ভেতর ঢেলে দিয়ে রক্তের বিষাক্ত বস্তুকে নষ্ট করতে থাকে। ঠিক তেমনি কাজ করে চলে আমাদের অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি, ফুসফুস এবং ঘর্মগ্রন্থিগুলি। এমনিভাবে দেহের সক্রিয় যন্ত্রগুলি অবিরাম চলতে থাকে। সেইসব যন্ত্র ও গ্রন্থিগুলিকে যথার্থরূপে চালু রাখার নিমিত্ত যোগ ও ব্যায়ামের অভ্যাস অপরিহার্য।

নিয়মিত যোগ ও ব্যায়াম অভ্যাসে শুধু দেহেরই উন্নতি নয় মনের মহান শক্তির সন্ধানও অচিরে পাওয়া যায়। যে শক্তির অভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

যোগ ব্যায়াম প্রকৃতি স্বীকৃত। তাই প্রকৃতি দেহ মনের সংস্কারকরূপে রোগারোগ্য করার ভূমিকায় প্রধান নায়কের কাজ করে—"Nature alone can cure" পারেন। একথা কাউকে ভুললে চলবে না যে গ্রন্থিঃস্রাব দ্বারাই মানুষের জীবন ও মনের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে। এবং এখানেই সাধারণ ব্যায়াম ও যোগ ব্যায়ামের তফাত। কারণ সাধারণ ব্যায়াম প্রধানত মাংসপেশীর পরিপুষ্টি আনে। আর যোগ ব্যায়ামে হয় গ্রন্থিরস

ক্রিয়ার বিপুল সমাবেশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবার কয়েকটি সচিত্র যোগ ব্যায়ামের উল্লেখ করব। প্রত্যেকটি যোগ ব্যায়াম আপাতত শরীরের প্রকার ভেদে ৩।৪ বার অভ্যাস করতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে। ৩০ থেকে ৫০ সেকেণ্ড প্রতিটি আসন অভ্যাস করে ততটুকু সময় শবাসনে বিশ্রাম অবশ্যই নিতে হবে। প্রতিদিন গায়ে তেলমালিশ করে স্নান করতে হবে। দাস্ত পরিষ্কার ও দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে তৎপর রাখার জন্য প্রয়োজন মতো জল ও শাক সব্জি ভাল হজম শক্তি অনুযায়ী পরিমাণে একটু বেশি খেতে হবে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে হবে। কেবলমাত্র ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসের সাহায্যেই বহু ব্যাধি দূর করা যায়।

"শ্বসন"—জীবনের মূল উৎস, প্রাণশক্তি (Life force)। প্রাণশক্তি আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এই প্রাণশক্তি আছে কোথায়?

—বাতাসে, বাতাসের একটা সূক্ষ্ম উপাদানের মধ্যে প্রাণের অনন্ত ভাণ্ডার আছে। প্রশ্বাসের সঙ্গে এই জীবনীশক্তি আমরা নিজেদের দেহে টেনে নিই। 'যত শ্বাস, তত জীবন'। আমাদের প্রত্যেকের জীবনদীপ মৃত্যু পর্যন্ত অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখে এই প্রাণশক্তি। তাই সকলেরই শেখা উচিত কেমন করে হৃদযন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যবহার করে শ্বাস নিতে হয়।
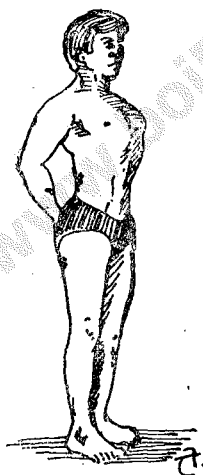
দুহাত পেছন দিকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ান। নাক দিয়ে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ প্রশ্বাস নিন, যাতে হৃদযন্ত্র যতদূর সম্ভব ফুলে উঠতে পারে। উদর যথাসাধ্য নিচু করে রেখে কয়েক সেকেণ্ড শ্বাস ধরে রাখুন। তারপর খুব আস্তে মুখ দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ুন।

এই প্রক্রিয়ায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ উপকার হয়। বর্ধিত প্রাণশক্তি মানুষের রক্ত বিশুদ্ধ করে, গায়ের রং উজ্জ্বল হয় ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা উপশম করে। স্মৃতিশক্তি ও হৃদযন্ত্রের শক্তি বাড়ায়। এই ব্যায়াম হাঁপানিও (Asthma) নিরাময় করে তোলে। শ্বাসপ্রশ্বাসে ছন্দের মাধুর্য আনে। এই যোগ-ব্যায়ামে মানুষের মনের ওপর সম্পূর্ণ সংযম আসে, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়। মনকে একাগ্র, একমুখী করার জন্য এই ব্যায়াম একান্ত উপযোগী।

'ক' চিত্রটির মত প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে কোমরে হাত রেখে ধীরে ধীরে অমনিভাবে হাঁটু সোজা করে দু পা তুলতে হবে। চিবুক বুকে ঠেকাবে না। এবার নির্দেশ মত

সময় ঐ অবস্থায় থেকে হাঁটু বুকের কাছে ভাঁজ করে এনে ধীরে ধীরে কোমর মাটিতে লাগিয়ে পা লম্বা করে 'শবাসনে'-এ শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।

এই বিপরীতকরণী মুদ্রাটির উপকার বহুরকম। পা দুটো উঁচু করে রাখার ফলে—অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে ক্ষুধাবৃদ্ধি পায় এবং রক্তশূন্যতা দূর করে শরীর ও মনকে বেশ সতেজ করে তোলে। কারণ যে সমস্ত রক্তবাহী নালী বা ধমনীর সাহায্যে শরীরের নিম্ন অঙ্গ থেকে উর্ধ্বাঙ্গে, মস্তিষ্ক ইত্যাদিতে প্রয়োজনমত রক্ত পরিচালিত হয়—প্রকৃতিগত নিয়মে সব সময়েই আমাদের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের বিপরীতকরণ করতে হয়। ফলে
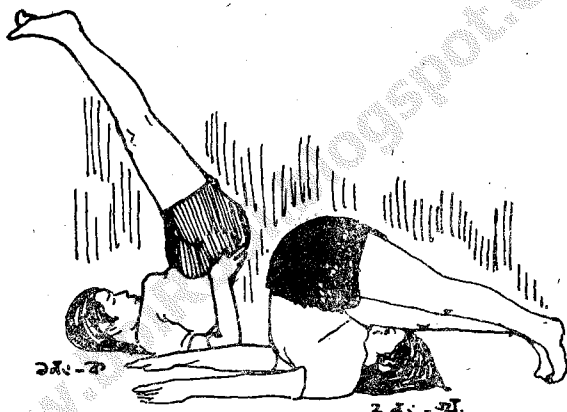
অঙ্গগুলি সহজে ক্লান্ত বা দুর্বল হবার যুক্তি রয়েছে। মনে রাখতে হবে মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, দুর্বল বোধ করার এও একটি যথার্থ কারণ। তাই সেইসব ধমনী-গুলিকে বিশ্রাম দেবার নিমিত্ত এই বিপরীতকরণীটি করা খুব দরকার। তাতে দেহে যৌবনোচিত রূপ ও সামর্থ্য অটুট থাকে।

"হলাসন" (২নং খ চিত্র)—আগের মতোই চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পেছনে কোমরের কাছে ভর দিয়ে রেখে বা ছবিটির মত পেছনে শুইয়ে রেখে হাঁটু সোজা রেখে মাথার পেছন দিক মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। তবে প্রথম প্রথম অনেকেই হয়তো পা মাথার পেছনে মাটিতে ঠেকাতে পারবে না। একটু উঁচুতেই রাখতে হবে। হাঁটু সোজা করতে না পারলে আপাতত একটু ভাঁজ করেও রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চিবুক বুকে নিশ্চয়ই ঠেকে থাকবে।

বিশেষ উপকার গলার কাছের কতগুলি যন্ত্র যেমন টনসিল, থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি, যারা দুর্বল হলে সর্দিকাশি এবং খুব রোগা বা বেশি মোটা করিয়ে দিতে

পারে। তাছাড়া মেরুদণ্ড সামনের দিকে বাঁকাতে হয় বলে মেরুদণ্ডের আশেপাশের পেশীগুলি এবং স্নায়ুকেন্দ্র ইত্যাদির দুর্বলতা দূর করে ও সবলতা ফিরিয়ে দেয়।

এছাড়া পেটের পেশী মজবুত হয়। প্লীহা, যকৃৎ, অন্ত্র ইত্যাদির যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য পেয়ে তারা নিজ নিজ দায়িত্বে সব সময় জাগ্রত থেকে, পেটের গণ্ডগোল বন্ধ করে। বহুমূত্র রোগীর পক্ষের এ ব্যায়াম যথেষ্ট কার্যকরী। কারণ প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থিতে যথেষ্ট চাপ পড়ে।

৩নং
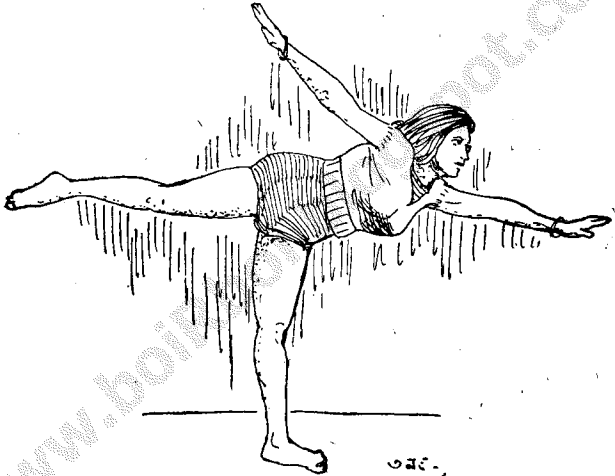
দণ্ডায়মান একপদ সলভাসন (৩নং চিত্র)—দাঁড়িয়ে হাত ছড়িয়ে দিয়ে এবার ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে একটি পা ছবিটির মত করে যতটা সম্ভব পেছন দিকে তুলে দিন। যদি সম্ভব হয় যে পা মাটিতে থাকবে সেই পায়ের গোড়ালি মাটি থেকে আলগা করে তুলে আধমিনিট স্বাভাবিক দম নেওয়া ছাড়া করতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে অপর পায়ে। এভাবে ৫।৭ বার অভ্যাস করা যেতে পারে।

এতে হিপ মানে পাছার সৌন্দর্য বজায় থাকবে, শিরদাঁড়ার শক্তি ও সৌন্দর্য অটুট থাকবে এবং পায়ের শক্তি বৃদ্ধি হবে, পেটের গণ্ডগোল ভাল হবে। তাছাড়া মনের স্থিরতা ও চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

চক্রাসন (৪নং চিত্র)—চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো কাঁধের কাছে এবং পা দুটো কোমরের কাছে এনে এবার হাত আর পায়ের জোরে কোমর ও পিঠ মাটি থেকে ঠেলে এমনভাবে ওপরে তুলতে হবে যেন দেহের আকৃতিটি একটি ধনুকের মতন হয়। ঐ

অবস্থায় নির্দেশমত সময় থেকে তারপর শুয়ে শবাসনে বিশ্রাম চাই। প্রথম প্রথম এই আসনটি আমার বর্তমান নির্দেশ মত অভ্যেস করতে হয়তো খুব কষ্ট হবে। তাই আপাতত যার যতটুকু কোমর ও পিঠ তোলা সম্ভব তিনি ততটুকু তুলবেন। এবং তুলে কিছু সময় থাকতে যদি কষ্ট হয় তাহলে ঐ ভাবে দম নিতে নিতে কোমর তুলে দম ছাড়তে ছাড়তে কোমর পিঠ মাটিতে ঠেকিয়েই পুনরায় দম নিতে নিতে তুলতে পারেন।
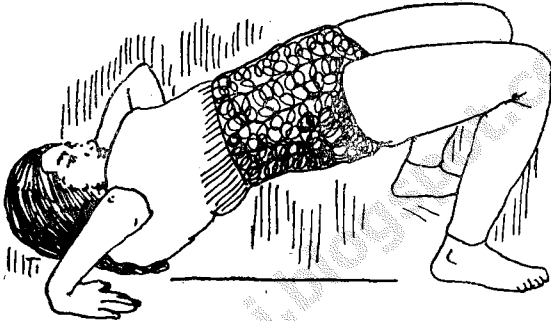
এর ফলে প্রধানত কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। কারণ পেটের ভেতরের যন্ত্রগুলি ঐ অবস্থায় লম্বালম্বি টান পড়ে তন্ত্রকে হালকা করে দেয়। আর এতে পেটের ও পিঠের অস্বাভাবিক চর্বিও কমে যেতে পারে। তাছাড়াও শিরদাঁড়ায় যথেষ্ট নমনীয়তা আসে। এবং হাত ও পায়ের সুন্দর গঠন ও শক্তি সামর্থ্য পাওয়া যায়। বুকের অনুন্নত বা অতি উন্নত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সুঠাম অবস্থা ফিরিয়ে আনতেও এই আসনের ভূমিকা প্রচুর।

৫ নং

বজ্রাসন (৫নং চিত্র)—পায়ের পাতা উলটিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে সোজা সরল হয়ে বসতে হয়।

এই আসনটি নিয়মিত অভ্যাস রাখতে পারলে হাঁটুতে বা পায়ের গোড়ালীতে বাত এবং সায়টিকা-বাত ভাল হয়ে যাবে আর না হলে কোনদিন এই বাতে ভুগতে হবে না। রাত্রে খাওয়ার পর এমনি করে বেশ খানিকক্ষণ বসে থেকে গল্পগুজব করলে আরাম ও হজম হবে।

ব্লু টাফের পথে অ্যাডভেঞ্চারি

কবিতা সিংহ

রাত সাড়ে নটায় পশ্চিম-বার্লিন থেকে একটা 'লেগে ওয়াগনে' উঠিয়ে দিলেন অমলের বাবা, অমলকে। ওর সহযাত্রী তখনো আসেনি। বাবা বললেন,—মনে রেখো ভোর ছটা পনেরয় ডোনাওয়ার্ট স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে উল্‌মের ট্রেন পাবে। উল্‌মে টেলিগ্রাম করা আছে। চন্দনমামা এসে নিয়ে যাবে তোমায়।

ট্রেন ছেড়ে দিল। লেগে ওয়াগন। মানে শোয়ার ব্যবস্থাওয়ালা গাড়ি। চমৎকার নরম বিছানা পাতা। হালকা সুন্দর কম্বল। অমল শুয়ে পড়ল। সঙ্গে তার একটি ছোট স্যুটকেস আর একটি ঝোলা। ঝোলায় দু বাক্স চকোলেট। চকোলেট খেতে খেতে অমলের বেশ ভয় ভয় করছিল, আর মজাও লাগছিল। বাবা রোজ কনফারেন্সে চলে যান। একা একা ঘুরে পশ্চিম বার্লিন যতটা পারে দেখেছে। চন্দনমামা থাকেন উল্‌মে। ওই শহরে আইনস্টাইন জন্মেছিলেন। চন্দনমামা চিঠিতে লিখতেন নতুন পুরোনো মেশানো ভারি রোমান্টিক শহর উলম্‌। আর মাত্র সাত আটদিন ওরা জার্মানীতে আছে। তাই যতটুকু ঘুরে দেখে নেওয়া যায়। চন্দনমামাকে পশ্চিম বার্লিন থেকে ফোন করেছিল অমল। চন্দনমামা দারুণ খুশি। বললেন,—শিগগির চলে আয়। তোকে ফ্রাঙ্কফুর্টের আন্তর্জাতিক বইমেলা দেখাব, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় দেখাব, কোলন দেখাব, বন্‌ দেখাব।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কামরার উষ্ণতায় কম্বলের আরামে অমলের ঘুম ঘুম আসছিল। বাইরে হিমশীতল হাওয়া। ঈষৎ বৃষ্টিও পড়ছে। ট্রেন প্রায় উড়ে চলেছে। ঝাঁকুনিহীন মসৃণ বেগে। জি. ডি. আর-এর উপর দিয়ে যাচ্ছে। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে দুবার পাসপোর্ট দেখাতে হ'ল।

অমল তার ঝোলা থেকে চকোলেটের বাক্সটা বের করে একটা চকোলেট খেল। এমন সময় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর কামরার অন্য সহযাত্রীটি ভিতরে ঢুকল কাঠের দরজা ঠেলে। লোকটি জার্মান নয়। পশ্চিম বার্লিনে নানান দেশের লোক থাকে। তুর্কী, ইতালিয়ান গ্রীক্‌, ইজিপসিয়ান এইসব। অমল ঠিক বলতেই পারবে না লোকটি ঠিক কোন্‌ জাতির। তবে কখনই জার্মান নয়। লোকটির চালচলন এবং চেহারার রুক্ষতা অমলকে কেমন যেন অপ্রসন্ন করে তুলছিল। বিদেশে বিভূঁয়ে, এই প্রথম সে একা একা এতদূর চলেছে। অচেনাকে সব সময়েই কেমন যেন ভয় ভয় করে মানুষের। অমলেরও করছিল। অমল একবার উঠে বাথরুমে গেল। এখানে ট্রেনে

লোকে জিনিসপত্র রেখে চলে যায়। কারণ চুরি ডাকাতি হয় না বললেই চলে। অমলের কিন্তু জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে যেতে মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করছিল।

ফিরে এসেই অমল দেখে সেই লোকটা উপুড় হয়ে তার ঝোলা হাতড়াচ্ছে। অমল ঢুকেই এই কাজ দেখে প্রতিবাদ করতে গেল, এক্সকিউজ মি—তার আগেই লোকটা এক গাল হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল,—এ চকোলেট্‌, এ চকোলেট্‌—লোকটার কথা শেষ হতে না হ'তেই পাসপোর্ট চেকিং অফিসার এসে ঢুকলেন ওদের কামরায়। পাস-পোর্ট দেখতে চাইলেন লোকটির। তারপর ডেকে নিয়ে গেলেন বাইরে। অমল তখন উঠে বসেছে। সে লক্ষ্য করল আরো তিনটি অ-জার্মান লোককেও ধরা হয়েছে। অমলের সহযাত্রীর ব্রীফ্‌কেসটিও নিয়ে নিলেন অফিসারটি। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন সকলকে নিয়ে। অমল তার ঝোলাটি একবার দেখল। এমন কিছু দামী জিনিসপত্র ছিল না তাতে। বাক্স দুই চকোলেট, কিছু চিজ্‌ স্যাণ্ডুইচ, কয়েকটা বই কলম আর ডায়েরী। কিছুই খোয়া গেছে বলে মনে হ'ল না তার। স্যুটকেসটাও ঠিক্‌ঠাক্‌ চাবি আঁটা। অমল নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অমলের ঘুম ভাঙল ঠিক ছটা পনেরয়। গাড়ি থামল ডোনাওয়ার্টে। একজন জার্মান যাত্রীকে তবু স্টেশনের নামটা জিজ্ঞেস করে নিল সে। নেমে প্ল্যাটফর্মে এসে উলমের ট্রেনের জন্য দাঁড়াল অমল।

অমল লক্ষ্য করল একটি মহিলা তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে। এ মহিলাটিও জার্মান নয়। রুক্ষ ধরনের চেহারা। পরনে আধময়লা জীনস্‌ এর প্যাণ্ট ও জার্কিন। তার উপর লোমের কোট, মাথায় টুপি পরা। হাতে একটা ভারী কিট্‌ ব্যাগ্‌।

উল্‌মের ট্রেন আসতে অমল ট্রেনে উঠে পড়ল। সে লক্ষ্য করল মহিলাটিও অমলের কামরায় উঠে পড়েছে। অমলের কেন যেন মনে হতে লাগল মহিলাটি তাকে অনুসরণ করছে। এবং কোথায় যেন মহিলাটির সাজ-পোশাক চলাফেরায়, গত রাতে তার সেই অদ্ভুত সহযাত্রীর সঙ্গে মিল আছে।

উল্‌মে পৌঁছে অমল একা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। যাত্রীরা সবাই চলে গেছে।

হঠাৎ অমল লক্ষ্য করল সেই মহিলা দূরের বেঞ্চ থেকে উঠে তার কাছে এগিয়ে আসছে। চোদ্দ বছরের ছেলে অমল। বিদেশে এই প্রথম সে এক ট্রেন জার্নি করছে। মহিলাটি এগিয়ে এসে একটা কৃত্রিম পোশাকী হাসি হেসে বলল,

—ক্যান্‌ আই হ্যাভ এ চকোলেট ?

অমল চম্‌কে মহিলার দিকে তাকাল। কাল রাতে তার সহযাত্রীটিও তো চকোলেটের জন্য তার ঝোলায় হাত বাড়িয়েছিল।

একটু হেসে অমল বলল, ওহ্ ইয়েস, হোয়াই নট? বলে সে চকোলেটের বাক্সর জন্য তার ঝোলা হাতড়াচ্ছে এমন সময় তার চোখে পড়ল চন্দনমামা আর মণিমামিমা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। অমল আনন্দে হাত তুলে বলল,—'হাই'—তারপর বাক্স খুলে মহিলাটিকে একটি চকোলেট দিল। মহিলা তার ঝোলার মধ্যে নিজেই হাতড়ে আর একটা চকোলেটের বাক্স নিতে যাচ্ছিল। চন্দনমামা আর মণিমামির হৈহৈ করে এসে পড়াতে তা পারল না।

অমলরা দ্রুত প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে এল। তারপর চন্দনমামার গাড়িতে সোজা ওদের বাড়ি।

উল্‌মের দানিয়ুবের তীরে দাঁড়িয়ে অমল বলল,—আচ্ছা চন্দনমামা, বাবা আর মা একটা মিউজিক শোনেন সেটার নাম 'ব্লু-দানিয়ুব', সেটা কি এই দানিয়ুবের রঙের জন্যে?

চন্দনমামা বললেন,—না, 'ব্লাউ' বা ব্লু' বলে একটি নদী আছে। সে এসে মিশেছে দানিয়ুবে। তাই থেকে ব্লু-দানিয়ুব। তুই তো আরো নদী দেখবি। মেইন দেখবি ফ্রাঙ্কফুর্ট যেতে। রাইন দেখবি কোলন যেতে।

অমল বলল,—রাইন?—মেইন? ব্লু?—দানিয়ুব—কি মজা! বাড়ি ফেরার পথে অমলকে নিয়ে ওরা শহরের কাউফালেতে গেল। বহুতল এক বাজার।

বাড়ি ফিরে বিশ্রাম। মণিমামিমা অমলের জন্য একটি ছোট্ট ঘর সাজিয়ে দিয়েছেন। স্নান সেরে, লাঞ্চ সেরে অমল ঘরে ঢুকে বিছানায় শুতে যাবে হঠাৎ চোখ পড়ল তার স্যুটকেস আর ঝোলার দিকে।

ঝোলাটা নিয়ে বিছানার ওপর উপুড় করে দিল সে। নাঃ সবই তো ঠিক আছে। দুটো চকোলেটের বাক্স, ডায়েরী, ডট পেন আরো টুকিটাকি কিন্তু এ কী?—এই চকোলেটের ছোট্ট বাক্সটা কোথা থেকে এল তার কাছে?

একটা ছোট্ট চৌকো বাক্স। ওপরে চকোলেট আঁকা বাক্সটা খুলতে গেল সে। অদ্ভুত

ধরনের সেলোফেনের সীল্ দেওয়া। ভিতরটা ভর্তি। কানের কাছে নেড়ে দেখল সে ভিতরে কি খড়খড় করে নড়ছে। কিন্তু—

অমলের খুব খারাপ লাগল। ছিঃ তার সহযাত্রীকে সে ভেবেছিল তাকে না বলে লোকটি তার চকোলেট চুরি করছে। আসলে তাই হয়। বিদেশ বিভুঁয়ে আগেই অবিশ্বাসটা আসে। আসলে সে ছেলেমানুষ বলে লোকটা তাকে একবাক্স চকোলেট প্রেজেণ্ট্ করেছিল। অমল সত্যিই চকোলেট্ বড় ভালোবাসে। একটা ছুরি হলে হ'ত অমল ভাবল। তাহলে এখুনিই এই ছোট বাক্সর চকোলেট তার শেষ হয়ে যেত। অমল খুব ক্লান্ত ছিল। চকোলেটের বাক্স খোলার চেষ্টা না করে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা তিনটে নাগাদ মামা মামির ডাকে উঠে পড়ল অমল। ঘুমিয়ে টুমিয়ে সতেজ। ওরা 'ব্লাউ' বা 'ব্লু' নদীর উৎস দেখতে যাবে। 'ব্লাউ টাফ্‌ফ্' সেই জায়গাটির নাম।

অমল তো সঙ্গে সঙ্গে তৈরি। সঙ্গে নিল তার ঝোলা। যদি গাড়ি থেকে নামা হয় পাতার নমুনা কুড়োবে। 'ব্লাউ টাফ্‌ফ্' যেতে পড়ে অদ্ভুত পাহাড়। তিনটি ছোট্ট ছোট্ট চূড়ার নাম তিনকুমারীর চূড়া। এই চূড়াগুলি নিয়ে রূপকথার গল্প আছে। রাস্তা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ দিয়ে। মামা ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর জায়গা দিয়ে। ব্ল্যাক ফরেস্টের খানিকটা অংশ দেখা গেল পথে। সত্যিই গাছের রং এত গাঢ় সবুজ যে দূর থেকে মনে হয় কালো। কালো কালো গাছের সারি সৈন্য দলের মত মাথা উঁচু করে আছে।

চন্দনমামা বললেন, একদা নেপোলিয়ন নাকি এই ব্ল্যাক-ফরেস্ট দেখে, সৈন্যের সারি দাঁড়িয়ে আছে ভেবেছিলেন। গাড়ি এবার 'অটোবানে' গিয়ে উঠল। 'অটোবান' হ'ল কেবল গাড়ি চলাচলের রাস্তা।

গাড়ি সর্বদাই মণিমামিমা চালাতেন। জার্মান মেয়ে। তাঁর যেমন ধীর স্থির মস্তিষ্ক, তেমনি কব্জির জোর। 'অটোবান' এক অদ্ভুত পথ। দ্রুত গাড়ি চালানোকে, আরো দ্রুত করার জন্য সারা জার্মানী জুড়ে এই অটোবান। অটোবান দিয়ে গাড়ি যায় কেবল একই দিকে। 'অটোবান' দিয়ে চলবার সময় মণিমামিমা কোন কথা বলেন না।

ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালানোর পরে ওরা এলো পথের পাশের একটি পান্থশালায়। অটোবান থেকে নেমে পান্থশালার চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল অমল। মণিমামিমা হাতমুখ ধুতে গেছেন। মামা নামিয়েছেন খাবার-দাবার। ছোট্ট একটি বাগানে কার্পেট পেতে বসা হ'ল। অমল তার ঝোলাটা গাড়িতে ফেলে এসেছিল। সে বলল, মণি-মামিমাকে আজ একটা নতুন ধরনের চকোলেট খাওয়াবো। মামা গাড়িটার চাবিটা দাও তো। অমল তার ঝোলা থেকে সেই চকোলেটের বাক্সটা বের করে ছুরি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। খানিকবাদে বাক্সটা খুলে যেতেই অমল অবাক। বাক্সের মধ্যে ঝলমল করছে কয়েকটি পাথর বসানো অলংকার ধরনের বস্তু। এগুলির মত

জিনিস অমল যেন কোথায় দেখেছে। ঠিক কোথায় তা সে তখনই মনে করতে পারল না। সে বুঝতে পারল পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য তার লেগে ওয়াগনের সহযাত্রী এই বাক্সটা তার ঝোলায় রেখেছিল। বাক্সটা বন্ধ করে হাতে নিয়ে সে ছুটে মামা মামির কাছেই যাচ্ছিল। হঠাৎ চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরল তিনচারটি লোক। তাদের মধ্যে তার সহযাত্রী আর সেই রুক্ষ মহিলাকে অমল চিনতে পারল। এক ঝটকায় বাক্সটা কেড়ে নিয়ে তারা ছুটল দাঁড়িয়ে থাকা 'কার' লটের দিকে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল একটা বড় বাদামী মার্সিডিজ-এ। অমল গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করবার আগেই গাড়িটা উঠে গেল অটোবানের উপর। বাগানে বসে চন্দনমামা আর মণিমামি হয়ত এই নিমেষে ঘটে যাওয়া ঘটনার খানিকটা দেখে থাকবে। দুজনে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুটিয়ে সরাই-এর মালিকানী-কে পুলিশ পেট্রলকে ফোন করতে বলে ছুটে চলল গাড়ির দিকে। এক মিনিটের মধ্যেই তাদের গাড়িও অটোবানে উঠে পড়ল। অটোবানে গাড়ি চালাবার সময় মণিমামিমা সব সময়ে রেডিও খুলে রাখে। কারণ রেডিও থেকে 'অটোবানের' অবস্থা বোঝা যায়। কোথাও জাম্ থাকলেই রেডিওতে জানিয়ে দেয়। দুপাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে গাড়ি যাচ্ছে। চন্দনমামা আর মণিমামিমাকে অমল গোড়া থেকে সব ঘটনা বলে যাচ্ছিল।

চন্দন মামা প্রশ্ন করলেন,—জুয়েলগুলো কেমন দেখতে বল্‌তো?

মণিমামিমা স্টীয়ারিং-এ চোখ রেখে বললেন,—আচ্ছা, জুয়েলগুলো ক্যাথিড্রাল জুয়েল নয় তো?

অমল প্রশ্ন করল মানে?

—আমাদের কোলন শহরের এক বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল থেকে বেশ কিছু প্রাচীন জুয়েলারী চুরি গেছে। ক্যাথিড্রাল সারানোর সময় ক্যাথিড্রলের একটি সুরক্ষিত ঘর থেকে লোকে সন্দেহ করে কয়েকজন মিস্ত্রী ওই ঐতিহাসিক জিনিসগুলো সরায়। কে জানে কাগজে কদিন ধরে বেরোচ্ছে সেই চোরদের নাকি হদিস শিগগিরই পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত অমলের মনে পড়ল অলংকারগুলো কেন তার এত চেনা চেনা লাগছিল। বার্লিনের একটি মিউজিয়ামে সে আর্চবিশপ পদের পোশাকের সঙ্গে এই ধরনের অলংকার দেখেছে। ক্রশ চিহ্ন দেওয়া সোনার উপর মণিমুক্তো বসানো।

চন্দনমামা প্রশ্ন করলেন— গাড়িটার নম্বর-টম্বর লক্ষ্য করেছিলি?

অমল বলল, না, তবে গাড়িটা হ'ল ব্রাউন মার্সিডিজ!

মণিমামিমা গাড়ির স্পীড্ বাড়ালেন। 'অটোবানে' গাড়িগুলো এমনিতেই স্পীডে চলে। কিন্তু আরো স্পীডে আরো, আরো স্পীড়ে যাওয়ার নেশা কেউই ছাড়তে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে টক্কর দিতে গিয়ে, ট্রাফিক নিয়ম না মানলেই অ্যাকসিডেন্ট্।

চন্দনমামা বললেন,—কি সাহস লোকগুলোর দিনদুপুরে এভাবে অমলের হাত থেকে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল! অমল যদি আগে ব্যাপারটা একটু জানিয়ে রাখত!

মণিমামিমা বলল, কেবল অমলের কেন? দোষ আমারও হয়েছে। আমরা যখন অমলকে উলম্ স্টেশন থেকে নিয়ে আসছিলাম, তখন ট্যাক্সি করে এক মহিলা সমানে আমাদের গাড়ির পিছন পিছন আসছিল। আমি সেই জন্য অমলকে বোধহয় একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম গাড়িতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো। আমরা আমাদের বাড়ির সামনে থামলাম, গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ আজ সকাল থেকেই ওরা আমাদের চোখে চোখে রেখেছে। 'অটোবানে' অত গাড়ির ভিড়ে আমরা আর লক্ষ্য করিনি ওরা আমাদের ফলো করছে কিনা?

অমল বলল, কিন্তু ওদের তো প্রায় সবাইকে আমার সামনে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধরে নিগে গেল। ওরা ছাড়া পেল কি করে?

চন্দনমামা বলল,—হয়তো প্রমাণাভাবে। কারণ আসল জিনিস তো তোর কাছে রয়েছে! অবশ্য পুলিশ অনেক সময় সন্দেহ করলেও ছেড়ে দেয়। তাদের সাদা পোশাকে নজরে রাখে।

হঠাৎ দেখা গেল সামনের দিকের দিগন্তপ্রসারী আকাশে হেলিকপটার উড়ছে। দুটো। তিনটে। একটা যেন অনেক দূরে নীচুতে নামল। মণিমামিমা গাড়ির রেডিওটা একটু জোর করে দিল। তারপর খানিকটা শুনে বলল, তিরিশ কিলোমিটার দূরে একটা অ্যাক্সিডেনট্ হয়েছে। জ্যাম্ হতে পারে। হেলিকপ্টারে করে বোধহয় আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।

চন্দনমামা বলল,—আহা কত বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে সবাই উইক এণ্ড কাটাতে যাচ্ছে। কাদের মাথায় বিপদ নেমে এল কে জানে?

অমল অবাক হয়ে ভাবতে লাগল অদ্ভুত ব্যবস্থা তো। অ্যাকসিডেন্ট্ হলে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু করা হয়ে যায়। তাদের পাশ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির সার চলে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে।

মণিমামিমা বলল, খুব বড় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। এত অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে।

চন্দনমামা বলল, যাক্ জ্যাম্ কেটে গেল। গাড়িটাড়ি প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করেছে!

অমল অবাক। সে প্রশ্ন করল,—এত অল্প সময়ের মধ্যে জ্যাম্ কেটে গেল। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা পরিষ্কার হয়ে গেল?

মণিমামিমা হেসে বললেন,—এরচেয়ে কি বেশি সময় লাগবে? এই তো যথেষ্ট!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছে গেল। পৌঁছে যেতেই অমল বলল,—মামিমা গাড়ি রাখো, রাখো। হুহু করে গাড়ি যাচ্ছে আটোবান দিয়ে।

মামিমা পুলিশ কারের লাইনে গাড়ি থামিয়ে রাখলেন। অটোবানের ধারের রেলিং ডিঙিয়ে ক্রেনে করে তুলে ওপাশে ফেলে রাখা হয়েছে একটা ভাঙা বাদামী মার্সিডিজ। মামা মামিমা নেমে পুলিশের সঙ্গে কথা বললেন। একটি ক্যারাভানের সঙ্গে ট্রাফিক রুল না মেনে চলা মার্সিডিজটির ধাক্কা লাগে। ক্যারাভানের সঙ্গে লাগানো একেবারে সামনের গাড়িতে চালক ছিলেন। ভ্যানটিতে সামান্য ধাক্কা লেগেছে। চালক আর যাত্রী·ও বাচ্চার কিছু হয়নি। কিন্তু মার্সিডিজটি উল্টে তুমড়ে মুচ্‌ড়ে যায়। ভিতরের পাঁচজন আরোহীর তিনজন নিহত। দুজন হাসপাতালে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় ভর্তি। এই·ক্রিমিনাল গ্যাংটিকে খোঁজা হচ্ছিল। এরা রেফিউজি হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয় নিয়ে অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। ক্যাথিড্রাল ভ্যালুয়েবল চুরির সঙ্গে এদের যোগ আছে কিনা তা অবশ্য এই সব পুলিশ ঠিক জানে না। তবে মোটর চুরির দায় তো আছেই। এই মার্সিডিজটাই একটা চোরাই মোটর।

অমলচন্দন মামাকে চকোলেটের বাক্সটার কথা মনে করিয়ে দিল। রাস্তার কোণে একটি ওভারকোট ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় মুখ থুবড়ে ছিল। একজন পুলিশ বলল,—হ্যাঁ, মার্সিডিজের যে ড্রাইভার তার গায়ে ওই কোটটি ছিল। কোটের পকেটে একটা ছোট চকোলেটের বাক্স আছে বটে। কোটটাও পুলিস কাস্টডিতে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা এনে খোলা হ'ল। বাক্স ভর্তি ক্যাথিড্রাল ভ্যাল্যুয়েবলস্‌!

পুলিশের কর্তা খুব খুশি। অমলকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

আবার গাড়ি চলল। 'অটোবান' থেকে এবার নামল গাড়ি। গ্রাম পথ দিয়ে চলল। মণিমামিমা বললেন আমরা যে গ্রাম দিয়ে যাচ্ছি, এটি প্রায় হাজার বছরের পুরোনো গ্রাম। বাড়িগুলি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কিন্তু খুব পুরোনো আমলের। এই গ্রামের শেষে এক পুরোনো শ্যাওলা পড়া গ্রামীণ চার্চের কাছে ব্লু নদীর উৎস। উৎসের পাশে একটি প্রাচীন কুটির। কাঠের কড়ি-বরগা দেওয়া। চূনকাম করা। যেমন রূপকথার গল্পে পাওয়া যায়। কুটিরটির পিছনে একটি জলচাকা। আজও চালায় উইণ্ডমিলকে।

কুটিরটি ঠিক সেই পুরোনো দিনের মত করে রাখা হয়েছে। এখানে চা কেক মেলে। মেলে নানান রঙীন কার্ড ও স্যুভেনির। ব্লু নদীর জল ক্রমাগত উঠে আসছে একটি বিশাল পুকুরের মত কুণ্ড থেকে। কুণ্ডের সামনে একটি সিমেন্টের থাক্ এমনভাবে করা হয়েছে যে সেই গাঢ় নীল জল—একেবারে ব্লু ব্ল্যাক আর ইণ্ডিগো দোয়াতের কালি জল-প্রপাতের মত নেমে আসছে থাক বেয়ে। তারপর বয়ে যাচ্ছে নদীর রূপ নিয়ে।

ব্লু বারেন গাঁয়ের ব্লুটাফ্‌কে যাতে ভালোভাবে দেখা যায় তাই চারিদিক দিয়ে যাবার জায়গা আছে। সেখানে কেবল চেস্টনাট গাছ আর চেস্টনাট গাছ। চারিদিক থেকে সেই নীলজল উঠতে থাকা নীল পাত্রটির উপর ঝুঁকে পড়েছে হলুদ, সোনালী, খয়েরী, ব্রঞ্জ ও কমলা ক্রিমসন পাতায় ভরা চেস্টনাট গাছ। কিছু কিছু ঝরা পাতা ভেসে যাচ্ছে নীল জলে। নীল সোনালীর সে কি আশ্চর্য শোভা। জল পড়ার মৃদু শব্দ, জলের তলায় নীল শ্যাওলার থোকা থোকা কাজ জায়গাটাকে শান্ত একটি মহিমায় ভরে দিয়েছে। একজন আধুনিক স্থপতি ব্লু টাফের এই সুন্দর চেহারা দিয়েছেন। এখানে আছে এক জলকন্যার রূপকথা। তাকে আটকে রেখেছিল এক দরিদ্র মাটির মানুষ। স্থপতি নিয়োজিত ভাস্করের তৈরি জলকন্যার শ্বেতপাথরের মূর্তিটি অপরূপ। নীলের মাঝখানে অমলিন শুভ্রতা নিয়ে আধোজাগা। অমলরা অনেকক্ষণ ব্লু টাফে রইল। এখানে খাওয়া-দাওয়া সারল। তারপর স্যুভেনিরের দোকান থেকে কিনল একটি রঙিন কার্ড। তাতে ব্লু বেরেনের ব্লু টাফের রঙিন ছবি।

ছবিটি মাকে দেখাবে সে, আর বলবে,—জানো মা এই নীলের চেয়েও আসল ব্লু টাফ্ আরো নীল। ব্লু টাফ্‌কে ছেড়ে আসার সময় অমলের কান্না পেল। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গাও আছে!

দুটো নম্বর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পুজোর ছুটি পড়ে গেল। কি মজা! হাফইয়ারলিতে মোটামুটি ভাল ফলই হয়েছে। অঙ্কে একশো পাওয়াই উচিত ছিল। দু নম্বর কাটা গেছে। বাবা বললেন,

'অপমান তোমার নয় অপমান আমার। আমি নিজে কোনও পরীক্ষায় একশোর কম পাইনি। আধটা নম্বরও কেটে নেবার সুযোগ কাউকে দিই নি। আমার ছেলে হয়ে তুমি দু দুটো নম্বর জলে ফেলে এলে। কতবার বলেছি, রিভাইস, অ্যাণ্ড রিভাইস, রিভাইস করবে। এক জায়গায় চুপ করে পাঁচ মিনিট বসতেই পার না ত কি হবে!'

টেবিলের তলায় যে উঁচু কাঠ থাকে সেই কাঠের ওপর পা রেখে আঙুলে আঙুলে প্যাঁচ খেলছিলুম। আঙুলে আঙুলে লড়াই। টেবিলে বসে থাকলে মানুষের ওপর দিকটাই কথা বলে হাত নেড়ে। কলম বাগিয়ে লেখে। নিচের দিকটার ত কিছুই করার থাকে না। বড়রা দেখেছি পা নাচান। পা নাচালে টেবিল নাচে। বড়দের নাচনে টেবিল নাচলে দোষের হয় না। বকুনি খেতে হয় না। ছোটরা নাচালে রক্ষে নেই। গম্ভীর মুখ বলে উঠবেন, সিলি, অসভ্য, জানোয়ার। আমি জানি বলেই পা নাচাইনি। দুপায়ের আঙুলে আঙুলে জড়াজড়ি করে লড়াই করাচ্ছিলুম। হঠাৎ পা স্লিপ করে মেঝেতে পড়ে গেল দুম করে। টেবিলটা কেঁপে উঠল!

বাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন, 'পাঁচটা মিনিট তোমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। সামান্য ব্যাপার। আকাশের চাঁদ ধরতে বলছি না, গরম জলে পা ডুবিয়ে বসতে বলছি না, সন্ন্যাসীদের মত পেরেকের বিছানায় শুতে বলছি না। বলেছি, গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু স্থির হয়ে বসতে শেখ, ছ্যাট ইজ ভদ্রতা। পড়াশোনা করার সময় একটু মনোযোগী হও, পরীক্ষার সময় তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যাই ভাবটা ছাড়। কে কার কথা শোনে? চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। হ্যাবিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার অফ ম্যান।'

কিছু দূরে ইজিচেয়ারে দাদু। মুখের সামনে দুপাশে ছড়ান স্টেটসম্যান কাগজ। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে কাগজের হাত পা বেরিয়েছে। ধুতি পরে চেয়ারে আধ-শোয়া। পায়ের ওপর পা? টুকটুক করে চটি নাচছে। মুখটা কাগজে ডুবড়ে আছে। পেছন থেকে দেখছি বলেই দাদুর মাথা দেখছি। আইনস্টাইনের মত এক মাথা সাদা ধবধবে চুল। চোখে নিকেল ফ্রেমের গোল চশমার পুরু কাঁচ। কাগজের আড়াল থেকে

দাদু বললেন, 'ছেলেটাকে তখন থেকে খুব দাবড়াচ্ছ দেখছি! ব্যাপারটা কি? খুব গুরুতর কিছু করে ফেলেছে না কি?'

বাবা বললেন, 'অঙ্কে প্রেসাস দুটো নম্বর নিজের ছটফটানির জন্যে খুইয়ে এল। একবার ভেবে দেখুন দু দুটো নম্বর।'

কাগজ কথা বলে উঠল—'কত পেয়েছে?'

'নাইনটি এইট, আটানব্বই।'

'বল কি? আটানব্বই। আমি একবার ষাট পেয়েছিলুম, আমার ফাদার, তুমি তাঁকে দেখনি, সারা গ্রামের লোককে ডেকে এনে পেটপুরে লুচি বোঁদে দই খাইয়েছিলেন। তাঁর ফাদার মানে আমার গ্র্যাণ্ডফাদার এক রাত যাত্রা দিয়েছিলেন, হাটতলায় বাজি পোড়ান হয়েছিল। আর তুমি আটানব্বই পাওয়া ছেলেকে গালাগাল দিচ্ছ!'

'আপনি ছিলেন আর্টসের ছাত্র। ইংরাজীতে, ইতিহাসে, বাংলায়, সংস্কৃতে লেটার মার্কস পেয়েছিলেন। অঙ্কে ষাট ত খুব ভাল নম্বর।'

'আরে দ্যুৎ, সে ত ওই একবারই পেয়েছিলুম। তার আগে ত ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ। চল্লিশ কখনও পেরোতে দিই নি। ষাটও পেলুম অঙ্ককেও বিদায় জানালুম! ষাট দিয়ে শেষ। কলেজে ঢুকেই কালিদাস, শেক্সপীয়ার যত মনের মতন মানুষ পেয়ে গেলুম। মোক্ষমূলারকে দেখে দাড়ি রাখতে শিখলুম। সেই দাড়িই বাড়তে বাড়তে আজ বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে।'

দাদু আবার কাগজে মুখে জড়াজড়ি করে সম্পাদকীয়তে ডুবে গেলেন। এখন বেশ কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না।

বাবা এতক্ষণ দাদুকে নিয়ে পড়েছিলেন। আবার আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন, 'ধৈর্যই সাফল্যের মূলে। তোমার অঙ্কে মাথা খুব খারাপ নয়। অভাব হল ধৈর্যের। ধৈর্য বাড়াতে হবে। কিন্তু ধৈর্য কিসে বাড়বে!' ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন বাবা। আমারও জানা নেই, ধৈর্য কিসে বাড়ে।

দাদুর সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। বাবা দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন,

'ধৈর্য কিসে বাড়ে আপনার জানা আছে বাবা?'

দাদু কাগজে ডুবে আছেন। মনে হয় সেই সম্পাদকীয়তে। কাগজে নাকি ওই একটাই পাতা। ওই পাতাটা না পড়লে কিছুই জানা যায় না। কাগজ দাদুর গলায় কথা বলে উঠলেন,

'কিসের ধৈর্য?'

'মানুষের ধৈর্য।'

'দুঃখ কষ্টে ধৈর্য বাড়ে বলে শুনেছি। আর ওই ত কবিতাতেই আছে,

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ, বাঁধ বুক, শত দুঃখ, শত জ্বালা আসিবে আসুক।'

দাদু কথাকটা কোনও রকমে বলেই চেয়ারে খচর-মচর খচর-মচর করে কাগজ টাগজ সমেত আর একপাশে কাত হয়ে গেলেন। কাগজ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। বাবা আবার ব্যস্ত আমার দুটো নম্বর কম পাওয়া নিয়ে।

'কি করে ওর দুঃখ কষ্ট হবে!'

'দিলেই হবে।'

মুখ দেখে মনে হল বাবা খুব বিপদে পড়েছেন। টাকা দিলে টাকা হয়। জ্ঞান দিলে জ্ঞান হয়। কি দিলে দুঃখ হয়! বাবা কি করে জানবেন। আমি জানি আমার কিসে দুঃখ। বলব না কি সাহস করে! না বাবা, বললে আমারই বিপদ।

আমাকে পড়তে বসালে ভীষণ দুঃখ হয়। বিকেলের খেলা বন্ধ হলে খুব কষ্ট হয়। রোজ রাতে কোঁত কোঁত করে এক গেলাস দুধ খাওয়া ভীষণ দুঃখের। মা আমাকে একা রেখে কোথাও বেড়াতে গেলে ভীষণ দুঃখের। পুজোর সময় নতুন জামা-কাপড় না

হলে ভীষণ দুঃখের। রাগ করে আমার সঙ্গে কেউ কথা বন্ধ করে দিলে ভীষণ দুঃখের। সকালে মেঘলা থাকলে ভীষণ দুঃখের। আমার বই নিয়ে নিলে ছিঁড়ে দিলে, দাগ কেটে দিলে খুব দুঃখের। গাছে ঘুড়ি আটকে গেলে খুব দুঃখের। আরও অনেক অনেক দুঃখ পাবার ব্যাপার আছে। আর কষ্ট!

কত রকমের কষ্ট আছে। দাঁতের যন্ত্রণা। প্রায়ই হয়। মা বলেন হর্তুকী ভরে রাখ। পেয়রা পাতা চিবো। মাঝে মাঝে রাতের দিকে যখন ভীষণ বাড়ে, বাবা অফিস থেকে এসে তুলোয় লবঙ্গর তেল লাগিয়ে দাঁতের ফুটোয় চেপে ধরে যখন রাগ রাগ গলায় বলেন, বাঙালী দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। সারা জীবন খেতে হলে দুবেলা দাঁত মাজতে হয়, এই সামান্য জ্ঞানটা বাঙালীর ছেলের হল না, তখন কষ্টের ওপর আরও কষ্ট হয়। সায়েবদের ছেলেদের মত নাকি ছেলে হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লেখাপড়ায় ভাল, দুবেলা দাঁত মাজে। রাতে শোবার আগে দাঁত মাজবেই। ভূমিকম্প হচ্ছে বাড়ি ভেঙে পড়বে, হিটলারের উড়ো বোম ভি-টু এসে লণ্ডন ছারখার করে দিচ্ছে। নিয়ম ইজ নিয়ম। সায়েব বাচ্চা ওয়াশ বেসিনে দাঁড়িয়ে রাতের দাঁত মাজছে। চন্দ্র সূর্য ঘুরে যাবে তবু সায়েবের নিয়ম পালটাবে না। আমার চেয়ে কেউ ভাল, এ কথা শুনলেও কত কষ্ট হয়! তবে আনন্দ হয়, দাদু যখন বাবার কথা না মেনে বলেন,

'তুমি আর সায়েবদের গুনগান কোর না। সায়েবদের মত খারাপ দাঁত পৃথিবীতে তুমি খুব কম জন্তুরই পাবে। যৌবনেই বত্রিশ পাটি ফেলে দিয়ে ফোকলা মানিক।'

দাঁতের কষ্ট ছাড়াও আরও কত কষ্ট আছে। খুব তেলেভাজা খেলে পেট ব্যথা করে। খেলার মাঠে তলপেটে বল লেগে ভীষণ কষ্ট হয়। চোখে বালি পড়লে কষ্ট হয়। স্কুলে হেড স্যার যখন মাথায় ডাস্টার পেটা করেন তখন খুব কষ্ট হয়। বাবা যখন বেড়াতে বের করে মাইলের পর মাইল হাঁটান তখন খুব কষ্ট হয়। কিছু কষ্ট আপনা থেকেই হয়। কিছু কষ্ট দেওয়া হয়। আমাকে দুঃখ কষ্ট দেবার জন্যে বাবাকে ভীষণ চিন্তিত দেখলাম।

বাবা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে যখন দেখলেন উপায় বেরোচ্ছে না, তখন আবার দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন', 'কি করে ওকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া যাবে।'

দাদু এবার কাগজটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। চশমাটা চোখ থেকে খুলে পাশের টেবিলে রাখলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বাবার দিকে তাকালেন।

'তোমার সমস্যাটা কি বল ত! এতক্ষণ কাগজ পড়ছিলুম, খেয়াল করিনি।'

'আপনি বললেন দুঃখে কষ্টে থাকলে মানুষের ধৈর্য বাড়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ত, ভুল কি বলেছি! খাঁটি কথা!'

'না না, ভুল বলবেন কেন? আমি সেকথা একবারও বলিনি। আমি বলছি...।'

'তুমি যাই বল, দুঃখে না থাকলে মানুষ বড় হয় না। আর বড় সেই হয় যার ধৈর্য আছে। তার মানে দুঃখে ধৈর্য বাড়ে। আমার যা বিশ্বাস, আমি যা দেখেছি তাই

বললুম। তোমার যদি অন্য কোন রকম ধারণা থাকে, থাক। আমি আমার ধারণা নিয়ে বসে রইলুম গ্যাঁট হয়ে। নড়বও না চড়বও না।'

আমার দাদুর বয়স হয়েছে ত। মা বলেন বয়স হলে মানুষ ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সত্যিই ভাই। দাদু এক ভাবছেন, বাবা এক বলছেন। দাদু যা বলছেন বাবাও তাই বলছেন। কিন্তু দাদু ভাবছেন, বাবা অন্যরকম বলছেন! বেশ মজা কিন্তু।

দাদুর সঙ্গে বাবার যখন এই রকম ভুল বোঝাবুঝি হতে থাকে, বাবা তখন চুপ করে যান। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলে দাদুর উত্তেজনা কমে আসে। সেই সময় আবার নতুন করে বেশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে বললে দাদু আবার ঠিক রাস্তায় চলতে থাকেন।

পাঁচ মিনিট দুজনেই চুপচাপ। কারুর মুখেই কথা নেই। খবরের কাগজ মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিঠের ওপর জাহাজের ছবি। টেবিলের তলায় আমার চটি জোড়া। ডানটার সঙ্গে বাঁটার লড়ালড়ি শুরু করিয়ে দিয়েছি। একটা পাটি মনে করছি আমি আর একটা পাটি আমাদের ক্লাসের হোঁতকা মদন। মদনাকে আজ হারাবই। খুব কসরত চলেছে পায়ে পায়ে। ভুলেই গেছি সামনে বাবা। জানালার পাশে ইজি চেয়ারে দাদু। এইবার মদনা! মুখ থুবড়ে ধপাস। খুব জোর শব্দ হয়েছে। নিজেই চমকে উঠেছি। বাবা ত উঠবেনই।

'কি করলে? তুমি দেখছি টেবিলের নিচের কাঠটা না ভেঙে ছাড়বে না। ভাঙলে নাকি!'

'আজ্ঞে না? কাঠ নয় চটি।'

'সহ্য হচ্ছে না বুঝি পায়ে অসুবিধে হলে অসভ্যতা না করে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এস। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।'

দাদু সুখ শব্দটাই কেবল শুনতে পেয়েছেন। তিনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ইয়েস সুখের চেয়ে দুঃখ ভাল। সুখে মানুষ অলস হয়ে যায়। নানা রকম পাপ এসে জড়িয়ে ধরে। মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে।'

'দুঃখ কি ভাবে আসে?'

'দুঃখ আসে সুখের পথ ধরে।'

'সে আবার কি?

'যে আকাশে রোদ সেই আকাশেই বৃষ্টি। এই আমার জীবনটাই দেখনা। জন্মে ছিলুম বড় পরিবারে। বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, দাদা, দিদা জুড়িগাড়ি, ল্যাণ্ডো, জন্মদিন, বাজি বাজনা। সব একে একে চলে গেল। এসে পড়লুম কলকাতার মেসে। ছেলেপড়াই আর পড়ি। ভুট্টা খাই। কলকাতার কলের জল। কেউ কোথাও নেই। আমি আর আমার জীবন। কত দুঃখ। সুখ থেকে দুঃখে। সেই দুঃখের সঙ্গে লড়তে লড়তে, জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে আবার সব ফিরে এল। যারা চলে

গেলেন তাঁরা আর এলেন না। সুখ এল অন্যভাবে, অন্য মূর্তি ধরে। সুখের পথে দুঃখ এল, দুঃখের পথে সুখ। মাঝখান থেকে কি হল আমার চরিত্রটা তৈরি হয়ে গেল। এখন আমার কাছে সুখও যা দুঃখও তাই। দুইই সমান।'

'তা হলে এখন আমার মৃত্যুই ভাল।'

'সে আবার কি?' দাদু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সারা ঘরে বার কতক পায়চারি করে এলেন। দুজনের কথা শুনে আমি হতভম্ভ হয়ে বসে আছি। আমার চটি দুপাটির যেটার নাম মদনা সেটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মদনা ফ্ল্যাট অন দি গ্রাউণ্ড। দাদু হঠাৎ বাবার সামনে থেমে পড়ে বললেন,

'তুমি দুটো মাত্র নম্বরের জন্যে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছ হে।'

'বলেন কি, দুটো নম্বরের কোনও ভ্যালু নেই?'

'পরের পরীক্ষায় ঠিক করে নেবে। ফুল মার্কস নিয়ে আসবে। ছেলে ত ভাল। মাথা আছে, একথাও তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।'

'মাথা আছে বলেই ত আমার এত দুঃখ। মাথা না থাকলে, গবেট হলে আমার কিছু বলার ছিলনা। আসলে ওর ধৈর্য নেই। অসম্ভব ছটফটে। একজায়গায় চুপ করে ভদ্রভাবে কিছুক্ষণ বসতে পারে না।'

'কেন? এইতো বেশ বসে আছে চুপ করে তখন থেকে।'

'চুপ করে!' বাবা একটু দুঃখের হাসি হাসলেন। 'টেবিলের তলায় দুটো ঠ্যাং নিয়ে তখন থেকে ঝটাপটি চলেছে। সব সময়েই মনে খেলা চলেছে। মনটা খেলার মাঠ হয়ে গেলে অঙ্ক আসবে কোথা থেকে! অঙ্ক ত আর ফুটবল নয়।

দাদু নিচু হয়ে টেবিলের তলাটা দেখে নিয়ে বললেন,

'দুটো পাই অবশ্য এখন স্থির হয়ে আছে। তবে এক পাটি চটি উলটে আছে। তার মানে ফ্রন্ট এখন শান্ত হলেও আগে লড়াই চলছিল।'

মনে মনে বললুম, 'দাদু ওটা মদনা। মদনাকে উলটে রেখেছি। পরশুদিন ক্লাসে আমাকে ঠেঙিয়েছিল। আজ তার প্রতিশোধ নিয়েছি।'

বাবা বললেন, টেমপরারি সিস ফায়ার। আবার এখুনি শুরু হল বলে।'

'চটি জিনিসটার তেমন গাম্ভীর্য নেই হে। বড় চপল, বড়ই টটুল। চপল পায়ে আরও, চপল। ওকে তোমরা বুটজুতো আর মোজা পরাও। তাহলে ছটফটানি যদি একটু কমে! দাদু আমার চোখে চোখ রেখে হাসলেন। বুঝলুম বলতে চাইছেন, 'আজ কেমন হচ্ছে হে।'

ঘরে এতক্ষণ আমি, বাবা আর দাদু ছিলুম। হঠাৎ মা এসে ঢুকলেন। হাতে একটা ভাঙা ফুলদানি। এই সেরেছে। একেই বোধ হয় বাবা বলেন, গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। দুপুরবেলা বাবার ঘরের টেবিলে বসে কাচের উপর গোটাকতক পয়সা রেখে

ক্যারাম খেলছিলুম। ট্যানজেণ্ট মারটা ভাল করে শিখতে হবে। এক মারে চারটে ঘুটি ক্যারামবোর্ডের চার পকেটে যতদিন ফেলতে না শিখছি ততদিন শান্তি নেই। সেই নেট প্র্যাকটিসের সময় একটা আধুলি ছিটকে গিয়ে ফিনফিনে ফুলদানিতে লেগেছিল। জলও ছিল না, ফুলও ছিল না। ফুলদানিটা ফ্যাঁস করে ফেঁসে গেল। কি ফুলদানিরে বাবা, আধুলির ধাক্কা সহ্য করতে পারে না। সেদিন বাথরুমের দেয়ালে ঘষা লেগে গা ছড়ে গেল, মা বললে, তোর কি গারে! ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাস! এমন ফুলদানি রাখা কেন যা আধুলির ঘায়ে টসকে যায়। ভাঙা ফুলদানিটা সাবধানে ঘুরিয়ে রেখে এসেছিলুম।

মা ফুলদানিটা বাবাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

'এটা কে ভাঙল?'

বাবা চমকে উঠেছেন। বিলেত থেকে আনা জিনিস। ভেঙে ফেলে আমিও মনে মনে দুঃখিত। তবে সাহস করে বলতে পারব না, আমি ভেঙেছি। বাবা ভাল করে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন,

'একি সর্বনাশ। কে ভাঙলে, এমন সুন্দর জিনিসটা। এতো মনে হচ্ছে ঠুকরে ভাঙা। আমার টেবিলে পাখিটাখি এসে বসে নাকি? তুমি কি টিয়া পুষেছ!'

'কই না ত!'

'তা হলে আর কি হতে পারে। উল বোনার কাঁটা। তোমার বোনার কাঁটা কি আমার টেবিলে ছড়িয়ে রেখেছ!'

'এখন আবার উল কি! সে ত শীতের মুখোমুখি সময়ে। এখনও অনেক দেরি।'

নিজেকে ভীষণ কাপুরুষ মনে হচ্ছে। বাবার প্রিয় ফুলদানি ভেঙে ঘাপটি মেরে বসে আছি। মা খুঁজছে অপরাধীকে। বাবা শার্লক হোমসের মত একের পর এক বলে যাচ্ছেন. পাখি, উলের কাঁটা। পাখিকে সন্দেহ করছেন, মাকে সন্দেহ করেছেন। আমাকে কিন্তু করেন নি। না করলেও বলে দেওয়াই ভাল। অবশ্য বাবার ডিটেকটিভ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি ভেঙেছ? আমি মিথ্যে বলে অস্বীকার করতে পারি। মিথ্যে কথা দু একবার বলে দেখেছি। খুব খারাপ লাগে। ছোট মনে হয়। কষ্ট হয় মনে। অপরাধ স্বীকার করলে বকুনি হবে। বকুনি খেলে কষ্ট হবে। দাদু বললেন কষ্ট পেলে মানুষ বড় হয়।

গম্ভীর মুখে বললুম, 'আমি ভেঙে ফেলেছি।'

মা বোধহয় চিৎকার করতে চাইছিল। মা যেমন করে। একটু কিছু হলেই চিৎকার, হইহই। কি করলি। কেন করলি। অসভ্য ছেলে। বাবা মাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

'তুমি ভাঙলে? কেন ভাঙাল?'

আমি মাথা নিচু করে বললুম, 'খেলতে খেলতে। ইচ্ছে করে ভাঙিনি।'

'কি খেলা ? ঘরে বল খেলছিলে, না গুলি, না বন্দুক ছুঁড়ে যেভাবে বেলুন ফাটায় সেইভাবে ফুলদানিতে টিপ প্র্যাকটিস করছিলে !'

'না, টেবিলের কাঁচে সিকি, আধুলি, দশপয়সা, পাঁচপয়সা ছড়িয়ে একটা আধুলিকে স্ট্রাইকার করে ক্যারাম খেলছিলুম। হঠাৎ আধুলিটা ছিটকে গিয়ে ফুলদানিতে লাগল আর পুট করে ফুটো হয়ে গেল।'

বাবা দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছেন ! সেই ছটফটানি। সেই ধৈর্যের অভাব। নিজের ক্ষতি, সংসারের ক্ষতি, দেশের দশের ক্ষতি।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়েদের শুনেছি খুব ধৈর্য। ধৈর্য কি করে হয় বলতে পার ?'

মা বললেন, 'রেশানের চাল থেকে কাঁকর বাছলে আর বসে বসে বেলকুঁড়ির গোড়ের মালা গাঁথলে।'

দাদু যোগ করলেন, 'মশারির ভেতর মশা মারার চেষ্টা করলে আর উকুন বাছলে। পাকা চুল তুললেও হতে পারে। অবশ্য লোভ দেখাতে হবে, পয়সায় একটা পাকা চুল।

আমাদের হরিদা কখন ঘরে এসেছে আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। কাঁচাপাকা চুল। কাঁধে ঝাড়ন। হরিদা বললে, 'মাছ ধরলেও খুব ধৈর্য বাড়ে। সবচেয়ে বেশি বাড়ে। সারাদিন পুকুরপাড়ে ফাতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কেমন বসে থাকে দেখেন নি। যেন এক ঠ্যাঙে বক দাঁড়িয়ে আছে মাছের আশায়।' কথা কটা বলেই হরিদা টেবিল থেকে কাপ ডিশ তুলে নিয়ে আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

বাবা নিজের হাঁটুতে দু'বার চাপড় মেরে বললেন, 'ঠিক হ্যায়। ওকে আমি প্রতি রবিবার মাছ ধরতে নিয়ে যাব, সিধু জ্যাঠার পুকুরে। হরি ঠিকই বলেছে। হি ইজ এ জিনিয়াস।'

মা বললেন, 'চাল বাছাটাই ধরুক না। চোখে ভাল দেখতে পাই না। ভীষণ কাঁকর। তোমার বাবার দাঁতে লাগলে বিরক্ত হও। হরিও আজকাল সময় পায় না। বাড়ির বাইরেও যেতে হচ্ছে না। দাওয়ায় বসে বসে রোজ সের দুয়েক চাল বাছলেই ধৈর্য বেড়ে যাবে।'

দাদু বললেন, 'ওর চেয়ে নরম, লাভলি আর একটা কাজও তোমরা বললে। রোজ ভোরে উষার আলোতে ও আমার জন্যে জুঁইফুলের মালা গাঁথুক না। দেবতার কাজ। মন পবিত্র হবে। স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

বাবা বললেন ভেবে দেখি। আমি মুক্তি পেলুম তখনকার মত। দরজার বাইরে একটা কাগজের গোল্লা পড়েছিল। সেটাকে ডানপা, বাঁপা, বাঁপা, ডানপা করতে করতে রান্নাঘরের দরজাটাকে গোল পোস্ট ভেবে এক শট। সামনেই দুধের ডেকচি। কাগজের গোল্লা সোজা সেই দুধপুকুরে। পালাই বাবা।

গোবর-গ্যাস, সৌরশক্তি ও চাঁদু

আশাপূর্ণা দেবী

ফী বছর গরমের ছুটিতে চাঁদু মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। কখনো মার সঙ্গে, কখনো একাই। মামার বাড়ি যার দার্জিলিং হেন জায়গায়, গরমের ছুটিতে সে আর কোথায় যাবে?

কিন্তু এবারে ছোটপিসি আগে থেকে একেবারে ঝুলে পড়েছে, তার শ্বশুরবাড়ির দেশে যেতে হবে। কারণ তার ভাশুর এবারে একটা আমবাগান কিনেছেন। যদিও আমের প্রতি চাঁদুর বিশেষ কিছু আকর্ষণ নেই, তবু ছোটপিসির ঝুলোঝুলিটা এড়ানো শক্ত হলো।

ছুটি শুরু হবার পরদিনই চাঁদু পিসির বাড়ি নলতাপুরে এসে হাজির হল। সাঁইথিয়া পর্যন্ত নিজেই এসেছিল, সেখান থেকে ছোটপিসে সাইকেল রিকশা নিয়ে হাজির ছিল, নিয়ে গেল আরো তিনমাইল পার করে। পিসির বাড়িতে চেনার মধ্যে পিসি পিসে আর পিসির ছেলে হাঁদু। দু'জনে নাকি একই দিনে জন্মেছিল, আর একই বাড়িতে। তাই ছন্দমিলিয়ে নাম রাখা!

তা' প্রকৃতিতেও দু'জনে যথেষ্ট মিল।

হাঁদু যখন মামার বাড়ি, মানে চাঁদুদের বাড়ি যায়, তখন চাঁদুর ঠাকুমা ওদের 'মানিক জোড়' বলে ডাকেন। পিসি অবশ্য বলে 'জগাইমাধাই'। আর বাবা বলে, হরি-হর।

কিন্তু সে সব তো চাঁদুদের কলকাতার বাড়ির ব্যাপার। যেখানে চাঁদু একাই একশো। হাঁদু গিয়ে জুটলে দুশো কুড়ি। বাড়তি 'কুড়ি'টা হাঁদু বাবদ। উৎকট বুদ্ধিতে হাঁদু চাঁদুর উপরে যায়।

সে যাক এখানে চাঁদুকে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতে হবে। মা পইপই করে বলে দিয়েছে, ক'টা দিন একটু সামলে থেকো বাবা, নিজমূর্তি ধোরোনা। সেই নির্দেশ জপ করতে করতে চাঁদুর এখানে আসা। এসেছে গতকাল সন্ধ্যায়, পিসির বাড়িতে আর কে আছে-টাছে বিশেষ দেখেনি। হাঁদুকে আর চাঁদুকে সাতসকালে খাইয়ে দিয়ে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিয়েছিল পিসি।

ঘুম ভেঙে গেলও খুব ভোরে। যাবেই তো, একটানা কত ঘণ্টা ঘুমোতে পারে মানুষ? অথচ সারা বাড়ি এখনো চুপচাপ সুনসান। চাঁদু তাই শান্তভাবে ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে, দালান থেকে সিঁড়ির দরজার খিল খুলে নীচে নেমে এসে, নীচের

দালানের খিল খুলে উঠোনে নেমে একটু থমকে দাঁড়াল। উঠোনে ঘেরা পাঁচিলের গায়ে বাইরে বেরিয়ে পড়বার যে দরজাটা, তাতে তালাবন্ধ।

তাইতো! এখন কী করা যায়?

চুপ করে বসে থেকে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। হাঁদু উঠে পড়ার আগে ওদের পাড়াটা দেখে নিতে পারলে মন্দ কী?

ওই পাঁচিলটা আর এমন কি উঁচু?

চাঁদুর কাছে কিছুই না। বল খেলতে খেলতে পাশের সুশোভনবাবুদের বাড়ির মধ্যে বল ঢুকে গেলে, ওর থেকে দেড়া উঁচু পাঁচিল পার হয়ে থাকে চাঁদু। তবে মায়ের উপদেশ ভুললে চলবে না! চাঁদু তাই আস্তে সাবধানে শান্তশিষ্টভাবে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে বাইরে এসে পড়ল।

আঃ গরমের ভোরের বাতাসটা কী চমৎকার! কলকাতায় ঠিক এরকম না। উঃ। বাড়িটা কী বিরাট! চাঁদু সবটা প্রদক্ষিণ করে দেখবে ঠিক করে পিছন দিকে এসে দেখল, টানা লম্বা বিরাট একটা ঘর বিরাজ করছে, যার দেওয়ালটা এই পুরনো বনেদী বাড়িটার সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছে না। স্রেফ ইট বারকরা, অথচ নতুন ইটে তৈরি! বেশ বোঝা যাচ্ছে সম্প্রতি তৈরি!

কিন্তু একে কি ঘর বলা চলে?

ঘরের কি শুধুই চারদিকে দেওয়াল থাকে? মাথায় ছাত থাকে না? দেওয়ালে জানালা দরজা থাকে না? ঠিক যেন একটা বিশাল উঁচু চৌবাচ্চা! বার বার ঘরটাকে প্রদক্ষিণ করে হঠাৎ বাড়ির দিকের দেওয়ালে একটা নীচু ছোট্ট দরজা দেখতে পেল চাঁদু। এত ছোট যে, কোনমতে একটা মানুষ মাথা নীচু করে গলে যেতে পারে।...খুব চাপা-ভাবে বন্ধ রয়েছে দরজাটা। চাঁদু একটু টেনে দেখতে গেল, পারল না। অথচ তালা চাবি নেই কোথাও। তার মনে হয় ভিতরে কেউ আছে, নয় অটোমেটিক কল। টেনে বন্ধ করে দিলেই চাবি পড়ে যায়। চাঁদুদের কলকাতার বাড়িতে আছে এরকম।...সেটাই সম্ভব, তা নইলে ওই মাথা খোলা চৌবাচ্চার মধ্যে আবার রাত্রে থাকতে যাবে কে?

কিন্তু কী এটা তবে?

গরুর ঘর কি?

তা' হয়তো হতে পারে। ছোটপিসির ওই অসুর না কে, যিনি আমবাগান কিনেছেন, তিনি হয়তো অনেক অনেক গরুও পুষেছেন। তাই সম্ভব।...হুঁ! তাই।... দরজাটার কাছে ঘেঁষটে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেন গোবর গোবর গন্ধ পেল চাঁদু।

আশ্চর্য! গরু পোষা মানেই তো দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা! দুধ কি একটা খাবার জিনিস? যাকগে, চাঁদু তো আর খাচ্ছে না তা।

'ঘরটা' সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে চাঁদু আর একটু এদিক ওদিক করে আবার বাড়ির মধ্যে চলে আসবার জন্যে ফিরে এসে পাঁচিলের মাথায় হাত দু'খানা চাপিয়েছে, দেখল পাশেই তালাবন্ধ দরজাটা কড়াং করে খুলে গেল, আর কে একজন লোক 'কে ? কে ওখানে ? চোর চোর !' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

চাঁদু তাড়াতাড়ি 'ধুপ' করে নেমে পড়ে, বেশ অপ্রতিভভাবে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এসে বলে এই যে দরজাটা খোলা হয়েছে !

যাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি যে পিসের নিকট কেউ, তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় একই ধরনের চেহারা, শুধু বয়েসটা কিছু বেশী !

ভদ্রলোকের পরনে যে পোশাকটি, সেটা ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের বয়স্ক গেরস্থ ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়। এখানে আবার কে এ বয়েসের লোক বাড়িতে হাফ্ প্যান্ট পরে বেড়ায় ? হাফ্‌প্যান্টের উপর একটা ফতুয়া। ফতুয়ার বোতাম খোলা। তার ফাঁক থেকে বুকের জঙ্গলের মত লোমের গাদা, আর মোটা পৈতের গোছাটা 'দ্রষ্টব্যে'র মত দৃশ্যমান।

ভদ্রলোক একবার চাঁদুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, তুমি হাঁদুর মামাতো ভাই না ?

হুঁ !

কাল এসেছো ?

হুঁ !

তা' তুমি হঠাৎ পাঁচিল টপকাতে গেলে কেন ?

চাঁদু দেখল লজ্জা পাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়, তাতে সত্যিই চোর চোর ভাব এসে যায়। তাই বেশ জোরালো গলাতেই বলল, তা দরজা তালা বন্ধ থাকলে কী করব ? 'মর্নিংওয়াক' করা আমার অভ্যেস !

ওঃ ! তা' কাউকে ডাকলেই পারতে দোর খুলে দিতে।

কাকে ডাকতে যাব ? সবাই তো ঘুমোচ্ছে তখন।

আমি রাত চারটেয় উঠি বুঝলে ?

তা' কি জানি। কই আপনাকে তো দেখলাম না কোথাও।

ও সময় আমি ছাদে থাকি।…ভদ্রলোক আত্মস্থ গলায় বলেন মর্নিংওয়াক করতে ছাদই হচ্ছে বেস্ট। এই যে পাঁচিল টপকাতে গেলে, ধর যদি পড়ে যেতে ? পিসির বাড়ি বেড়াতে এসে হাত পা হারিয়ে যাওয়া কি বেশ ভালো ব্যাপার হতো ?

চাঁদু পাঁচিলটার দিকে অগ্রাহ্যের মত তাকিয়ে বলল, ওইটুকু পাঁচিল।

ভদ্রলোক তাঁর টাক টাক মাথাটি নেড়ে বললেন, বুঝেছি। হাঁদুর কার্বন কপি !

চাঁদু জোর গলায় প্রতিবাদ করল, মোটেই না। হাঁদুই আমার কার্বন কপি !

শাবাশ ! গুড ! এই তো চাই। বেশ বেশ।

চাঁদু কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল।

দেখল একটা রোগা পট্‌কা কালো কালো একটুকরো গামছামাত্র পরা ছেলে ইয়া বড় একটা বালতি করে কী একটা জিনিস নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এল।···সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচ্ছিরি গন্ধে চারদিক গুলিয়ে উঠল যেন।
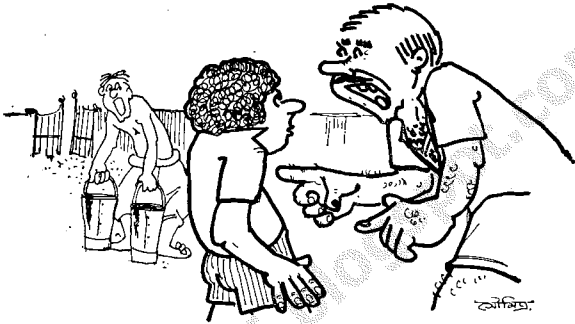
জিনিসটার ভারে ছেলেটা প্রায় বেঁকে গেছে। কী ও?··· ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল চাঁদুর। শুনেছে পাড়াগাঁয়ে 'খাটা ইয়ে' থাকে। শুনেছে কেন, পাঠ্যপুস্তকে পড়েওছে।··· সেই সব ব্যাপার নয় তো? ছেলেটা জমাদারদের ছেলে নয় তো?···কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলো যে?

যাক বাঁচা গেল।

ছেলেটা দুম্ করে বালতিটা নামিয়ে দিয়ে বলল, এই ন্যান দাদু আপনার গোবর।··· মা বলেছে এটা পাঁচদিনের পচা। বৈকেলে মা সাতদিনেরটা নে' আসবে।···মা টাকাটা চেয়েছে।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, টাকাটা চেয়েছে? কেন? চাইতে হবে কেন? চাইতে হবে কেন? আমি দেব না?

ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট দিয়ে বললেন, তো এখানে নামালি কেন? যেখানে রাখবার রেখে আস্‌ব চল।

ছেলেটা বেজার গলায় বলল, টাইম নেই দাদু!

অ্যাঁ। বলিস কীরে রাখলা? কালে কালে কত শুনব? চামচিকে গুবরে পোকারও টাইম নেই। যত্তোসব—নে চল চল, আর পঁচিশটা পয়সা দেব।

ফতুয়ার অন্য পকেট থেকে একটা চাবি বার করে ছেলেটাকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু চাঁদু কি আর না দেখে ছাড়বে কোনদিকে গেলেন। নির্ঘাত সেই মাথাখোলা

ঘরটায়। পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখল ঠিক তাই। ওইদিকেই ঘুরে সেই নতুন দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওঃ! তাহলে গরু নয়, অন্য ব্যাপার। বিশেষ কোনো বাগান-টাগানের ব্যাপার। তার জন্যে 'সার' গেল। কিসের বাগান হতে পারে? কিন্তু অতো সার। রাখাল আশ্বাস দিয়েছে, মা বৈকেলে আরো আনবে।

ভদ্রলোক ফিরে এসেই প্রায় রেগে উঠে বললেন, এ কী! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো যে!

এই এমনি! আচ্ছা। (কী বলবে? জ্যাঠামশাই? হাঁদুর যখন তাই, যা থাকে কপালে।) জ্যাঠামশাই এতো কাউডাং কী হবে?

অ্যাঁ কী বললে? এতো কী?

এতো কাউডাং!

কাউডাং! ও হো হো!

ভদ্রলোক আকাশ ফাটানো হাসি হেসে বলেন, গোবর! গোবরের কথা বলছ?··· হা হা হা!

হঠাৎ হাসি থামিয়ে কড়া গলায় বলে ওঠেন, তাতে তোমার কী দরকার হে ডেঁপো ছেলে? তোমার কী দরকার? যাও। ভেতরে চলে যাও। পিসির কাছে চর্বচোষ্য খাওগে, গালগল্প করগে। ব্যস!

ব্যাপারটা যদি বা 'যাহোক কিছু' মনে হচ্ছিল, এখন গুরুত্ব নিল। বেশ রহস্যজনক, রহস্যজনক।

হাঁদুর সঙ্গে 'ব্রেকফাস্টে' বসে পিসির দিকে তাকিয়ে কথাটা তুলল চাঁদু, আচ্ছা ছোট্ট পিসি, তোমার ওই অসুর না কে এতো গাদা গাদা পচা গোবর নিয়ে কী করেন?

অসুর! অসুর মানে?

আহা ওই যে হাফ্‌প্যান্ট পরা অদ্ভুত মত ভদ্রলোক।

পিসি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, সর্বনাশ! অসুর কী রে! উনি আমার ভাশুর।

হলো একই কথা। তা গোবর নিয়ে ওঁর কী কাজ?

হাঁদুর মুখটা আস্ত একটা ডিম সেদ্ধয় ভর্তি ছিল বলে কথা বলতে পারছিল না। এখন তাড়াতাড়ি 'মুখে চাবি' দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, চুপ! খবরদার ওকথা না। ভেরি সীক্রেট।

পিসিও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ খবরদার না। জিগ্যেস করতে যাসনি। ক্ষেপে যাবেন। কী না কি এক এক্সপেরিমেণ্ট করছেন, কম্‌প্লীট হয়ে গেলে তবে প্রকাশ করবেন।

পচা গোবরের গন্ধ কি বিচ্ছিরী।

চুপ চুপ! ও কথাও বলবার আইন নেই।

এই গ্যাখনা রান্নাঘরের পিছনেই তো ওঁর ওই 'কারখানা'; তাও আবার মাথা খোলা। রাঁধতে রাধতে পচা গন্ধে—

হঠাৎ থেমে যায় পিসি।

জ্যেঠামশাইয়ের বৌ আসছেন।

চাঁদু ফিসফিসিয়ে বলল, হ্যাঁরে উনি কিছু জানেন না? লোকে তো গিন্নীর কাছে সব সীক্রেট কথাই প্রকাশ করে শুনেছি—

হাঁদু একটা বুড়ো আঙুল নাচিয়ে আরো আস্তে বলল, করলেই বা কী? বুঝতে পারলে তো? হেড্ অফিসে তো স্রেফ্ কাউডাং! তবে পচা নয় ফ্রেস্! ...ও নিয়ে তুই আর মাথা ঘামাসনি চাঁদু, বিপদে পড়তে পারিস! বেড়াতে এসেছিস বেড়া, আড্ডা দে, খানাপিনা কর। এই অভাগা 'নলতাপুরের' যা দ্রষ্টব্য আছে গ্যাখ ব্যস!

হাঁদু তো ভাবলো 'ব্যস' বললেই ব্যস! কৌতুহলের ঘরে তালামারা হয়ে গেল। কিন্তু তাই কি হয়?

এই হাঁদু, ছাতে চল না। দেখি উঁকি মেরে জ্যাঠার ওই 'কারখানার' ভেতরটা দেখা যায় কিনা।

সে গুড়ে বালি। পাঁচফুট উঁচু কাঁটা তারের বেড়া বসানো হয়েছে।

হাঁদু, জ্যাঠা যখন 'ইয়ে' বাথরুমে যায় সে সময় চাবিটা একবার হাতাতে পারিস না?

ওই আনন্দেই থাক। তখন পৈতেয় বেঁধে নিয়ে যায় চাবি।...

হাঁদু, তোদের বাড়িতে উঁচু মইটই নেই? পুরনো বাড়িতে তো এসব থাকে টাকে।

ছিল! আছেও। জ্যাঠা সেটাকে ওই কারখানায় ঢুকিয়ে রেখেছে!

উঃ কী চালাক। কিন্তু তুই এই বাড়ির ছেলে হয়ে বোকা বনে আছিস!

কী করবো? চালাক বনতে গেলে স্রেফ পিঠে চ্যালাকাঠ পড়বে। জানিস না তো ওনাকে।...তবে যেটা করছে, সেটায় সাকসেসফুল হলে, দেখিস অন্তমানুষ!

আমি দেখতে আসছি না।...

রাগ রাগ করে বলল চাঁদু।

পিসির বাড়ি বেড়াতে এসে এই এক 'রহস্যকন্টকী' ধরেছে চাঁদুকে।...দেখে চলেছে রোজ বালতি বালতি গোবর সাপ্লাই হচ্ছে। জ্যাঠামশাই তাকে ভাঁড়ার জাত করছেন, রাখালকে টাকা দিচ্ছেন গোছা গোছা। আর একটু উঁকি মারতে গেলেই কড়া গলায় বলছেন, এদিকে কেন? এদিকে কেন? যাও ভেতরে। খেলা করগে।

কুটুমবাড়ির ছেলে বলে একটু সমীহ নেই।

ইতিমধ্যে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে চাঁদু। ছাতের ওপর একেবারে চিলেকোঠার মাথায় তিনখানা বাঁশ বেঁধে, একটা কাক তাড়ুয়া গোছের কী যেন করা

আছে। তার মাথায় তেরচা করে বেঁধে রাখা হয়েছে একখানা গোল আয়না। দুপুরে রোদের সময় আয়নাটা যেন সূর্যের মত জ্বলে। তার থেকে একটা সরু ইলেট্রিকের তার দেয়াল বেয়ে কোথায় যেন নেমে গেছে।

নীচে থেকে বা দোতলার ছাত থেকে দেখা যাবার কথা নয়, নেহাত একটা কেটে এসে পড়া ঘুড়ি ধরতে বাঁশ বেয়ে ওঠার দরুন দেখতে পাওয়া গেল।

হাঁদু বলল, সর্বনাশ করেছে! তুই আবার ও ছাতেও উঠতে গেছলি? আমি তো জীবনেও—

চাঁদুর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হাঁদু সব জানে।

একদিন ওকে পেড়ে ফেলল চাঁদু।

'নলতাপুরের' একমাত্র দ্রষ্টব্য দিব্যকালীর মন্দির দেখতে গিয়ে, খপ করে বলে উঠল, তোদের এই 'দিব্যকালীর সামনে দিব্যি কর দিকি, জ্যাঠার কাণ্ডকারখানার তুই কিছু জানিস না।'

হাঁদু আর কী করে?

বলল, জানা মানে কি? কানে শুনেছি। চোখে তো দেখিনি।

কার কাছে শুনলি?

ওই গোবর বাহক রাখলার কাছে। একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, দাদু পচা গোবরের গ্যাস থেকে একটা বিলিতি যন্তর বানাবে। তার নাম হবে 'তেজোস্‌কিয়ো।'

বুঝেছি 'তেজস্ক্রিয়'। তারপর?

তারপর আর কি?...রাখালের ভাষায়, 'ওদ্দুর থেকে শাঁস বার করে নে' জমা করে করে ওই গ্যাসে আরো জোর ফলাবে। সেটার নাম হবে। শোউর শোক্তি।'

হুঁ। সৌরশক্তি। তারপর? কীভাবে হচ্ছে সেটা বলেনি?

হাঁদু মা কালীর দিকে তাকিয়ে বলে ফেলে, বলেছে। ওই প্রকাণ্ড ঘেরটার মধ্যে নানা মাপের সারি সারি সব চৌবাচ্চা!...একটা থেকে আর একটার মধ্যে জয়েন আছে। জয়েনের নলের মুখে জালি আঁটা। চৌবাচ্চাগুলোয় সব ভারী ভারী ঢাকনা চাপা। তাতে এক দুই তিন নম্বর আঁটা। ক'দিনের গোবর তারও হিসেব রাখতে নম্বর।... আর ওই শোউর শোক্তিটি, না কি ছাত থেকে তার বেয়ে নেমে এসে একটা মজবুত লোহারড্রামে সঞ্চিত হতে থাকে। তার মুখেও ভারী লোহার ঢাকনি।...ত্যাখ মা কালীর সামনে বলিয়ে ছাড়লি তাই, নইলে রাখলা আমায় এসব বলে ফেলে বারবার কানমুলে জিভ কেটে আমায় দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে কাউকে যেন না বলি।

আমি আর কাউকে কি? আমি তো তোর প্রাণের বন্ধু। ওতে দোষ হয় না। কিন্তু হাঁদুরে। হাঁদা! হাঁদা গঙ্গারাম।• এই সব জেনে তুই একবার দেখবার চেষ্টা না করে বসে আছিস? ভাবতে পারছি না।

হাঁদু উদাস গলায় বলে, কী করবো বল? একা কি কিছু হয়? নইলে জ্যাঠা যেদিন মালমশলা কিনতে কলকাতায় যায় সারাদিনের মত, ইচ্ছে কি আর হয় না? চাবিটি তো পৈতেয় বেঁধে নিয়ে যায়। দেওয়ালে কোনোখানে একটা ফুটো পর্যন্ত নেই। এই তো কালই তো শুনছি জ্যাঠা থাকবে না। রাখলা বলছিল, দাদু কাল 'ইলাস্টিক এসিট্' কিনতে কোলকাতা যাবে।

ইলাস্টিক এসিট্! সেটা আবার কী?

হবে একটা কিছু অ্যাসিড ফ্যাসিড। রাখালের মুখে রূপান্তর ঘটেছে। জ্যাঠার যা কিছু কথা রাখালের সঙ্গে। জানে যে রাখাল একথা বলে বেড়ালেও ফাঁস হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না ওর কথা। ওকে নাকি বলেছে—আম খাবার জন্যে আম বাগান কেনেনি জ্যাঠা। কিনেছে আম পাতার জন্যে।...এরপর বস্তা বস্তা আম পাতা এনে চৌবাচ্চায় ঢেলে তাতে অ্যাসিড ঢেলে পচিয়ে তার মধ্যেকার যত সৌরশক্তি নিংড়ে বার করে নেবে।

তা' আমপাতাই বা কেন? ঝোপে জঙ্গলে এতো গাছ পাতা—

ভগবান জানে। বলেছে—আমপাতাতেই না কি 'য্যাতো ওদ্দুরের শাঁস আটকে থাকে।'

ওদ্দুরের শাঁস। হি হি হি। ভাষা বটে একখানা।

ওই তো। ওই জন্যেই নিশ্চিন্দি! ওকে দিয়েই তো অনেক কাজ করিয়ে নিতে হয়। তাই ওকে না বলে পারে না।

তোর বিশ্বাস হয় হাঁদু, সত্যি কিছু কাজ হচ্ছে? না জ্যাঠার হেড্অফিসে গণ্ডগোল!

হাঁদু হাত উল্টে বলে কী জানি। তবে বরাবরই অনেক কিছু করতে পারে জ্যাঠা। একবার বড় চিংড়ি মাছের খোলা জমিয়ে জমিয়ে কী যেন করেছিল। ভীষণ জোরালো একটা আলো বেরিয়েছিল তা' থেকে।...

সত্যি?

সত্যিই। আমি তখন খুব ছোট। রাখালকে না কি বলেছে জ্যাঠা, দেখিস এরপর বাড়ি সর্বক্ষণ আলোয় আলো হয়ে থাকবে, রান্না করতে কাঠ, কয়লা, কেরোসিন কিছু লাগাবে না। গ্যাসের জোরে-বাসন মাজা হবে, কাপড় কাচা হবে, বাগানে জল দেওয়া হবে।...ছোট তো? বলে ফেলে, আবার নাক কান মুলে বলে, দাদু টের পেলে রক্ষ্যে রাকবে না।

চাঁদু উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে, আর কিছু বলতে হবে না, যা জানা গেছে তাই যথেষ্ট। কাল তোতে-আমাতে লেগে পড়ব।...কাছাকাছি কোনো বাড়িও নেই যে, দেখে ফেলবে।...পিসি কী করে দুপুরে?

কী আবার? গল্পের বই বুকে করে ঘুম মারে।

ব্যস!

পরদিন ভোরবেলাই জ্যাঠা একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে নিয়ে রওনা দিলেন।··· চলে যাবার পর চাঁদু খুব ভাল মানুষের মত মুখ করে জ্যেঠির কাছে গিয়ে বলল, জ্যাঠামশাই ভাত খেয়ে গেলেন না জেঠি? সমস্তদিন কী খাবেন?

জ্যেঠি রেগে ওঠে। ওমা কলকাতায় আবার ওনার খাবার ভাবনা? আমার বাপের বাড়ি রয়েছে না? সেখানে নাইবে, খাবে, দোকান বাজার সেরে, বিকেলের গাড়িতে চড়ে বসবে। ফিরতে সেই রাত আটটা!

ব্যস! চাঁদুর কাজ হয়ে গেছে। এইটিই জানবার কথা ছিল তার। কখন ফিরবেন 'কারখানা'র মালিক।

খুব মস্ত একটা দড়ি পাওয়া যাবে রে হাঁদু?

কত বড়?

যত বড় পাস।

দড়ি, বড় দড়ি। ওঃ পাওয়া গেছে। ইদারার জল তোলা দাড়িটা দারুণ লম্বা। ওতে হবে?

হবে। সরাতে পারবি?

দুপুরে পারবো।

ঠিক আছে।

একটা ছোট লোহার ডাণ্ডা-ফাণ্ডা?

গাদা গাদা! সিঁড়ির তলায় অনেক পুরনো জানলা ভাঙা রড পড়ে আছে। বুঝেছি কী করতে চাস।

তোদের বেশ মজা। বিরাট বাড়ি কতো রকম সব জায়গা, চারদিকে কতোরকমের আবোল-তাবোল জিনিস ছড়ানো থাকে। ফ্ল্যাট বাড়িতে কোনো মজা নেই।··· তাছাড়া এখানে উঃ! জ্যাঠা যা একখানা!

এখন দারুণ টেনশান!

ভাত খাওয়া পর্যন্ত কোনো মতে ধৈর্য ধরে থাকা।······

খেতে খেতেই পিসিদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে চাঁদু, আজ আর দুপুরে পুকুরে ছিপ ফেলতে যাওয়া নয় হাঁদু, দারুণ টায়ার্ড লাগছে। লম্বা একখানা ঘুম দিতে হবে।

পিসি বলল, তবু ভাল যে সুমতি হয়েছে। হাঁদু, তুইও যানা একটু শুতে। টায়ার্ড আর হবি না? ক'দিন ধরে তুই অবতার যা করে চলেছিস!

রড্‌টার মাঝখানে দড়িটাকে আচ্ছা করে বেঁধে, কাছের একটা গাছে উঠে, দারুণ

জোরে জ্যাঠার কারখানার দেয়াল টপকে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলে দেয় চাঁদু। দড়ির অন্য মুখটা ওই গাছটারই গোড়ার দিকে বেঁধে ফেলে, তারপর বলে ওঠে, রেডি থাকিস হাঁদু, যেই শুনতে পাবি লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দেওয়ালে ঠুকছি। সেই দড়িটা ধরে টানতে থাকবি!······পারবি তো?

পারবো না মানে? তোর পর আমার চান্স না?

তাই বলছি। না পারলে কিন্তু আমার অবস্থা কা হবে বুঝতে পারছিস? স্রেফ আলিবাবার গল্পের কাসেম আলির মত।···কাল জ্যাঠা এসে চাবি খুলে দেখবে, চাঁদু তার সৌরশক্তির ভাঁড়ারে হানা দিতে এসে—তোর জ্যাঠার কিন্তু খুব মাথা আছে হাঁদু। রোদের মুখে আয়না ফিট্ করে সারাদিন সৌরশক্তি চার্জ করে নিয়ে চলেছে।

এসব কিন্তু সবই রাখালের মুখে শোনা।

সেটাই তো আরো ভরসা। ওতো আর এসবের কিছু বানাতে জানে না। তবে জ্যাঠা যখন বলেছে—কিছুদিনের মধ্যেই ওই শক্তিতে বাড়ির সব রান্না-টান্না হবে, কাপড় কাচা বাসন মাজা হবে, বাড়ি আলোয় ঝলমল করবে। তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে।···আমি শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি হাঁদু। এতোদিন তুই ধৈর্য ধরে ছিলি কী করে?

মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না চাঁদু। বললাম তো একা হয় এসব?

তা বটে। রেগে যাস না। তাহলে নামছি?

এদিকে গাছের গোড়ায় দড়ির একদিক বাঁধা। ওদিকে লোহার রড-এর ভার। চাঁদু সাবধানে দড়ি ধরে ধরে ওঠে, এবং দেওয়ালের মাথায় চড়ে পড়ে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করে:···

হাঁদু চেঁচায়, কী দেখতে পাচ্ছিস?

চুপ! চেঁচাসনে। গিয়ে বলব।

হাঁদু ভাবল, বলার জন্যেই বা কী, ও চলে এলেই তো আমি নিজেই নেমে দেখে নেব।

তবু ধৈর্য রাখা শক্ত।

দেওয়ালে মুখ চেপে চেঁচায় হাঁদু, কী বুঝছিস চাঁদু?

সাংঘাতিক! মনে হচ্ছে—

আর শোনা হয় না। হঠাৎ বোমা ফাটার মত দুম করে একটা দারুণ আওয়াজ হয়, ভয়ঙ্কর একটা আলোর রেখা তীর বেগে ওপরে উঠে যায়, আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সেই আলোর রেখার মাথায় চাঁদুকে দেখতে পায় হাঁদু!

তার মানে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন গ্যাসের ঠেলায় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হয়ে শূন্যে চলে গেছে চাঁদু।

একী ভয়ঙ্কর কাণ্ড! এ কী সর্বনাশ।

হাঁহু গলা ফাটিয়ে বলে, গাছটাছ কিছু ধরে ফেল না চাঁহু। এটা কী হচ্ছে? অ্যাঁ? কী করছিস তুই? ওই তাল গাছটা ধরে ফেল না।

পারছি না। অদ্ভুত হালকা হয়ে গেছি!

ও চাঁহু! পাজী বদমাশ! তুই যে ক্রমেই উঁচুতে উঠে যাচ্ছিস? ভেবেছিস কী?

হাঁহু ঠাঁই ক'রে একখানা ইট ছোড়ে ওকে তাক করে।···পা ভেঙেও পড়ে তো পড়ুক। নইলে—চোখের সামনে দিয়ে চাঁহু তার হাত ফসকে আকাশে উঠে যাবে?
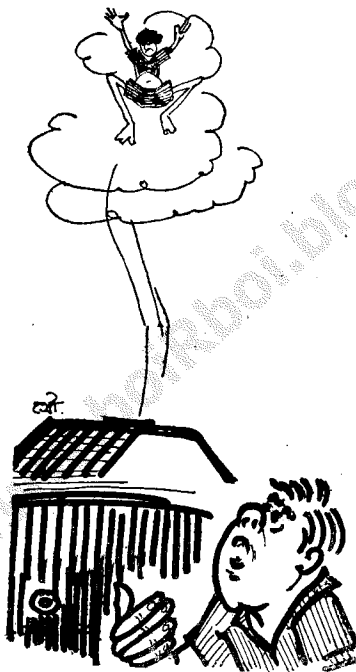
কিন্তু ইটে চাঁহুর পা ভাঙে না। ছিটকে দূরে সরে যায়। আর হঠাৎ বোধ হয় সেই ধাক্কায় শূন্যমণ্ডলের খানিকটা আলোয় ঝলমলে হয়ে ওঠে। সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে হাঁহুর গলা ভাঙে, এই চাঁহু, তোর পায়ে পড়ি, আর উঠে যাসনি। নেমে আয়। মামা মামী কী বলবে আমায়? মাকে কী বলব আমি? জ্যাঠা কী করবে এসে?

চাঁহুরও গলা ভাঙছে। কী করবো? আমার যে নিজের ওপর কোনো কণ্ট্রোল নেই। নীচে থেকে গ্যাসে ঠ্যালা মারছে। ড্রামের চাবিটা খুলে ফেলেছিলাম বন্ধ করতে পারিনি।···

চাঁহু! কেন ড্রামের চাবি খুলেছিলি?

বু—বু: ঝতে: পা: পা: রি নি ই ই!

চাঁহু তুই উড়ে গেলে আমি মরে যাবো। চাঁ আঁ আঁহু।···

গ্যাসের ঠ্যালায় হাঁহুর কথাগুলো ওপরে উঠে যাচ্ছে, চাঁহু শুনতে পাচ্ছে।···কিন্তু চাঁহু যে গলা চিরে উত্তর দিচ্ছে, আমার হাত নেই! ক্রমেই উঠে যাচ্ছি, হাল্কা হয়ে যাচ্ছি। মাকে বাবাকে বুঝিয়ে বলিস—

সে সব হাঁহু শুনতে পাচ্ছে না।

হাঁদু তাই দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বলে চলে, আমার হাত ফসকে তুই একা একা আকাশে উঠে গেলি ? কেন মরতে আমি তোকে এসব বলেছিলাম রে !

ওদিকে চাঁদুও মুখের দুদিকে হাত চাপা দিয়ে বলে চলেছে, (মাথা হেঁট করার উপায় নেই।) কাঁদিস না।··· এও একটা মজা হল। বিনা খরচে আকাশ ভ্রমণ! পারি তো খবর দেব।

কিন্তু আর কেউ কারুর কথা শুনতে পায় না।

আর চেঁচাতেও পারে না হাঁদু।

মে মাসের দুপুরের রোদ ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

যেখানে চাঁদুর নীল প্যাণ্ট আর লাল শার্টের ছায়াটুকু কাটা ঘুড়ির মত ভাসতে ভাসতে হালকা মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।······

গ্যাস ফুরিয়ে ঠ্যালা কমে গিয়ে আছড়ে কোথাও পড়ে যাবে চাঁদু এ ভয় নেই, চাবি খুলে ফেলা সৌরশক্তির ড্রাম থেকে তখনো শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে চলছে, আর গোবর গ্যাসের সমস্ত ঢাকাগুলো খুলে ফেলায়, এক যোগে সব গ্যাস উর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে।

অতএব চাঁদুর আর পড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

শূন্যের মধ্যে ভাসতে ভাসতে চাঁদু ভাবে 'জ্যাঠা বলেছিল, পিসির বাড়ি এসে হাতটা পা টা হারিয়ে ফিরলেই ভাল হতো ?' আর আমি ?···বাড়িই ফিরলাম না। নিজেকেই হারিয়ে ফেললাম।····কিন্তু কোথায় চলেছি আমি ?
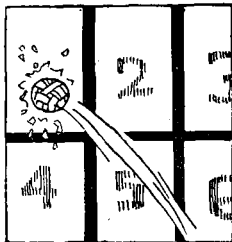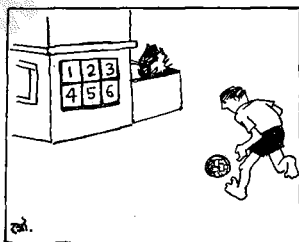
মস্কোয় গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ

চিরঞ্জীব

ভারতে খেলাধুলার খুব বড় ধরনের পর পর দুটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে। ৫১-য় হয়েছিল দিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেম্‌স এবং পরের বছর বোম্বাইয়ে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা, ওই দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আঠাশ-উনত্রিশ বছর আগের ওই প্রতিযোগিতার গুরুত্বও কম ছিল না। অবশ্য আজ আশির দশকে জনসংখ্যা বেড়েছে, সকলের মধ্যে খেলাধুলায় উৎসাহ বেড়েছে। তাই খেলাধুলার গুরুত্ব অনেক। ত্রিশ বছর আগেও 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' বলা হত ওলিম্পিক গেম্‌সকে। এই ওলিম্পিকস নিয়ে আমাদের মধ্যে হৈচৈ দশগুণ বেড়েছে এখন। কিন্তু ওলিম্পিকসের গুরুত্বটা কেমন! কলকাতার ১৯৭৫ সালে যখন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তাতে ষাটটিরও বেশি দেশ অংশ নিয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতা আয়োজনের শুরু থেকে প্রতিযোগিতার শেষদিন পর্যন্ত আড়াই বছর ধরে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বুঝেছিলাম এত বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন কত মানুষ, কত টাকা, কত পরিশ্রম ইত্যাদির প্রয়োজন। তাও তো টেবল টেনিস একটি মাত্র খেলা। এশিয়ান গেম্‌সের আয়োজনে ওই সব আরও বেশী দরকার। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলি এলেও খেলার সংখ্যা অনেক বলেই অর্থ, লোকবল ইত্যাদি অনেক বেশি চাই।

কিন্তু ওলিম্পিক গেম্‌স? পুরাকালে রাজসূয় যজ্ঞ কেমন হত জানি না। তবে তার বর্ণনা যা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় বহু রাজসূয় যজ্ঞের সম্মিলনে একটি ওলিম্পিক হতে পারে। সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে গত ডিসেম্বরে ওদেশে গিয়েছিলাম ওলিম্পিক প্রস্তুতি দেখতে। খেলাধুলা নিয়ে একটা দেশ ও জাতি যে এমনভাবে মেতে উঠতে পারে তা ওদেশে না গেলে বুঝতে পারতাম না। শুনেছি ১৯৭২-এ মিউনিখ ওলিম্পিক ঘিরেও সারা পশ্চিম জার্মানিতে এমনই সাড়া পড়েছিল।

অক্টোবর থেকে কয়েকমাস সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। জানুয়ারিতো ওদেশে যাওয়া মানে বরফ হয়ে যাওয়া। তবুও ওদের আমন্ত্রণটা বেছে নিয়েছিলাম। আমাদের দার্জিলিং সিমলায় তো শীতে ছুটি ছুটি ভাব। স্কুল,

কলেজ ছুটি। কাজকর্ম ছেড়ে অনেকে চলে যান গরম এলাকায়। তাই মনে হয়েছিল মস্কোর শীতে নদীর জল যখন বরফে পরিণত, তখন তো কাজকর্ম সব বন্ধই। কিন্তু ওদেশে 'বন্ধ' বলে কিছুই নেই। শীত, গ্রীষ্ম রাত, দিন—সবই যেন ওদেশের মানুষের কাছে সমান। ডিসেম্বরে বরফ-ঢাকা মস্কোয় পৌঁছে শুরুতে মনে হয়েছিল এই সময়ে এখানে কোনো কাজ হতেই পারে না। বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি, গাছ—সব কিছুই বরফে ঢাকা। এই অবস্থায় কাজ হতে পারে? কোনো কোনো জায়গায় বড় বড় উঁচু উঁচু ক্রেন দেখলাম, তাও বরফে ঢাকা। মনে হচ্ছিল গ্রীষ্মের পর আর কাজ হয়নি। কাজ হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম এলে আবার কাজ শুরু হবে। শীতে এদেশে গেলে মনে হবে প্রথম প্রথম—এখানে এখন সবকিছু বন্ধ। অফিস কাছারি বন্ধ। স্কুল কলেজ বন্ধ। সিনেমা, থিয়েটার বন্ধ। বন্ধ খেলাধুলাও। কিন্তু তা নয়। বরং গ্রীষ্মেই বন্ধ থাকে স্কুল-কলেজ, ওদের গ্রীষ্মই হল আমাদের কলকাতার ডিসেম্বরের মত বা তার চাইতে বেশি ঠাণ্ডা। তাহলে ডিসেম্বরে এদেশের শীতটা কেমন নিশ্চয়ই অনেকে কিছুটা অনুমান করতে পারেন।

জিমন্যাস্টিক স্কুলে বিমের উপরে প্রশিক্ষণ। পাশে শিক্ষিকা।

এই শীতকে এরা একদম ভয় পান না। আমরা প্রতিবছর দেখি ও শুনি কত লোক শীতে আমাদের দেশে মারা যাচ্ছেন। এদেশে এমন ঘটনা নাকি একটিও নেই। কলকারখানা অফিস কাছারি, স্কুল-কলেজ সব আচ্ছাদিত বাড়ির মধ্যে। যেখানে সব সময় চলছে ইলেকট্রিক হিটার। কিন্তু বাইরে তো বরফ জমা ঠাণ্ডা। সেখানেও কাজের ঘাটতি নেই। এই যে এত বড় ওলিম্পিক গেম্স, তার জন্য কত প্রস্তুতি। কত আয়োজন

শীতের জন্য কিন্তু তার কাজ একদিনের জন্যেও বন্ধ ছিল না। বরফ ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন খোলা মাঠে, খোলা জায়গায়। তবে হ্যাঁ, সকলের গায়ে শীত মানাবার জন্য পোশাক আপাদমস্তক। মনে হয় প্রত্যেকেই এক একজন মহাকাশচারী। ওলিম্পিকের জন্য এরা খুব বেশি স্টেডিয়াম বা ক্রীড়া কেন্দ্র নতুন বানাননি। ছোট ছোট কিছু স্টেডিয়াম নতুন তৈরি করেছেন, আর সংস্কার করেছেন বড় বড় কিছু স্টেডিয়ামের।

ওলিম্পিকের আয়োজনের ব্যাপারে একটা জিনিস ভীষণ ভাল লেগেছিল, তা হল স্বতঃস্ফূর্তভাব। এর কাজে ছোট বড় সকলের সাহায্য। যারা নানাধরনের পেশায় নিযুক্ত, তারা তাঁর প্রতিদিনের কাজের শেষে চলে গেছেন ওলিম্পিকের কাজ করতে। কিংবা ছুটির দিনে না বেড়িয়ে, না ঘুরে ওলিম্পিকের কাজে মেতেছেন। ওলিম্পিক-কমিটি সকলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন কাজের বিনিময়ে। অনেকেই ওই অর্থ নিয়েছেন, আবার অনেকেই নেননি। যারা অর্থ নিয়েছেন, তারা তার পুরোটাই দান করেছেন ওলিম্পিক কমিটিকে। একটা ব্যাপার কোনোদিন ভোলার নয়—স্কুলের ছোট ছেলে-মেয়েরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তা পাঠাত ওলিম্পিক কমিটির কাছে। ওরা তো ওলিম্পিকের কাজে লাগতে পারছে না, তাই অন্যভাবে সাহায্য করা। এতে ওলিম্পিক কমিটি বিপাকে পড়েন। কোপেক (ওদের পয়সা) বা ১০ কোপেক-এর হিসাব রাখতে তো আরও সমস্যা কমিটির। তারা জানালেন, ৫ কোপেকের হিসাব রাখতে সমস্যা বাড়ছে, অকারণে অন্য বড় কাজের ক্ষতি হচ্ছে। ওই ধরনের ছোট ছোট দান নেওয়া বন্ধ হল। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা নাছোড়বান্দা। ওরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা মারফত আর্জি জানাল, সরকারের কাছে—"আমাদের তো আর কিছু করার শক্তি নেই, অন্যভাবে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা বাবা মার দেওয়া টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তা পাঠাচ্ছি। দেশে এতবড় ব্যাপার ঘটছে আমাদের এইভাবে অংশ গ্রহণকে, দেশের এই বিরাট কাজে সাহায্য করা থেকে বঞ্চিত করবেন না।" ব্যাপারটা সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট লিওনার্ড ব্রেজনেভের কাছেও পৌঁছয়। তিনি ছোটোদের আর্জি শুনে বলেন, যত অসুবিধাই হোক, ওদের দান নেওয়া হোক। অর্থের দিক থেকে দান সামান্যই। কিন্তু এতে যে প্রাণের পরশ রয়েছে, তার দাম বোধহয় অনেক অ-নেক।

পরে দেখা যায় ওদের ক্ষুদ্র দান মিলিয়ে কয়েক হাজার রুবল (রুশ টাকা। ১০০ কোপেকে ১ রুবল হয়) হয়েছে।

খেলাধুলার ব্যাপারে সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়েদের বোধহয় জুড়ি নেই। জুড়ি নেই লেখাপড়ার ব্যাপারেও। আবার খেলাধুলায়ও। প্রতিটি স্কুলে খেলাধুলার কী ব্যাপক ব্যবস্থা ! প্রত্যেককে খেলাধুলা করতেই হবে। আর যারা খেলায় ভাল ফল করে, তাদের নিয়ে যাওয়া হয় সুযোগ দেওয়া হয় বিশেষ স্পোর্টস স্কুলে। পড়াশুনার

স্কুলে ছুটির পর ওরা যায় স্পোর্টস স্কুলে। দুটি স্কুলেই সমান কড়াকড়ি। খেলার জন্য যদি জেনারেল স্কুলের ফল খারাপ হয়, তবে চিঠি চলে যায় বাড়িতে। বলা হয়—ওর জেনারেল স্কুলে কোচিংটা আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। খেলায়ও ভাল না দেখা গেলে অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ একটিকে বাদ রেখে আরেকটি নয়! পড়ার স্কুলের মত, পড়ার কলেজের মত সারা দেশে অসংখ্য খেলার স্কুল, খেলার কলেজ। পড়াশুনা যেমন শুরু সাত বছর বয়স থেকে, তেমনি খেলাধুলাও শুরু ওই বয়স থেকে, সাত থেকে আঠার—এর মধ্যে গ্রুপ ভাগ করে বিভিন্ন খেলার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর পড়ার স্কুলে যেমন প্রতি সপ্তাহে উইকলি পরীক্ষা, খেলায়ও তেমনি প্রতি সপ্তাহে উইকলি কম্পিটিশন।

রাশিয়ার নিজস্ব খেলা সাম্বোতেও ট্রেনিং শুরু হয় সাত বছর বয়স থেকে।

স্পোর্টসের স্কুলগুলিও অভিনব। সব খেলারই আলাদা আলাদা যেমন স্কুল, তেমনি মেয়েদের খেলার সঙ্গে ছেলেদের খেলার স্কুলের যোগাযোগ নেই। না, হয়তো ঠিক বললাম না। একই বাড়িতে মেয়ে ও ছেলেদের স্কুল থাকলেও প্রশিক্ষণ হয় আলাদা আলাদা। অর্থাৎ একই বাড়িতে দুটি পৃথক বিভাগ।

আমার ধারণা ছিল, ওদেশের যারা ওলম্পিকে অংশ নেয় তারা আট-দশ বছর ধরে পৃথক পৃথক রেসিডেন্সিয়াল কোচিং ক্যাম্পে থাকে।

কিন্তু এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে, সব দেখে শুনে বুঝলাম আবাসিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কেননা, সারা বছরই তো সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে কোচিং ও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে স্থানীয় প্রতিযোগিতার ও মাঝে মাঝেই অন্যদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলের ভিত্তিতে সেরা খেলোয়াড়দের এরা উন্নততর ট্রেনিং-এর

ব্যবস্থা করে। এইভাবে এবারও তাই ওলিম্পিকের জন্য জাতীয় দল নির্বাচন হয়েছে প্রতিযোগিতার ছয় সপ্তাহ আগে।

শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, খেলাধুলায় এগিয়ে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের জাতীয় দল গড়ার কাজটি চলে প্রায় এইভাবেই। কেউই আমাদের মত শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের মত গয়ংগচ্ছ মনোভাব বা খেলাধূলাকে হেলফেলা করে না। এসব দেখে বড় খারাপ লাগে—আমরা কত পিছিয়ে।

'ডায়নামো' চিলড্রেন্স স্পোর্টস স্কুলে ফুটবল প্রশিক্ষণ।

ওলিম্পিকের আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে মোটা একখানা বই হয়ে যায়। সংক্ষেপে জানাচ্ছি এর জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে নিযুক্ত হয়েছেন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কর্মী। আর লেগেছে আড়াই'শ কোটি রুবল। হিসাব করাও সহজ টকায়। এক রুবল অর্থাৎ বারো টাকা। আড়াই'শ কোটি গুণ বারো—কত টাকা! গত ছয় বছর ধরে এরা এর আয়োজন করেছে। বারো হাজার প্রতিযোগীর জন্য ওলিম্পিক ভিলেজে প্রায় ৫০০ রকম খাদ্য ছিল। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের পছন্দসই। অর্থাৎ কত রাঁধুনীও লেগেছে। ১৯ জুলাই উদ্বোধন হয়েছে মস্কো ওলিম্পিকের, আর সমাপ্তি ৩রা আগস্ট। এই কদিন কোনো প্রতিযোগী, কোনো সাংবাদিক, কোনো ডেলিগেটকে মস্কোর মেট্রো রেল, বাস, ট্রেন, ট্রামে চড়তে পয়সা লাগেনি। ওদেশের প্রধান ভাষা রুশী। অন্য কোনো বিদেশী ভাষার প্রচলন নেই ওদেশে। ইংরাজিও অচল। কিন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গত কয়েক বছরে ইংরাজি, স্প্যানিস, লাটিন, ফরাসী ভাষা শিখে নিয়েছিল বিদেশীরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন, তাই। সত্যি বলতে কি এমন ব্যাপক আয়োজন এর আগে কখনও কোথাও হয়নি, ওলিম্পিক গেম্স নিয়ে। একথা ঠিক রাজনৈতিক কারণে কিছু দেশ ওলিম্পিকে অংশ নেয়নি। কিন্তু তাতে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর গ্ল্যামার কমেনি।

হাওয়া কুমারী

অমর মিত্র

তখন পৃথিবীর জন্ম দিয়ে ভগবান বিশ্রাম নিচ্ছেন। পৃথিবীর মাথায় সূয্যি আছে চাঁদ আছে, তারার ফুলঝুরি আছে। এসব তো উপরের আকাশে। নিচে সব জলেজলাকার।

শুধু এক কেঁচো সেই জলের তলা থেকে মাটি তুলছিল। মাটি তুলে তুলে রাখছিল এক পদ্মপাতায়। কেঁচো ভগবানের আদেশে এই কাজ করছিল। মাটির ভারে পদ্মপাতা ডোবে ডোবে, তখন এক কচ্ছপ এসে ধারণ করল সেই পদ্মপাতা। কচ্ছপের পিঠে পদ্মপাতায় মাটি জমতে লাগল। এমনি করেই কতশত বছর কেটে গেল। মাটির উপরে গাছ হল। গাছে গাছে পাখি হল। তখন পৃথিবীতে একটাই ঋতু। বসন্তকাল। সব সময় সুবাতাস। বাতাসে ফুলের গন্ধ ম-ম করে।

এর ভিতরে আসল কথাটা বলতে ভুল হয়ে গেছে। ভগবান পৃথিবী গড়ার আগে একটা মানুষ খেলার ছলে গড়েছিলেন। তার বয়স এই পৃথিবী থেকে অন্ততঃ বিশ বছর বেশি। চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে সেই মানুষ বড় হচ্ছিল স্বর্গে। ভগবানের খাবার চুরি ক'রে খেত বেজায় লোভী। লোভী এবং নির্লজ্জ। ভগবান তার নাম দিয়েছিলেন বেল্লিক।

একদিন ভগবান হাওয়ার পিঠে চেপে জগৎ দেখছিলেন। ভগবান যেই তাঁর বাহনে চেপেছেন অমনি সেই মানুষ লাফ দিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। গলা জড়িয়ে পিঠে ঝুলতে লাগল ভগবানের।

ভগবানের বাহন হাওয়া রাজার কষ্ট হচ্ছিল বেল্লিকের ওজনে। হাওয়া রাজা সে কথা ভগবানের কানে কানে বলল। বেল্লিক শুনতে পেল আচমকা, শুনেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে। সে চীৎকার ক'রে হাওয়া রাজাকে বকে উঠল। মহাশূন্যে বেল্লিক মানুষের চীৎকার যেন অন্ধকার নামাল। পৃথিবীর হাওয়া বাতাস জল আলো সব ভয় পেয়ে গেল।

ভগবান বেল্লিককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন নিচে। বেল্লিক ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর পড়ল। পৃথিবীতে মানুষ নামল।

কেঁচো তখনো সমুদ্রে দ্বীপ তৈরি করছে। বেল্লিক তার ভাগ্য বুঝতে পেরে কষ্ট পেল। স্বর্গভ্রষ্ট হল সে। কিন্তু অতবড় পৃথিবীটা তার একার। সে সমুদ্র বেলায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল। আমি পৃথিবীর রাজা, আমি বেল্লিক শাহ্।

বাতাসে বাতাসে এই কণ্ঠস্বর পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। গাছপালা কীটপতঙ্গ পাখি আর জন্তুরা সকলে মাথা নোয়াল বেল্লিকের পায়ের কাছে। বেল্লিক পৃথিবীর প্রথম রাজা হল।

এখন থেকে আমরা বেল্লিককে বেল্লিক শাহ্, আপনি,-ক'রে কথা বলব। কেন না পৃথিবীর প্রথম রাজা, তাঁর তো একটা সম্মান আছে।

এ এক তিন সত্যির কাহিনী। সেই বেল্লিক শাহ্ বেঁচে আছেন এখনো। হাওয়াই নগরে তার ঘর।

হাওয়াই নগর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তার চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। সেখানে ঘন অরণ্যের ভিতর এক অন্ধকার গুহায় তপস্যায় ব'সে আছেন তিনি। আর বছরে বানে ভেসে আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম, বেল্লিক শাহ্ বুড়োর কাছে সব জেনে তো তবে বলছি। এ কাহিনীর ইতিহাস ভূগোল নেই। থাকবে কি করে? পৃথিবীর প্রথম রাজার কথা তো কেউ জানে না।

সে সব থাক, কেন যে বেল্লিক রাজা গুহায় লুকিয়ে আছেন সে খবর জানার দরকার। তাই বলছি।

বেল্লিক তো নিজে হলেন রাজা। তার বাবা ভগবান তখন হাওয়া বাহনে অন্য মুলুকে। তখন চির বসন্তের পৃথিবী। দুঃখ কষ্ট নেই। রাতে চাঁদের আলো। দিনে সূয্যি পৃথিবীকে ঝলমলে ক'রে সাজায়। কেঁচো একের পর এক দেশ তৈরি করছে। গাছে গাছে ফলপাকুড়। খেয়ে বেল্লিক শাহ্ মাতৃসন্তুষ্ট হলেন। মনে করতে আরম্ভ করলেন তিনিই ভগবান। আর যেই না মনে করা; তক্ষুনি দুঃখ এল তাঁর চোখে মুখে। এর চেয়ে ভগবানের স্বর্গরাজ্য কত সুখের।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কেটে যেত। এখানে তাঁকে ফলপাকুড় পেড়ে খেতে হয়। আর সন্ধ্যে হ'তে হ'তেই অন্ধকার হয়ে যায় সব। অমাবস্যায় তো অন্ধকার ঘুটঘুটে।

ভোরবেলা বেল্লিক শাহ্ দুঃখ মুখে ক'রে জেগে উঠলেন। সেই দুঃখ দেখল এক পাখি। তার সবুজ রঙ। নীল ঠোঁট। নাম দীর্ঘচঞ্চু। ঠোঁট দুটো বেশ বড় ছিল।

পাখি জিজ্ঞেস করল, মহারাজ দুঃখ কিসের ?

বেল্লিক শাহ্ বললেন, রাতে বড় অন্ধকার !

পাখি বলল, আমি ব্যবস্থা করছি আলোর।

তারপর দিন প'ড়ে আসে। ঠিক বিকেলে পাখি উড়ে চলে সূর্যের দিকে। তখন পশ্চিমে সূর্য লাল থালা হয়ে নেমে যাচ্ছিল তার ঘরের দিকে। পাখি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। গিয়ে দেখল কি !

হ্যাঁ, সেই বিকেলে সূয্যির দেশে রঙের খেলা শুরু হয়েছে। লাল সিঁদুর গোলা ছোড়া-ছুড়ি হচ্ছে। তাই সূয্যিটা এত লাল। পাখি গিয়েছিল সূয্যির কাছ থেকে আগুন আনতে। সেই আগুন দিয়ে আলো জ্বালাবে পৃথিবীতে। তখন তো পৃথিবীতে রাতের বেলা আগুনের আলো জ্বলত না।

পাখি সেখানে গিয়ে দেখল হাওয়া কুমারীকে। হাওয়া কুমারী হাওয়া রাজার একমাত্র কন্যা। রূপের বাহারে ফুরফুরে। কি তার চোখ মুখ ! হাওয়া কুমারী তো দীর্ঘচঞ্চু পাখিকে দেখে অবাক।

হাওয়া রাজার এক কন্যা—সগ্‌গে-মর্তে রূপের বন্যা।

পাখি আর হাওয়া কুমারী মিতা পাতাল। হাওয়া কুমারী আদর ক'রে পাখির ঠোঁটটি ধ'রে নেড়ে দিল। ঠোঁট গেল বেঁকে। দীর্ঘচঞ্চু বাঁকা ঠোঁটে সূয্যির কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিল। আগুন ঠোঁটে নেওয়ার সময় সূয্যির গায়ের সিঁদুর লেগে গেল পাখির ঠোঁটে। ঠোঁট হয়ে গেল লাল। সে হয়ে গেল টিয়া। এই জন্যেই টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল।

আগুন নিয়ে কতপথ পাড়ি দিয়ে দীর্ঘচঞ্চু বেল্লিক শাহ্‌র কাছে এসে দাঁড়াল। রাতে বেল্লিক শাহ্ তার ঘরে আলো জ্বালালেন সেই আগুনে। আলোতে বেল্লিক শাহ্ দেখলেন, দীর্ঘচঞ্চু পাখির ঠোঁটটি বেঁকে রঙ হয়েছে লাল।

তার কারণ কি ? বেল্লিক শাহে্‌র প্রশ্নে দীর্ঘচঞ্চু বলল হাওয়া কুমারীর কথা। সূয্যি দেশের সিঁদুরের কথা। হাওয়া কুমারীর সঙ্গে তার মিতা পাতানোর কথা।

বেল্লিক শাহ্ ছিলেন কুঁড়ের বাদশা। স্বর্গে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটত তাঁর। এখানে এসে অসুবিধে হচ্ছিল বিস্তর। এর জন্য দায়ী কে ?

মহারাজার দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। পুরনো রাগ ফিরে এল। তাঁর এই পরিণামের জন্য দায়ী ভগবানের বাহন হাওয়া রাজা। মনে মনে বেল্লিক শাহ্ ফন্দী আঁটতে লাগলেন। এই হল পৃথিবীর প্রথম ফন্দী আঁটা। বললেন, আনো তোমার মিতাকে।

দীর্ঘচঞ্চু পাখি আবার উড়ল হাওয়া রাজ্যের দিকে। হাওয়া রাজ্য পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-উর্ধ্ব-অধঃ কোণে। সেখানে হাওয়া রাজা তাঁর মেয়ে হাওয়া কুমারীকে নিয়ে সুখে বাস করেন। তাঁর কত সৈন্য ! একদিকে অগ্নি সেনা অন্যদিকে হিম

সেনা। বড় ছেলের নাম শরৎকুমার। এমনিভাবেই তাঁর রাজত্ব চলে।

দীর্ঘচঞ্চু মিতার সঙ্গে হাওয়া কুমারী নামল পৃথিবীর মাটিতে।

তখন বেল্লিক শাহ্ কৌশল করলেন। যে কচ্ছপ ধ'রে আছে পৃথিবীর মাটি, সে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল হাওয়া রাজ্যের রাজকুমারীকে। বেল্লিক শাহ্ কচ্ছপের মুখে মারলেন এক চড়, অমনভাবে দেখলে রাজকুমারীর মান যায়। ভয়ে কচ্ছপ তার মুখ ঢুকিয়ে নিল ভিতরে। ন'ড়ে উঠল তার দেহ।

সেই যে কচ্ছপ ভয়ে মুখ ঢুকালো খোলের ভিতর, আর মুখ বার করে না লজ্জায়।

আর কচ্ছপ যে ন'ড়ে উঠল! তারপর?

কচ্ছপ নড়তেই মাটি দুলতে আরম্ভ করল। মাটি দুললে হাওয়া রাজার কন্যা হাওয়া কুমারী উল্টে পড়ল সমুদ্দুরে।

সমুদ্দুরে উল্টেই রাজকুমারী ডুবে গেল। জলের ভিতর ডুবে রাজকুমারী হাবুডুবু খেতে লাগল। জলের বুড়বুড়ি কাটতে লাগল। জল ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তাকে আমরা বলি বুদ্‌বুদ!

এইভাবেই বুদ্‌বুদের জন্ম হল।

হাওয়া রাজকুমারী জলে ডুবে গেলে তার মিতা দীর্ঘচঞ্চু পাখি চীৎকার ক'রে উড়তে লাগল জলের উপর। রাজকুমারীর জন্য পাখি কাঁদতে শুরু করল। এই হল পৃথিবীতে প্রথম কান্না।

হাওয়া রাজা হাওয়ায় হাওয়ায় জানতে পারলেন তাঁর কন্যার দুঃখের খবর।

কোথায় তুমি কোথায় তুমি হাওয়া রাজার মেয়ে।
হাওয়া রাজার দুঃখ ঝরে, চোখের কোণ বেয়ে।

দুঃখে ভাসতে ভাসতে হাওয়া রাজা ক্রমশঃ ক্ষেপে ওঠেন। এই ক্ষেপেন তো সেই ক্ষেপেন। লাগল যুদ্ধ। ঝন্‌ঝন্ শন্‌শন্ অস্ত্রের ওঠা নামা শুরু হল জগতে।

হাজার সৈন্য নিয়ে হাওয়া রাজা ধেয়ে এলেন বেল্লিক শাহ্‌র দিকে। ঝড় এল পৃথিবীতে। অরণ্য পাহাড়ে হল ভয়ের জন্ম।

ঝড়ের জন্ম হ'ল এইভাবে। তখন বেল্লিক শাহ্ ঢুকলেন গুহার ভিতরে। হাওয়া সৈন্য পৃথিবী তছনছ ক'রেও বেল্লিক শাহ্‌র কিছু করতে পারল না। ঝড় ফিরে গেল। তখন হাওয়া রাজা অগ্নিপর্বত থেকে ডাকলেন অগ্নি সেনাদের।

এল অগ্নি সেনা। বাতাস গরম হল। মাটি গরম হল। গুহার পাথর গরম হয়ে গেল। এই সময়ের নাম গ্রীষ্মকাল। তারপর থেকেই গ্রীষ্মকালের শুরু হল।

গুহার ভিতরে গরমে বেল্লিক শাহ্ ছটফট করতে লাগলেন। সমুদ্দুরের জল মেঘ হয়ে উড়ে গেল আকাশে। তখন বেল্লিক শাহ্ আর পারেন না। তীর ছুঁড়ে দিলেন মেঘের দিকে। মেঘ ফুটো হয়ে সব জল ঝ'রে পড়তে লাগল পৃথিবীতে।

তখন সারাদিন ঝমঝম রিমঝিম বিষ্টি সমুদ্র নদী-নালা সব আবার ভর্তি হয়ে গেল। এইভাবে তৈরি হল বর্ষাকাল।

গ্রীষ্ম এল গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এল ঐ
বসন্ত দিন উধাও হল, সেই কন্যা কই ?

আস্তে মেঘের জল শেষ হয়ে আসে। হাওয়া দেশে তখন অন্ধকার। সবাই চুপ ক'রে আছে। হাওয়া রাজকুমারীর জন্য সবার মনে কষ্ট।

হাওয়া রাজার ঘুম নেই। তখন এল তাঁর একমাত্র পুত্র শরৎকুমার। যেমনি কন্যা তেমনি পুত্র। হাওয়া কুমারির মতই সুন্দর হাওয়া কুমার শরৎ। সে তার ছোট বোনের জন্য কষ্ট পাচ্ছিল। হাওয়া রাজার অনুমতি নিয়ে সে উড়ে চলল পৃথিবীর দিকে।

তখন মেঘের জল শেষ হয়ে সবে শান্ত হচ্ছে পৃথিবী। বেল্লিক শাহ্ আবার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এমনি সময় বেল্লিক শাহ্ চমকে উঠলেন। আকাশের কালো মেঘ সরে যাচ্ছে। এক অপরূপ রাজপুত্তুর আকাশে উড়তে উড়তে এল। তার গায়ে নীল পোশাক, সেই পোশাকে সাদা তুলোর মত কাজ করা। হাওয়া কুমার এসে পরিচয় দিল। সুমধুর কণ্ঠে বলল, না সে যুদ্ধ করতে আসে নি। সে তার ছোট্ট বোনটাকে বড় ভালবাসে।

বেল্লিক শাহ্ তার হাওয়া কুমারী বোনকে মুক্ত করে দিন। অমন সুন্দর মেয়েটাকে বন্দী করতে কি একটুও কষ্ট হয় না বেল্লিক শাহ্র।

এসব শুনতে শুনতে বেল্লিক শাহ্ দুঃখ পেতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মন বদলাতে আরম্ভ করল। তিনি খুব কষ্ট পেলেন।

কিন্তু বেল্লিক শাহ্ করবেন কি ? হাওয়া কুমারী যে জলে গুলে গেছে। তাকে মুক্ত করার উপায় তাঁর জানা নেই। এসব শুনে শরৎকুমার মন খারাপ করে ফিরে চলল তার দেশে। এই শরৎ কুমারই হল শরৎকাল। বর্ষার পর যে নীল সাদা মেঘ উপরের আকাশে ঝলমল করে তা আর কিছুই নয়। হাওয়া কুমারীর দাদা শরৎকুমার এসেছেন বোনকে উদ্ধার করতে।

হাওয়া কুমার, শরৎ ঋতু দুঃখে ফিরে গেলে।
আবার এসো হাওয়া কুমার বোনকে ফিরে পেলে।

তখন হাওয়া রাজা আবার রেগে গেলেম। রাগে গরগর করতে করতে ডাকলেন তাঁর হিমসেনাদের। বেল্লিক শাহ্কে শাস্তি দাও।

হিমসেনারা ঘুমোয় হিমালয়ে। হিমসেনাদের তখন একে একে ঘুম ভাঙছে। তারা আস্তে আস্তে উড়ে আসতে লাগল পৃথিবীতে। সব হিমে ছেয়ে যেতে আরম্ভ করল। এক সকালে বেল্লিক শাহ্ দেখলেন গাছের পাতায় হিম পড়েছে। সেই হিমে রোদ্দুর পড়ে জ্বল জ্বল করছে। এই হল হেমন্ত ঋতুর জন্ম। পৃথিবীর চির বসন্ত উধাও।

ক্রমে হিম সেনারা এক সঙ্গে ধেয়ে আসতে লাগল। দুদ্দাড় রাগে গরগর করছে সব। ঠাণ্ডায় ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো সব। গাছ পালারা দুঃখে বোবা হয়ে থাকল। পাখিরা ভয়ে পালিয়ে গেল। সব কুয়াশায় ঢেকে গেল। ফুলেরা ভয়ে ভয়ে মুখ লুকোল।

বেল্লিক শাহ্ তখন ভাল হয়ে যাচ্ছেন। শরৎকুমারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মন বদলে গেছিল। হাওয়া কুমারির জন্য দুঃখ হচ্ছিল তাঁর। প্রবল ঠাণ্ডায় বেল্লিক শাহ্ গিয়ে দাঁড়ালেন সমুদ্রের সামনে।

তিনি ডাকলেন, কুমারী, বেরিয়ে এস। জলে বুদ্বুদ কাটলো। হাওয়া কুমারীর দুঃখের নিঃশ্বাস।

বেল্লিক শাহ্ চীৎকার ক'রে উঠলেন, হাওয়া কুমারী আমি দোষ করেছি। হাওয়া কুমারী তো জলে ডুবে গেছে। জলে গলে গেছে সে। কোন জবাব হয় না। বেল্লিক শাহ্‌র মন ভার হয়ে গেল।

গাছপালা পশুপাখি সকলে বলতে লাগল, এই পৃথিবীর যে এই কষ্ট তার জন্য দায়ী বেল্লিক শাহ্। ছিল চির বসন্তের দেশ, বেল্লিক সব বদলে দিল। ফুল বলল, আমি ফুটতে পারছি না, পৃথিবী খারাপ হয়ে গেছে।

পাখি বলল, আমি গান গাইতে পারছি না, ঠাণ্ডায় মরে যাই। গাছপালারা বলল, কোথায় বসন্ত, ঠাণ্ডায় আমার সব পাতা ঝরে গেল!

শীতকাল। বেল্লিক শাহ তখন আবার ঢুকে গেলেন গুহায়।

তিনি চোখ বন্ধ করে ভগবানের কথা ভাবতে লাগলেন। ভগবান হাওয়া কুমারীকে জল থেকে উদ্ধার করে দাও। তাহলে পৃথিবীতে সুদিন আসবে। এখনো বসে আছেন। হাওয়া কুমারী তখনো মুক্ত হয়নি। তাই বসন্ত ছাড়া আরো পাঁচ ঋতুর খেলা চলে পৃথিবীতে। যুদ্ধ করে যখন খুব ক্লান্ত হন হাওয়া রাজা, তখনই কদিনের জন্য বসন্ত আসে। শীত বা গ্রীষ্মের দুপুরে যে টিয়া পাখিটা ডেকে ডেকে আকাশ পানে উড়ে যায়, সে আর কেউ নয়, ঐ হাওয়া কুমারীর মিতা! তার বাঁকানো ঠোঁটে সূর্যের সিঁদুর মাখা।

বেল্লিক শা বেল্লিক তুমি ভগবানের ছেলে।
এমন কাণ্ড ক'রে রাজা, বন্ধু খুঁজে পেলে?

মস্কো ওলিম্পিক এবং ওলিম্পিকে ভারতের ভূমিকা

মুকুল দত্ত

ওলিম্পিক গেমস আমাদের কাছে এসেছে অনাদিকালের পথ বেয়ে। আড়াই হাজার কি তিনহাজার বছর আগে এই গেমস মহা ধুমধামের মধ্যে হত গ্রীকদেশের ওলিম্পাস পর্বতের প্রান্তরে। সেই জন্যই নাম ওলিম্পিক গেমস। ওলিম্পিক গেমস-এর উৎপত্তির কত উপকথা আছে, গেমস নিয়ে আছে কত কাব্য, কত সাহিত্য, কত গৌরবময় কাহিনী আছে এবং এই গেমসের পেছনে আছে কত বড় আদর্শ কে না শুনেছ। সেই ওলিম্পিক গেমসের আদলে এবং আদর্শে শুরু হয়েছে একালের ওলিম্পিক গেমস।

সে কথা এখন থাক, মস্কোতে হয়ে যাওয়া বাইশতম গেমস নিয়েই আলোচনা করি। সেই সঙ্গে ওলিম্পিকে ভারতের ভূমিকা নিয়ে।

ওলিম্পিক গেমসে যে রেকর্ড হয় তাকে বলে ওলিম্পিক রেকর্ড। আর বিশ্ব-রেকর্ড পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো সময়েই হতে পারে। তবে নিয়মমাফিক অনুমোদিত প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত বিচারকদের দ্বারা সে-রেকর্ড স্বীকৃত হওয়া চাই। ওলিম্পিকেও বিশ্ব রেকর্ড হতে পারে, যেমন মস্কোয় ৩৬টি বিশ্ব-রেকর্ড হয়েছে। ওলিম্পিক গেমসে আগের ওলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে বিশ্ব-রেকর্ডকেও ম্লান করলে হয় বিশ্ব-রেকর্ড। তাকে বলা হয় ওলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড। এবারে যে ৩৬-টি রেকর্ড হয়েছে সেই ৩৬-টিই ওলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড। যেমন মেক্সিকো ওলিম্পিকে নিগ্রো লং জাম্পার বব্ বীমন ২৯ ফুট ২½ ইঞ্চি লাফিয়ে এক অসাধারণ বিশ্ব-রেকর্ড করে রেখেছেন। কেউ যদি কোনো অনুমোদিত প্রতিযোগিতায় ওর চেয়ে বেশি লাফায় তবে বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙে যাবে কিন্তু ওলিম্পিক-রেকর্ড ভাঙবে না, ওলিম্পিকে ওর চেয়ে বেশি না লাফানো পর্যন্ত। বিশ্ব-রেকর্ড সব সময়ই ওলিম্পিক রেকর্ডের চেয়ে উন্নত। ওলিম্পিক গেমসেই হোক কিংবা অন্য কোনো প্রতিযোগিতায় হোক একটি ইভেণ্টে পাঁচ ছয় জন রেকর্ড ভাঙ্গতে পারেন। এবারই তো মস্কোয় হাই জাম্পে ছয়জন আগের ওলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। রেকর্ডের অধিকারী কিন্তু হয়েছেন একজনই, যিনি সবচেয়ে বেশি লাফিয়েছেন। ওই রেকর্ডকে একটি রেকর্ডই ধরা হয়েছে। যত প্রতিযোগী এবারে মস্কোয় রেকর্ড ভেঙ্গেছেন সবাইকে রেকর্ডের কৃতিত্ব দিলে বিশ্ব-রেকর্ড হত ৯৭টি, ওলিম্পিক রেকর্ড হত ২৪০-টি।

ইভেণ্টে সেরা কৃতিত্বের অধিকারী একজনই রেকর্ডের স্বীকৃতি পান বলে ৩৬ টি বিশ্ব-রেকর্ড ও ৭৪-টি ওলিম্পিক রেকর্ড ধরা হয়েছে।

যে গেমসে ৯৭ বার বিশ্ব-রেকর্ড এবং ২৪০ বার ওলিম্পিক-রেকর্ড ভাঙ্গাগড়া হয়েছে সে গেমসের মান কত উঁচু ছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা কত তীব্র হয়েছে সহজেই বোঝা যায়।

এর পরও যদি ৩৪-টি দেশ মস্কো ওলিম্পিক বয়কট না করত—যদি আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, চীন ও কেনিয়ার প্রথম সারির প্রতিযোগীরা মস্কোয় আসতেন তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঠত চরমে। রেকর্ড হত অনেক বেশি। দলগত খেলাগুলি হত আরও আকর্ষণীয়।

আমেরিকার পুরুষ সাঁতারুরা মন্ট্রিয়েল ওলিম্পিকে ১৩টি ইভেণ্টের মধ্যে সোনার পদকই পেয়েছিলেন ১২টি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকের বিশ্ব-রেকর্ড এখনো অম্লান। হ্যাঁ, মস্কো ওলিম্পিকের পরেও। অনেকের রেকর্ড মস্কোয় ভেঙে গেছে। অনেকে হালফিল বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। হালফিল করেছেন মানে ওলিম্পিকের কিছু আগে করেছেন। যেমন ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে সি বিয়ার্ডসলে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন গত জুলাই মাসে। দুটি ব্যক্তিগত মেডলি রিলেতে জে ভাসালোর বিশ্ব-রেকর্ড ৭৯ সালে করা। ফ্রি স্টাইলের দুটি রিলেতেও আমেরিকা দলের বিশ্ব-রেকর্ড বেশি দিনের পুরনো নয়। তাছাড়া মন্ট্রিয়েলের সোনাজয়ী জিম মণ্টোগোয়ারি, জন নেবার প্রভৃতি বিশ্ব-রেকর্ডের সময় বজায় রেখে দারুণ ফর্মে সাঁতার কাটছেন। মেয়েদের মধ্যে সি উডহেড ৮০ সালেই ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ও ২০০ মিটার মেডলিতে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। ১৫০০ মিটারে কিমলাইনহ্যান এবং ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে মেরি মেথহারের বিশ্ব-রেকর্ড মাত্র বছরখানেক আগে করা। এরা এলে মস্কোর সুইমিং পুল থেকে সোনার পদক তুলে গলায় পরতেনই।

তেমন মার্কিন মুলুকের অ্যাথলীটরাও নিশ্চয়ই কিছু সোনার পদক পেতেন যদিও মন্ট্রিয়েলে পেয়েছিলেন অ্যাথালেটিকসের মাত্র ৫টি সোনা। সোনা জেতার সম্ভাবনা ছিল ১১০ মিটার হার্ডলস ও ৪০০ মিটার হার্ডলসে বিশ্ব-রেকর্ডকারী রেনাল্ডো নেহেমিয়া এবং এডউইন মোজেসের, দুটি রিলেতে মার্কিন দলের এবং ডেকাথলনে ব্রুস জেনারের। ৪ বছর পর পর এক একটি ওলিম্পিক। এদের অনেকে হয়তো আর সোনা জেতার সুযোগ পাবেন না। তাই এদের কথাই বিশেষ করে লিখছি। চীন, জাপান, পশ্চিম জার্মানি এবং কেনিয়ার বহু নামী প্রতিযোগীও বঞ্চিত হয়েছেন। নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ থেকে।

খেলার ইভেণ্টে—অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, ভারোত্তোলন, সাইকেল চালনা, রাইফেল স্যুটিং, রোয়িংয়ে রেকর্ড ছাড়াও ওলিম্পিকে ব্যক্তিগতভাবে বেশি পদক পাবার রেকর্ড হয়, দলগতভাবে রেকর্ড হয় এবং নতুন কৃতিত্বের রেকর্ড হয়।

মন্ট্রিয়েলে রাশিয়া পেয়েছিল ১২৫-টি পদক—সোনা ৪৭, রুপো ৪৩, ব্রোঞ্জ ৩৫। ওটাই ছিল রেকর্ড। এবার মস্কোর পদক তালিকায় চোখ রাখলে দেখা যাবে রেকর্ড কোথায় পৌঁছে গেছে।

ব্যক্তিগতভাবে পদক জয়ে এবার রেকর্ড করেছেন রাশিয়ার জিমন্যাস্ট আলেকজাণ্ডার দিত্যাতিন। তিনি পেয়েছেন ৪-টি সোনার, ৩-টি রুপোর ও ১-টি ব্রোঞ্জের—মোট ৮-টি পদক। আজ পর্যন্ত একটি ওলিম্পিকে কেউ এত পদক পায়নি। মার্কিন সাঁতারু মার্ক স্পিজ মিউনিখ ওলিম্পিকে পেয়েছিলেন ৭-টি। অবশ্য সাতটিই সোনার পদক।

সাঁতারে অনেকেই মস্কোয় তিনটি করে সোনার পদক পেয়েছেন। পূর্ব জার্মানির এক মেয়ে ইনেস ডায়ারস সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ মিলিয়ে পেয়েছেন ৫-টি পদক। সবচেয়ে বেশি ওলিম্পিক পদক আছে কার দখলে? এবং তাঁর কাছে আছে কটি পদক? না, পাভো নুর্মি বা এমিল জেটোপেক নন, জোসি ওয়েন্স, ভেরা ব্যাসলাভস্কা বা নাদিয়া কোমানেচিও নন। তিনিও এক মেয়ে জিমন্যাস্ট। রাশিয়ার মেয়ে। নাম লারিশা ল্যাটিনিনা। তাঁর বাড়ির আলমারিতে আছে ১৮-টি ওলিম্পিক পদক—সোনার ৯-টি, রুপোর ৫-টি ও ব্রোঞ্জের ৪-টি।

মস্কোয় নতুন কৃতিত্বের নজিরগুলি হচ্ছে: পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ১৫ মিনিটের কম সময়ে ১৫০০ মিটার সাঁতারকাটা। নজির সৃষ্টিকারী পুরুষ সাঁতারু রাশিয়ার ভ্লাডিমির সালনিকভ। মেয়েদের সাঁতারে ১০০ মিটারের সময় সর্বপ্রথম ৫৫ সেকেণ্ডের নিচে নামিয়ে এনেছেন পূর্ব-জার্মানির বারবারা ক্রাউস। পেণ্টাথলনে পাঁচ হাজার পয়েণ্টের বাধা সর্বপ্রথম পার হয়েছেন রাশিয়ার মেয়ে নাদেজদা ট্রাশেঙ্কো।

পেণ্টাথলন প্রতিযোগিতা পুরুষদেরও আছে। আমি মেয়েদের পেণ্টাথলনের কথাই বলছি। পেণ্টাথলনের ৫টি ইভেণ্ট হচ্ছে—১০০ মিটার হার্ডলস রেস, লোহার ভারি বল ছোঁড়া, হাই জাম্প, লং জাম্প ও ২০০ মিটার দৌড়। প্রতিযোগিতা হয় দুদিন ধরে।

পুরুষদের পেণ্টাথলন প্রতিযোগিতা দারুণ শক্ত। তাতে আছে—ঘোড়ায় চড়ে ৮০০ মিটার প্রতিবন্ধক, পথ পার, অসিযুদ্ধ পিস্তল স্যুটিং, ৩০০ মিটার সাঁতার কাটা এবং ৪ হাজার মিটার ক্রসকাণ্ট্রি দৌড়। আগে শুধু সৈন্যদের জন্য এ প্রতিযোগিতা ছিল এবং ইভেণ্ট ছিল আরও শক্ত। এখন সবাই যোগ দিতে পারে। আগের তুলনায় ইভেণ্ট বদলে গেছে বলে এখন বলা হয় মডার্ন পেণ্টাথলন।

এবার হেভিওয়েট বক্সার কিউবার তিওফিলো স্টিভেনসনের আবার সোনা জয় এবং একই ওয়েটে পরপর তিনটি ওলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হওয়াও নতুন নজির। কিন্তু আমি সব চেয়ে কৃতিত্ব দেব দুজনকে—একজন বেশি বয়সী অ্যাথলীটকে এবং তোমাদের মত কম বয়েসী এক সাঁতারুকে।

বেশি বয়সী অ্যাথলীট হচ্ছে পরলোকগত আবেবে বিকিলার দেশ ইথিওপিয়ার আর দৌড়বীর মিরাটস ইফতার। মিউনিকস ওলিম্পিকে ১০ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ-পদক জয়ী ইফতার মন্ট্রিয়েল গেমসে যোগ দিতে পারেননি আফ্রিকার দেশগুলি গেমস বয়কট করেছিল বলে। ৮ বছর পরে এবং ৩৭ বছর বয়সে এবারে জিতেছেন ৫ হাজার মিটার দৌড় ও ১০ হাজার মিটার দৌড়ের দুটি সোনা।

কম বয়সীর কৃতিত্ব কি? সাঁতারে তিনটি বিশ্ব-রেকর্ড করা। যে করেছে তার বয়স কত? মাত্র ১৫ বছর। নাম রিকা রিনিশ। পূর্ব-জার্মানির মেয়ে। মেয়ে না বলে জল-কন্যা বলা উচিত। রিকা বিশ্ব-রেকর্ড করেছে ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আর মেডলি রিলে রেসে।

এবার ভারতের কথা বলি। মন্ট্রিয়েল ওলিম্পিক থেকে ভারতকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। এবার পেয়েছে মাত্র একটি সোনার মেডেল, হকি খেলারই দৌলতে।

ওলিম্পিকে ভারত এ পর্যন্ত কটি পদক পেয়েছে প্রশ্ন করলে অনেকে হয়তো বলবে—১২টি। ভালভাবে হিসাব করে দেখে হয়তো বলবে—হকিতে ৮টি সোনার পদক, একটি রুপোর পদক, দুটি ব্রোঞ্জের পদক এবং আর একটি ব্রোঞ্জের পদক ব্যান্টামওয়েট কুস্তিতে—হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে যেটি পেয়েছিলেন কে ডি যাদব।

কিন্তু আমি যদি বলি এ উত্তর ভুল। তাহলে? আকাশ পাতাল ভেবেও ঠিক উত্তর দেওয়া সবার পক্ষে শক্ত হবে। ওলিম্পিক থেকে ভারতে এসেছে ১৪টি পদক। পারীতে দ্বিতীয় ওলিম্পিকে ভারতের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাথলীট নর্ম্যান প্রিচার্ড পেয়েছিলেন দুটি রুপোর পদক—২০০ মিটার দৌড় ও ২৭০ মিটার হার্ডলস রেসে। ২০০ মিটার হার্ডল রেস পরে উঠে যায়। তখন ভারতে ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় নি। দ্বিতীয় ওলিম্পিকের সময় পারীতে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্বমেলা। সেই মেলার জন্যই হোক কিংবা ওলিম্পিকের জন্যই হোক নর্ম্যান প্রিচার্ড একা একাই ভারত থেকে পারী গিয়েছিলেন এবং ভারতের প্রতিনিধি হিসাবেই ওলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তিনি যে ভারতেরই প্রতিযোগী ওলিম্পিকের নথী-পত্রেই তা লেখা আছে। প্রিচার্ডের নামের পাশেই লেখা আছে—"ইণ্ডিয়া"। অর্থাৎ ভারতের প্রতিযোগী।

নানা গুণের অধিকারী ছিলেন এই প্রিচার্ড। খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। কলকাতার ফুটবল খেলায় উনিই প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন। পড়তেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ৯১ বছর আগে, ১৮৮৯ সালে ট্রেডস কাপের খেলায় শোভাবাজার দলের বিরুদ্ধে প্রিচার্ড হ্যাটট্রিক করেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পক্ষে। পরে হয়েছিলেন আই এফ-এর সম্পাদক। আরও পরে আমেরিকায় গিয়ে ছায়াছবিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। হলিউডের

বিখ্যাত চিত্র তারকা রোনাল্ড কোলম্যানের সঙ্গে উপনায়ক হিসাবে বেশ কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

সে কথা যাক। ওলিম্পিকে ভারতের অন্যান্য খেলার কথা আলোচনা করতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। ফুটবল খেলা নিয়ে তোমাদের আগ্রহ বেশি তাই ফুটবল নিয়ে কিছু লেখা যাক। জানই তো ১৯৬০ সালের পরে ভারত প্রাথমিক প্রতিযোগিতা, মানে প্রি-ওলিম্পিকে বেড়া টপকে মূল ওলিম্পিক ফুটবলে খেলতে অধিকার পায় নি।

আচ্ছা, ওলিম্পিকে ভারতের ফুটবল খেলা নিয়ে লীগ টেব্‌লের মত একটা টেব্‌ল তৈরি করলে কেমন হয়?

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ
১৯৪৮—লণ্ডন—(অধিনায়ক-টি আও)	১	•	০	১	১	২
১৯৫২—হেলসিঙ্কি (অধিনায়ক-এস মান্না)	১	০	০	১	১	১০
১৯৫৬—মেলবোর্ন (অধিনায়ক এস ব্যানার্জী)	৩	১	০	২	৫	৯
১৯৬০—রোম (অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জী)	৩	০	১	২	৩	৬
	৮	১	১	৬	১০	২৭

উপরের টেব্‌লে দেখা যাচ্ছে—৪টি ওলিম্পিকে মোট ৮টি খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটি খেলায়। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪—২ গোলে। ড্র করেছে একটি খেলা। রোমে ফ্রান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে। বাকি ৬টি খেলাতেই হেরে গেছে। মোট গোল ১০টি, খেয়েছে ২৭টি। তার মধ্যে একটি খেলাতেই ১০ গোল। হেলসিঙ্কিতে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে।

ভারতের পক্ষে ওলিম্পিক ফুটবলে কে কে গোল করেছেন? বোম্বাইয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডি'সুজা যিনি এ বছর মারা গেছেন, তিনি একা করেছেন ৪টি গোল। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকসহ তিনটি এবং ওখানেই সেমিফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ১-টি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল ৪—২ গোলে। হেরেছিল যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১—৪ গোলে এবং তৃতীয় ও চতুর্থস্থান নির্ণয়ের খেলায় বুলগেরিয়ার কাছে ০—৩ গোলে। যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধেও গোলটি করেছিলেন ডি'সুজা। লণ্ডন ওলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোলটি করেছিলেন রমন। ওখানে ভারত যে ১—২ গোলে হেরে গিয়েছিল টেবল দেখেই বোঝা যাবে। হেলসিঙ্কিতে ১—১০ গোলে হারও পাবে টেবলে। হার হয়েছিল ওই যুগোশ্লাভিয়ার কাছে। ভারতের পক্ষে গোল

করেছিলেন আমেদ খাঁ। রোমে হাঙ্গেরীর কাছে ভারত হেরেছিল ১—২ গোলে। গোল করেছিলেন বলরাম। পেরুর কাছে হেরেছিল ১—৩ গোলে। গোলদাতা সাইমন সুন্দররাজ। ফ্রান্সের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র ম্যাচের গোল করেছিলেন পি কে ব্যানার্জী।

ওলিম্পিকে ফুটবল খেলার মত ওলিম্পিকে ভারতের হকি খেলারও একটি টেবল করা যাক।

		খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ
১৯২৮—আমস্টার্ডাম (সোনা) (অধিনায়ক জয়পাল সিং)	—	৫	৫	০	০	২৯	০
১৯৩২—লস অ্যাঞ্জেলেস (সোনা) (অধিনায়ক লাল শাহ বোখারী)	—	২	২	০	০	৩৫	২
১৯৩৬—বার্লিন (সোনা) (অধিনায়ক ধ্যান চাঁদ)	—	৫	৫	০	০	৩৮	১
১৯৪৮—লণ্ডন (সোনা) (অধিনায়ক কিষেণলাল)	—	৫	৫	০	০	২৫	২
১৯৫২—হেলসিঙ্কি (সোনা) (অধিনায়ক বাবু)	—	৩	৩	০	০	১৩	২
১৯৫৬—মেলবোর্ন (সোনা) (অধিনায়ক বলবীর সিং)	—	৫	৫	০	০	৩৮	০
১৯৬০—রোম (রুপো) (অধিনায়ক ক্লডিয়াস)	—	৬	৫	০	১	১১	২
১৯৬৪—টোকিও (সোনা) (অধিনায়ক চরঞ্জিত সিং)	—	৯	৭	২	০	২২	৫
১৯৬৮—মেক্সিকো (ব্রোঞ্জ) (অধিনায়ক পৃথ্বিপাল সিং)	—	৯	৭	০	২	২৩	৭
১৯৭২—মিউনিখ (ব্রোঞ্জ) (অধিনায়ক হরমিক সিং)	—	৯	৬	২	১	২৭	১১
১৯৭৬—মন্টিয়েল (×) (অধিনায়ক অজিতপাল সিং)	—	৮	৪	০	৪	২০	১৭
১৯৮০—মস্কো (সোনা) (অধিনায়ক ভি ভাস্করণ)	—	৬	৪	২	০	৪৩	৯
		৭২	৫৮	৬	৮	৩২৪	৫৮

এই টেব্‌ল থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারত কোন অলিম্পিকে হকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কোন ওলিম্পিকে পেয়েছে রুপো কিংবা ব্রোঞ্জের পদক। আরও দেখতে পাবে প্রথম ছয়টি ওলিম্পিকের ২৫টি খেলার মধ্যে ভারত একটি খেলাতেও হারেনি, একটি খেলাও ড্র করেনি। কিন্তু পরের দিকে কিভাবে হেরেছে এবং কিভাবে ড্র করেছে।

ফল দেখে মনে হতে পারে, ভারতের হকি খেলার মান বুঝি খুব নেমে গেছে। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, বাবু প্রভৃতি খেলোয়াড়, যাঁদের কথা অনেকেই জানে—হকি স্টিকে জাদুকরের মত মাঠে যাঁরা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতেন তাঁদের মত খেলোয়াড় এখন না থাকলেও খেলার মান যে কমে গেছে তা কিন্তু নয়। আসলে অন্যান্য অনেক দেশ হকি খেলায় অনেক এগিয়ে গেছে। অনেক দেশ তাই ভারতের উপর টেক্কা দিচ্ছে। হকি খেলায় ভারত যখন ছিল বিশ্বজয়ী তখন ওই সব দেশ হকি খেলত বটে কিন্তু এত গুরুত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে খেলত না। ষোলো বছর পরে মস্কো ওলিম্পিকে ভারত যে আবার সোনা জিতেছে যদি পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড মস্কোয় খেলত তবে সোনা জিততে পারত কিনা সন্দেহ।

সরকারীভাবে ভারত ১৯২০ সাল থেকে ওলিম্পিকে যোগ দিতে শুরু করলে অন্যান্য খেলাধুলায় কিন্তু একেবারেই ভাল ফল করতে পারেনি। অ্যাথলেটিকস ওলিম্পিকের প্রধান ইভেন্ট। সেই অ্যাথলেটিকসে একটি পদক পাওয়া দূরের কথা, ৬০ বছরের মধ্যে —ফাইনালে উঠতে পেরেছেন মাত্র ৪ জন অ্যাথলীট। অবশ্য যে সব ইভেণ্টে প্রাথমিক হিট পার হয়ে ফাইনালে উঠতে হয়। ৪৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে হপস্টেপ ও জাম্পের ফাইনালে উঠেছিলেন হেনরি রেবেলো। ৬০ সালে রোম ওলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে উঠে মিলখা সিং চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। গুরবচন সিং ৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ডল রেসে পেয়েছিলেন পঞ্চম স্থান। আর গতবার মন্ট্রিয়েল ওলিম্পিকে ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে উঠে সপ্তম হয়েছিলেন শ্রীরাম সিং। সাব্য আর কিছুই নয়।

অথচ ছোট ছোট দেশের প্রতিযোগীরা কেমন দুহাত ভরে ওলিম্পিক থেকে পদক কুড়োচ্ছে। পূর্ব জার্মানি কতটুকু দেশ? আয়তনে পশ্চিম বাংলার চেয়েও ছোট। আয়তন ১০৮১৭৮ স্কোয়ার কিলোমিটার। লোকসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ। সেই পূর্ব জার্মানি এবার ওলিম্পিকে পেয়েছে ১২৬টি পদক। আর ৬৫ কোটি মানুষের দেশ ভারত পেয়েছে মাত্র একটি পদক।

চুম্বকে ওলিম্পিক গেমস

কোন শহরে	ক'রকম খেলা	কত দেশ	কত প্রতিযোগী
১৮৯৬—এথেন্স (গ্রীস)	৯	১৩	৩১১
১৯০০—পারী (ফ্রান্স)	১৭	২২	১৩৩০
১৯০৪—সেণ্টলুই (যুক্তরাষ্ট্র)	১৪	১২	৬২৫
১৯০৮—লণ্ডন (গ্রেটব্রিটেন)	২১	২২	২০৩৪
১৯১২—স্টকহোম (সুইডেন)	১৪	২৮	২৫৪৭
১৯১৬—প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য অলিম্পিক গেমস হয়নি			
১৯২০—অ্যাণ্টোয়ার্প (বেলজিয়াম)	২২	২৯	২৬০৭
১৯২৪—পারী (ফ্রান্স)	১৮	৪৪	৩০৯২
১৯২৮—আমস্টার্ডাম (হল্যাণ্ড)	১৫	৪৬	৩০১৪
১৯৩২—লস অ্যাঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্র)	১৫	৪৭	১৪০৮
১৯৩৬—বার্লিন (জার্মানি)	২০	৪৯	৪০৬৬
১৯৪০, ১৯৪৪ } দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য গেমস হয়নি			
১৯৪৮—লণ্ডন (গ্রেটব্রিটেন)	১৮	৫৯	৪০৯৯
১৯৫২—হেলসিঙ্কি (ফিনল্যাণ্ড)	১৭	৬৯	৪৯২৫
১৯৫৬—মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)	১৭	৭১	৩৩৪২
১৯৬০—রোম (ইতালি)	১৭	৮৩	৫৩৪৮
১৯৬৪—টোকিও (জাপান)	১৯	৯৩	৫১৪০
১৯৬৮—মেক্সিকো (মধ্য আমেরিকা)	১৮	১১২	৫৫৩১
১৯৭২—মিউনিখ (পঃ জার্মানি)	২১	১২২	৭১৪৭
১৯৭৬—মন্ট্রিয়েল (কানাডা)	২১	৮৮	৬১৮৯
১৯৮০—মস্কো (রাশিয়া)	২১	৮১	৫৭৪৮
১৯৮৪—লস অ্যাঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্রে)	?	?	?
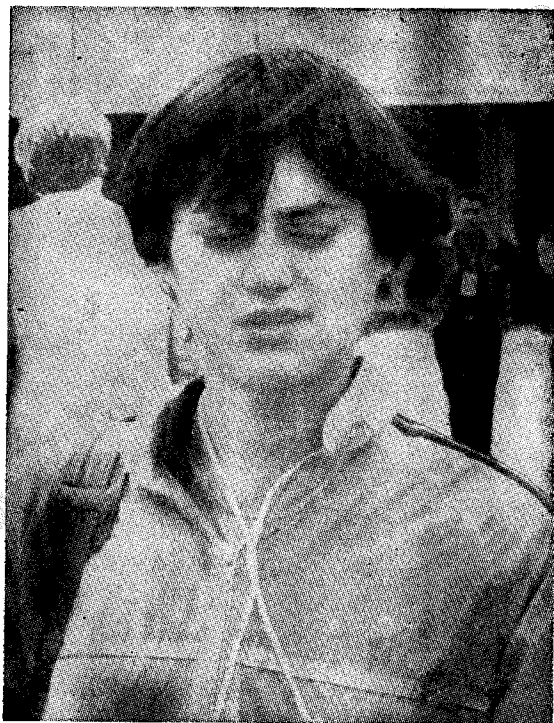
নাদিরা কোমানেক্কি — মস্কো ২২তম ওলিম্পিকে স্বর্ণ বিজয়িনী

মস্কো ওলিম্পিকের শেষ দিনে ওলিম্পিক প্রতীকের বিদায় দৃশ্য
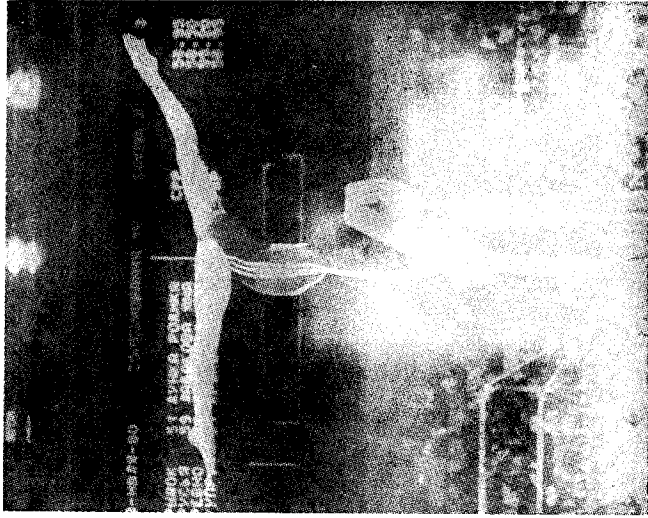
সোভিয়েট রাশিয়ার মহিলা জিমন্যাস্টের অংশগ্রহণকারিণীদের একজনের ক্রীড়াপ্রদর্শনী
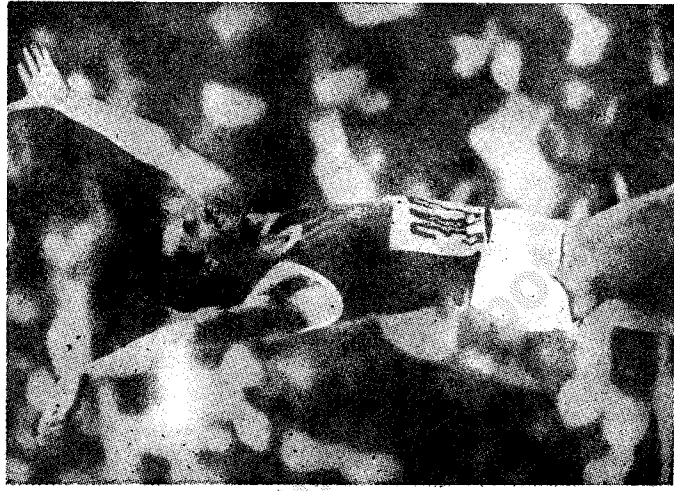
হাইজাম্পে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত জি ডি আর এর গার্ড ওয়েসিগ

মস্কো ওলিম্পিকে (১৯৮০) বিজয়ী ভারতীয় হকিদল।

মস্কো ওলিম্পিকে ১৯৮০ দলগত জিম্‌নাস্টিক চ্যাম্পিয়ান, ইউ. এস্. এস. আর গ্রুপ।

ইন্দ্রনাথ
শ্রীকান্ত
মূল কাহিনী
কথা শিল্পী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পরিকল্পনায়
চিত্রে
কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'।

'ফুটবল ম্যাচ'। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি।

ওরে বাবা—
—এ কি রে!
চটাপট্ শব্দ।

পাঁচ-সাতজন ছোকরা তখন আমার চারিদিকে বূ্যহ রচনা করিয়াছে পলাইবার এতটুকু পথ নাই।

ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বিদ্যুদ্‌গতিতে বাহির হইতে ব্যূহ ভেদ করিয়া আমাকে আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ

পালা।

তুমি ?
তুই পালা না —গাধা কোথাকার !
ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম
—না।
না—তবে কি ? দাঁড়িয়ে মার খাবি না কি ? আচ্ছা তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—
তোর নাম কি রে ?
শ্রী—কা—ন্ত—
শ্রীকান্ত ?
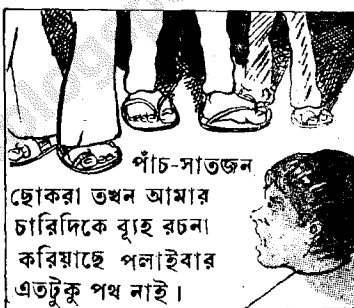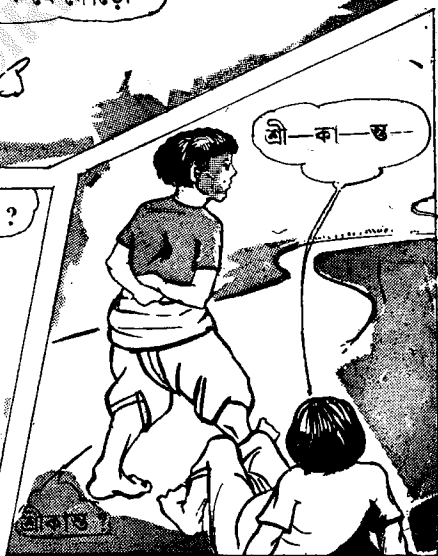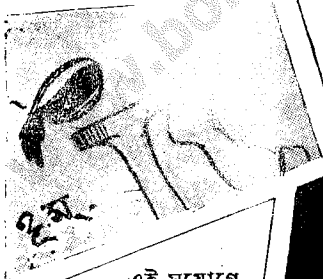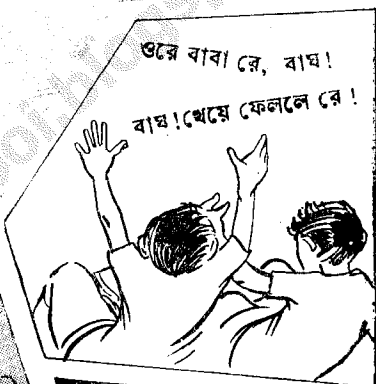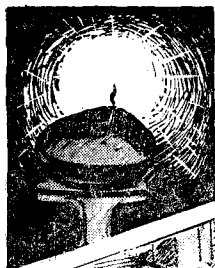
ওরে বাবা রে, বাঘ!
বাঘ! খেয়ে ফেললে রে!
আউর মারো—
ব্যাটাকে মার ডালো—
এই সুযোগে একটা চোর নাকি পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

আরে, এ যে ভট চাযি্যমশাই !
বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।
ছুট ছিলেন কেন ?
ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।
'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।
কিন্তু কোথা সে ? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'ই হোক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায় ? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই !
'উই বয়ঠা'

ওরে বাঘ! বাঘ!
পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া,
পালিয়ে আয়।
এমনি সময়ে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।
কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।
এ বাঘ নয় বোধ হয়।
না বাবুমশাই, না।
আমি বাঘ-ভালুক নই—
হিনাথ
বহুরূপী।
হারামজাদা!
তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?
খোট্টা ব্যাটারা আমাকে যেন
কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ব্যাটাকো
কান পাকড়কে লাও।
ছিনাথের রঙিন কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।
তুই বুঝি এই বাড়ীতে থাকিস, শ্রীকান্ত?
হাঁ।
তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চ?
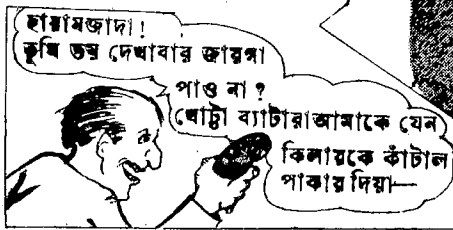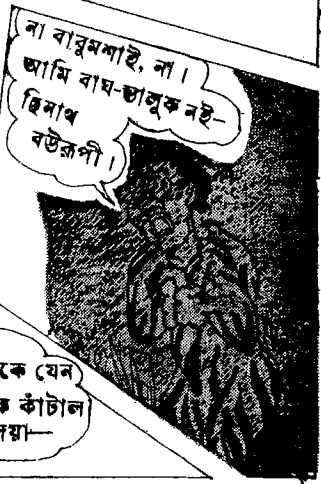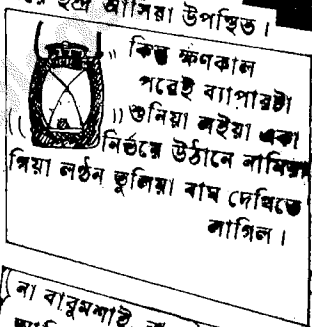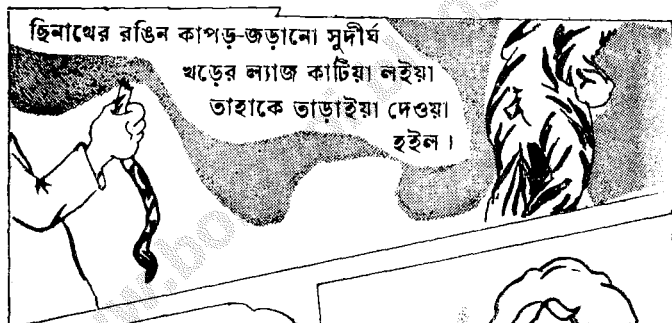
রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা।
আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—
মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?
অত অন্ধকারে
ডিঙিতে চড়বে?
ভয় কি রে! সেই ত মজা।
সাঁতার জানিস?
খুব জানি।
তবে আয় ভাই।
একলা এত স্রোতে
উজান-বাইতে পারিনে
কাউকে খুঁজি, যে ভয়
পায় না।
এই দড়ি ধ'রে পা
টিপে টিপে নেবে যা;
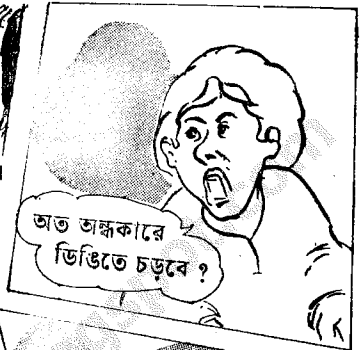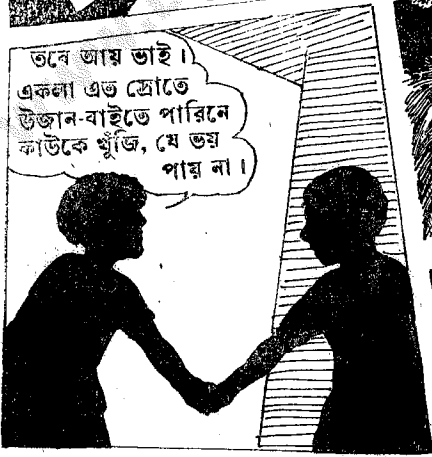
সাবধানে নাবিস, পিছলে প'ড়ে গেলে —
আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না;
তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে না'বব।
দড়ি খুলে দিয়ে?
আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।
ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।
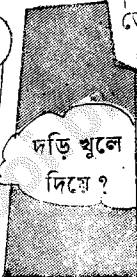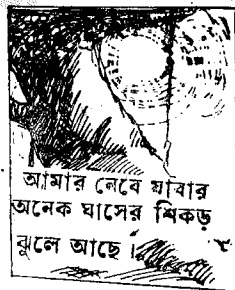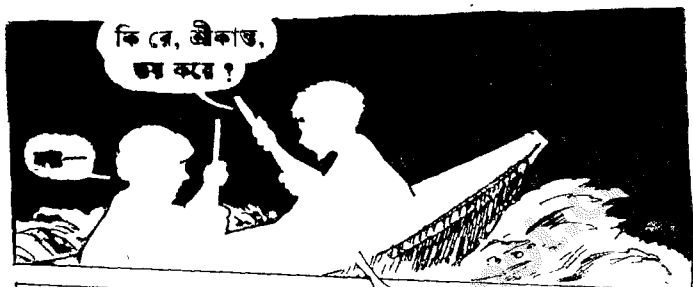
জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ। ওঃ, ভাই ত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি-শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব।

তুই দাঁড় টানতে পারিস ?
পারি।
তবে টান্।

উঁহু—উঁহু যে কালো মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মতো আছে, তারি ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু জেলেরা টের পেলে লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে !

তবে ওর ভেতর দিয়ে নাই বা গেলে !
আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে।

মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই !

তবে এলি কেন ? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ !
আমাকে কাপুরুষ !

এই ত চাই : কিন্তু আস্তে ভাই ব্যাটারা ভারী পাজী আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে, মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করেনিয়ে যাব যে ব্যাটারা টেরও পাবে না।
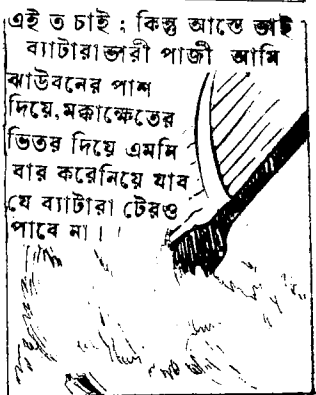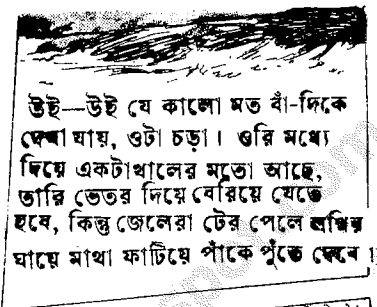
একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বাকি ? প্ররা কি মুখের কথা ! দ্যাখ শ্রীকান্ত. কিচ্ছু ভয় নেই— কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে ব'লে

তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক-ডুবে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্ !

সতুয়ার চড়া ? সে ত অনেক দূর !
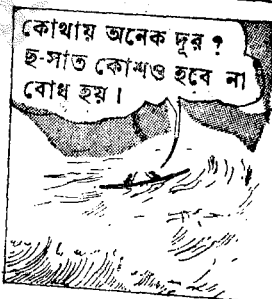
কোথায় অনেক দূর ? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়।

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমিষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল।
এত মাছ কি হবে ভাই ?
কাজ আছে। আর'না, পালাই চল্।

হঠাৎ একস্থানে একটা দমক মারিয়া আমাদের ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতে প্রবেশ করিল।
কি ? কি হ'ল ?
চুপ ! ব্যাটারা টের — পেয়ে এদিকে আসচে— ঐ দ্যাখ্ ।
সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল।
ইন্দ্র
আমি নীচে।
ডিঙি টেনে বার করতে হবে। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।
ও কি ভাই ?
ও কিছু না— সাপ জড়িয়ে আছে ;
কি সাপ, ভাই ?
ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, করেত— কিন্তু কামড়ায় না দুটো তিনটে ত আমার গা-ঘেঁষে পালাল। আর কামড়াইলেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি।
পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বোধন / দক্ষিণারঞ্জন বসু

আগমনীর সুর বাজে ঐ শরৎ-বাঁশিতে
এই ধরাতল জল-স্থল তাই উছল হাসিতে।
দীর্ঘ বরষ পর   বর্ষা শেষে রবিকর
স্বর্ণরেণু ছড়ায় ভূতলে,
দোয়েল শ্যামার ডাকে   কিশলয় জেগে থাকে
দীঘি শোভে কুমুদ-কমলে।
কাশের গুচ্ছ চামর দোলায় হেথা হোথা,
হরিত-হিরণ শস্য ক্ষেতে আসন পাতা ;
অপরূপ পরিবেশে   সুমধুর হাসি হেসে
অতিথির পুণ্য আগমন
দুলিয়ে দুই চরণ-পদ্ম সোনার শরৎ রথে,
শিউলি এত তাই ছড়ানো সকল পথে পথে ;
চমৎকৃত এ বিশ্ব-ভুবন !
অদূরে নদীর চরে   কি-সুখে যে খেলা করে
যত হংস-বলাকার-দল,
দেবীর বোধন-ক্ষণ   হর্ষ-মুখর মন
নামে যেন আনন্দের ঢল।
আনন্দে মেঘ আকাশ বুকে দল বেঁধে যায়,
সপ্তসুরে বাতাস মায়ের বন্দনা গায় ;
মায়ের কাছে ছোট-বড়োর ভেদ কিছু নাই,
বোধন মন্ত্রে মায়ের কাছে প্রার্থনা তাই।

ডাকাতে-কাশি / আদিনাথ নাগ

ডাকাত বটে গঙ্গা সেন,
সদাই ঘঙর্-ঘঙ্ কাশেন।
কাশির আওয়াজ শুনবে যেই—
বুঝবে গঙ্গা পৌঁছেছেই।

এক কাশিতে ভয়টা কম—
প্রাণ যাবে না, পিঠ জখম।
দুই কাশিতে শঙ্কা আছে—
হাত-পা বেঁধে টাঙায় গাছে।
তিন কাশিতে সর্বনাশ,—
মুণ্ডু কেটে ফেলবে লাশ॥

আজগুবি / আশিস সান্যাল

এক ছিলো গিরগিটি,
ধুতি-জামা পরিপাটি
গিয়েছিলো একদিন বাজারে।
গিয়ে দেখে, হনুমান
গায়ে সাদা চাপকান
বসে আছে চুপচাপ বাজারে।

তার মাঝে বসে বিল্লী,
বাড়ি বুঝি নয়া দিল্লী,
গাইছিলো কাওয়ালি গান;
তাই শুনে গিরগিটি,
হেসে করে হুটোপাটি,
মুখে দিয়ে দোক্তা ও পান॥

চেঞ্জে যাওয়ার ঠ্যালা / মনোজিৎ বসু

ট্যাক্সিওলা ! ট্যাক্সিওলা ! রোখ্‌কে বাপু, রোখ্‌কে,—
হাত তুলে যে দাঁড়িয়ে আছি, পড়ছে নাকি চক্ষে ?
ইস্টিশানে ধরব গাড়ি,—একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মী।
তুমি তো আর বুঝবে না ছাই চেঞ্জে যাওয়ার ঝক্কি !
'শরীরটাকে সারিয়ে নিতে হাওয়া-বদল দরকার'—
সেই কথাটা বুঝিয়ে গেলেন ডাক্তার-শ্রী সরকার।
ভেবেছিলাম একলা যাব, কম খরচেই সারব,
কিন্তু পেলাম বাগ্‌ড়া তাতে, কী ক'রে আর পারব ?
একলা আমায় ছেড়ে দিতে কেউ তো দেখি চায়না,
বাড়ির সবাই সঙ্গে যেতে তাই ধরেছে বায়না।
কী আর বাপু করব বলো,—বন্ধ ক'রে বাড়ি
সকলকে সঙ্গে নিয়েই চেঞ্জে দেব পাড়ি।

কী হ'লো ভাই, দেখছ কী ছাই, অমন ক'রে চেয়ে ?
ইনিই আমার গিন্নী এবং ওরাই ছেলেমেয়ে।
ঘোমটা মাথায় বৌমা আমার, পুঁচ্‌কেগুলো নাতি,
পিসির হাতে জপের মালা, জামাই নিয়ে ছাতি।
সব মিলিয়ে খুব বেশি নয়, এই তো মোটে ষোলো !
তোমার বাপু ভাবনা কিসের ? ভাড়া পেলেই হ'লো।
গাড়ির ভেতর হোক্ না মোদের একটু ঠেসাঠেসি,
কপাল জোরে ট্যাক্সি তোমার পেলাম সেটাই বেশি !
মালপত্তর আমরা সবাই দিচ্ছি না-হয় তুলে,
তুমি শুধু নজর রেখো, কিছু না যাই ভুলে।
ছোটোবড়ো বাক্স-বেডিং মাত্র গোটা কুড়ি,
জলের কুঁজো চারটে এবং দশটা ফলের ঝুড়ি।

কী হ'লো ভাই ? ভাবনা কিসের ? বলোই না এই বেলা—
ট্যাক্সি ছেড়ে আমায় তুমি বলছ নিতে ঠ্যালা ?
ঢের হয়েছে ! যাও চ'লে যাও, ট্যাক্সি তোমার চাই নে,
ভাঙাচোরা ধ্যাড়ধেড়ে ওই ট্যাক্সিতে আর যাই নে !
বুঝছি এখন তোমায় ডেকে কী বোকামিই করলাম,
ঠ্যালায় চ'ড়েই যেতে হবে ! হায় কি ঠ্যালায় পড়লাম !!

মাটির মানুষ / রঞ্জন ভাদুড়ী

বাবা নাকি মাটির মানুষ সবাই বলে,
তাই যখনই নাইতে নামে নদীর জলে
আমি তখন আঁতকে উঠি—ভয়েই মরি,
মনে মনে মা-দুগ্গাকে স্মরণ করি—
বাবা যেন জলের ছোঁয়ায় না যায় গলে !

এমনতরো ভাবনা আমার নয় অকারণ,
মাটির পুতুল চান করিয়ে ভেঙেছে মন—
আচ্ছা করে তেল মাখিয়ে টবের জলে
ডুবিয়ে রেখেছিলুম তাকে খেলার ছলে,
একটু পরেই দেখতে হল কাদার মতন।

বাবা নাকি মাটির মানুষ সবাই বলে,
তাইতো আমি শিউরে উঠি নামলে জলে।

অল্প জলের গল্প / রাখাল বিশ্বাস

অল্প জলের গল্প জানি সাঁতার কাটা,
ডুবতে পারি, ভাসতে পারি, কাতলা কাঁটা,
বিঁধলো কবে কার গলাতে ?
যাচ্ছি না তার মন গলাতে
খাচ্ছি শুধু পাচ্ছি বলেই মানের বাটা।

ইশ্‌কুলে যা, শুধোয় যে মা, পাচ্ছে হাসি
বাড়ির ছাদে চড়ুইভাতি হচ্ছে বাসি
কিচ্ছুটি তাই চাই না
ইশ্‌কুলে আর যাই না
যাই না বলেই পাই না তিলের নাড়ুর রাশি।

মাতারিকি / দাউদ হায়দার

মাতারিকি—
এ কী
ঝিকিমিকি
কোথা গেল সে তারার।

তানে বুঝি দিলো ফাঁকি
হিংসুটে পরী ডাকি
ও-পাড়ার!

তুমি ওই কার কাছে—
জল-দেশে কি করো
আমি ভাবি, তুমি পাছে
ভয়ে বড়ো জড়োসড়ো।

মাতারিকি
সেই খুকি
তোমা নিয়ে গেল কোথা।

তারাটির আলো নেই
বুঝি তাই আমি সেই
খুঁজি তোমা হেথা হোথা।
তারাটিকে ভেঙে দিয়ে
তুমি আছো জলে গিয়ে
তাই ওই জলে এত শ্বাস!

মাতারিকি
খুকিটি কী
আমা-মতো দ্যাখে রোজ নীলাকাশ!

[রুশদেশের একটি রূপকথা অবলম্বনে]

শুধুই কাঁকর শেষে / সুশীলকুমার গুপ্ত

মুখে ভাতের গরাস পুরে
চেঁচান হবু রাজা,
'চালে কাঁকর মেশায় যে তার
হবে চরম সাজা'
ভাত চিবোতে কাঁকর লেগে
নড়ে দাঁতের গোড়া,
'ভাঙব এবার এ কারবারি
আছে রাজ্য জোড়া।
নিয়োগ কর এখুনি লোক
করতে খবরদারি,
ধরে আনুক যে বেটারা
লোভী মিথ্যাচারী।'
লোক নিযুক্ত হল তখন
তবু বাড়ল কাঁকর ;
যত লোকের নিয়োগ ঘটে
কাঁকর ততই মেশে ;
ক্রমে ক্রমে কাঁকরে চাল,
শুধুই কাঁকর শেষে।

আমপাতা জামপাতা / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আমপাতা জামপাতা কাঁঠাল পাতায় সই
জলেকাদায় তৈরি হল বাসি বিয়ের দই।
এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
ঝুম্‌কোলতার টোপর মাথায় বসলো সেথায় বর !

ইন্টিবিন্টিশিন্টিরা সব বিয়ের বরযাত্রী,
দশটা তেরোয় লগ্ন গেল, কোথায় গেলেন পাত্রী ?

হরিনাম / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভৃত্যের নাম হরি, সবাই ডাকে হরিয়া
এই আকালে রোজ সকালে আনে বাজার করিয়া।
কলকাতায় গোল বাঁধায় নিত্য নতুন বাজার দর
হিসাব হরির মেলেনা তাই টাকা আনা গোনার পর।
সব চেয়ে ভাই শ্রীমান হরির মাছ কেনাটাই রহস্য
সবাই বোঝে ব্যাটার ম্যানেজ, পরিবেদনা কাকস্য !
দামটা যদি সঠিক বলে ওজন তবে কমাবেই
দশ বারোবার ডাকার আগে দেয়না সাড়া সে কাউকেই।
বললে বলে "সকালবেলা হরির নাম খারাপ কি
হরিনামের শ্রীনাম হরির নিত্য নতুন ইয়ার্কি।
ভীষণ রেগে ভাবি এবার বলবো তাকে দূর হ
বলতে গিয়ে হয়ে পড়ি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
কাজের লোক পাওয়া নয়তো এ বাজারে সস্তা
বাজার রেশন কয়লা তেল টানা গমের বস্তা।
সুতরাং ভাই হরিই এখন যাচ্ছে হরণ করিয়া
এই আকালে রোজ সকালে আনছে বাজার করিয়া।

কঙ্গো থেকে / উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কঙ্গো থেকে এলেন ফিরে
বঙ্গদেশের সারজন
সেদেশে কি ছিল পশার
নোরা এবং টারজন
বাঁচলো নাকি তারই হাতে
ভাত জোটে না এখন পাতে
এখন এই কলকেতাতে
রোগী মাত্র চারজন !

মুক্তিপণ / খোকন চক্রবর্তী

দিনের আলোয় পাই নাই যারে
কেন মিছে খুঁজি রাতের আঁধারে
যা হারায়ে গেছে তার লাগি কেন কাঁদি
কেন তারে জড়ায়ে রাখি স্মৃতির মাঝারে।
"ওরে, নির্বোধ মন, শোন ওরে শোন
হারায়ে আবার হারাবি অমূল্যরতন—"
নে শিক্ষা নে অতীত হতে
নতুন পথে নতুন ভাবে
ছেড়ে দে গোলামগিরি
ঘৃণা কর বাবুগিরি
নেমে আয় কোমর বেঁধে
ভেঙে ফেলতে এই কু-সমাজে
ভবিষ্যতের নবজাতকে
আন ধরে নতুন সমাজে
তোর বুকের রক্ত পড়বে ঝরে
এই ধরণীর পরে।
তোরই রক্তে উঠবে গড়ে নতুন সমাজ,
নব আশা—ভরসা লয়ে।

ছড়া / সুধীরকুমার করণ

পান্তাড়ি তোল সন্ঝে বেলা
পুকুরঘাটে ধুয়ে গা
গাল গাইছে ব্যাঙের ছা।
ঠাকুরদাদা বুড়ো ব্যাঙ্
গাল ফুলিয়ে গ্যাঙোর্ গ্যাঙ্।
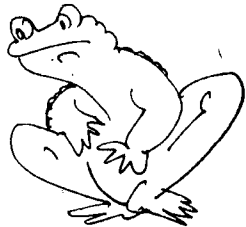
কেলেঙ্কারি / রাম বসু

এই জোনাকি সত্যি নাকি
বেগুন গাছে মই লাগিয়ে পাড়ছিলি কি ঝিঙে
তোর ফুলো গাল পেয়ারা ভেবে
আকাশ থেকে হঠাৎ নেমে
বহুত জোরে ঠুকরে দিয়ে পালিয়ে গেল ফিঙে ?
তারপরে কী কান্না বাবাঃ !
চিনি দিয়েও থাবা থাবা
রেশ থামে না ; তখন দিদি আনলো কিনে দই
এই জোনাকি তারপরে কি ?   বলবো নাকি ?—বলি ?

মহুয়া বনের ভালুকগুলো
কেউ বা হুলো কেউ বা নুলো
দই না দেখে থপ্‌থপিয়ে সই পাতাতে এল

কোথায় গেল কান্না তখন
এ সই কি যেমন-তেমন !
ভয়ের চোটে বল্লি হেঁকে—যা না আপদ
হবো না তোর সই

একটা দই
অন্য হাতে মই
মায়ের কাছে গিয়ে
বল্লি কেঁদে ঘাড় বেঁকিয়ে
জরাইকেলায় একটুও নয়, রাউরকেলা চলো
এই জোনাকি, সত্যি নাকি ? বল দেখি কী কেলেঙ্কারি হলো !

রোদের সোনা দোলে / পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

সবুজ সবুজ মাঠের ঘাস—
চোখের আগে আলো ;
খেলতে খেলা নরম ঘাসে
খুবই লাগে ভালো !
পূব-আকাশে সূয্যিমামা
মন-মাতিয়ে তোলে !
ফুলের বনে ঝিলমিলিয়ে
রোদের সোনা দোলে।

ছড়িয়ে খুশী ফুলের রেণু
হাওয়ার বুকে ওড়ে ;
মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে
পাতায় পাতায় ঘোরে !
মন্‌টি-রানী তাই তো খুশী
বাঁধবে খেলাঘর ;
ভাব জমাবে সবার সনে
কেউ রবে না পর ॥'
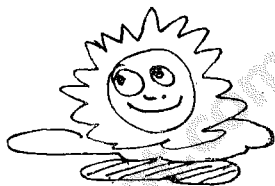
একটা ছিল বুড়ো / শশাঙ্কভূষণ চৌধুরী

একটা ছিল বুড়ো
নাকটা হাতি-শুঁড়ো।
রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে
গর্জে ওঠে ভীষণ জোরে।
পথের ধারে ঘর।
খবর ভয়ঙ্কর !—

ভূতরা কোথায় থাকে / সুবোধ ধর

তোমরা কি কেউ ভূত দেখেছো
সত্যিকারের ভূত ?
মামদো, গেছো, মেছো, পেঁচো
অদ্ভুত, কিম্ভুত ?
শ্মশানবাসী, ছ্যাখেন হাসি
ভয় দেখানো ভূত ?
বন বাদাড়ের—জলার ধারের
যে ভূত অচ্ছুৎ ?
বট পাকুড় আর তেঁতুল শিরীষ
যাদের বাসস্থান
শ্যাওড়া শিমুল তাল গাছেতে
যারা শোনায় গান।
পোড়ো বাড়ির ন্যাড়া ছাতে
যে ভূত শুয়ে থাকে
চলতি পথে আঁধার রাতে
দেখেছ কি তাকে ?
অমাবস্যার রাতে কিংবা ঠিক
দুপপুর বেলা
টাপুর টুপুর, ধাঁই ধপাধপ্
মারছে যারা ঢেলা

তোমরা বলতে পারো
কোথায় তারা থাকে ?
নাকী সুরে, খোনা গলায়
কাদের তারা ডাকে ?
কেউ যদি না দেখে থাকো
শোন আমার কাছে
কোথায় তারা থাকত এবং
আজও কোথায় আছে।

ভয় কাতুরে ভীতু ছেলের
মনেই তাদের বাসা
সেখানেতেই চিরটা কাল তাদের
যাওয়া-আসা।
মন থেকে ভয় হঠিয়ে দিলে
বুঝবে সহজেই
ভূতুড়ে সব ভূতের দলে
একটাও ভূত নেই।

পণ্ডিত হতে হলে / রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

পণ্ডিত হতে হলে ইয়া টিকি চাই,
বিরাট গোঁফের বোঝা, গলা বাজখাঁই।
চলতে বলতে কথা, নড়া চাই ছড়ি
দেখলে ছুটবে সবে, করি তাড়িঘড়ি।
চাঁদির ফ্রেমের চাই চশমা বাহার
নাকের ডগায় ঠিক স্থানটি যাহার।
লিকলিকে রোগা হবে নড়বে শরীর
ঢিলেঢালা পানজাবি ওপরে অধীর।
পায়েতে খড়মজোড়া খটমট করে
ভাববে ছেলেরা ভয়ে পণ্ডিত ধরে।
পণ্ডিত হতে হলে শেষ কথা ভাই
খুব কম মাইনেতে মন থাকা চাই।
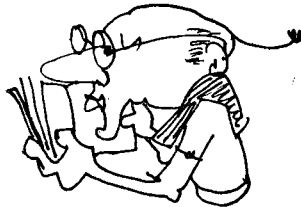
গরমিল / ললিতমোহন মাহাত

মধুপুরের মাধু মাসি মুখে শুধুই বিষ,
ভদ্র পাড়ার ভদ্র মশাই মারেন টেনে শিস।
সোনারপুরের রাজকন্যার ধরণটি হয় কালো,
উজলপুরের রাজবাটীতে নাইকো মোটেই আলো॥
দাসনগরের চরণদাসের বিরাট জমিদারী,
কামারপুকুর গ্রামে শুধুই স্বর্ণকারের সারি।
ইছাপুরে থাকতে সবাই বড়ই অনিচ্ছুক,
বর্ধমানের মান্নাবাবুর কমছে খালি সুখ।
নামের সঙ্গে কাজের মিল যাচ্ছে কি ছাই পাওয়া,
ভেবে ভেবে রামু তাই ছাড়লে নাওয়া খাওয়া।
ছোট্ট রামুর ছোট্ট মাথায় হিসেব নাহি আসে,
যুগের হাওয়ার গহীন গাঙে তৃণের মতই ভাসে॥
কথায় কাজে এক আর নামে কাজে মিল,
উল্টোমুখি এ যুগেতে মিলবে না এক তিল।

কুস্তি লড়িং / হরেন ঘটক

ফড়িং, ফড়িং, গঙ্গাফড়িং ;
এসো তো ভাই কুস্তিং লড়িং।
যদিই আমি উল্টে পড়িং
আমায় তবে তুলবে ধরিং।
নাই বা যদি নড়িং চড়িং
হাসপাতালে তড়িং ঘড়িং
পাঠিয়ে দেবে ট্যাক্সি করিং।
দুর্ঘটনা গেলে ঘটিং
দর্শকেরা উঠবে চটিং !
গঙ্গাফড়িং, গঙ্গাফড়িং
কাজ তবে নেই কুস্তি লড়িং॥

পিন্‌ডিদার মানবিক ভূত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শুরু থেকেই বোঝা গেছল পিন্‌ডিদার মেজাজপত্র সেদিন একটুও ভালো ছিল না। যদিও আমাদের পাঁচজনের হাতে কুড়ি পয়সার ঝাল মুড়ির ঠোঙা আর পিন্‌ডিদার একলার হাতে আট আনার অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সার ঠোঙা। চট্ করে ফুরিয়ে যাবে বলে আমরা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি আর যত না ঝাল তার থেকে বেশি হুসহাস শব্দ করছি। আর রাগের চোটে পিন্‌ডিদা খাচ্ছে বলার থেকে মুড়ি-কুল ধ্বংস করছে বলা যেতে পারে।

পিন্‌ডিদার বিবেচনায়, আর বলা বাহুল্য তার পয়লা নম্বরের চামচে হোঁতকা হাবুলের বিবেচনায় দোষটা আমারই। কারণ আমি নাকি লোভ দেখিয়ে অসুস্থ শরীরে পিন্‌ডিদাকে এখানে টেনে এনে তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। চটপটির হাত থেকে মুড়ির ঠোঙাটা নিয়ে একবার ভিতরে চোখ চালিয়েই ফ্যালফ্যাল করে এমন চেয়ে রইল যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। তারপর আমার দিকে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কানে গরম সীসে ঢালতে চাইল।—দ্যাখ সোনা, কাট ছাঁটের ব্যাপারে তুই তো দেখি আমার ব্রেজিলের ফ্যানদেরও হার মানালি! প্রদীপনারায়ণ দত্তকে তারা পি.এন. ডি করেছে তারপর পিন্‌ডি করেছে—এই ছাঁট-কাটে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি—আর তুই কিনা মোগলাই পরোটা আর কষা-মাংস ছেঁটে দিয়ে শেষে ঝাল মুড়িতে দাঁড় করালি? বলিহারি তোর ভক্তিশ্রদ্ধা।

জবাবে হাবুল-হাতিটা ঘন-ঘন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল, কারণ দ্বিতীয় দফায় পিন্‌ডিদাকে ওই ডেকে এনেছিল বলে পিন্‌ডিদা ওর ওপরেও তেরিয়া হয়ে উঠতে পারে ভাবছিল হয়তো।

ব্যাপারখানা খুলেই বলি। আমি কার্তিক আর চটপটি আসতে আসতে দেখি আমাদের চিরাচরিত বসার জায়গায় হাবুল একলা বসে আছে। সাধারণত ওই পিন্‌ডিদাকে নিয়ে আসে। পারলে কাঁধে করে নিয়ে আসে—পিন্‌ডিদার এমনিই ভক্ত হনুমান সে। পিন্‌ডিদা ছাড়া আড্ডা জমানোর চেষ্টা মানে বরফ ছাড়া কুলপী জমানোর চেষ্টার মতো। এই এক ব্যাপারে আমরা বর্ধমান বাবুগঞ্জের মার্কা মারা আড্ডাবাজ পার্টি পিন্‌ডিদার কাছে হার মেনেছি সেটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই।

কাছ কাছি হতে হাবুল দুশ্চিন্তায় তার থলথলে মুখ হাঁড়ি করে জানান দিল, আজ আর পিন্‌ডিদার আশা নেই বোধহয়—কম করে দশবার ডাকলাম—বাড়ির সামনে বিশ মিনিট পায়চারি করলাম—পিন্‌ডিদার নো পাত্তা। অথচ কাল ফেরার সময়ে আমাকে

আজ একটু সকাল সকাল ডাকতে বলেছিল—এক জায়গায় হয়ে তারপর মাঠে আসার কথা। এরকম তো হয় না···

আমি আমার জায়গা নিয়ে বসতে বসতে বললাম, তাহলে হয়তো তুই ডাকতে আসার আগেই বেরিয়ে গেছে।

হাবুল তাইতেই তেতে উঠে বলল, কখনো তা হতে পারে না। পিন্‌ডিদা কথার খেলাপ করে না!

এই রকমই মোটা বুদ্ধি ওর। হোঁতকাটার হাতের নাগালের মধ্যে বসে তর্ক করাও নিরাপদ নয়। দূরের দিকে চোখ যেতেই দেখি আমাদের সংস্কৃত বিশারদ কেবলু হনহন করে আসছে। সংস্কৃত পরীক্ষায় হালে পানি পায়না বলে চুটিয়ে সংস্কৃত কপচে গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কেবলুর হাঁটা দেখেই মনে হল খবর আছে।

একটু দূর থেকেই গলা চড়িয়ে জানান দিল, নো পিন্‌ডিদা—পিন্‌ডিদা শ্মশান যাত্রাস্ত ফলং ভোগন্তি!

শুনে আমাদের পেটের ভেতরসুদ্ধ কচলে উঠল। এ বলে কি! কাল বিকেলেও জলজ্যান্ত মানুষটাকে দেখলাম, আড্ডা দিলাম—এর মধ্যে সে বিনা নোটিসে শ্মশানযাত্রা করে বসল—এ হয় কি করে? তাছাড়া সবার আগে তো তাহলে আমরা জানব!

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, বলিস কিরে তুই?

আমাদের মুখ দেখেই কেবলু বুঝেছে ওর সংস্কৃত বলার মধ্যে বড় রকমের কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সামাল দিতে চেষ্টা করল, সাদা কথাটাও বুঝলি না, কি-যে পাকা মাথা তোদের জানি না। পাশের বাড়ির এক বুড়ো টেঁসে যেতে কাল রাতের ঠাণ্ডায় শ্মশানযাত্রা করে পিন্‌ডিদার শরীর খারাপ হয়েছে—আজ সকাল থেকে গুনে গুনে আড়াইশ হাঁচি হয়েছে বলল। আমি আসতে আসতে দেখি গায়ে চাদর জড়িয়ে পিন্‌ডিদা দোতলার রেলিংএ ঝুঁকে রাস্তা দেখছে। ডাকতেই খেঁকিয়ে উঠলো। —বুড়ো মরার ধকলে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছি—সর্দিতে ভেতরটা ঢপঢপ করছে—এর মধ্যে মাঠে গিয়ে কিছু লাভ হবে, শরীর টানার মতো মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের ব্যবস্থা করবি যে এত আদর করে ডাকছিস?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের। পিন্‌ডিদা শ্মশানযাত্রা করেনি, শ্মশান-যাত্রার ফল ভোগ করছে। অমন চমকে দিয়েছিল বলে কেবলুর মাথায় আমারই একটা রাম গাঁট্টা বসাতে ইচ্ছে করছে। অনাত্মীয় কেউ মারা গেলে শ্মশানবন্ধু হয় পিন্‌ডিদার এই গুণ আমাদের জানা ছিল না। শ্মশান-টশানে আমার যেতে বিচ্ছিরি লাগে, ও-দিকে গেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলি। কিন্তু পিন্‌ডিদা আজ এলে ওই শ্মশান-টশান নিয়েই হয়তো ছমছমে আড্ডা জমত একটা। পিন্‌ডিদার অভিজ্ঞতার তো আর শেষ নেই। তাছাড়া পিন্‌ডিদার জন্য হঠাৎ বেশ টানও অনুভব করলাম। কেবলু হতভাগার কথা শুনে যা

ভেবে আঁতকে উঠেছিলাম তাই যদি হত! আমার মনে হতে লাগল, পিন্‌ডিদার সঙ্গে আমাদের সকলের একটা ফাঁড়া কাটল। শুধু এই কারণেই কিছু খরচা করা উচিত। কিন্তু পকেটে মাত্র দেড়টি টাকা সম্বল তা-ও জানি।

ভেবে চিন্তে আমি হাবুলের দিকে তাকালাম। বললাম, মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের মতো অতটা হবে না—তবে সর্দি লাগা শরীর খানিকটা টানার মতো একটু কিছু হবে—হেবো যা তুই পিন্‌ডিদাকে ডেকে নিয়ে আয়।

হাবলু তখুনি উঠে রওনা দিল। আমার ইচ্ছে ছিল চটপটিকে পাঠিয়ে স্পেশাল ঝাল দিয়ে পিঁয়াজি আনা হোক। কিন্তু তার আগেই ঝালমুড়িঅলা এসে হাজির। ও আমাদের চেনে আমরাও ওকে চিনি। তাই এদিকে এলে না ডাকতেই হানা দেয়। হুকুম করলেই কটকটে ঝালের স্পেশাল ঝালমুড়ির ঠোঙা সাজায়। আমরা সকলেই এক মত। দেড় টাকায় ক'টা আর পিঁয়াজি হবে তার থেকে স্পেশাল ঝালমুড়ি ভালো। এতেও পিন্‌ডিদা'র ঠাণ্ডা লাগা শরীর চাঙ্গা হবে। আমাদের পাঁচ জনের অর্থাৎ আমার চটপটির কেবলুর কার্তিকের আর হাবুলের কুড়ি পয়সার ঠোঙার অর্ডার দিলাম আর পিন্‌ডিদার পঞ্চাশ পয়সার। পিন্‌ডিদার বেলায় ভাগের ব্যাপারটা এই রকমই হয়।

আমাদের হাতে হাতে কুড়ি পয়সার ঠোঙা আর চটপটির হাতে কুড়ি পয়সার ঠোঙা দিয়ে আর হাবুলের কুড়ি আর পিন্‌ডিদার পঞ্চাশ পয়সার ঠোঙা দুটো সামনে রেখে মুড়িওয়ালা বিদায় হতে না হতে অদূরের রাস্তায় পিন্‌ডিদা আর হাবুলের মূর্তি দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদার ঠোঙা চটপটির হাতে আর হাবুলের ঠোঙা কেবলুর হাতে। নইলে পিন্‌ডিদার যে খুঁতখুঁতনি, হয়তো বলে বসবে ঘাসের ঠাণ্ডায় মুড়ি মিইয়ে গেছে—আর হেবো মোটকাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবে।

কিন্তু চটপটির হাত থেকে ঠোঙা নিয়ে আর তাতে মুড়ি দেখে পিন্‌ডিদা যে অমন

খিঁচড়ে যাবে আর কট-কট করে ওই রকম কথা শোনাবে তা কি ভেবেছি ? তার উঁচু টিবির আসনে বসে খাচ্ছে তো দিব্বি, অথচ ভাবখানা এমনি যেন মুড়ি খাইয়ে তার ইজ্জত মেরে দিয়েছি।

তার কথার পোঁ ধরে হাবুল আয়েস করে মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলল, সত্যি সোনা, তুই দেখালি বটে। মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের বদলে একটু কিছু হবে বলতে আমি ভাবলাম বিনোদের দোকানের মেটের চচ্চড়ি চচ্চড়ি অন্তত হবে—আর তুই কিনা একেবারে মুড়িতে নেমে এলি ! কাল রাতের ওই ঠাণ্ডায় শ্মশান যাত্রা করে পিন্‌ডিদার শরীরের কি হাল জানিস ?

আমাকে জবাব দিতে হল না, তার আগে পিন্‌ডিদা হাবুলের ওপরেই রাম খাপ্পা হয়ে উঠল।—কি বললি স্টুপিড কোথাকারের—আমি শ্মশানযাত্রা করে মানে ?

হাঁসফাঁস করে হাবুল শুধরে বলল, মানে, কনকনে শীতের রাতে ওই বুড়ো মড়া শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ধকলে বলছিলাম—

পিন্‌ডিদা আরো খাপ্পা।—ইডিয়েট ! আমি বুড়ো মড়া শ্মশানে নিয়ে গেছলামতোকে কে বললে ? আমার কি দায় পড়েছে ?

আমরা সকলেই হতভম্ব। পিন্‌ডিদা এখন আর হাঁচছে কাশছে না অবশ্য, কিন্তু গায়ে তার এখনো বেশ করে গরম চাদর জড়ানো। এবারে কেবলুই ভয়ে ভয়ে বলল, তুমি যে বললে রাতের অত ঠাণ্ডায় পাশের বাড়ির বুড়ো মড়ার ধকলে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছ—শুনে শুনে আড়াইশ হাচ্ছো মাচ্ছো করেছ !

মুখ বিকৃত করে পিন্‌ডিদা বলল, বলিহারি বুদ্ধি তোদের ! বুড়ো মড়ার ধকলে বললাম বলেই আমি শ্মশানে চলে গেলাম।

আমতা আমতা করে চটপটি জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ধকলটা কি পিন্‌ডিদা ?

পিন্‌ডিদা বীতশ্রদ্ধ।—উঃ ! কি আর বলব তোদের—আরে বাবা শীতের রাতে গেঞ্জি গায়ে লেপের তলায় ছিলাম—হঠাৎ পাশের বাড়িতে মড়াকান্না শুনে বেরিয়ে এলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে না ? তার জন্যে আমাকে তোরা একেবারে শ্মশানে পাঠিয়ে ছাড়বি !

মনে মনে বললাম, ননীর শরীরে লেপের তলা থেকে বেরুনোর ঠাণ্ডাটুকুও সয়না ভাবব কি করে। কিন্তু মুখে তো আর সে কথা বলতে পারি না। যাক, হেবো হোঁতকাকে পিন্‌ডিদা একটু আগে স্টুপিড বলল ইডিয়েট বলল তাইতেই আমার কান জুড়িয়েছে। এবারে পিন্‌ডিদাকে নরম করার দায় আমিই নিলাম।—যাক্ পিন্‌ডিদা এবারের মতো মাপ করে দাও—এই পকেট উল্টে দেখাচ্ছি তোমাকে, আমার কাছে আজ ঝালমুড়ির দেড়টি টাকাই ছিল। কেবলুর সংস্কৃতর যন্ত্রনা থেকে তোমাকে জ্যান্ত উদ্ধার করতে পেরে একবারটি দেখার জন্য ভিতরটা আঁকুপাকু করছিল।

পিন্‌ডিদার দুই পাতলা ভুরুর মধ্যে বড়সড় ভাঁজ পড়ল একটা।—কেন, কেবলু কি সংস্কৃতর চোটে আমাকেই মেরে ভূত বানিয়ে দিয়েছিল নাকি ?

এবারে কেবলুর মুখ আমসি। কিন্তু বোকার মতো ওর ফাঁড়া কাটিয়ে দিল ওই হাবলুই। পিনডিদার মন পাওয়ার আশায় ফস করে বলে বসল কেবল সংস্কৃতই কপচায়, তুমি দেহ ছাড়লে ভূত না হয়ে ভগবান হতে পারো সেই কাণ্ডজ্ঞান ওর আছে !

আজ হাবুলের কপালই মন্দ। দেহ ছাড়ার কথা শুনেই পিন্‌ডিদার পিত্তি জ্বলে গেল। হুমকি দিয়ে উঠল, খাথ রাসকেল, ফের তুই টকাশ-টকাশ কথা বলবি তো আমি তোর মাথায় ঠকাশ-ঠকাশ গাঁট্টা বসিয়ে দেব। ভর সন্ধ্যায় উনি আমাকে দেহ ছাড়াতে এসেছেন !

আনন্দে আমাদের পেটের ভিতরটা দুলে দুলে উঠছিল। সাহস পেয়ে কেবলু পর্যন্ত গম্ভীর চালে বলে উঠল, হাবুল, পিন্‌ডিদাকে আর ক্রুদ্ধং মা কুরু।

হাবুল কটমট করে কেবলুর দিকে তাকালো। তিন তিনবার দাবড়ানি না খেলে ও হাবুলের মাথাটা চিবিয়ে খাবার জন্য তেড়ে যেত।

প্রসঙ্গ বদলাবার তাগিদে আদুরে সুরে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা পিন্‌ডিদা তুমি ভূত বিশ্বাস করো ?

মনে মনে আমি কার্তিককে তারিফ করলাম। আমার ভিতরটাও এই গোছের জমাটি আলোচনার মধ্যে ঢুকতে চাইছিল। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু পিন্‌ডিদা চুপচাপ মুড়ি চিবুতে লাগল। তাকে আর একটু উসকে দেবার জন্য একটু দাবড়ানির সুরে কার্তিককে বললাম, কেন আবার পিন্‌ডিদার মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিস—এই ভর সন্ধ্যায় ও-সবের নাম টাম করাও হয়তো পছন্দ করে না।

একটু আঁতে লাগার মতো করেই বলেছিলাম। পিন্‌ডিদা ঘাড় বাঁকা করে আমাকে দেখল একটু। তারপর বলল, ভর সন্ধ্যা ছেড়ে পিন্‌ডিদা পর পর চার রাত ভূতের সঙ্গে ঘর পর্যন্ত করেছে—বুঝলি ? তাও তোদের এখানকার মতো খোলা গলার দিশি ভূত নয় জলজ্যান্ত বিলিতি ভূত।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সকলে উৎসুক, এমন কি হাঁড়ি মুখ হাবুলও নড়েচড়ে বসল। আব্দারে গলায় চটপটি আর কার্তিক বলে উঠল, শুনব পিন্‌ডিদা—শুনব।

আবার আমার দিকে তেরছা একটা চাউনি ছুঁড়ে পিন্‌ডিদা গলা দিয়ে ব্যঙ্গ ঝরালো, আট আনার ঝালমুড়িতে সাহেবভূতের সঙ্গে ঘর করার গপ্‌প হয় না !

রাগতে গিয়েও আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা। ভালো মুখ করে জিগ্যেস করলাম, আট আনার ঝালমুড়িতে হয় না···খুব জমাটি ব্যাপার বুঝি ?

তেমনি ব্যঙ্গের সুরে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, খুব কিনা জানি না, পৌষের শীতের মতো।

সকলেই উৎসুক। আমি বললাম, শুনে যদি সে-রকম জমাটি মনে হয়,—কাল না হয় মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসই হবে।

এবার গলার স্বর পালটে পিন্‌ডিদা বলল, বলছিস ?

আমি আর একবার ঘুরিয়ে শর্তটাকেই বড় করে নিলাম। জবাব দিলাম, বলছিলাম, সত্যিই জমাটি হলে, তবে…।

পিন্‌ডিদা আবারও গলায় স্নেহ ঢেলে একই কথা বলল।—বলছিস তো ?

আমি মাথা নাড়লাম। আমার মতলবটা অন্যরকম। একবার যে-যার গল্প বলার ব্যাপারে পিন্‌ডিদা আমাকেই নস্যাৎ করার মতলব এঁটেছিল। যার গল্প পিন্‌ডিদার বিচারে সকলের থেকে সাদা-মাটা হবে সে বাকি ক'জনকে খাওয়াবে এই শর্ত ছিল। কোপটা সেবারে হাবুলের ঘাড়ে পড়বে ধরে নিয়েই সানন্দে আমরা রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু পিন্‌ডিদা যে-চাল চেলে হাবুলকে ছেড়ে কেবলু আর কার্তিককে পর্যন্ত উতরে দিয়ে কমপিটিশানটা শেষ পর্যন্ত আমার আর চটপটির মধ্যে টেনে এনেছিল—তখনই পিন্‌ডিদার মতলব বুঝেছিলাম। পিন্‌ডিদা চটপটিকেও উতরে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিকার বানাবে ধরে নিয়ে গল্প না বলেই আমি রাগ করে হার স্বীকার করেছিলাম, আর গ্যাঁটের কড়ি গুনে দিয়েছিলাম। সেই রাগ আমার মনে জমা ছিলই। এবারে তার উপযুক্ত শোধ নেবার মওকা। পিন্‌ডিদার ভূতের সঙ্গে ঘর করার গল্প শেষ হলেই মুখ কাঁচুমাচু করে সবার আগে আমি বলে উঠব, এ আর কি জমাটি গপ্‌প হল পিন্‌ডিদা। চটপটি ওরাও তখন ব্যাপার বুঝবে, একমাত্র হাবুল ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ অন্তত করবে না। তাছাড়া গল্প জমাটি হল কি না হল এবারে সে বিচারের ভার তো শুধু আমার।

সকলে এত উৎসুক যে আবছা অন্ধকারে পিন্‌ডিদাকে ঘিরে আর একটু ঘন হয়ে বসেছে। ধীরে সুস্থে মুড়ির ঠোঙা শেষ করে পিন্‌ডিদা সেটা মুড়িয়ে একদিকে ফেলে দিয়ে ফোঁস করে বড় নিশ্বাস ফেলল একটা। বলল, মাইকেলটাকে আর রাখা গেল না, আত্মহত্যাই করল শেষ পর্যন্ত।…এতদিনে বোধহয় কোথাও মানুষ-টানুষ হয়ে জন্মেই গেছে—কিন্তু মাইকেলের মানুষ হওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না।

হেঁয়ালির মতো লাগল সকলেরই। আত্মহত্যা করে মানুষ হয়ে জন্মালে আর কি ভূতের গল্প হল ! চটপটি জিজ্ঞেস করল, কে মাইকেল, তোমার কোনো সাহেব বন্ধু ?

—না। ইংল্যাণ্ডের রেডফোর্ট কাস্‌লএতে এক সাহেব ভূত…আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে দেড়শ বছর ওখানে আস্তানা গেড়েছিল।

আমি সুদ্ধু একটু হতভম্ব। শুরুটা চড়া সুরেরই বটে। কার্তিক বলে উঠল ভূত আত্মহত্যা করল ! আর আত্মহত্যা করে মানুষ হয়ে গেল ?

নিস্পৃহ গলায় পিন্‌ডিদা জবাব দিল, না হবার কি আছে, মানুষ আত্মহত্যা করলে ভূত হয়, আর ভূত আত্মহত্যা করলে মানুষ ছাড়া আর কি হবে—মারবেল ?

মওকা পেয়ে এতক্ষণে হাবুল কার্তিককে খেঁকিয়ে উঠল, কেন মাঝখানে কথা বলে পিন্‌ডিদাকে থামাচ্ছিস ? আমার বলে এটুকু শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে !

এরপর পিন্‌ডিদা যা বলে গেল হুবহু তাই তুলে দিলাম—

—"শোন্ তাহলে, শুরু থেকেই বলি। ব্রেজিলের ফুল ফুটবল টিম ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এগ্‌জিবিশন ম্যাচ খেলতে আসছে। আমার তখন হাঁটুর মালাই চাকতি খোলা, সঙ্গে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু টিমের ম্যানেজার আমার ডেরায় এসে হত্যা দিয়ে পড়ল। বলল, পিন্‌ডি, তুমি খেলো না খেলো, তুমি না গেলে টিম নিয়ে যাওয়ারই কোনো মানে হয় না—তুমি সঙ্গে থাকলেই এমন মরাল বুসটিং হবে যে আমাদের টিম তেজী ষাঁড়ের মতো লড়বে। তোমাকে সঙ্গে যেতেই হবে, তোমার থাকা-খাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ভার ব্রেজিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের।

"কি আর করা যাবে, রাজি হয়ে গেলাম। এমন প্রাণ-ঢালা ভালবাসার ডাক এড়াই কি করে। কিন্তু রাজি হলাম একটা শর্তে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে হোটেলে বা কোনরকম ভিড় ভাড়াক্কার মধ্যে আমার থাকা পোষাবে না—লণ্ডনের রেডফোর্ট কাস্‌লএ আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বারো মাস ওটা খালিই পড়ে থাকে, তোমরা লিখলেই অনায়াসে ব্যবস্থা হয়ে যাবে—তবে খাবার-দাবার সব কোনো সেরা হোটেল থেকে পাঠাতে হবে।

"ম্যানেজার তক্ষুনি রাজি হয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। যেন আমি সঙ্গে যাচ্ছি মানেই তার টিম জিতে বসে আছে। এখন আমার ওই কাস্‌লটা বেছে নেবার বিশেষ কারণ আছে। আমি যে অ্যাপার্টমেণ্টে থাকি তার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস জোনস আমাকে ছেলের মতো ভালবাসে। তবে নিজের ছেলেপুলে নেই, গোটাকতক মেয়ে। তারা যে-যার স্বামীর ঘর করছে। আধবুড়ী মিসেস জোনস বিধবা। তার কাছে থাকে তার খুব আদরের এক ছোট ভাইয়ের পনের বছরের মেয়ে লুসি। এই ভাই অর্থাৎ লুসির বাপের জন্য মিসেস জোনসএর দুঃখের শেষ নেই।···বছর পাঁচেক আগে লুসির বাপ জনাকয়েক বন্ধুর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছল। তারা সকলে মিলে লণ্ডনের ওই রেড্‌ফোর্ট কাস্‌লএ উঠেছিল। সেখানে নাকি এমন অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটতে লাগল যে বন্ধুরা সব পর দিনই পালিয়ে বাঁচল। গোঁ ধরে কেবল থেকে গেল লুসির বাবা। কিছুদিন বাদে সে যখন ব্রেজিলে ফিরে এলো, তার মাথার সব চুল পেকে গেছে, অস্বাভাবিক চাউনি, সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত। সর্বদা মুখে কেবল এক বুলি, কি ভীষণ ! কি ভয়ংকর! কি সাংঘাতিক ! লোকটা শেষ পর্যন্ত বদ্ধপাগল হয়ে গেল, তারপর গাড়ি চাপা পড়ে মারাই গেল। পরের মাসেই লুসির মা আর একজনকে বিয়ে করে সরে গেল। লুসি চলে এলো পিসির কাছে। সেই থেকে ভাইয়ের জন্য শোকের পাথর বুকে করে বসে আছে মিসেস জোনস। তার দুঃখ দেখে আমারও বুকের ভেতরটা টনটন করত। তাই

ইংল্যাণ্ডে যাবার নেমন্তন্ন পেয়েই ঠিক করে ফেললাম লণ্ডনের ওই রেডফোর্ট কাস্‌লএই আমাকে থাকতে হবে, ব্যাপারখানা ভালো করে বুঝতে হবে। যদি রহস্য ভেদ করতে পারি তাতেও মিসেস জোনসএর বুক একটু হালকা হবে।

"কিন্তু মিসেস জোনস শোনামাত্র বিপত্তি। ধরে পড়ল সেও যাবে। নিজের খরচাতেই যাবে। আমাকে বলল, তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে একলা পাঠিয়ে আবার শোকের ওপর শোকের মুখে পড়ব। আমি যাবই তোমার সঙ্গে। তাছাড়া সুযোগ যখন পাচ্ছি, আমাকেও দেখতে হবে ভাইয়ের অমন হাল কেন হল। লুসির জন্য কোনো চিন্তা নেই, দশ বারো দিনের তো ব্যাপারে—তাকে আমার বান্ধবীর কাছে রেখে যাব। ওকে একটা নতুন ইজেল কিনে দেব বললেই ও খুশি হয়ে থেকে যাবে।

"ইজেল মানে ছবি আঁকার স্ট্যাণ্ড। ওই এক ছবি পাগল মেয়ে। ছবি আঁকতে বসলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। আঁকেও বেশ। ক'দিন ধরে পিসির কাছে নতুন ইজেলের বায়না করছিল। কিন্তু আশ্চর্য, ইংল্যাণ্ড যাওয়া হচ্ছে শুনে সে ইজেল-ফিজেল ভুলে গেল। গোঁ ধরে বসল সেও সঙ্গে যাবেই যাবে। লণ্ডনের রেডফোর্ট কাস্‌ল দেখবে। ওই কাস্‌লটার জন্যই ওর বাবা পাগল হয়ে ফিরেছিল এ কতবার শুনেছে ঠিক নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়েই সে সেখানে যাবে। এখন আণ্টি আর পিন্‌ডি সেখানে যাচ্ছে যখন, তার যাওয়াও কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। ও যাবেই যাবে, মরে গেলেও যাবে।'

"অগত্যা মিসেস জোনস বলল, তাহলে তিন জনেই যাওয়া যাক! আমি থাকতে কার কি হবে। গনগনে কুকিং প্যান হাতে নিয়ে আমি ডাকাত তাড়া করেছি। ভূতটুত আমি মানি না। গাল ফুলিয়ে লুসিও বলল, আমিও ভূতকে একটুও ভয় করি না—সামনে পেলে তাকে জোর করে সামনে বসিয়ে ছবি এঁকে নেব। সত্যি আমারও দারুণ ভালো লাগল, এমন সাহসের অমর্যাদা করতে ইচ্ছে করল না। ফলে তিন জনের এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক হল।"

"এরোপ্লেনে দূরের পথও কত আর পথ। দলবলের সঙ্গে মিসেস জোনস আর লুসিকে নিয়ে রওনা হলাম। পৌঁছলাম। দলের লোকেরা হোটেলে চলে গেল। ঠিক সময়ে মাঠে হাজির থাকব কথা দিয়ে আমার মিসেস জোনস-এর আর লুসির জন্য রিজার্ভ করা আলাদা মোটরে উঠলাম। ম্যানেজার শুধু আমার জন্য এক-গণ্ডা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। অমন বিলিতি গাড়িতেও কম করে দু'ঘণ্টার পথ রেড-ফোর্ট কাস্‌ল। চারদিক নির্জন খাঁ-খাঁ করছে। মাইলখানেকের মধ্যেও লোকবসতি নেই। কাস্‌ল-এর পেল্লায় লোহার ফটক খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকেই আমার দুই চোখ ছানাবড়া। ভিতরে কম করে বিশ বিঘে জমি। সবটাই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে গাছ-গাছড়ায় ছাওয়া। মস্ত মস্ত বাগান ছিল বোঝা যায়, তাও এখন ঘন

জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে। তার মাঝখানে এক পেল্লায় চার তলা পাথুরে বাড়ি। বিশাল বিশাল থাম। আর তেমনি বড় বড় ঘর! ওই বাড়ির মধ্যে কেন, গেট দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গা-ছমছমানি শুরু হয়। আর বাড়ির মধ্যে ঢুকলে তো নিজের বুকেরই টিপ-টিপ শব্দ শোনা যায়।'

"আমরা বাড়িতে ঢুকতেই ছ'ছটা জোয়ান লোক এগিয়ে এলো। তারা এখানকার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের শ্রমিক কর্মচারী আর দু'জন হোটেলের বেয়ারা। আমাদের থাকার জন্য দোতলাটা সংস্কার করেছে। থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা রেডি। রাতের হিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চালু, খাবার মজুত রাখার ফ্রীজ চালু, টেলিফোনও চালু—কোনো কিছুতে ত্রুটি হাওয়ার কারণ নেই। তবু কিছু দরকার হলে কাল সকালে যেন ফোন করা হয়। কারণ বিকেলের পর কেউ আর এ তল্লাটে আসে না, তারাও আসবে না। আর হোটেলের বেয়ারা দুটো জানালো, রোজ সকালে তারা গাড়ি নিয়ে একবার করেই আসবে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সমস্ত দিনের টি আর কফি ইত্যাদি সবই দিয়ে যাবে।'

'খাওয়ার ব্যাপারে আমার একটু দুর্বলতা আছে জানিসই তোরা। অনেক দিনের দোস্তি, ফুটবল টিমের ম্যানেজারও জানে। তাই আমার খাওয়ার সব থেকে জাঁদরেল ব্যবস্থা রাখার তাগিদ টেলিগ্রামেই দিয়ে রেখেছিল জানি। কিন্তু সমস্ত দিনের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে না দেখে বেয়ারা দুটোকে ছাড়ি কি করে। ওরা এক পেল্লায় ফ্রীজ খুলে দেখালো কি ব্যবস্থা। দুধ, এক পাউণ্ডের একটা মাখনের তাল, ব্রেড, তিন রকমের দু'ডজন স্যাণ্ডউইচ, থোকা থোকা আঙুর, কলা, সুপ, ইনডিয়ান ডিশের চিকেন বিরিয়ানি আর প্রন ফ্রায়েড রাইস, আস্ত চারটে চিকেন রোস্ট, মস্ত এক রোল মাটন স্টেক, ফ্রুট স্যালাড, আইসক্রিম। পাশের মিট সেফে, হরেক রকমের বিসকিট, জ্যাম, জেলি, টফি, স্ন্যাকস। দেখে আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল। তবু একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল, সুইট-ওয়াটার ফিশের কোনো প্রিপারেশন নেই। আজ যা এনেছে কাল তার সঙ্গে ওই ব্যবস্থার হুকুম দিয়ে হোটেলের বেয়ারা দুটোকেও বিদায় দিলাম। ওরা চলে যেতেই লুসি লাফিয়ে উঠল, পিন্‌ডি! আমরা কি সব রাক্ষস যে রোজ এত খাবার আসবে!'

"যাক, সে-দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। কেবল সন্ধ্যা থেকে গা ছমছমানি একটু বাড়ল। চলতে ফিরতে কাছেই যেন ফোঁসফোঁস শব্দ, আর ওদিকে গাছপালার অবিরাম সড়সড় শব্দ। তার ওপর একটা মুশকিল ইলেকট্রিক লাইট নেই। ওরা চারটে বড় হ্যাসাক রেখে গেছে। দু'টো জ্বাললেই যথেষ্ট হয়, কারণ আমরা তো বড় হল্-ঘরটাতেই থাকব ঠিক করেছি। একদিকে দুটো বেড্ জোড়া করা হয়েছে মিসেস জোন্‌স আর লুসির জন্য তারপর হলের আধাআধি একটা কার্টেন টাঙানো হয়েছে—কার্টেনের এ ধারে আমার বেড। সেই আসার পর থেকে আমার তো বেশির ভাগ সময় খেয়েই কেটে গেল। যা বলছিলাম, দুটোর জায়গায় চারটে হ্যাসাকই জ্বালা হল। হাড়

কাঁপানো শীত। রুম হীটার চালিয়ে দিয়ে রাতের খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে শুয়ে পড়া গেল। তখন অন্য হ্যাসাকগুলো নিভিয়ে বাথরুমে একটা হ্যাসাক শুধু জ্বলতে থাকল। মিসেস জোনস-এর তাতেও আপত্তি ছিল। তার আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার না হলে ঘুম হয় না। সকলের কাছেই তো জোরালো টর্চ আছে, হ্যাসাক জেলে রাখার দরকার কি? তবু প্রথম রাত, একটা আলো কাছাকাছির মধ্যে থাকাই ভালো মনে হল আমার।

"সকলেই ক্লান্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি শোয়া সত্ত্বেও সকালের আগে আর ঘুম ভাঙল না। প্রথম রাত এত নিরুপদ্রবে কাটতে সকলেই খুশি। পরে ধীরে সুস্থে সমস্ত বাড়িটাই তল্লাসি করার সংকল্প আমার। শুধু বাড়িটা কেন, কাস্‌লের গাছপালা-ঝোপ-ঝাড়ও। কিন্তু সকালে চা খেতে খেতে মিসেস জোনস-এর একটা কথা খচ করে কানে বিঁধল। সে বলল, মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙতে দেখলাম বাথরুমের দিকে হ্যাসাকটা নেভানো—কখন নেভালে? আমি নেভাইনি শুনে প্রথমে সে-ও অবাক একটু। তারপর বলল, ঘুমের চোখে কখন উঠে নিভিয়েছ এখন মনে করতে পারছ না।

"এ নিয়ে আমি আর তর্ক করলাম না। আমার বেশি ভয় লুসির জন্য। ও না ভয়টয় পায়। যাক সকালে আবার হোটেলের সেই দুই বেয়ারা এসে এক গাড়ি বোঝাই খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। ঘর দোর পরিষ্কার করে পুরনো বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল। বেলা বারোটার মধ্যে আমরা লাঞ্চ সেরে তৈরি। কারণ সেদিনই বেলা দুটোয় প্রথম একজিবিশন খেলা। সময় ধরে গাড়ি এলো। আমরা চলে গেলাম। খেলা শেষ হবার পর আমাকে নিয়েই সকলে মিলে খানিক হৈ-চৈ করল। কারণ খেলা শুরু হওয়ার আগে আমি ওদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলাম, ছ' গোলে না জিতলে আমার মন ভরবে না, মনের দুঃখে আমি হয়তো ব্রেজিল ফিরে যাব। লাস্ট মিনিটের গোলে সেই ছ' গোলেই জিত।

"বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ব্যাক টু দি কাস্‌ল। প্রকাণ্ড গেট দিয়ে ঢুকতেই মনে হল হঠাৎ যেন বাতাসে ঘাটতি পড়েছে। গাছপালার পাতাও নড়ছে না। দোতলায় উঠেই মনে হল, একটু সোঁসোঁ করে শব্দ করে সামনে থেকে খানিকটা বাতাস সরে গেল। তারপর থেকে যে-যখন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি মনে হচ্ছে পিছনে কেউ আসছে। পিছন ফিরলে কিছু না। শুধু আমি নয়, মিসেস জোন্‌স আর লুসিও মাঝে মাঝে চমকে চমকে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল। হঠাৎ মিসেস জোন্‌স চেঁচিয়ে উঠল, পিন্‌ডি—ওই লোহার রডটা ওভেনে গুঁজে দিয়ে ডগডগে লাল করে রাখো তো—ছ্যাঁকা দিয়ে আমি ভূতের জম্মো ঘোচাতে পারি কি না দেখি—

"অমনি লুসি বলে উঠল, না, আন্টি না, আমি কখনো ভূত দেখিনি, তুমি ভয় পাইয়ে দিও না। তারপর লুসিও চেঁচিয়ে উঠল, পিছন পিছন ঘুরঘুর করছ কেন, সামনে এসে দাঁড়াও না, একটু দেখতে দাও—আমি চট্‌ করে একখানা ছবি এঁকে ফেলি।"

"সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড। হঠাৎ খানিকটা জমাট বাতাস যেন কিছুটা দূরে সরে

গেল। তারপর কেউ যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে ধুপধুপ শব্দ করে হাঁটতে লাগল। হাঁটছেই। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। খুব রাগ করে পা মাটি আছড়ে হাঁটলে যেমন হয়, তেমনি। এবারে আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তোমরা, আমার নাম পিন্‌ডি, ওর পিণ্ডি চটকাব বলেই তো এখানে এসে উঠেছি—ও যা করছে করুক, তোমরা দেখে যাও।'

"পায়ে হাঁটার শব্দ থেমে গেল। কেউ যেন থমকালো। তারপর সাড়াশব্দ নেই।

"সন্ধ্যা হতে আবার চারটে হ্যাসাক জ্বালা হল! কিন্তু আধঘণ্টা না যেতে ঝনঝন শব্দে দুটো হ্যাসাক ভেঙে গেল। কেউ যেন ডাণ্ডা-পেটা করে ভাঙল ও দুটোকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মিসেস জোনস, এখুনি আমাদের হোটেলে ফোন করো, আমার ব্যবস্থা মতো এখুনি ট্রাক-বোঝাই এক রেজিমেণ্ট সেই ট্রেনড্ লোক পাঠাতে বলো, আমাদের শান্তি নষ্ট করলে ওর শান্তিরও আজ বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছি।

"মিসেস জোনস টেলিফোনের দিকে ছুটল। তার ধারণা সত্যিই আমি ও রকম কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, গিয়ে পৌঁছনোর আগেই রিসিভারটা ক্রাডল থেকে আপনি উঠে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। মিসেস জোনস ছুটে সেটা তুলে নিতে গেল। কিন্তু কেউ যেন লাথি মেরে ওটা আর একদিকে সরিয়ে দিল। একটা গাল পেড়ে মিসেস আবার ওটা ধরতে গেল। আবার কেউ ওটা লাথি মেরে আর একদিকে সরালো। এই চলল প্রায় মিনিটখানেক। লুসি হঠাৎ হাত তালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

"মিসেস জোনস দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, থাক মিসেস জোনস, আর যদি একটা হ্যাসাক ভাঙে তাহলে ওই হতভাগাকে আমি যীশুখৃষ্টের নাম নিতে শেখাব। কথা শেষ হতে না হতে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো কিছু হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি এগিয়ে এসে রিসিভারটা জায়গা মতো রাখলাম।

"সেই রাতটা মোটামুটি ভালোই কেটে যাবে ভাবলাম। সামনের দুটো রাত এখানে থাকা যাবে না কারণ এর পরের এগজিবিশন খেলা পড়েছে ম্যানচেস্টারে, তার পরেরটা লীডসএ। তারপর টিমের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী তিন রাত এই

কাস্‌লএ থাকার সুযোগ পাব। হেস্তনেস্ত যা হয় তখন হবে। যাক, এই রাতের কথাই বলি। তোফা খেয়ে বেশ পাকা ঘুম এসেছিল। মাঝরাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য সেই স্বপ্নের মধ্যে যে নিজেও কথাবার্তা কইছি খেয়াল নেই। দেখলাম, জানলার কাছে একটা ধোঁয়াটে মূর্তি, পরনে ইংরেজদের সেকেলে পোশাক-আশাক। বেজায় গম্ভীর, বেজায় বিরক্ত, কানে টেলিফোনের রিসিভার লাগিয়ে কথা কইছে। তারের ভিতর দিয়ে তার গলা বিচ্ছিরি রকমের ফ্যানফেনে শোনাচ্ছিল। টেলিফোনের এদিকে আমি বিনা টেলিফোনেই শুনছি, বলছি। প্রথমেই বলল, খুব সাহস দেখাতে এসেছ—কেমন?

'—সাহসের কি দেখলে? আমি ফিরে জিগ্যেস করলাম।

'—কোন্‌ সাহসে তোমরা আমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ? তোমাদের আগে যারা এসেছে, তাদের হাল কি হয়েছে জানা আছে? নেহাত তোমাদের সঙ্গে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে মায়া পড়ে গেছে তাই এখনো সহ্য করছি!

'—কে তুমি?

'—মাইকেল।

'—কে মাইকেল?

'—দেড়শ বছর আগে জন্মালে জানতে পারতে। অত খোঁজে দরকার কি—ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যেই তোমরা এখনো বেঁচে আছ—ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো।

'আমি জিগ্যেস করে বসলাম, বাচ্চা মেয়েটার জন্য কি রকম? তোমাদেরও আবার মায়া দয়া আছে?

'—গাধার মতো কথা বোলো না! চটেই গেল।—গোরু ছাগল থেকে ভূত হয়েছি—না মানুষ থেকে? তাহলে মানবিক গুন মানে মায়া দয়া থাকবে না কেন? যাক এখন চললাম, এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং মনে রেখো।

'হঠাৎ গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লুসি ঠেলছে আমাকে!—পিনডি, তুমি ঘুমের মধ্যে কি বকছ সেই থেকে?

'বলতে যাচ্ছিলাম স্বপ্ন। তার আগেই বন্ধ জানলার দিকে চোখ পড়তে আমি অবাক! ফোনের রিসিভারটা ছিঁড়ে কে জানলার কাছে ফেলে গেছে। লুসিও দেখে চেঁচিয়ে উঠল, আন্টি দেখে যাও, ওই পাজী ভূত কি কাণ্ড করেছে—একবার দেখা পেলে এমন বিচ্ছিরি করে ওকে আমি আঁকব যে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না।

'—এবারে শোন্‌ আসল কাণ্ড। প্রোগ্রাম মতো দু'রাত বাইরে কাটিয়ে এগজিবিশান ম্যাচ শেষ করিয়ে দিয়ে আমরা আবার কাস্‌ল্‌এ ফিরলাম। এবারে একটু সাবধানও হতে হল। ছোট ছুটো 'ক্রস' লুসি আর মিসেস জোনসএর গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। আর চকের গুঁড়ো দিয়ে নিজের বুকে বড় করে একটা রাম নাম লিখে রাখলাম। কিন্তু সন্ধ্যে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন উপদ্রবের ব্যাপার ঘটল না। তিনজনে ডাইনিং

টেবিলে গিয়ে বসলাম, আর আমি বেশ জোর একখানা থ্যাঁট সেরে উঠলাম। লুসির খাওয়া আগেই শেষ হয়েছিল, সে শোবার ঘরে গেল।

'—পিন্ডি! আন্টি শিগগীর এসো! শিগগীর!

'লুসির চিৎকার শুনে আমরা ছু'জন ছুটে এলাম। তারপর আমাদেরও চক্ষু স্থির। ঘরের মেঝেতে টকটকে রক্তের ধারা—ওদের শয্যার কাছ থেকে সেই রক্ত আমার শয্যার পাশ দিয়ে জানলার দিকে চলে গেছে।
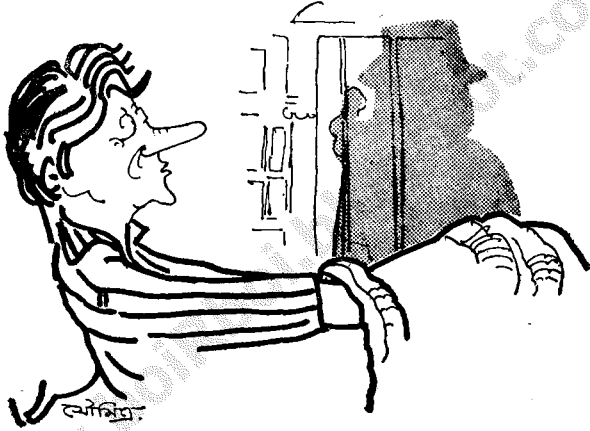
'খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে আমি মেঝেতে ঝুঁকে রক্তটা পরীক্ষা করলাম। তারপর মিসেস জোনসকে বললাম, জল নিয়ে এসো, ধুয়ে ফেলি। বসে বসে ভালো লাগছিল না, তবু একটা কাজ জুটল। '···সেই রাতেও তোফা ঘুমটি লাগিয়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে জানলার কাছে আবার সেই মূর্তি। রাগে গরগর করে বলল, শিক্ষা হয়েছে, না এর পরেও আরো কিছু দরকার হবে? এই শেষবারের মতো আমি জানতে চাই, কালকের মধ্যে তোমরা এখান থেকে যাবে কি যাবে না?

'ফিরে জিগোস করলাম, কাল কতক্ষণের মধ্যে?

'—ছোট মেয়েটা সঙ্গে আছে, ছুপুরের লাঞ্চ সেরেই কেটে পড়ো। নয়তো এমন বিভীষিকা দেখবে যে হাড়সুদ্ধু জমে যাবে।

'—আমি বললাম, লাঞ্চের পর যাওয়া হবে না—রাত দশটা পর্যন্ত সময় দাও।

'ফ্যাসফেসে গলায় খেঁকিয়ে উঠল, রাত দশটায় তোমরা এখান থেকে যাবে কি করে?

'—সে আমরা বুঝব। না যাই তখন তুমি যা পারো কোরো। কিন্তু কথা দাও রাত দশটার আগে আমাদের ঘরের এই ত্রিসীমানায় তুমি ঘেঁষবে না।—ডান?

'—ডান্।

'—রাজি হয়ে সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পরদিন আর লুসি বা মিসেস জোনসকে এ ব্যাপারে কিছুই বললাম না। সকাল থেকে তেমনি ফূর্তি করে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব চলল। দুপুর গড়ালো, সন্ধ্যে হল, রাত হল। ন'টায় ডিনারও সেরে ফেললাম। তারপর আমার কাজের পালা। ফিসফিস করে মিসেস জোনস আর লুসিকে বললাম, এখন আমি এমন কিছু করতে যাচ্ছি যা তোমরা শুধু চোখ চেয়ে দেখবে—একটি কথাও বলবে না—কি-চ্ছু জিগ্যেস করবে না। আমার কাজ শেষ হলে সব ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়বে। তারপরে এক ঘণ্টা অন্তত জেগে থেকে লুসির সঙ্গে গল্প করবে হাসাহাসি করবে—লুসি ইচ্ছে করলে শুয়ে শুয়ে গলা ছেড়ে একটা দুটো গানও গাইতে পারে।

'—চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ করে এবারে আমি লুকনো জায়গা থেকে আমার দুটো সরঞ্জাম বার করলাম। একটা কালো রঙের সরু দড়ি, আর একটা বড় মাটির হাঁড়ি। ফ্রিজ থেকে কনকনে ঠাণ্ডা জল এনে হাঁড়িতে ভরলাম। তারপর জানলা থেকে তিন হাত দূরে সেই দড়ি বেঁধে হাঁড়িটা ঝুলিয়ে দিলাম। কিন্তু আড়াআড়ি দড়িটার একদিক ভিতরের দেয়ালের হুকের সঙ্গে এমন করে বাঁধলাম যাতে একটু নাড়া পড়লেই ওটা খুলে যায়। সব ব্যবস্থা করতে আধঘণ্টাও লাগল না। তারপর মিসেস জোনস আর লুসিকে বিছানায় পাঠিয়ে আমি আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে জানলাটা খুলে দিলাম। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার এখন। পা-টিপে আমি নিজের বিছানায় চলে এলাম।

'—মিসেস জোনস আর লুসির টুকরো টুকরো কথা আর হাসি কানে আসছে। একটু বাদে লুসি গানও ধরল। আরো মজা, হেঁড়ে গলায় মিসেস জোনসও তার সঙ্গে বেসুরে গাইতে লাগল। আমি এদিক থেকে গলা চড়িয়ে তারিফ করতে লাগলাম। আমার হাত ঘড়িতে অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। রাত তখন দশটা বেজে এক মিনিট। হুড়মুড় করে একটা জমাট বাতাস খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপরে কিছুর সঙ্গে বড়সড় একটা ঠোক্কর খাওয়ার শব্দ। ফ্যাসফ্যাসে গলার জোর আওয়াজ একটা কেউ যেন ধরাশায়ী হল—আর একই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা জল ভরতি মাটির হাঁড়িটা, পড়ে ভেঙে চৌচির। তাড়াতাড়ি আমরা যে যার টর্চ জ্বালালাম। মেঝময় ভাঙা হাঁড়ির টুকরো। জলে জলাকার। আমি হেসে মিসেস জোনসকে বললাম, এবারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও আর জাগার দরকার নেই।

'—মিসেস জোনস্ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ব্যাপারখানা কি হল ?

'—ব্যাপারখানা কি হল সেটা হয়তো কাল বোঝা যাবে। আমিও বলতে পারছি না। এখন যে যার শুয়ে পড়ো।

'পরদিন। সকালটা আমরা বেশ হৈ-চৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। পড়ো বাগান দেখলাম, জঙ্গল গাছপালাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কাস্‌লএর এক তলায় ঘুরলাম।

কোথাও অস্তিত্ব টের পেলাম না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টা দেড়েক গড়াগড়ি করে আমি একলাই পা-টিপে উঠে এলাম। তিন-তলা আর চারতলাটা দেখার মতলব।... তিনতলাটা খাঁ-খাঁ করছে। আমার সাড়া পেয়ে বাদুড় চামচিকে ঝটপট করছে। কিন্তু চারতলার সিঁড়িটা কোন দিকে? কোণের দিকে লোহার একটা সরু প্যাঁচানো সিঁড়ি চোখে পড়ল। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে উঠব কি উঠব না ভাবছিলাম। হঠাৎ ওই চারতলা থেকেই ফ্যাসফেসে গলায় একটা হাঁচি কানে এলো। আমি কান পাতলাম, একটু পরে পরেই আরো গোটাকতক হাঁচি। পায়ে পায়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। হাঁচির শব্দ বাড়ছেই।...ছাদে পৌঁছলাম। কিন্তু এমন দৃশ্য দেখব কল্পনা করিনি। ছাতের চিলেকোঠার সামনে হাত পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে সেই ধোঁয়াটে মূর্তি। তার আলখাল্লা টালখাল্লা তখনো জবজবে ভিজে। একের পর এক হেঁচে চলেছে। আর এমন বিমর্ষ মুখে বসে আছে যে আমারও খারাপ লাগল।

"পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। জিগ্যেস করলাম মাইকেল?

"—জানোই তো আবার জিগ্যেস করছ কেন। কি হাল আমার করেছ ভালো করে দেখ। মানুষ না হয়েও আমার যেটুকু মানবিক বোধ আছে, মানুষ হয়েও তোমার তা নেই। অমন হাড় জমানো শীতের রাতে বজ্জাতি করে এভাবে ভিজিয়ে মারলে, আমরা আগুনের কাছে যেতে পারি না—সেই থেকে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছি—একটু মায়া দয়াও নেই তোমার?

"আমি বললাম, অতটা করা আমার সত্যি অন্যায় হয়েছে মাইকেল—কিন্তু তুমিও বজ্জাতি কম করোনি, লুসির ছবি আঁকার রঙের বাক্স থেকে লাল রং চুরি করে তাই গুলে তুমি রক্তের দাগ এঁকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলে। বাচ্চা মেয়েটা তার রং খোয়া গেছে জানলে কেমন দুঃখ পাবে বলো তো?

"আবার তিনটে হাঁচি দিয়ে সে মুখ গোমড়া করে বলে উঠল, তুমি একটা বদ-খৎ চালাক লোক।

"আমি বললাম, তা ছাড়া তুমি আরো অন্যায় করেছ—ওই লুসির বাবাকে তুমি ভয় দেখিয়ে পাগল করেছ—তাইতেই সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

"আবার হাঁচতে হাঁচতে মনে করতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, সেই লোকটা লুসির বাবা বুঝি...। কিন্তু আমি তার কোনো ক্ষতি করতে চাইনি, ভয় দেখিয়ে সরিয়ে

দিতে চেয়েছিলাম শুধু।

"—কি ভয় দেখিয়েছিলে?

"নিচের ওই বাগানে আমার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে কি ভাবে আমাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল, আর তারপর কিভাবে আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে বুকে ছুরি বসিয়ে হত্যা করা হয়েছিল—সেই দুটো দৃশ্য।

"শুনে আরো দুঃখ হল। বললাম, থাকগে, এখন আমাদের আর কোনো রাগ নেই তোমার ওপর। আমরা কালই এখান থেকে চলে যাব।

"আবার দুটো হাঁচি দিয়ে ধোঁয়াটে মুখখানা বেজার করে মাইকেল বলল, এরপর তোমরা গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি—আমি এক্ষুনি আত্মহত্যা করব।

"আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—কেন তোমার আত্মহত্যা করার কি হল?

"—কি হল সে তুমি বুঝবে কি করে। মাইকেলের গলার স্বর আরো বিষণ্ণ, কিন্তু একটু তপ্তও। বলে গেল, এ জীবন আমার এমনিতেই ভালো লাগছিল না……তার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মানুষ আমাকে ভয় করে—মানুষের এই ভয়টুকুই সব ভূতের সম্বল—কিন্তু মানুষ যদি ভয়ই না করল, আর বেঁচে থেকে লাভ কি—তুমি ছেড়ে ওই বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত আমাকে ভয় পেল না। আর তিন মিনিটের মধ্যে দেখবে ওই পেল্লায় উইলো গাছের মস্ত একটা ডাল মাটিতে ভেঙে পড়েছে—তক্ষুনি বুঝবে আমি খতম।

"আমি অবাক। বলে উঠলাম, অতটুকু উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে ভূতেরা মরে যায়।

"শেষ তিনটা হাঁচি দিয়ে মাইকেল উঠে দাঁড়াল। জলদ গলায় বলল, অত বুদ্ধি ধরেও বোকার মতো কথা বলো কেন। ওই গাছের ডালে বসে ছোট এক টুকরো ডাল দিয়ে ক্রস্ বানিয়ে বুকে ঠেকালেই ভূতের খেলা শেষ।

"কথা শেষ হবার আগেই মাইকেল অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখতে দেখতে উইলো-গাছের একটা মস্ত ডাল দুলে উঠল। আমি হাঁ হয়ে দেখছি। দেখতে দেখতে সেই বিশাল ডালটা চচ্চড় করে ভেঙে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।"

হাবুল, কার্তিক, কেবলু, চটপটি আর আমি বিমূঢ়ের মতো বসে আছি। পিন্‌ডিদা থামার পরেও আমরা সেই রেড কাস্‌ল-এর মধ্যেই ঢুকে বসে আছি। পিন্‌ডিদা একটুও দম নেবার সময় না দিয়ে চট্ করে আমার দিকে ঘুরে জিগ্যেস করল, কিরে সোনা, মানবিক ভূত মাইকেলকে কেমন লাগল?

আমার তেমনি অভিভূত অবস্থা। গলা দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো, চমৎকার!

এবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তেরছা চোখে তাকালো পিন্‌ডিদা।—বলছিস?

এতক্ষণে খেয়াল হল কি ভুলটা করে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরে গচ্চার কথাটা ভেবেও ভিতরে ভিতরে আমার খুব একটা আফসোস নেই।

রাম ও হরি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রাম আর হরি দুইজনে একটা নতুন গাঁ পত্তন করতে এক মস্ত মাঠের দুধারে বাড়ি বানাল। আস্তে আস্তে জ্ঞাতিগুষ্ঠি বেড়ে আপনা থেকেই গাঁ তৈরি হবে।

বসবাস শুরু করতেই প্রথম দিন রামের বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল। পরদিন হরির বাড়িতে ঢুকে নিয়ে গেল কাপড়-চোপড়।

তৃতীয় দিন সকালে দাঁতন করতে দু'জনে বেরিয়েছে। মাঠের মাঝখানে দেখা।

রাম বলল, আর বোলো না হে, পরশু রাতে চোর ঢুকে বাসনপত্র সব নিয়ে গেছে।

হরি বেজার মুখে বলে, আমারও কাল রাতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড় আর কিছু রেখে যায়নি।

তাহলে তো সাবধান হতে হয়।

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

দু পক্ষই দরজা জানালা আরো মজবুত করল, রাতে উঠে ঘন ঘন তামাক খেতে লাগল। লাঠি ঠুকে, কেশে, খড়ম পায়ে হেঁটে জানান দিতে লাগল, জেগে আছি হে চোরের পো।

আবার একদিন সকালে উঠে পুকুরঘাটে গিয়ে রাম দেখে, কাকচক্ষু জলে যে মাছগুলো ঘোরাফেরা করত সেগুলো সংখ্যায় কম কম ঠেকছে। রাতে কেউ জাল ফেলে বড় মাছগুলো ধরে নিয়ে গেছে।

ওদিকে হরির তিনটে নারকোল গাছ ফাঁক করে সত্তর আশিটা নারকোল বেপাত্তা।

মাঠের মাঝে দাঁতন করতে এসে দুই বন্ধুর দেখা।

পুকুরে মাছ নেই হে।

আমার গাছেও নারকোল নেই।

বড়ই মুশকিলে পড়া গেল।

বড়ই মুশকিল।

কি করা যায় বলো তো!

তুমিই বলো, আমি ভেবে পাচ্ছি না।

রামের ছাগলছানাটা মাঠে ঘাস খেতে গিয়ে আর ফিরল না। ওদিকে পরদিন হরির চারটে মুরগী চুরি গেল।

রাম গাছ থেকে লাউ আর পুকুর থেকে একটা মাছ তুলে মাথায় গামছা বেঁধে চলল থানায় নালিশ ঠুকতে, লাউ আর মাছ দারোগাবাবুর ভেট।

ওদিকে হরি গোটাকয় নারকোল আর ডজনখানেক ডিম নিয়ে একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে।

থানা অনেক দূরের রাস্তা। মাঝপথে জিরিয়ে নিতে রাম একটা গাছতলায় বসে কোঁচার খুটে বাঁধা চিঁড়েগুড় খেয়ে একটু ঠেস দিয়ে চোখ বুজল।

হরিও খানিক তফাতে আর এক গাছতলায় বসে মুড়ি বাতাসা খেয়ে চোখ বুজেছে।

কেউ কারো খবর জানে না।

একটু বাদে রাম চোখ খুলে দেখে তার লাউ আর মাছ নেই। বোধহয় একটা গাছে আর একটা পুকুরে ফিরে গেছে।

জেগে উঠে হরিরও মাথায় হাত। কোথায় নারকোল, কোথাই বা ডিম?

আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে গিয়ে দুজনের সঙ্গে দুজনের ফের মুখোমুখি।

রাম যে!

হরি যে!

কি খবর?

আর কি খবর। যাচ্ছিলাম থানায়, নালিশ ঠুকতে। তুমি কোনদিকে?

আমিও ঐদিকেই যাচ্ছিলাম যে! আমারও নালিশ!

রাম চোখ মিটমিট করে হরির হাতের দিকে চেয়ে বলে, বাঃ দিব্যি লাউটা তো! নধর, কচি! মাছটাও খাসা! বেশ, বেশ।

হরিও একগাল হেসে বলে, তোমার নারকেলগুলো বেশ ঝুনো দেখছি। ডিমগুলোও বড় বড়, দেখলেই ভাল লাগে।

রাম বলল, তা আর থানায় গিয়ে কি হবে? চলো, আমার বাড়িতে ডিমের ঝোল হবে, নারকোলের পিঠে হবে, একসঙ্গে বসে দুজনে খাবোখন।

তাই কি হয়! আমার এত বড় মাছটা পচে নষ্ট হবে যে! লাউটাও শুঁটকো হবে। তার চেয়ে আমার বাড়ি চল, লাউ ঘণ্ট আর মাছের ঝোল দিয়ে দুজনে সাঁটাই।

ঠিক আছে। আজ আমি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। কাল কিন্তু আমার বাড়িতে—

আরে তা আর বলতে—

রাম আর হরি ফিরে আসতে লাগল।
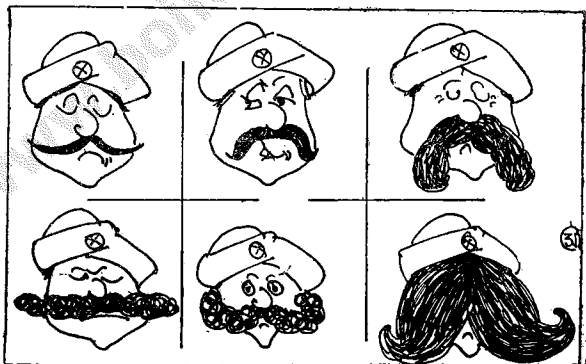
কথা নিয়ে কথা

সন্তোষকুমার ঘোষ

যার কথা দিয়ে তোমার কথা চলে। এই লাইনটা রবীন্দ্রনাথের। তোমার বলতে তিনি ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জীবনদেবতা বা ওই রকম কিছু ভেবে থাকবেন। কিন্তু আমরাও—তোমরা একবার ভেবে ভ্যাখো—কথা দিয়েই কিন্তু আমাদের কথা বলি। মানে, চোখে চাউনিতে ভাষা থাক বা না থাক, মুখে ভাষা থাকা চাই-ই চাই!

এই মুখের ভাষাকেই বলা হয় কথা। কথা অনেক রকম। এক : খালি গালগল্প, এমন কি কখনও কখনও খুব রেগে গেলে বা আঘাত পেলে গালাগালি। সবাই দেন না, এমন মহাজন অনেক আছেন, যাঁরা অপমান-টপমান সব হাসি মুখে হজম করেন, তবু বেশির ভাগ মানুষ একেবারে হাড়, চামড়া রক্ত-মাংসে তৈরি তো! তাদের স্নায়ু-টায়ু যদি কিছু থাকে, তবে খালি ডাক্তার আর মনের ডাক্তারদেরই জানা। এই কথা দিয়েই আমরা সাধারণত এ ওকে স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রীতি সব জানিয়ে থাকি। লিখে বা চিঠিতে হয়, তবে মুখে মুখে যতটা সোজাসুজি, ততটা ছাপার হরফে কখনও নয়।

তাই বলে এই ছাপার হরফের ওজনকেও একেবারে হাল্কা করে ওড়ানো যায় না। ছেলেমেয়েরা গোড়ায়—এবং পরেও—শুনে শুনে কিছু কিছু শেখে ঠিক, কিন্তু পরে পড়ে পড়ে যা জানে, তার ছাপ অনেকের আজীবন থেকে যায়।

কথার তিনটে দিক। শব্দ, বাক্য-বিন্যাস আর বানান। তিন নমবরেরটা অবিশ্যি কানের ব্যাপার একদম নয়, শুধুই চোখের। শব্দ আমাদের উত্তরাধিকার। বাপ-মা-পিতামহ—এঁরা তো বটেই, অগ্রজ আর অগ্রগণ্য লেখকেরা নানান ভাষা থেকে যেসব শব্দ সংগ্রহ করেছেন, সে-সব আমাদের সম্পদ অবশ্যই। তাছাড়া (এক) দেশজ হাজারো শব্দ ছিল তো! ঝড়ে-পড়ে এমন কি মরেও তাদেরও অনেক এখনও জ্যান্ত আছে। (দুই) কত প্রবাদ আর প্রবচন—এই সমস্তই মোটামুটি দেশী। মাতৃস্তন্যের মতোই বিনা দাবিতে পাওয়া। তবে লেখার ভাষায় আহরণের কথাটা উঠে পড়ে। মানে, এ-বাগান ও-বাগান থেকে ফুল তুলে সাজাতে হবে। আগে যাঁরা সাজিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের শিল্প ফেলে দেব না নিশ্চয়ই, বরং যতটা পারি ততটাই অঙ্গীকার স্বীকার করে নেব, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আরও অনেক ফুল পাতা এমন কি চারাগাছ চুরিও করব। সাহিত্যে, মানে লেখালেখির ব্যাপারে এতে দোষ নেই।

প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে যেগুলো রুচির সঙ্গে মেলে, সেগুলো তো থেকেই যায়। মেলে না যেগুলো, সেগুলো নিজে নিজেই খারিজ। বাতিল হয়—কারও ফতোয়ায় নয়। যেমন

শব্দের ব্যাপারে, তেমনই ইংরেজিতে যাকে বলে ইডিয়ম আর ইউসেজ, অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশের যত বাহন, তাদের ব্যাপারেও এক-একটা সময়, সমাজ, মানুষের রুচি আর অভিরুচি কিছু রাখে কিছু কুলোয় ঝেড়ে, ফেলে দেয়। এইভাবে ফেলতে ফেলতে আর নিতে নিতে এক-একটা ভাষা, আমাদের কথা বলায় মতো কথা তৈরি হয়।

বানানেও তাই। আজ অবধি এমন কোনও ভাষা সৃষ্টি হয়নি, অন্তত আমি তো তাদের খবর রাখি না, যেসব ভাষা শুধু উচ্চারণের বেত-মানা শাসনেই তৈরি। অনেক বানান শুধু উত্তরাধিকার, আমরা সংস্কৃত থেকে যেরকম যেভাবে নিয়েছি। একভাবে বলি, লিখি আর একভাবে। তৎসম নাম দিলেও এসব শব্দ সংস্কৃতের সম বা সমান নয়।

আরও কত কী আছে! এত স, এত ন, এত য, কেন, যদি তারা আমাদের জিভের ডগাতেও না থাকে? ভাঙা ভাঙা অক্ষরের যুগলবন্দীই বা কেন, যদি তার আলাদা তাৎপর্য অন্তত সমান্তর ব্যবহার বা নজির না পাই? হিন্দীতে লেখে লখনউ, আমরা খামোকা তা লক্ষ্মৌ করে রামচন্দ্রের ভাই করেছি কেন?

"সিনদ্‌রি"-তেই যেখানে ওই শহর, সেখানকার মানুষ যদি খুশী হয়, তবে আমরা বাঙালীরা অকারণ তাকে সৈরিন্ধ্রীর কাছাকাছি খটমট করি কেন? এই রকম নমুনা বিস্তর। খালি বলে রাখি, বোধ হয় যে-কোনও ভাষার যে-কোনও উচ্চারণই আগে থেকে জানা না থাকলে যতই না অক্ষর দিয়ে অক্ষর গাঁথি, কিছুতেই ফোটানো যাবে না। শব্দের ধ্বনি আসলে সংস্কার-প্রসূত। একটু দুরূহ হল? বুঝিয়ে দিই। আগে থেকে কেউ না বলে দিলে, আগে থেকে জানা না থাকলে বর্ণমালা যত বৈজ্ঞানিক আর নির্ভুলই হোক, কখনোই শুধু লেখা দেখে ঠিক ঠিক মুখে আনা অসম্ভব।

বাংলায় সমস্যা আছে ঠিকই। ধরো, প্রথমে যদি যুক্তাক্ষর থাকে, ভাঙলে বিচ্ছিরি ঠেকে। পাঞ্জাবীদের গুরুমুখী যেমন। তবু কোনখানে কোনও সরলতা আছেই আছে, দেবভাষা সংস্কৃত মাথায় থাকুক, চলতি দেশী বা অর্ধ-তৎসম শব্দেও আমরা কেন যে একটার পিঠে আর একটাকে চড়াই! বলি যুক্ত অক্ষর। যুক্ত সত্যি সত্যিই কি হয়? যে হরফটা নিচে থাকে, সে চ্যাপ্টা হয়ে যায় না? তাছাড়া বানান কথাটার মূলেই তো আছে বর্ণনা। কোনটা সবুজ কোনটা হলুদ, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, আমরা কী করে বর্ণনা করি, যদি—একে তো কৃত্রিম ইডিয়ম ইত্যাদি—তার উপরে জবরদস্ত, আর অনর্থক লেখার নিয়ম এখনও সব কিছু শাসন করতে চায়? আরে না না, কোনও স্বৈরতন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে কিছু বলছি না, মুখের কথা কী করে সাচ্চা কথা হয়, সেইটে নিয়েই এই লেখা আর আমার ভাবনা। সাবেকি ফতোয়ায় এর খানিক রাখলাম, ওর খানিক, ফলে কথা যদি বা মুখে মুখে বলা যায়, লেখাটা হয় আজগুবি। আরও সোজাসুজি বলি: বানান জিনিসটাই যদি হয়ে যায় বানানো, তবে কী করে কোনও কবি অক্ষরে অক্ষরে আঁকবেন রামধনু, বর্ণে বর্ণে কোনও বন, উপবনের দেবেন বর্ণনা?

ফ্রেজারকে ছোঁয়া অসম্ভব

মতি নন্দী

মস্কো ওলিম্পিকসে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে ১২টি দেশের ২০টি মেয়ে এক মিনিটের কম সময় রেখেছে। এখন আমাদের দেশে মাত্র পাঁচটি ছেলে ৫০ বছরের চেষ্টায় তা পেরেছে, তার মধ্যে একজন বাঙালী।

দ্রুত সাঁতরানো খুবই কঠিন, দ্রুত দৌড়ানোর মতই। নিরন্তর অনুশীলন আর মনের জোর ছাড়া এটা পারা যায় না। তাই নয়, দৌড়ের বা সাঁতারের যে বিষয়েই হোক না, এক একটা সময়ের বাধা এমন অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে বহু বছর, বহুজন চেষ্টা করেও সেটা ভাঙতে পারে না। কিন্তু যেই একজন সেই সময় ভেঙে বেরিয়ে যায় অমনি তার পিছনে আরো অনেকে এসে বাধাটা টপকাতে শুরু করে।

যেমন ১৯৫৪ সালে ব্রিটেনের ডাঃ রজার ব্যানিস্টার একমাইল দৌড়ে ৩ মিনিট ৫৯'৪ সেকেণ্ড সময় করার আগে বহু চেষ্টা হয়েছে চার মিনিটের বাধা কাটিয়ে মাইল দৌড়বার। অনেকে তো ধরেই নিয়েছিলেন এটা অসম্ভব। ব্যানিস্টার তা সম্ভব করে দেবার পর, গত ২৬ বছরে একশোরও বেশি অ্যাথলীট চার মিনিটের কমে মাইল দৌড়েছে। এখন সময়টা কমে হয়েছে ৩ মিঃ ৪৮'৮ সেঃ। এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত চার মিনিট টপকাবার কাছাকাছি সময়ে এসে গেছে। অবশ্য আমাদের দেশে কোনো পুরুষ এখনো তা পারেনি, মেয়েরা তো নয়ই।

মেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এক মিনিটের পাঁচিলটা ১৯৬৪ পর্যন্ত খাড়া ছিল, যতক্ষণ না অস্ট্রেলিয়ার এক দুর্দান্ত মেয়ে সেটা ভেঙে দেয়। নাম : ডন ফ্রেজার। গত ১৬ বছরে বিশ্বে অন্তত ৪০টি মেয়ে একমিনিটের কম সময় রেখে সাঁতরেছে এই দূরত্ব। কিন্তু ফ্রেজারের আগে সবারই ওই পাঁচিলে এসে মাথা ঠুকে গেছে।

টোকিও ওলিম্পিকসে সোনা জিততে ডন ফ্রেজারের সময় হয়েছিল—৫৯'৫ সেকেণ্ড। মস্কো ওলিম্পিকসে সোনা জেতা পূর্ব জার্মানির বারবারা ক্রাউসের সময় হল ৫৪'৭৯ সেঃ। ১৬ বছরে সময় কমানো গেছে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড। এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। অল্প দূরত্বের দৌড় বা সাঁতারে দমের থেকেও দরকার বেশি শরীরের জোরের। সাঁতারে এই জোরটা, ১৬।১৭ বছর বয়স থেকে ২২।২৩ বয়স পর্যন্ত বেশ ভালই ধরে রাখা যায়। বয়স যত বাড়ে, শরীরের চটপটে ভাব আর সেই সঙ্গে মনের জোর, একাগ্রতা, কমে আসে। প্রতিদিন হাড়ভাঙা অনুশীলনে অনিচ্ছা দেখা দেয়, কঠোর শৃঙ্খলা মেনে জীবনযাপন আর পারে না। তাকে হটিয়ে তখন আর কোন অল্পবয়সী তার জায়গা দখল করে নেয়।

অল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে আধসেকেণ্ডও সময় কমানো শক্ত ব্যাপার, এজন্য নিরলস সাধনা করে যেতে হয়। নিজেকে শারীরিক ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছে দিয়ে সেটা ধরে রাখতে প্রতিদিন অনুশীলন করে যেতে হবেই। কিন্তু শরীরের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে, সেটা চট করে ইচ্ছামত বাড়িয়ে ফেলা যায় না। আজকাল নানান রকমের ঔষধপত্রের আর গবেষণার সাহায্য পাচ্ছে খেলোয়াড়রা। তবু অল্প দূরত্বের ব্যাপারে সবাই প্রায় একই সময়ের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ করার, কিবা দৌড়ে কিবা সাঁতারে, ওলিম্পিকসে আজ পর্যন্ত কেউই কোন পুরুষ বা মেয়ে দুবার ১০০ মিটার প্রতিযোগিতা জিততে পারেনি—শুধু একজন ছাড়া এবং সে জিতেছে তিনবার। কারণটা আগেই বলেছি—চারবছর অন্তর ওলিম্পিক গেমস হয় এবং চারবছরে শরীর অনেকখানি জোর হারিয়ে ফেলে, চটপটে ভাব নষ্ট হয়, একবার সোনা জিতে ফেললে মনের দিক থেকেও ঢিলেমি আসে আর ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর বাছাই করা অল্পবয়সীরাও টগবগে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সামনে আসে। এইসব বাধা উপেক্ষা করে যে দাঁড়ায়, তার মত বিস্ময়কর আর কিছু কি হতে পারে?

ডন ফ্রেজার হচ্ছে সেই বিস্ময়। ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪—মেলবোরন, রোম, টোকিও—তিনটি ওলিম্পিকসে এবং মোট আটবছর, ডন বিশ্বের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে অপরাজিতা। ১৮ বছর বয়সে প্রথম সোনা, ২৬ বছরে তৃতীয়টি। সাঁতারে আমেরিকার ছেলে মারক স্পিৎজ আর পূর্ব জারমানির মেয়ে করনেলিয়া এনভার খুব হৈচৈ ফেলেছিল মিউনিক আর মনট্রিয়েল ওলিম্পিকসে। কিন্তু ওরা, একবার সাফল্য পেয়েই সরে গেল। ডন তা করেনি। সে দেখিয়ে দিয়েছে চ্যামপিয়ন কাকে বলে।

ডন ফ্রেজারের এই অসাধারণ তুলনাহীন ব্যাপারের পিছনে আছে তার স্বভাব, মেজাজ আর চরিত্র। ভীষণ আবেগী আবার তেমনি বদরাগী, যেমন উচ্ছল তেমনি গোমড়া, এই শান্ত আর পরক্ষণেই দুষ্টু। ওর মধ্যে একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ যেন পাশাপাশি বাস করেছে। যেমন, টোকিও ওলিম্পিকসের সময় বাজি ধরল, জাপান সম্রাটের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে যে পতাকা রয়েছে সেটা চুরি করে আনবে। প্রাসাদ ঘিরে পরিখা, তাতে জল। রাতের অন্ধকারে ডন সাঁতরে গিয়ে পতাকা নিয়ে ফেরার সময় পুলিশের তাড়ায় পালাতে গিয়ে পা মচকায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠান কয়েকঘণ্টা পরই এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে সে অসট্রেলীয় দলের সামনে ভারী দণ্ডে বাঁধা জাতীয় পতাকা বহন করে নিয়ে গেল একবারও না খুঁড়িয়ে, যন্ত্রণার ছাপ মুখে না ফেলে।

এই পতাকা বহনের ভার ওকে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল রোম ওলিম্পিকসে। তখন কর্তারা সেটা নাকচ করে বলেছিল, অমন ভারী জিনিস, রোদের মধ্যে অতক্ষণ নিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা কোন মেয়ের থাকা সম্ভব নয়। শুনে ডন বলেছিল, শুধু পতাকা কেন, দুটো কুস্তিগীরকেও সেই সঙ্গে ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখি।

অথচ এই মেয়েটির বয়স যখন ১২, তখন সন্দেহ করা হয় ওর যক্ষ্মা হয়েছে। অসম্ভব রুগ্ন ছিল। বাবার হাঁপানি, মায়ের হৃদরোগ। অত্যন্ত গরীব, বস্তিবাসী ফ্রেজার পরিবারে ডন অষ্টম সন্তান। মাসের পর মাস ডনের বাবা অসুখের জন্য কাজে যেতে পারেন না, সংসার অচলপ্রায়। ডনই সংসারের কাজকর্ম করতো, রান্না, সেলাই, কাচা-কাচি সবই। তখন বয়স তেরো। অবসর পেত রাত্রে। তখন সে আড্ডা দিতে বেরোত ছেলেদের সঙ্গে। ওর স্বভাবে বুনোভাবটা আসে এই সময়েই। স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়, এক ফ্রক তৈরির কারখানায় কাজ পাওয়ায়।

পাঁচ বছরের ডনকে প্রথম জলে নামায় ওর দাদারা। ওদের অঞ্চলে একটা পুকুরে বহু ছেলেমেয়ে ঝাঁপাঝাপি করত।' এইখানেই সাঁতার শিক্ষক হ্যারি গ্যালাঘার প্রথম ডনকে দেখেন। কয়েকটি ছেলে একটি মেয়েকে জলে চোবাচ্ছে আর মেয়েটি প্রচণ্ড বিক্রমে হাত-পা, মুখ চালাচ্ছে। ছেলেরা ওর সঙ্গে মারামারিতে পারছে না। মেয়েটি ডন ফ্রেজার। ওর মুখের ভাষা আর চালচলনের মত সাঁতারের স্টাইলটাও যাচ্ছেতাই। কিন্তু সমবয়সীদের থেকে জোর সাঁতরায়, ছিপছিপে শরীর চওড়া কাঁধ।

গ্যালাঘার যেচে ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলেন। প্রথম কথা: 'তোমার স্ট্রোকগুলো ভারি সুন্দর তো, খুব সাঁতার কাটো বুঝি?'

'নাহঃ, এই এমনি হাত পা ছুঁড়ি।'

এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডনের বিশ্রী স্ট্রোকগুলোকে সুন্দর করার কাজ শুরু করলেন গ্যালাঘার। কিন্তু অপাত্রে। শিক্ষা নেবার থেকে জলে লাফালাফি করতেই ডনের উৎসাহটা বেশি। প্রায় দুবছর লেগেছিল অসীম ধৈর্যবান গ্যালাঘারের, এই বন্য মেয়েটির স্ট্রোক নিখুঁত করতে। তিনি বুঝে গেছলেন, একবার পোষ মানাতে পারলে এই মেয়ে অসাধ্য সাধন করবে।

ডন তা করেছিল। ধীরে ধীরে সে বদলে যেতে থাকে। ভোরে সাঁতার অনুশীলন, দুপুরে ফ্রকের কারখানায় কাজ, বিকেলে অনুশীলন, রাত্রে আবার চাকুরি এক দুধের দোকানে। এরই মাঝে সংসারের যাবতীয় কাজ। বয়স তখন তার পনেরো। গ্যালাঘারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক বছর পরই ১৯৫৪ সালে ডন অসট্রেলিয়া জাতীয় সাঁতারে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তৃতীয়স্থান পেল। ১৯৫৫-য়, ২০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড, ১৯৫৬-য় ১০০ মিটারে প্রথমবার বিশ্ব রেকর্ড (৬৪.৫ সে) এবং ছমাস পর ওলিম্পিক সোনার পদক (৬২.০ সে)। সাঁতার শিক্ষার তিনবছরের মধ্যেই এইসব।

সিডনীর উপকণ্ঠে এক জাহাজঘাটার বস্তি থেকে বিশ্বখ্যাতির শিখরে উঠে আসে যে মেয়েটি বরাবরই তার হাঁপানির ধাত কিন্তু আট বছর সে ছিল বিশ্বের দ্রুতগামী মেয়ে সাঁতারু। ডন ফ্রেজারের সময় পিছনে ফেলে বহু মেয়ে এগিয়ে গেছে এবং যাবেও, কিন্তু একজনও তার তিনবার ওলিম্পিক স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়নের গৌরব ছুঁতে পারবে না।

জীবন নিয়ে খেলা

জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র

আমার স্বদেশবাসী ভাই-বোনেরা,

বিদেশে বসে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু লেখার সুযোগ পেলে খুবই খুশি। তা থেকেও বেশি আমার গর্ব। গর্ব তো বটেই। তোমাদেরই হয়ে, আমি এখন বিশেষ একটি বিষয়ে মানে ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যায়, ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছি এদেশে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস হয়ে গেল, আমার ভারত থেকে আসা। দলের সবাই এবং আমিও এবার ভারতে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ। কী নিয়ে যাব, এখান থেকে তোমাদের জন্য ?

অনেক অনেক কিছু। এবং এমন কিছু যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। কিন্তু কী ?

তাহলে শোন : ফিলিপিন সরকারের আমন্ত্রণে এদেশে আসি ইন্দ্রজাল দেখাতে। দশ হাজার আসন নিয়ে 'ফোক আরটস থিয়েটর'-এ জনাকীর্ণ চার সপ্তাহের অনুষ্ঠান শেষে দর্শকদের অনুরোধেই আমাকে আবার ম্যাজিক দেখাতে হয়—আরানেতা বালেসিয়াম ইনডোর স্টেডিয়ামে। এর আসন সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার। শুনলে অবাক হবে এখানেও ব্ল্যাক-মার্কেটে টিকিট বিক্রি হয়েছে। তাহলে দেখ কেমন ডিম্যাণ্ড।

তারপর সেবু শহরে ম্যাজিক শো। আয়োজন করে পৌরসভা। এখানে সংবর্ধনা জানানো হয়। শহরের মেয়র এবং স্থানীয় গভর্নর আমাকে সেবু শহরের 'চাবি' উপহার দেন। ভুল বললাম ভাই। আমাকে নয়। একজন ভারতীয়কে। মানে ভারতকেই। আসলে আমার হাত দিয়ে। আমি তো ভারতের প্রতিনিধি। তাই। শুধু ওই চাবি উপহারই নয়, ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে দেন কলাগাছের আঁশের তৈরি স্থানীয় পোশাক 'ব্যারং'। যে কোন বিদেশীর কাছেই এটা হল দুর্লভ সম্মানের প্রতীক। কিন্তু বিদেশী মানে কোন্ দেশী ? নিশ্চয়ই ভারতীয়। তাহলে দুর্লভ সম্মানটা কে পেল, ভারত নয় ?

সেবু শহরের পর (মালয়েশিয়ায় এসে) পেনাং (Penang), আইপো (Ipoh), সেরেমিবাং (Seremban) বাটু পাহাত (Batu Pahat) মালাক্কা (Malacca), প্রভৃতি শহরে শো। এখন কুয়ালালামপুরে (Kuala Lumpur)-এ।

এসব কথা তোমাদের শুনতে ভাল লাগছে কি ?

আচ্ছা তাহলে একটা গল্প বলি। শোন :

সেদিন জুলাই মাসের সাতাশ। ৩৪ বছর বয়সের একজন জ্যান্ত যুবককে একটা থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে দেওয়া হল। তারপর সেই থলি হল বাক্সবন্দী। পেরেক ও লোহার পাত দিয়ে শক্ত করে আটকিয়ে মজবুত তালা লাগান হল। এই কাজে কোন ফাঁকি ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখলেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং সঙ্গে ডিসট্রিক্ট এন্‌জিনীয়ার এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। আর উৎসুক নয়নে উপস্থিত ছিলেন, হাজার হাজার দর্শক এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ। জায়গাটা কোথায় জান ? ডিকসন বন্দর।
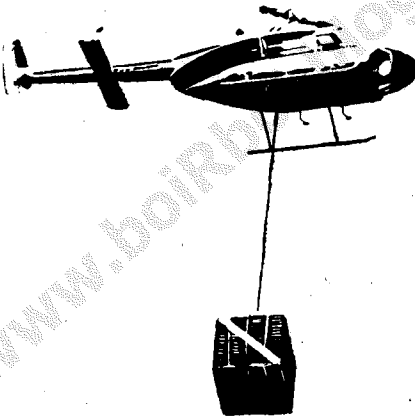
তারপর একটি হেলিকপ্টার সেই বাক্সটি তুলে নিয়ে উঠে গেল একশ ফুট উঁচুতে। তারপর সমুদ্রের দিকে। তারপর ?

হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছি। বাক্সবন্দী আর থলি ভর্তির আগেই সবার সামনে বুক উঁচিয়ে যুবকটি ঘোষণা করলেন :

'আমি যদি মারা যাই তবে দায়ী কেউই নন। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে আমি স্বেচ্ছায় এই খেলায় হাত দিয়েছি। তবে আমি জানি—আমি মারা যাবো না। তার কারণ, আপনাদের সবার শুভকামনা, মা-বাবার আশীর্বাদ আর ভগবানের করুণা আমার সঙ্গে আছে। তবু, বলা যায় না, কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি আমি মারাও যাই, জেনে রাখবেন সে মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কারণ পৃথিবীতে······শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির জন্যই আমি এই খেলাটি দেখাচ্ছি। এই মৃত্যু তাহলে আমার গৌরবপূর্ণ মৃত্যু হবে।'

তারপর সেই হেলিকপ্টার বাক্সটিকে নিক্ষেপ করল সমুদ্র বক্ষে। তখন, কী আশ্চর্য, মাত্র ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই যুবকটি থলে আর বাক্স থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল।

তারপর কী ঘটল সেই যুবকের জবানীতেই শোন :

ভর্তি-আমি সেই বাক্সটি আকাশ থেকে প্যারালাল সমান্তরাল হয়ে জলে পড়ে নি। একদিকে একটু কাত হয়ে গিয়েছিল। কেন? না ওভাবে পড়বার জন্য যেভাবে কিছু ইট বাক্সের তলার দিকে ঝোলানো ছিল তা একদিকে ওজনে বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই অপ্রত্যাশিত ওই পতন। ফলে আমি আমার পিঠে আঘাত পাই। তবু এই পরিবর্তিত অবস্থায় বাক্সর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্তেরও বেশি লাগে নি। বেশি লাগলে কী হত?

ভাবা যায় না। সমুদ্রের অতল গহ্বরে ভিতরে আমি……

আমার পিঠের আঘাত আর নিমেষে বাক্স-মুক্ত হওয়ার জন্য শারীরিক পরিশ্রম আমাকে ভীষণ পরিশ্রান্ত করে তুলল। বাধ্য হয়েই কয়েক ঢোক নোনা জল গিললাম। এতই অবসন্ন যে আর সাঁতার দিতে পারি না। চোখে অন্ধকার। মনে হল—তরী এসে কি শেষে তীরে ডুববে! পূর্ব ব্যবস্থা মতো আমাকে তুলে নেওয়ার নৌকা কোথায়? একটু দূরে বুঝি পুলিশের বোট। আরও দূরে দর্শকদের নৌকা অনেকগুলি। কিন্তু আমাকে এখুনিই যে জল থেকে তোলা দরকার কেউই বুঝতে পারছে না। আমি প্রায় শ্বাসরুদ্ধ। গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছে না। হাতের ইশারা তাদের কারও চোখে পড়ছে না। তাহলে কি সত্যিই……। চোখে শুধু অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার। তারপর—

হঠাৎ আলোর ঝিলিক। চোখের সামনে এক টুকুরো কাঠ। হাত বাড়িয়ে ধরলাম ওটা। বুকের কাছে টেনে নিলাম। আর বাঁচলাম। পরে জানলাম, মাছ ধরার নৌকা থেকে এক জেলে ওই কাঠ ছুঁড়ে দিয়েছে আমার দিকে। তিনিই আমার পরিত্রাতা। নাকি ঈশ্বর!

কিন্তু কাঠ বুকে জড়িয়ে কতক্ষণ আর ভেসে থাকতে পারবো। না, আমার সৌভাগ্যে আমাকে তুলে নেওয়ার বোট দূর থকে রবারের টিউব ছুঁড়ে দিল। আমি উঠে এলাম। আমি বেঁচে গেলাম।

এবার তোমাদের বলি—আদৌ এটি একটি রোমাঞ্চকর গল্প নয়। একেবারে সত্যি ঘটনা। স্থান কাল ও পাত্র—সবই যথার্থ। এবং ওই যুবকটির এই জীবন-বিপন্ন খেলা পৃথিবীতে আর কেউই এখনো দেখাতে পারে নি। আমার এই বলার শেষ কথা কী জান?

তিনি একজন ভারতীয় এবং তোমাদের পরিচিত।

টফির কাণ্ড কারখানা

কণা বসু মিশ্র

টফির ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে। ও চোখ মেলেই দেখে, মা, বাবা খুব ঘুমুচ্ছেন। এই সময় একটু সাইকেল চালিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

টফিদের পুরনো আমলের বাড়ি। মাঠের মত বিরাট তার ছাদ। এই ছাদটা কখন টফির ফুটবলের মাঠ হয়। কখন ক্রিকেটের উদ্যান হয়ে যায়, কখন সাইকেল ভ্রমণের রাস্তা। মাথার ওপরে খোলা আকাশটার দিকে তাকিয়ে ওর প্ল্যানেটারিয়ামের কথা মনে হয়।

টফি তার দু চাকার লাল বেঁটে সাইকেলটা নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সদর দরজায় এসে থামে। প্যাডেল করার সময় যখন চেনের সঙ্গে প্যাডেল লেগে ক্যাচ্ কাচ্ শব্দ হয়, তখন হঠাৎ মায়ের গলা শুনতে পায় ও! 'কে?'

এই রে ঠিক ঘুম ভেঙে গেছে। মার হাত থেকে আর রেহাই নেই। নতুন কিছু একটা আইডিয়া মাথায় এলেই মা ঠিক বাগড়া দেবেন। টফি প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। ও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সাইকেলটা নিয়ে। তারপর দ্বিতীয়বার মা 'কে' বলতেই ও উত্তর দেয় 'আমি।' 'তুমি কি করছ এই সাত সকালে? কখন উঠলে?' 'এইমাত্র। আমি এখন ইংরিজি টেক্সটা খুঁজছি।' 'তাই খোঁজো। এরই মধ্যে হারিয়ে ফেলেছ? কালই তো রাত্তিরে আমি তোমার স্কুলের সুটকেস গুছিয়ে রাখলাম।'

আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লেন ফের। সদর দরজার ওপরে ছিট্‌কিনি। টফি তো নাগাল পায় না দরজাটা ও খুলবে কি করে? খাবার টেবিলের একটা চেয়ার ও অতি সাবধানে টেনে আনে। তারপর তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিট্‌কিনিটা খুলতেই খুট্ করে আওয়াজ হয়। টফির বুক কেঁপে ওঠে। এবার নির্ঘাত ও ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ যাত্রাও পার পেয়ে যায়।

ঘটাং ঘটাং ঘটাং। ছাদের মাথায় মিনিট দশেক সাইকেল চালাতেই, ও হঠাৎ চেনা গলায় নিজের নামটা শুনতে পায়। সর্বনাশ! মা! টফির হাত, পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মা ওকে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যান নীচেয়। 'বাঁদর ছেলে! এই তোমার পড়া হচ্ছে?'

মায়ের এই গোয়েন্দাগিরি আর ভাল লাগে না টফির। ছোটদেরও মান, অপমান আছে। টফি কি গরু না ছাগল যে উনি ওর কান ধরবেন?

আজ ছুটির দিনের সকাল। তবুও পড়তে বসিয়ে দিয়ে গেছেন মা। টফি চেঁচিয়ে একটা কবিতার কয়েক লাইন পড়েই থেমে যায়। মা বাজার যাচ্ছেন কাজের লোক সুদামাকে নিয়ে। বাবা এখন বসার ঘরে অফিসের লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। মা বেরিয়ে গেলেই টফি পুরোপুরি স্বাধীন।

ওর পড়ার ঘরে উঁকি মেরে মা বলে যান, 'আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তোমার হোম ওয়ার্ক সব তৈরি হয়ে গেছে।' টফির মাথার মধ্যে তখন গুব্‌রে পোকার মত সাইকেলের চেনটা ফের ঘুরঘুর করে। আচ্ছা এই সময় সাইকেলের ব্যালেন্সটা খুলে ফেললে কেমন হয়? ও তো বড়ই হয়ে গেছে। এখনো কি ব্যালেন্স ছাড়া সাইকেল চালাতে পারবে না?

বাবার স্ক্রু ড্রাইভার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও অনেকক্ষণ ধরে খুলতে চেষ্টা করে ব্যালেন্সটা। হাতুড়ি দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে ঠোকে। ওর মা বলেন, বড় হলে ও নাকি ওর বাবার মতই

বড় এঞ্জিনিয়ার হবে। বাবা তো খুলতে পারেন সাইকেলের ব্যালেন্স। তবে ও কেন পারবে না। টফির সব খুলে খুলে দেখতে ইচ্ছে করে। ব্যালেন্স খুলতে গিয়ে ও স্ক্রুয়ের মত ছুঁচলো কি একটা জিনিস পেয়ে যায়। এটা ওর দরকার হতে পারে। টফি অনেক যত্ন করে ওর খেলার বাক্সের টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে ফেলে রাখে।

কদিন থেকেই প্রচুর কাজ জমে আছে টফির। এই যে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেটের

মধ্যে যে নাইলনের জালটা এটা কি ওর কম প্রয়োজন ? র‍্যাকেটটা ভেঙে ফেলে যদি জালটা খুলে ফেলা যায়, তবে যা সুতো বেরোবে না ? দারুণ। মা তো গড়িয়াহাট থেকে কিনে এনেছিলেন কাপড় টাঙানো নাইলনের দড়ি, কিন্তু এই র‍্যাকেটের দড়ির মত এত ফাইন তো নয়।

দরজার বেল বেজে চলেছে। এইরে, মা বোধহয় ফিরলেন এখন। তবু এখনো এক মিনিট সময় হাতে আছে। যা কিছু করার, এখনই করে ফেলতে হবে। হাতুড়ি ঠুকে র‍্যাকেটটা ভেঙে ফেলেছে ও। নাইলনের দড়ি বা সুতোটা জড়িয়েও ফেলেছে ঘুড়ির লাটাইয়ের সঙ্গে। র‍্যাকেটের ভাঙা টুকরোগুলো ও তাড়াতাড়ি ফেলে দেয় জানলা দিয়ে। মা দেখলেই তো আবার চ্যাঁচামেচি করবেন, 'ছিঃ ছিঃ পিশেমশাই এই সেদিন কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে দিয়ে গেলেন। কেউ কোন জিনিস দিলে তা কি এইভাবে নষ্ট করতে হয় ?'

সে কথা কি আর টফি জানে না ? পিশেমশাই আর পিশেমশায়ের দেওয়া জিনিস সবাইকেই তো ও খুব ভালবাসে। কিন্তু নাইলনের দড়িটা খুব দরকার বলেই না ওকে এ কাজ করতে হ'ল ?

দড়িটাকে আলমারির তলায় চালান করে দিয়ে টফি তড়িঘড়ি ছুটে যায় পড়ার টেবিলে। ও চেঁচিয়ে পড়ে,

'আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে এমন ভয় পেলে।"

পেছন থেকে কান ধরে বাবা বলেন, 'কাকে কামড়ে দিবি বাবাজীবন ?'

খিলখিল করে হেসে টফি বলে, 'আমি নাকি ? সে তো সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের ভয় পেয়ো না জন্তুটা।' 'ও তাই বল্।' বাবা হোহো করে হাসেন।

ছোটদের কানটা যেন একটা ভয়ানক খেলার জিনিস বড়দের কাছে। বাবার কান ধরায় কেমন এক ঠাট্টা থাকে, মায়ের কান ধরায় থাকে রাগ। কোন কান ধরাই ভাল লাগে না ওর। টফি যদি একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। যদি স্লোগান দেয়, 'ছোটদের কানধরা চলবে না, চলবে না। এতে ছোটদের অপমান। অপমান।'

যেই না ভাবা, অমনি ও একটা কাগজে রসগোল্লার মত বড় বড় করে লেখে কথাগুলো।

'আমার জন্যে চকলেট এনেছ মা ? কাল যে বলেছিলে, দেবে ?'

'দেব বলেছিলাম। কিন্তু তার বদলে কি কথা ছিল ? দশটা অঙ্ক করবে তাই না ? দেখি খাতা, কি কি হল ?' কথা বলতে বলতে মা ঢুকে পড়েন টফির পড়ার ঘরে। 'একি সাইকেলটা এভাবে ভাঙল কে ?' 'ভাঙিনি, মানে...।' 'আবার মিথ্যে কথা ?'

টফির বুক টিপ্‌টিপ্ করে। টফি কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে সুদামা, 'বউদি, অ বউদি, দেখেছেন, কাল নতুন কিনে আনা বাদাম তেলের টিনটা কে হাজার ফুটো করে রেখেছে।' 'কে আর রাখবে ?' মা আগুন চোখে তাকান টফির দিকে। সুদামা আবার চেঁচিয়ে বলে, 'কত তেলই না নষ্ট করেছে।'

টফির কান ধরে মা বলেন, 'দুষ্টু ছেলে, আমার রান্নাঘরে গিয়ে তোমায় অকাজ করতে কে বলে ?'

'ইস। আবার সেই কান ! আমি কি গাধা ? না ঘোড়া ?' বিড়বিড় করে টফি বলে। মা রেগে বলেন, 'কি বললে ?'

টফি রাগে গোঁগোঁ করতে থাকে, 'তেলটা তো তোমার ফুটো করতেই হত। তাই আমি... ।'

ও ঘর থেকে বাবাও চেঁচান, 'টফি, ফের তুমি আমার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তেলের টিন ফুটো করেছ ?'

'তোমার স্ক্রু ড্রাইভার আমি নিইনি। অন্য একটা বানিয়ে নিয়েছি।' কান ধরার অপমান ভুলে টফি চট্ করে পকেট থেকে বের করে দেয় সাইকেলের ব্যালেন্সের স্ক্রুটা।

'দুষ্টু ছেলে, সামান্য এই স্ক্রুটার জন্যে অমন সাইকেলটা... !'

মা আর শেষ করেন না কথাগুলো। ওর অঙ্কের খাতাটা টেনে নিয়ে খস্‌খস্ করে গোটা দশেক অঙ্ক লিখে দেন। 'নাও, এগুলো কর।'

সুদামা ফের ফোড়ন কাটে। 'বউদি, বিকেলে ভাইয়ের খেলতে যাওয়া বন্ধ।' হিহি হাসে সুদামা। মা এখানে না থাকলে, টফি হয়ত এক্ষুনি ওকে একটা ক্যারাটে

মেরে দিত। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিজেকে সামলে নেয়। সুদামাকে মারলে মা কি আর আস্ত রাখবেন ওকে ?

কিন্তু সুদামা যে ওর পেছনে লাগে। ওকে খ্যাপায়। সে কথা মা বোঝেন না কেন ? ও যদি চলে যায় সেই ভয়ে ? টফি জানে, সুদামা কোনদিন যাবে না। টি. ভি. আছে যে। টি ভি. দেখার লোভেও ঠিক থেকে যাবে। ও তো সেদিন টফিকে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময় বলছিল, 'আগের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিলাম কেন জানো ভাই ? ওদের তো টি. ভি. ছিল না তাই।'

মা কি টফির চেয়ে সুদামাকেই বেশি ভালবাসেন ? টফি তো মা বাবার চেয়ে কক্ষনো কাউকে বেশি ভালবাসে না। মা যখন ওকে খুব আদর করেন, চুমু খান, তখন তো জিজ্ঞেস করেন, 'টফি, তুই আমায় কতখানি ভালবাসিস বলত ?'

টফি সঙ্গে সঙ্গে দু হাত লম্বা করে বলে, 'এই এত্তোখানি।'

ও যখন আরো ছোট ছিল, তখন বলত, 'এই এখান থেকে আকাশ অবদি।' এখন আর বলে না। ওতো জানে, আকাশটা কোন মাপই না। আকাশ মানেই তো কিছু না। শুধু শূন্য আর শূন্য ।

অঙ্কের খাতা সামনে রেখে টফি ভাবে, ও অনেকদিন ঘুড়ি ওড়ায়নি। লাটাইয়ে প্যাঁচানো নাইলনের সুতোটা ঘুড়ির মধ্যে ফুটো করে বেঁধে দিলে যা হবে না ? দারুণ।

টফি ভরদুপুরে ছাদে উঠেছে ওই ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যেই। কিন্তু ছাদের ট্যাঙ্কের কাছে একটা ফুটো দেখতে পেয়ে ও থমকে যায়। গোল মত খানিকটা জায়গা ফুটো। ফুটোটা বেশ গভীর।

ছাদে ভূত আছে সুদামা ওকে বলেছে। এই বাড়িটা তৈরির সময় একটা রাজমিস্ত্রী নাকি পড়ে গিয়েছিল, এই ট্যাঙ্কের ওপর থেকে। কথাটা মনে পড়ায় ও যেন অন্যমনস্ক-ভাবে কিছু একটা ভাবে।

কাজ-টাজ সেরে সবে চোখ বুজেছে সুদামা। অমনি ছাদের মাথায় দুপুর দাপুর শব্দ। মহাযন্ত্রণা তো! টফি গেছে নাকি ছাদে ? কিন্তু এতো বাচ্চা ছেলের হাঁটা নয়। শব্দটা ঠিক সুদামার ঘরের মাথার ওপর। কে যেন হাতুড়ি পিটছে মনে হয়। ভূত-টুত নয়ত ? রাজমিস্ত্রীটা মরেছিল ছাদে। সুদামার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ও কান খাড়া করে ফের শোনে সেই শব্দ। মনে হচ্ছে যেন ওর, ছাদের ওপর দড়াম্ দড়াম্ করে কেউ ভারী জিনিস ফেলছে। বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় সুদামা ডাকে, 'বউদি।'

কিন্তু টফির মা শুনতে পান না। উনি তখন গল্পের বই নিয়ে মশগুল। 'সুদামা দৌড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। পারে না। দরজাটা যে বাইরে থেকে বন্ধ। সুদামা কাঠের পুতুলের মত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। আর চেঁচিয়ে ডাকে. 'বউদি, অ বউদি।'

'আহ্‌ চেঁচাচ্ছ কেন ?' অনেক পরে সাড়া দেন টফির মা। 'আরে, কি কাণ্ড, দরজাটা বন্ধ করল কে ?'

বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুদামা দেখে, ঘরের সিলিংয়ের খানিকটা অংশ ঝুপ্‌ করে ভেঙে পড়ল। পুরনো বালি, ইটের গুঁড়ো ছাইয়ের মত উড়ে পড়ে সুদামার গায়ে মাথায়। 'সর্বনাশ! সেই রা আ রা আ জ মিস্ত্রীর ভূত!' সুদামা তোতলা হয়ে যায়। চোখ ছানাবড়া, মুখটা ব্যাঙের মত করে সুদামা সিলিঙের দিকে তাকায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুদামা দেখে, ভাঙা সিলিংয়ের ফুটো দিয়ে একটা নাইলনের সরু দড়ি নেমে আসছে। গোঁগোঁ শব্দ করতে করতে সুদামা ডিগবাজী খেয়ে বলে, 'ভূতটা কি ফাঁসি দেবে নাকি আমায় ?'

টফির মা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে বলেন, 'কি হল ? সুদামা কি হল তোমার ?' সুদামা কিছু বলে না শুধু মুখ দিয়ে গোঁগোঁ আওয়াজ করে। তারপর অতি কষ্টে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ওপরের সিলিংটা।

ছাদের মাথা থেকে তখনো হাতুড়ির শব্দ আসছে ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌।

নাইলনের দড়িটা খুব চেনা লাগে টফির মায়ের। সিলিঙের ফুটোর দিকে তাকিয়ে উনি চীৎকার করে বলেন, 'হনুমান নেমে এসো শিগগিরই। নইলে তোমার ওই লেজটা আর থাকবে না।' এই কথা বলেই উনি বঁটি দিয়ে ক্যাঁচ করে কেটে দেন টফির অনেক শখের নাইলনের দড়িটা।

বিষ্টির তিন কন্যে / পঙ্কজ সাহা

বৃষ্টি এলো ঝেঁপে
ধান দিইনি মেপে
তাই বৃষ্টি থেমে
আবার এলো নেমে।

বৃষ্টির তিন কন্যে
গায়ে হলুদের জন্যে
হাত করলো চিৎ
রোদ্দুরের জিৎ।

লণ্ডন জাদুঘরে

নবকুমার বসু

সত্যি কথা বলতে কি, জাদুঘর সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা—লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকতেই সে ধারণা একেবারে পালটে গেল। পুরো জায়গাটাকে একটা ছোটখাট শহর কিংবা এক বিশাল রাজবাড়িও বোধহয় বলা যায়। যেমন ঝকঝকে তকতকে নিখুঁত ব্যবস্থা, তেমনই অবাধে ভেতরে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা।

জুলাই মাসের শেষদিক তখন। লণ্ডনের আকাশে আঁধার নামে রাত (!) দশটা সাড়ে দশটায়, আবার তিনটের মধ্যেই ভোর। অফুরন্ত দিনের আলো আমরা উপভোগ করতাম ক্রিকেট খেলে। জাদুঘর দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক করা ছিল। এক সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সঙ্গে ক্যামেরা আর নোট বই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাতাল রেলে চেপে নটার আগেই পৌঁছে গেলাম জাদুঘরে।

কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম একটা ব্যাপার জানার পরে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা এবং প্রত্যেকটিই এতো বিরাট এবং এত্তো সুন্দর যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি! যাই হোক শেষপর্যন্ত আমার সবচেয়ে, কাছেরটা প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘর বা ব্রিটিশ মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি—থেকেই আরম্ভ করলাম। কিন্তু প্রথমেই আমার দুটো চমক লাগলো।

জাদুঘর চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে আমি এদিক ওদিক টিকেট কাউন্টার খুঁজছি। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় মিউজিয়মেরই রক্ষণাবেক্ষণ করেন এরকম একজন ভদ্রলোক—তাঁর পরনে নীল যুনিফর্ম এবং মাথায় নীল টুপি—আমায় জিগ্যেস করলেন—আপনি কি কিছু খুঁজছেন? ক্যান আই হেল্প য়ু?

আমি ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—আমায় টিকেট কাউন্টারটা কোনদিকে দেখিয়ে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন—কিসের টিকেট কাউন্টার বলুন তো? পাতাল রেল-এর?

আমি বললাম—না, না। মিউজিয়ামে ঢোকার।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বললেন—আসুন আমি আপনাকে ভেতরে ঢোকার গেটে পৌঁছে দিয়ে আসি। মিউজিয়ামে ঢুকতে কোনো টিকেট লাগে না। টিকেট কাউন্টার বলেও কিছু নেই।—উনি আমাকে ঘোরানো গোল রাস্তা আর অসংখ্য পায়রার মধ্য দিয়ে মিউজিয়ামের বিশাল প্রাসাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় দিলাম ভদ্রলোককে।

আমার দ্বিতীয় চমক জাদুঘরের ভেতরে ঢোকার পর। মিউজিয়ামে ঘুরতে গেলে সঙ্গের জিনিসপত্র ক্যামেরা সব নিশ্চয়ই গেটের কাছেই জমা দিয়ে টোকন নিতে হবে। আমি সামনেই একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে দেখে কাঁধ থেকে ক্যামেরা এবং বিভিন্ন লেন্স ইত্যাদি খুলে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম জমা দেবো বলে।

কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই আমায় লক্ষ্য করেছিলেন। নিজেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমায় বললেন—কি ব্যাপার, ক্যামেরা খুলে রাখছেন কেন? আপনি মিউজিয়ামের ভেতর ছবি তুলবেন না?

আমি তো তাজ্জব! আমাদের দেশে ছবি তোলা তো দূরের থাকুক, ক্যামেরাশুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে পা দেওয়াই আইনত দণ্ডনীয়। বললাম—মিউজিয়ামের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া এবং ফটো তোলা অ্যালাউড?

ভদ্রমহিলা বললেন—নিশ্চয়ই। তা নয় তো আর মিউজিয়ামে এসে লাভ কি?

আমি তো পুরো বোকা বনে গেলাম। ভেতরে ফটো তোলা যায় না ধরে নিয়েই, আমি তখনও ফিল্ম কিনি নি। এদিকে এই ছবি যদি না তুলে নিয়ে যাই, সেটা হবে এক অপরাধ। কি করি! ভদ্রমহিলারই সাহায্য চাইলাম!—কাছাকাছি কোথাও ফিল্ম কিনতে পাবো?

—আসুন।—ভদ্রমহিলা জাদুঘরের মধ্যেই এক বিশাল দোকানের সামনে নিয়ে গেলেন আমায়। বললেন—আপনার যা যা দরকার সব পাবেন এখানে।

দেখি একটা বিরাট স্টেশনারি দোকান—মিউজিয়ামেরই ছাদের নিচে। বইপত্র ছবি রং তুলি ফিল্ম ক্যামেরা থেকে শুরু করে চকোলেট চিউংগাম পর্যন্ত পাওয়া যায়। আমি ক্যামেরার ফিল্ম আর কয়েকটা চিউংগাম কিনে বিনি পয়সায় জাদুঘরের একটি

মানচিত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে এলাম। মোটামুটি একটু গুছিয়ে নিলাম যে কোন দিক থেকে দেখা আরম্ভ করা যায়।

বাইরে রাস্তা থেকে প্রথমে মিউজিয়াম দেখে মনে হয়েছিল এক বিরাট মঠ কিংবা মন্দির। ইঁটের বদলে রঙীন পাথর দিয়ে তৈরি। অনেক উঁচু মাথাটা দেখতে চার্চের মতন। ভেতরে ঢুকেই দেখি সামনে এক বিশাল হলঘর—যার ছাদ প্রায় পাঁচ ছ' তলা বাড়ির মতন উঁচুতে এবং জাদুঘরের ভেতরের যথেষ্ট আলো আসার জন্য, ছাদের অনেকটা অংশ শুধুমাত্র কাঁচ দিয়ে ঢাকা।

গেট পেরোতেই—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরনো ডাইনোসোরাসের কঙ্কালের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আড়াই হাজার বছরের পুরনো এই অতিকায় দানবের সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে অসম্ভব তুচ্ছ মনে হল! এর চার হাত পায়ের এক একখানা হাড় যেন এক একখানা বিরাট গাছের গুঁড়ি। আর জঙ্ঘা'র (পেলভিস) হাড়টা আমার মনে হল একখানা ছোটখাট মোটরগাড়ি মতন সাইজ। মাথাটা মাটি থেকে পনেরো কুড়ি ফুট উঁচু, আর মাথার পিছন থেকে শুরু হওয়া শিরদাঁড়া—একটি ক্রমশঃ সরু হয়ে যাওয়া খুব মোটা শিকলের মতো একেবারে দুশ ফুট দূরে লেজের প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। যেমনই বিশাল বিচিত্র এই কঙ্কাল তেমনই আশ্চর্য এর গঠন। মনে মনে একবার কল্পনা করার চেষ্টা করলাম—রক্তমাংস চামড়া এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমেত তাহ'লে এই কঙ্কালের কি চেহারা দাঁড়াতে পারে!

ব্রিটিশ মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি এখান থেকে শুরু, কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানি না এর শেষ কোথায়। বিশাল হলঘরের দু পাশে কিছুটা অন্তর একটি করে গেট। তার যে কোনো একটি দিয়ে ঢুকে গেলে—এক একটি ভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর ঐতিহাসিক জগতে। কোনটি পক্ষিজগৎ, কোনটি কীটপতঙ্গের। কোনটি মেরুদণ্ডী কোনটি স্তন্যপায়ী কোনটি উভচর আবার কোন একটি হয়তো শুধুমাত্র মানব জন্ম ইতিহাস অবলম্বন করেই। আরও কতো কি!

হলঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সামনেই বিশাল চওড়া পাথরের সিঁড়ি। সোজা খানিকটা উঠে শেষ হয়েছে একটি প্ল্যাটফর্মে, সেখান থেকে আবার ডাইনে বাঁয়ে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি। ডাইনোসোরাসের কঙ্কালের পর থেকেই পুরো হলঘর জুড়ে রয়েছে হাজার রকম সরীসৃপের কঙ্কাল। তাক্ লাগানো কিম্ভুত সেইসব আকৃতি। স্বচ্ছ কাঁচের দেয়ালে লেখা আছে কঙ্কালদের বংশ ইতিহাস বয়স এবং পরিচিত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে হঠাৎই যেন ঢুকে পড়েছি কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক গুহায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোক এসেছেন জাদুঘরে। ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ঝিলিক দিয়ে উঠছে মুহুর্মুহু। কেউ নিজের নোটবইতে টুকিটাকি কোন ব্যাপার লিখে নিচ্ছেন। কেউ দ্রুতহাতে এঁকে নিচ্ছেন ছবি।

কয়েকটি ছবি তুললাম আমি। সামনে এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালাম। আরও কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে কি শুনছে। কিন্তু কে বলছেন এবং কি বলছেন—দেখতে কিংবা বুঝতে পারলুম না। একটু পরেই দেখি সেখানকার সব লোকজন আবার অন্যদিকে চলে গেলেন দেখতে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না বলেই কৌতূহল বাড়লো। আর একটু এগিয়ে গেলাম চৌখুপি জায়গাটায়। আরও কয়েকজন লোক এসে দাঁড়ালেন আমার আশে পাশে।

এবার হঠাৎই এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করলেন। আর সেইসঙ্গে রঙিন টেলিভিশন চালু হল। কণ্ঠস্বর জানালেন : আমি এখন আপনাদের দেখাবো—কিভাবে একটি ডিম থেকে মুরগীছানার জন্ম হয়। লক্ষ্য করুন। টেলিভিশনের পর্দায় একটি ডিমের অভ্যন্তর এবং ক্রমশঃ তার বিবর্তন দেখানো এবং সেই সঙ্গে বোঝানো চললো। প্রদর্শনী মাত্র মিনিট পাঁচ ছয়ের। অপূর্ব সুন্দর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার। পরে অবশ্য দেখেছিলাম মিউজিয়ামের আরও অনেক জায়গাতেই ঠিক ঐ ধরনের টেপরেকর্ডার এবং টেলিভিশন চালিয়ে নানা ব্যাপার বোঝানোর ব্যবস্থা আছে। কিছুক্ষণ পরে পরে আপনা আপনি প্রদর্শনী শুরু এবং শেষ হয়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে। বাঁ দিক থেকে দেখা আরম্ভ করলাম। এক আশ্চর্য জীবজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে। প্রতিটি জীবজন্তু দেখলে মনে হবে তারা সবাই জ্যান্ত, যেন এখনই তাদের ধরে নিয়ে খাঁচায় পোরা হয়েছে। অথচ তারা নিশ্চল স্থির স্তব্ধ। বাঘ ভল্লুক সিংহ শিপাঞ্জী থেকে শুরু করে ইঁদুর বেজি খরগোশ প্রতিটি প্রাণী যে যে অবস্থায় ছিল, হঠাৎই যেন কোন মন্ত্রবলে তাদের স্ট্যাচু করে কাচের আলমারিতে ভরে রাখা হয়েছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে গা শিরশির করে। মনে হয় কি জানি বাবা—হুস্ করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে না তো!

কোনো জায়গায় দেখি অবিকৃত অবস্থায় দাঁড় করানো একটি পশু, আর পাশেই রয়েছে তার ব্যবচ্ছেদ করা শরীর এবং শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। ভেটেরিনারী কলেজের এবং জীববিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা দেখে দেখে ছবি আঁকছে কিংবা নোট নিচ্ছে। পাশেই রাখা আছে টেপরেকর্ডার। কোনো কিছু জানতে কিংবা বুঝতে অসুবিধা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা বোতাম টিপছে। টেপরেকর্ডার তার উত্তর দিচ্ছে।

এক জায়গায় দেয়ালের মধ্যে কাচের বাক্সে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখি দেখে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই দেখি পাশে লেখা রয়েছে 'খুব কাছের থেকে দেখুন।' তাই করলাম। কাচের বাক্সের ওপর প্রায় চোখ এগিয়ে দিলাম। আর মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক অপূর্ব দৃশ্য। ধবধবে সাদা তুষারে ঢেকে রয়েছে কোনো এক সমুদ্র-পৃষ্ঠ। মাঝখানে কিছুটা জায়গায় ছলছল করছে নীল জল, তার মধ্যে মাস্তুল সহ আটকে রয়েছে একটি মাছধরা নৌকো। আর কাছেই বরফের ওপর বসে রয়েছে

কয়েকটা পেঙ্গুইন। নীল আর সাদা গায়ের রং। যেন গা হাত পা পরিষ্কার করছে কিংবা স্নান করতে করতে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। আলোছায়ার মধ্যে এমনভাবে দৃশ্যটি তৈরি যে মনে হয় সবকিছু জীবন্ত নড়ছে।

মানবদেহ বিজ্ঞানের হল ঘরে ঢুকলাম। এক আলাদা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। অনেক বছর আগে মেডিকেল কলেজে অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ার দিনগুলোর স্মৃতি মনে আসছিল। ভাবছিলাম, কলেজে পড়ার সময় এসব জায়গায় আসার সুযোগ ঘটলে আরও অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম। এখানে দেখলাম, মানবদেহের প্রতিটি যন্ত্রাংশের পাশে মাইক্রোস্কোপ এবং টেলিফোন রাখা। টেলিফোন তুললেই সেই বিশেষ যন্ত্রাংশের সবরকম বিবরণ শোনা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যেতে পারে তাদের সূক্ষ্ম গঠন। এক একটি জায়গায় ছোট ছোট সিনেমার আয়োজন। পর্যায়ক্রমে সেখানে এক একটি বিষয়ের ওপর সিনেমা হয়েই চলেছে।

একটু বেশিক্ষণ সময় কাটিয়ে ফেলেছিলাম ওখানে। হঠাৎ মনে হল জলজ এবং সামুদ্রিক প্রাণীদের দিকটা একবারও যাওয়া হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে চললাম। কি বলবো, মাথা ঘুরে যায় ওদিকটা গেলে। আমি কখনও তিমি দেখিনি। কিন্তু একটি তিমির অবিকৃত সংরক্ষিত শরীর এবং পুরো কঙ্কাল দেখে, প্রথমে আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথায় নিতে পারিনি। বিরাট কিংবা বিশাল এসব কথায় ঠিক বোঝানো যায় না তিমি কতো বড়। আমার মনে হচ্ছিল, একটা 747 বিমানের ডানা দুটো একটু ছোট করে দিলে চেহারাটা যেরকম দেখাবে একটা তিমিও সেইরকম। একটা কাঁকড়া ছিল, যার সাইজ প্রায় একটি মরিস মাইনর গাড়ির কাছাকাছি। আর একটি চিংড়ি মাছ (তাকে অবশ্য মাছ বলা উচিত নয়) দেখেছিলাম, তার ওজন সতেরো পাউণ্ড লেখা ছিল।

মিউজিয়াম খুব ফাঁকা লাগছিল। আমার মতো উৎসাহী দর্শক ছাড়া অধিকাংশই ফিরে গেছেন। ঘড়িতে দেখলাম দু'টো বাজে।
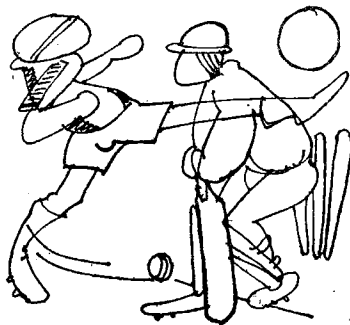
ভূতের রেডিও প্রোগ্রাম

বেলা দে

বয়স তখন সবে পাঁচ। বাড়িতে চারকোণা একটা বাক্সের সামনে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছি। হঠাৎ বাবা বললেন—তোর অনিমাদিকে চিনিস তো?

আমি বললাম—কেন কি হয়েছে অনিমাদির? অনিমাদি তো আমার বড় মাসিমার মেয়ে। তাকে না চেনবার কি হল?

বাবা বললেন—হ্যাঁ, তোর সেই দিদি কাল রাত্তিরবেলা থেকে এই বাক্সটার ভেতর ঢুকে বসে আছে।

আমি বললাম, কেন? কি হয়েছে অনিমাদির?

বাবা বললেন—তোর অনিমাদি তো ভাল গান করেন। আজ সকালবেলা সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্য এই বাক্সের ভেতর থেকে ঠিক ন'টায় গান করবেন।

শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। অনিমাদির বয়স কম করেও সাতাশ। বয়স অনুপাতে শরীরটা আরো বড়। সেই অনিমাদি কিনা এই বাক্সের ভেতর বসে আছেন। আমি অবাক হয়ে বাবাকে আবার প্রশ্ন করলাম, এ কি করে সম্ভব বাবা?

অনিমাদির মত একজন এত বয়সের মেয়ে কি কখনো সামনে রাখা এই ছোট্ট বাক্সের ভেতর ঢুকতে পারেন?

বাবা হাসি চেপে বললেন, বেশ তাহলে আর একটু অপেক্ষা কর। ন'টা বাজতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। তারপর গানের গলা শুনে বুঝে নিস তোর অনিমাদি কিনা।

অধীর আগ্রহ ও বিস্ময় নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। ঠিক ন'টা বাজতেই বাবা ঐ বাক্সের সামনে থাকা একটি নব ঘুরিয়ে দিতেই শুনতে পেলাম একজন ঘোষিকার কণ্ঠস্বর। আকাশবাণী কলকাতা, এখন আপনাদের সামনে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন শ্রীমতী অনিমা ঘোষ দস্তিদার।

দারুণ আনন্দিত হচ্ছিলাম আমি। দৌড়ে বাড়ির ভেতর থেকে মাকেও ডেকে আনলাম অনিমাদির গান শোনার জন্য। পর পর দুখানা গান শুনলাম। গানের মানে না বুঝলেও অনিমাদির মুখখানা চিন্তা করে খুব খুশি হলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই অনিমাদি ম্যাজিক জানেন। না হলে নিজেকে অত ছোট করে ঐ চৌকোণা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গান গাইতে পারতেন না।

হঠাৎ মাথায় একগাদা প্রশ্ন এসে ভিড় করল। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে প্রশ্ন করলাম,

বাবা সত্যিকার ব্যাপারটা আমাকে একটু বলো। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

বাবা বললেন, বোকা মেয়ে—ঐ চৌকোণা বাক্সটাকে তুই বাক্স ভেবেই ভুল করেছিস। ওটা হোল রেডিও। এ রকম রেডিও সারা দেশ জুড়ে অনেকের বাড়িতেই আছে। এবং একই সঙ্গে অনেকের বাড়িতেই এ গান বেজেছে। শুনে তো আমি আরো অবাক। তা এই গান গাওয়া হয় কোথা থেকে ?

উত্তরে বাবা বললেন, হ্যাঁ, সে কথাটাই বলছি শোন। কোম্পানী আমলের এক বাড়ি ১ গারসটিন প্লেস। সেখানেই আছে নানান যন্ত্রপাতি। এই যন্ত্রপাতি পরিচালিত হয় একটা তালের মত মাইক্রোফোনের সাহায্যে। এই মাইক্রোফোনের সামনে শিল্পীরা বসে কথা কিংবা গান করলে সেই কথা গান বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক অভিনব কায়দায়।

প্রত্যেকের বাড়িতে রাখা ঐ চৌকণো বাক্সতে রাখা আছে গ্রাহক যন্ত্র। ঐ যন্ত্রে ধরা পড়ে শিল্পীর কণ্ঠস্বর।

বাবা, আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে ঐ ভাবে কিছু বলার।

বাঃ, বেশ তো। তুই আর একটু বড় হ। আমার জীবনের ইচ্ছা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন ঐ রেডিও সম্বন্ধে আরো কিছু জানাই।
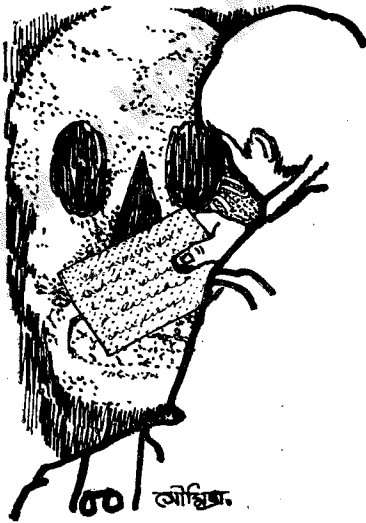
আজ যেখানে আকাশবাণী ভবন, রেডিওর শুরুতেই অবশ্য সেখানে অফিস ছিল না। পূর্বেই বলেছি রেডিওর কাজকর্ম শুরু হয়েছিল ১নং গারসটিন প্লেসে। এই বাড়িটি ভূতের বাড়ি হিসাবে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের আগে থেকে যারা রেডিও'র সঙ্গে যুক্ত তারা এই বাড়িটির সম্বন্ধে অনেকেই জানেন। এই বাড়ির পেছনের দিকে একটা সিঁড়ি ছিল সেটা বাড়িতে ঢোকার জন্য ভূতেরাও ব্যবহার করত। অনেক সময় ভূতেরা নাকি সুরে রেডিওতে প্রোগ্রামে অংশ নিত। তাছাড়া তখনকার কেন্দ্র অধিকর্তা সাহেবীয়ানায় চলতেন বলে অনেকের কাছে তাঁর আচরণ সাহেব ভূত বলে মনে হত। এক এক সময় দেখা গেছে অফিসের টেলিফোন, কাগজপত্র সব কিছু রাতের বেলায়

তছনছ করে দিয়ে গেছে ভূতেরা। এবং কাউকে আশ্রয় করে তাকে নানা বিপদে ফেলবার চেষ্টাও করেছে।

আগে প্রোগ্রামটা হত লাইফ ব্রডকাস্টিং। এখন অবশ্য আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা হয়।

একবারের ঘটনা। শিশুমহলে আবৃত্তি করবার জন্য একটি শিশু এসেছে। বয়স দশ থেকে এগার। তখন লাইফ্ ব্রডকাস্টিং-এর নিয়ম ছিল। ছেলেটি বারে বারে মহড়া দিয়েও ভালভাবে কবিতাটি আয়ত্ত করতে পারেনি। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে আমি বললাম, ভয় কি ? মনে করো তুমি বাড়িতেই আবৃত্তি করছ। কিছু পরে সে তৈরি করে নিল নিজেকে। তাকে মাইক্রোফোনের সামনে বসালাম। হঠাৎ কিছু পরে যখন তার নাম ঘোষণার পর আবৃত্তি করতে বললাম, সে আরম্ভ করল।

আবৃত্তি শেষ হ'তে আর মাত্র কিছুটা সময় বাকি। হঠাৎ হাত পা ছড়িয়ে গোঁগোঁ করতে করতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আবৃত্তির বাকি অংশটুকু করে দিলাম। তাকে ইতিমধ্যেই বাইরে এনে জল ও বাতাসের সাহায্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে। খুব অবাক লাগল যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হয়েছিল ?

সে বললে, একটা কালো কঙ্কাল যেন তার গলা ধরে টিপতে শুরু করেছিল। তার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে পারিনি। শুধু ভেবেছি ভূতের সাহস কি প্রচণ্ড।

বাজিয়ে গেলো / প্রীতিভূষণ চাকী

শিমুলবনে আকাশ দিলো উঁকি,
পাখি এসে ডাক দিয়ে যায়—টুকি ;
পথের পাশে ছোট্ট ফুলের কুঁড়ি
বললো, ওরে ঘুম গিয়েছে চুরি !
মৌমাছিরা দৌড়ে এসে বলে ঃ
লুকোস্না তুই, বল না রে কার ঘুম ?
বাতাস এসে বাজিয়ে গেলো শুধু
ঝুমুর্···ঝুমুর্···ঝুমুর্···ঝুমুর্···ঝুম্ !

জঘন্যতম অপরাধ মহত্তম কল্যাণ

অজয় দাশগুপ্ত

১৮২৭ সাল। এডিনবরায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। ঘটনার নৃশংসতায় সবাই চমকে উঠল। মানুষ এমন কাজ করতে পারে! ঘৃণায় সবাই শিউরে উঠল। ছিঃ ছিঃ। পয়সার জন্য মানুষ খুন। জঘন্যতম অপরাধ, খুন করে মৃতদেহ বিক্রি?

এ যে ভাবাই যায় না!

অথচ এই জঘন্যতম অপরাধের পেছনে ছিল মহত্তম এক কল্যাণ। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শল্য-চিকিৎসায় যে উন্নতি, তারই তো বীজ রোপণ করা হয়েছিল ওই অপরাধের মাধ্যমে।

ঘটনাটা খুলেই বলা যাক।

রেনেশাঁর পরে সমস্ত ইউরোপ ধাবিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সর্বাত্মক উন্নতির পেছনে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ঢেউ পৌঁছেছিল সমানভাবে। চিকিৎসা ভাল করতে গেলে আগে জানতে হবে মানুষের শরীরের ভেতরটা। কি আছে শরীরে। কোথায় কিভাবে! কিন্তু যদি না একটা শরীর খুলে দেখা যায় তাহলে তা জানা যাবে কি করে।

আন্দাজে জানার চেষ্টা হল প্রথমদিকে। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২) মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা দেন। কিন্তু তা ভুল ও অসম্পূর্ণ। এরপর গ্যালেন (১৩০—২০০ খ্রীস্টাব্দ) একই বিষয়ে গবেষণা করেন। বিখ্যাত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তুকার, লিওনার্দো ভিঞ্চিও এবিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি মানুষের শরীরের ভেতরের অনেকগুলি ছবি আঁকেন—যা সত্যিই সেদিনের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

যে কথা বলছিলাম।

তখন এডিনবরা ছিল ইউরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহাকেন্দ্র। এখানে শব ব্যবচ্ছেদ করে চিকিৎসাবিদরা সত্যিকার মানুষের দেহগঠন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। কিন্তু শব পাওয়া যাবে কোথায়? দুটো একটা শবে তো হবে না—প্রতিদিন শব চাই বিভিন্ন মানুষের। কিন্তু তা তো পাওয়া সম্ভব নয়। কে আর যেচে মৃতদেহ দান করবে!

এমন সময় ঘটল ওই ঘটনা। হেয়ার ও বার্ক দুই বন্ধু। এডিনবরাতেই থাকে।

একবার হেয়ার তার একজন পরিচিত জনকে পাঁচ পাউণ্ড টাকা ধার দেয়। কিন্তু সেই ভদ্রলোক টাকাটা পরিশোধ করবার আগেই মারা যান।

হেয়ার এই ঘটনায় খুবই রেগে যায়। সে তার পাঁচ পাউণ্ডের জন্য দিন রাত ভাবতে থাকে। এই সময় ডাক্তাররা মৃত ব্যক্তির শব কেনে খবরটি হেয়ার পেয়ে যায়। ব্যস, আর চিন্তা কি! হেয়ার তার বন্ধু বার্কের সহায়তায় ঐ ব্যক্তির মৃতদেহটি কবর খুঁড়ে বের করে। তারপর গোপনে সেই শবদেহটি সার্জন স্কোয়ারে সাত পাউণ্ড দশ শিলিং-এ বিক্রি করে।

এর থেকে ওদের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। শবদেহ বেচলে বেশ ভাল পয়সা পাওয়া যায়। এবার তারা প্রায়ই কবরখানায় হানা দেয়। টাটকা মৃতদেহের দাম আরো বেশি। সুতরাং তারা ফলাও ব্যবসা করার জন্য মানুষ খুন শুরু করে। এ ব্যাপারে তাদের একটা সুবিধেও ছিল। ওদের বাড়িটা ছিল শহরের নির্জনতম প্রান্তে। সন্ধ্যের পর সেখান দিয়ে মানুষ গেলেই সুযোগ বুঝে তারা তাকে খুন করে তারপর তাকে বেচে দেয়।

প্রায়ই এ রকম চলতে থাকে।

ব্যবসাটা বেশ চলছিল। ডাক্তাররাও বিশেষ খুশি। টাটকা মানুষের মৃতদেহ এবার তাদের করায়ত্ত। গবেষণা চলতে থাকে দ্রুতগতিতে।

কিন্তু অপরাধ খুব বেশিদিন চাপা থাকে না। হেয়ার আর বার্কের এই ব্যবসা একদিন ধরা পড়ে যায় হঠাৎই। ওই বাড়ির বাড়িওয়ালা একদিন উঠোনে খড়চাপা দেওয়া এক বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহ দেখতে পায়। হেয়ার ও বার্ক বেশির ভাগই বৃদ্ধা, অন্ধ বা খোঁড়া এমন মানুষ খুন করত—যাতে না কোনো ঝামেলায় যেতে হয়। বাড়িওয়ালার কেমন সন্দেহ হয়। তিনি গোপনে পুলিশে খবর দেন। ঘটনার তদন্তে এসে পুলিশ বৃদ্ধার মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে দুই বন্ধুর ফলাও ব্যবসার কথা জানতে পারে।

আদালতে বিচারে বার্কের ফাঁসি হয়ে যায়। পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ মানুষ খুন, সুতরাং বিচারক নির্দ্বিধায় বার্ককে শাস্তি দেন।

কিন্তু আরেকজন কই? এই মারণ যজ্ঞের অন্যতম শরিক।

হেয়ার পলাতক। পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু করতেই সে গা ঢাকা দেয়।

তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য বার্ক ছাড়াও আরেকজন শাস্তি ভোগ করেন এই মামলায়। তিনি নকেসর। যিনি মৃতদেহগুলি কিনেছেন ওদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে।

নকেসর শাস্তি পান অপরাধে যোগসাজস করায় জন্য। অথচ পৃথিবীর এক মহত্তম কল্যাণের দিকেই ছিল তাঁর নজর। ১৮২৭ সালে ওই ভাবে মৃতদেহ সংগ্রহ করে তাঁরা ক'জন দুঃসাহসী যদি না শব-ব্যবচ্ছেদ চালিয়ে যেত তো মানুষের শরীরের অ্যানাটমী এত সহজে জানা যেত না। এবং তা না জানা গেলে রোগ নিরাময়কে এমন দ্রুততর করা সম্ভব হত না।

হেয়ার পালিয়ে চলে যায় লণ্ডনে। দীর্ঘকাল গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় সে। কিন্তু লোকের চোখে ধুলো দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কি করে লণ্ডনের পথে তাকে লোকে চিনে ফেলে।

আর কোথায় যাবে সে!

মানুষের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এক সঙ্গে তার প্রতি বর্ষিত হয়। সবাই মিলে তার চোখে চুন ঢেলে দেয়। হেয়ার অন্ধ হয়ে যায় চিরকালের জন্য। এই অন্ধ অবস্থায় সে এর-পরও পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিল! এবং লণ্ডনের পথে পথে ভিক্ষে করে খেয়েছে।

নিয়তির কি পরিণাম!

দুটো অপরাধী জঘন্যতম যে অপরাধ করল তারই উপর দিয়ে নির্দেশিত হল মানুষের জীবনের এক মহত্তম কল্যাণ। সুতরাং অপরাধ করেও ঘৃণিত ওই দুই ব্যক্তিও বেঁচে থাকবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে। বেঁচে থাকবেন নকেসর, যিনি অকুতোভয় হয়ে ওই মৃতদেহ কিনেছিলেন সেদিনের জরুরী প্রয়োজনে।

প্রথম বই

শ্রীপান্থ

বই ছাড়া আজ আর কারো চলে না।

ছোটদের বই চাই। বই চাই বড়দেরও। যে দিকে তাকাই বই আর বই। ঝুলিতে বই, ক্লাসে বই, দোকানে বই, বাড়িতে বই, লাইব্রেরিতে বই। এক একটা লাইব্রেরিতে কত বই আছে ভাবাই যায় না। আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস নামে একটি লাইব্রেরি আছে। সেখানে বই আছে নাকি এক কোটি। মস্কোয় লেনিন-এর নামে একটি মস্ত লাইব্রেরি আছে। সেখানে বই আছে শোনা যায় দেড় কোটি। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর একটা মস্ত লাইব্রেরি। সেখানে সঠিক কত বই আছে লাইব্রেরির লোকেরাও নাকি তা জানে না। তাঁদের একটা মোটামুটি আন্দাজ আছে, এই পর্যন্ত। একবার ওঁরা ঠিক করলেন সব বইয়ের নাম একটা খাতায় তুলবেন। তেইশ বছর কাজ চলার পর দেখা গেল তখনও অনেক বাকি। একজন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন— একাজ সারতে হলে আরও বিরাশি বছর চাই। ততদিনে লাইব্রেরির তাকগুলো এক সঙ্গে জুড়লে কত লম্বা হবে জান?—আশী মাইল। সুতরাং ক্ষান্ত দাও। আমাদের কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারেও মেলা বই। তার চেয়েও মজার কথা লোকেরা আজকাল পকেটেও বই নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। সেদিন ভিড়ের ট্রামে দেখলাম এক ভদ্রলোক একহাতে মাথার ওপরের হ্যাণ্ডেলটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আর এক হাতে একটি খোলা বই।

চিরকাল কিন্তু এরকম ছিল না। তিন চারশ' বছর আগেও কিন্তু আমাদের দেশে এত বই দেখা যেত না। কারণ এদেশে তখন ছাপাখানা ছিল না। সুতরাং, ছাপা-বইয়েরও কোনও বালাই ছিল না। তাই বলে একদম বই ছিল না বলা কিন্তু ভুল হবে। ছিল অন্য ধরনের বই। বই যে কত রকমের হতে পারে তার লেখাজোখা নেই। আমাদের দেশের মানুষ বই লিখেছেন যিশুখ্রীস্ট জন্মাবার তিন চারশ বছর আগে থেকে। সে সব বইকে বলা যায় পাথুরে বই। পাথরের ওপর লেখা। যেমন অশোকের শিলালিপি। এক একটি লিপি যেন বইয়ের এক একটি খোলা পাতা। পাথরের ওপর লেখা বইয়ের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠাটি রয়েছে মিশরে নীল নদীর ধারে থিবেস-এ তৃতীয় রামেসিস-এর মন্দিরের দেওয়ালে। তিন হাজার বছর আগে লেখা এই পাথুরে পাতাটি চওড়ায় একশ' আটত্রিশ ফুট!

পাথর ছাড়াও সেকালে বই লেখা হত তামার পাতে। পোড়া মাটিতে, কাপড়ে, কাঠের ফলকে,—ভূর্জপত্রে। ভূর্জপত্রে মানে ভূর্জ নামে এক গাছের চামড়া। হ্যাঁ, চামড়ায়ও বই লেখা হত। তবে আমাদের এই বাংলায় কাগজ বাদ দিলে বেশি চল ছিল গাছের পাতার। তালপাতা, তেরেট পাতা, তুঁত, নোটা, বট—অনেক পাতাকেই কাজে লাগিয়েছেন সেকালের লেখকরা। কেউ কেউ আবার শোলার পাতেও লিখেছেন। হাতে লেখা এসব বইকে বলা হয় পুথি। অনেক লাইব্রেরিতে পুথিও যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন হাতের লেখার ছাঁদ, তেমনই মলাট। কাঠের ওপর হাতে আঁকা সুন্দর ছবি, তা-ই হল পুথির মলাট। সে সব মলাটকে বলা হত পাটা।

পুথির সবই ভাল, কিন্তু মুশকিল এই পুথি সংখ্যায় বড় কম। হাতে আর কত পুথি লেখা যায়? সেজন্যই পুথি যাঁদের ছিল তাঁদের ছিল। সকলের ঘরে পুথি ছিল না। থাকত না। লেখাবার লোক চাই। তাছাড়া খরচপত্তরও আছে। কেউ হয়তো চার কাণ্ড রামায়ণ লিখে দিলেন। বিনিময়ে পেলেন নতুন একখানা গামছা আর থানকয় মোয়া। পুথির শেষে অতএব লিপিকর লিখলেন – "কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া। পুস্তক সাঙ্গতে দিবেন বস্ত্র মোয়া।" ইত্যাদি। অবশ্য কেউ কেউ বেশিও পেতেন। যাঁর যেমন ভাগ্য। আর যাঁর যেমন ক্ষমতা। পর্তুগালে এক কবি জোয়াও ডি বোরস একখানা বই লিখে সেটি তুলে দিয়েছিলেন দেশের রাজার হাতে। বিনিময়ে পেয়েছিলেন মস্ত এক রাজ্য। রাজা ব্রাজিলের একটি আস্ত প্রদেশই দান করেছিলেন তাঁকে।

তেমন ভাগ্য আর ক'জনের হয়? পুথি যেমন সবাই লিখতে পারেন না, পুথি তেমনই সবাই সংগ্রহও করতে পারতেন না। পুথির-যুগে বিদ্যা ছিল তাই মাত্র গোনা-গুনতি মানুষের দখলে। অন্যরা ফ্যালফ্যাল করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন,—কবে যে একখানা পুথি সংগ্রহ করতে পারব!

সে-সমস্যা সমাধান করে দিল ছাপাখানা। ছাপাখানার দৌলতে একই পুথি দেখতে দেখতে অনেকগুলো ছাপা হয়ে গেল। যা ছিল হাতে লেখা পুথি তা হয়ে গেল ছাপা বই। আর পায় কে?

প্রথম বই ছাপার বাহাদুরি চীনাদের। কাগজ, ছাপার কালি, ছাপাখানা—সবই প্রথম আবিষ্কার করে তারা। চীনাদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে। তারা বলে সুসভ্য মানুষ বলি তাঁকেই যিনি বই পড়েন, দাবা খেলেন, গান জানেন, ছবি আঁকেন, কবিতা লেখেন, ফুল ভালবাসেন। সুতরাং, প্রথম-বই যে তাঁরা ছাপবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে?

চীনাদের ছাপা যে প্রথম বইটি পাওয়া গেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে – হীরক সূত্র। বৌদ্ধদের বই। পর পর ছয়টি পৃষ্ঠা জুড়ে লাটাই পটের মতো। লম্বায় ষোল ফুট,

চওড়ায় এক ফুট। সেটি ছাপা হয়েছিল ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। ছেপেছিলেন ওয়াং চিচে নামে একজন। সেটি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটি গুহার গোপন কুঠরিতে। সেখানে সেটি খুঁজে পাওয়া যায় ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। ছাপা বই, তবে আজকালকার কায়দায় ছাপা নয়। হীরক সূত্র ছাপা হয়েছিল কাঠের ওপর খোদাই করে ব্লক তৈরি করে তা-ই দিয়ে। আমাদের নামাবলী কিংবা শাড়ি যেমন করে ছাপা হয় অনেকটা সেই কায়দায়।

সত্যকারের ছাপার কাজ শুরু হয় আরও পরে। ছাপার কাজে নতুন যুগের আরম্ভ বলা যায় ধাতু দিয়ে হরফ তৈরি করে তা দিয়ে ছাপা। প্রথমে আলাদা আলাদা হরফ তৈরি ঢালাই করা হল। তারপর সেগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে বাক্য গড়া হল। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে তৈরি হল পৃষ্ঠা। তারপর ছাপা। পণ্ডিতেরা বলেন—মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের ব্যবহারের মতো, চাকা আবিষ্কারের মতোই গুরুতর এই ধাতু দিয়ে তৈরি ছাপার হরফ। এ-কাজেও সকলের আগে চীনারা। ওরা প্রথমে আলগা হরফ দিয়ে ছাপা শুরু করে ১০৪৫ খ্রীস্টাব্দে নাগাদ। প্রথমে হরফ তৈরি হত মাটি দিয়ে। মাটির হরফ পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। তারপর টিন, কাঠ, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। চীনের মতো সেকালের জাপান এবং কোরিয়ায়ও এভাবে ছাপা হত।

সে তুলনায় ইউরোপে ছাপাখানা চালু হয় কিন্তু বেশ পরে। পনের শতকে। সেখানে প্রথম মুদ্রাকর গুটেনবার্গ নামে একজন জার্মান সাহেব। তিনি পথ দেখালেন। দেখতে দেখতে ইউরোপের অন্য দেশগুলোও শিখে নিল ছাপার বিদ্যা। আমাদের দেশে ছাপাখানা আসে আরও একশ' বছর পরে। এলো ইউরোপ থেকে। পর্তুগীজরা নিয়ে এলেন। গোয়ায় তাঁরা ছাপার কল বসালেন। সেটা ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের কথা। বাইশ বছর পরে কুইলনে ছাপা হল এদেশের ভাষায় প্রথম ছাপা বই। ধর্মপুস্তক। ভাষা—তামিল। আমরা বাংলায় ছাপাখানা পেলাম কিন্তু আরও দুশ' বছর পরে। গোয়া থেকে বাংলা—এমন আর কী দূরত্ব। আজকাল তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। অর্থাৎ এই পথটুকু পাড়ি দিতে ছাপাখানার লাগল পাকা দুশ' বছর। ভাবা যায় ?

বাংলা-মুলুকে প্রথম বই ছাপা হয় দুশ' দুই বছর আগে। সেটা ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। বাংলা তখন বলতে গেলে পুরোপুরি ইংরাজদের দখলে। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রাজত্ব। তাঁর লেখা পড়ার ঝোঁক ছিল। পড়ুয়াদেরও উৎসাহ দিতেন তিনি। তিনি ভাবলেন এদেশে রাজত্ব করতে হলে দেশের মানুষদের ভাষা জানা চাই। তিনি নিজে অবশ্য কিছুটা জানেন। কিন্তু অন্য সাহেবেরা বলতে গেলে কিছুই জানেন না। হেস্টিংস স্থির করলেন তিনি সাহেবদের বাংলা শেখাবেন। কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব ? কলকাতায় তখন হ্যালহেড নামে একজন সাহেব ছিলেন। পণ্ডিত মানুষ। অক্সফোর্ড-এ লেখাপড়া শিখেছেন। ফার্সি জানেন। বাংলাও শিখে নিয়েছেন। হেস্টিংস তাঁকে ডেকে বললেন—তোমাকে একটা বই লিখতে হবে। এমন বই যা পড়ে

ইংরাজরা বাংলা শিখতে পারে। হ্যালহেড কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন। কিন্তু মনে প্রশ্ন—এ-বই ছাপবে কে? হেস্টিংস বললেন—তার জন্য ভাবনা নেই। তুমি লিখে যাও। কলকাতায় তখন উইলকিনস নামে আর এক সাহেব ছিলেন। তিনিও সরকারী কর্মচারী। হেস্টিংস তাকে বললেন—তোমাকে একটা বই ছেপে দিতে হবে। তাতে বাংলা লিপিও থাকবে। ব্যবস্থা কর। উইলকিনস মহা সমস্যায় পড়লেন। তাঁর খোঁজে একটি ছাপাখানা আছে বটে, কিন্তু বাংলা হরফ পাবেন কোথায়? বাংলা মুলুকে কেউ কি কখনও বই ছেপেছে? তিনি হুগলি ছুটলেন। সবেধন নীলমণি সেই ছাপাখানাটি তখন হুগলিতে। সেখানে পৌঁছে তিনি খোঁজখবর নিতে লাগলেন—এমন কেউ আছে কি যাঁরা খোদাইয়ের কাজ জানেন, ঢালাই জানেন? খুঁজতে খুঁজতে দু'জনের সন্ধান মিলল। একজন সাহেব। অন্যজন বাঙালী। সাহেবের নাম—শেফার্ড। তিনি ধাতুর ওপর খোদাই করতে জানেন। বাঙালীর নাম পঞ্চানন কর্মকার। তিনি জানেন ঢালাই করতে। উইলকিনস তক্ষুনি কাজে লেগে গেলেন। বাকি শুধু ছাপা।

হুগলিতেই ওরা ধীরে সুস্থে ছাপালেন সেই বই। আমাদের প্রথম ছাপা বই। নাম —"এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।" বাঙালীরা বলেন হ্যালহেড-এর ব্যাকরণ। সাহেবরা বলেন—"বেঙ্গল গ্রামার।" হ্যালহেড উইলকিনস বই হাতে একদিন এসে হাজির হলেন কলকাতায়। হেস্টিংস-এর হাতে তাঁরা তুলে দিলেন সেই ঐতিহাসিক বই। হেস্টিংস চমৎকৃত।

চমৎকৃত আমরাও। সত্যি, ভাবা যায় না এটা আমাদের প্রথম বই। ঝকঝকে ছাপা। বাংলা হরফগুলোও দেখবার মতো। সেই থেকে শুরু হল আমাদের এখানে বই ছাপা। এখন প্রতি বছর হাজার হাজার বই ছাপা হয়। কলকাতায় কয়জন জানেন কলকাতার আগে বই ছাপা হয়েছিল হুগলিতে!

প্রথম বইটির দাম কত ছিল। ত্রিশ টাকা। অনেক টাকা। অবশ্য সাহেবদের পক্ষে এমন আর কি বেশি। তবে কিছু মজার ব্যাপারও ছিল বইটিতে। যেমন দপ্তরীদের বলে দেওয়া হয়েছে—সাবধানে বাঁধাই করবে। বইটি বর্ষার মধ্যে ছাপা হয়েছে তো তাই একটু শুকিয়ে নেওয়া ভাল। বর্ষা শেষ না-হওয়া অবধি সবুর!

কাকীমা

সিয়ারাম শরণ গুপ্ত

(অনুবাদক : লক্ষ্মী শূর)

সেদিন খুব ভোরে শ্যামুর ঘুম ভেঙে যেতে সে দেখল সারা বাড়িতে কান্নার রোল।

ওর উমা কাকীমা মাটিতে একখানি কম্বলের উপর মাথা থেকে পা অবধি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর বাড়ির সবাই ওঁকে ঘিরে কাঁদছে। কাকীমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তুলতে গেলে শ্যামু বড় উপদ্রব শুরু করে দেয়। সবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে কাকীমার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে—'কাকীমা ঘুমুচ্ছে। ওঁকে তোমরা উঠিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।'

অনেক কষ্টে শ্যামুকে সরানো হয়। কাকীমার দাহ-সংস্কারে ও যেতে পারে না। একটি ঝি কোন রকমে বাড়িতেই ওকে আগলে রাখে।

যদিও বিচক্ষণ গুরুজনেরা শ্যামুকে বুঝিয়েছেন যে কাকীমা ওর মামার বাড়িতে গেছেন। কিন্তু অসত্যের আড়ালে সত্য বেশিদিন চাপা থাকে না। আশপাশের আর সব অবুঝ ছেলেদের মুখ থেকেই শ্যামু আপনিই সব বুঝতে পারে। কাকীমা আর কোথাও নয়, ওপরে গেছেন ভগবানের কাছে। কাকীমার জন্য ক'দিন ধরে এক নাগাড়ে কেঁদে কেঁদে ওর কান্না আস্তে আস্তে আপনিই থেমে যায়। কিন্তু কাকীমার শোক মন থেকে মুছে যায় না। প্রবল বৃষ্টির পরে দু'একদিনের মধ্যে মাটির ওপর জলটুকু অদৃশ্য হয়ে যায় বটে, কিন্তু ভেতরে আর্দ্রতা যেমন অনেকদিন টিকে থাকে, ঠিক তেমনি শ্যামুর শোকও তার অন্তরে গিয়ে বাসা বাঁধে। সে প্রায়ই একা একা বসে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন আকাশে একটা ঘুড়ি উড়তে দেখে সে। না জানি কি ভেবে মনটা ওর খুশিতে নেচে ওঠে। বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে গিয়ে বলে—'কাকু, আমাকে একটা ঘুড়ি এনে দাও না।'

স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে বিশ্বেশ্বরবাবু বড় অন্যমনস্ক। 'আচ্ছা এনে দেব' বলে তিনি উদাস মনে বেরিয়ে যান।

শ্যামু এদিকে ঘুড়ির জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে। মনের ইচ্ছেটাকে কোনমতেই সে দমিয়ে রাখতে পারে না। এক জায়গায় দেওয়ালের একটি পেরেকে বিশ্বেশ্বরবাবুর কোটটা টাঙানো। এদিক ওদিক তাকিয়ে শ্যামু কোটটার কাছে একখানা টুল টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে কোটের পকেটগুলোকে হাতড়ায়। পকেট থেকে একটি সিকি তুলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়ে।

সুখিয়া ঝি-এর ছেলে ভোলা শ্যামুর সমবয়সী, খেলার সাথী। সিকিটাকে ভোলার হাতে দিয়ে শ্যামু বলে—'তোর দিদিকে বলে চুপিচুপি একটা ঘুড়ি আর সুতো এনে দে না। চুপিচুপি আনবি, দেখিস, কেউ যেন জানতে-টানতে না পারে।'

ঘুড়ি আসে। একটি আঁধার ঘরে বসে ঘুড়িতে সুতো বাঁধা চলতে থাকে। শ্যামু ফিসফিসিয়ে বলে—'ভোলা, কাউকে যদি না বলে দিস তো একটা কথা বলি?'

ভোলা মাথা নেড়ে বলে—'না, কাউকে বলব না।' শ্যামু তখন রহস্য ফাঁস করে বলে —'এ ঘুড়িটাকে আমি ওপরে ভগবানের কাছে পাঠাব; এটাকে ধরে কাকীমা নিচে নেমে আসবেন। আমি তো লিখতে জানি না, নইলে এর ওপরে কাকীমার নামটা লিখে দিতাম।'

ভোলা শ্যামুর চাইতে বেশি বুদ্ধি ধরে। বলে—'কথাটা ভেবেছেন তো ভালোই। কিন্তু একটা যে মুশকিল রয়ে গেছে। এ সুতোটা যে পলকা। এটাকে ধরে কাকীমা তো নামতে পারবেন না। সুতোটা ছিঁড়ে যাবে। ঘুড়িতে মোটা দড়ি দিলে অবশ্যি ছিঁড়বে না।'

শ্যামু গম্ভীর হয়ে পড়ে। ভাবখানা এই—কথাটা তো বলেছিস লাখটাকার কথা। কিন্তু মুশকিলটা হল মোটা দড়ি যোগাড় করি কি করে? হাতে পয়সা নেই আর বাড়ির যে লোকগুলো দয়ামায়া বিসর্জন দিয়ে কাকীমাকে জ্বালিয়ে এসেছে, তারা এ কাজের জন্য কিছু দেবে না। ভাবনা চিন্তায় সেদিন অনেক রাত অবধি শ্যামুর চোখে ঘুম আসে না।

আগের দিনের একই ফিকিরে পরদিন শ্যামু আবার বিশ্বেশ্বরবাবুর কোটের পকেট হাতড়ে একটা টাকা বের করে নেয়। টাকাটাকে নিয়ে গিয়ে ভোলার হাতে দিয়ে বলে —"দেখ ভোলা, কেউ যেন টের না পায়। শক্ত দেখে দু'গাছা দড়ি এনে দে। একটা দড়িতে হবে না। জোড়া দিতে হবে। জহরদাকে দিয়ে আমি একখানা কাগজে

'কাকীমা' লিখিয়ে রাখব। নাম লেখা কাগজ থাকলে ঘুড়ি ঠিক কাকীমারই কাছে পৌঁছে যাবে।'

দু'ঘণ্টা পরে খুশি মনে শ্যামু আর ভোলা সেই অন্ধকার কুঠরীতে বসে বসে ঘুড়িতে দড়ি বাঁধছে। অকস্মাৎ শুভকর্মে মূর্তিমান বিঘ্নের মত উগ্রমূর্তি ধারণ করে বিশ্বেশ্বরবাবু ঘরে এসে ঢোকেন। ভোলা আর শ্যামুকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন—'আমার কোটের পকেট থেকে তোরা টাকা নিয়েছিস?'

এক দাবড়ানিতেই ভড়কে গিয়ে ভোলা রাজসাক্ষী হয়ে পড়ে। বলে দেয়—'দড়ি আর ঘুড়ি কিনতে শ্যামুদা নিয়েছেন।'

শ্যামুকে দুই থাপ্পড় মেরে বিশ্বেশ্বরবাবু বলেন—"চুরি শিখে জেলে যাবি? দাঁড়া আজ তোকে মজা টের পাওয়াচ্ছি।' বলে আরও দু-চা'র থাপ্পড় কষে ঘুড়িটাকে ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর দড়ির দিকে চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করেন—'এগুলো কে এনেছে রে?'

ভোলা বলে—'শ্যামুদাই এনেছেন। বলছিলেন, এগুলো দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে কাকীমাকে ভগবানের কাছ থেকে নিচে নামিয়ে আনবে।'

বিশ্বেশ্বরবাবু ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছেঁড়া ঘুড়িটাকে হাতে তুলে নিয়ে দেখেন ঘুড়িটার গায়ে একটুকরো কাগজে লাগানো, তাতে লেখা—'কাকীমা'।

আর্যভট ভাস্কর রোহিণী

অমরনাথ রায়

অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই মানুষ যুগে যুগে ব্রতী হয়েছে অনেক দুঃসাহসী অভিযানে। তাতে কখনও এসেছে নৈরাশ্য, কখনও বা সাফল্য।

আমাদের মাথার উপরে ঐ যে বিরাট মহাশূন্য রয়েছে, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা মানুষ শুরু করেছে অনেককাল আগে থেকেই। আর মানুষ তার এই প্রচেষ্টায় হাতিয়ার-পেয়েছে রকেটকে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দারুণ এগিয়ে গেছে। তাই তো পৃথিবীর মানুষ মহাকাশযানে চেপে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে। চাঁদের বুকে নেমে সেখানে দিব্যি ঘুরে বেড়িয়ে এবং সেখানকার মাটি, পাথর, নুড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে আবার নিরাপদে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে।—মানুষের দুঃসাহসিক এই অভিযানের তুলনা হয় না।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষও মহাকাশ অভিযানের প্রচেষ্টায় পেছিয়ে নেই। যদিও এ অভিযান খুবই ব্যয়বহুল, তবুও আমরা প্রকৃতির অনন্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে এবং সত্যানুসন্ধানে সেই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছি। সাফল্যও লাভ করেছি অনেকটা।

চাঁদে বা অন্য কোনও গ্রহে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্যে আমাদের মহাকাশ অভিযান পরিকল্পিত হয় নি। মহাকাশ সম্পর্কে জ্ঞান এবং নভশ্চারণবিদ্যা বা 'অ্যাস্ট্রনটিক্স' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা ছাড়াও আমাদের মহাকাশ অভিযানের আরও কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মহাকাশে সর্বদা সঞ্চরণশীল এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি এবং নিউট্রন কণা সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা, পৃথিবীর,—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্যানুসন্ধান করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাই আমাদের মহাকাশ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য।

১৯৭৫ সালে ১৯শে এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কিন্তু কেন?—কারণ ঐ দিন 'আর্যভট' নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপ ক'রে ভারতের মহাকাশ অভিযানের সূচনা করা হয়। 'আর্যভট' ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর এক প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁরই নামানুসারে নাম রাখা হয়েছে 'আর্যভট'।

'আর্যভট' ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তৈরি অনন্যসাধারণ এক কীর্তি। এটি তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় তিন বছর। কিন্তু এটি ভারতের মাটি থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় নি।—উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল সোভিয়েত দেশের এক মহাকাশযান বন্দর বা 'কসমোড্রোম' থেকে, এক শক্তিশালী সোভিয়েট রকেটের সাহায্যে।

তিনশো আটান্ন কিলোগ্রাম ওজনের 'আর্যভট' দেখতে মস্ত বড় একটি বাক্সের মতো। প্রস্থসহ এর দৈর্ঘ্য ১'৫৯ মিটার এবং উচ্চতা ১'১৯ মিটার। এর ভিতরটা অনেক সূক্ষ্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। এইসব যন্ত্রপাতির সব ক'টিই সৌরশক্তি চালিত। আর্যভটকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ছ'শোর মতো কিলোমিটার ঊর্ধ্বে প্রায় বৃত্তাকার এক কক্ষপথে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে থেকে আর্যভট প্রতি ৯৬ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন মত নির্দেশ দিয়ে আর্যভটের যন্ত্রগুলিকে ইচ্ছামতো পরিচালিত করতে থাকেন। সেও এক চমকপ্রদ ব্যাপার। যাই হোক—মাত্র ছ' মাসের জন্যে এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পাঠানো হয়েছিল মহাকাশে, কিন্তু

সুখের বিষয় যে তার অনেক বেশি সময় আর্যভট রয়েছে তার কক্ষপথে, যদিও পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে এখন আর তার কোন সক্রিয় যোগাযোগ নেই।
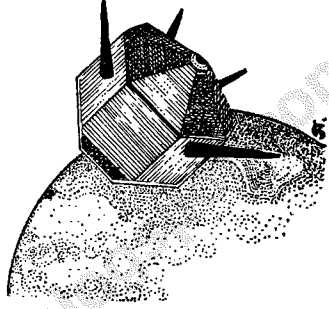
আর্যভটের সাফল্যের পর এলো 'ভাস্কর'। 'ভাস্কর' ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভারতে 'ভাস্কর' নামে দু'জন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। প্রথম জন ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর আর দ্বিতীয়জন ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ। এঁদের নামানুসারে ভারতের দ্বিতীয় সার্থক কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম রাখা হয়েছে 'ভাস্কর'।

১৯৭৯ সালের ৭ই জুন তারিখে সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কাছাকাছি এক কসমোড্রোম থেকে শক্তিশালী একটি রুশ রকেটের সাহায্যে একে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করা হয়। চারশো চুয়াল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের 'ভাস্কর' কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রতি ৯৫'২ মিনিট অন্তর একবার ক'রে পৃথিবী পরিক্রমণ করে চলে। উপবৃত্তাকার পথে ঘুরপাক খেতে খেতে একবার সে পৃথিবীর কাছে আসে ৫১২ কিলোমিটার দূরত্বে, আবার সরে যায় পৃথিবী থেকে ৫৫৭ কিলোমিটার দূরে। এমনিভাবে পৃথিবীর টানে বাঁধা পড়ে ঘুরে চলে ভাস্কর। ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ঘুরপাক খাবার সময় 'ভাস্কর' তার স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে তরাই অঞ্চলের অনেক ছবি তোলে। সেই সব ছবি সে পাঠিয়ে দেয় ভূপৃষ্ঠে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে। সেখানে ঐ সব ছবির প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তরাই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ. কৃষি সম্পদ আবহাওয়া ও জল সম্পদের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারেন—ঐ অঞ্চলের মাটি কতোটা আর্দ্র, তখনকার বায়ুমণ্ডল কতোটা উষ্ণ আর ভারত ভূখণ্ডের সাগরগুলির একাধিক বৈশিষ্ট্য।

আর্যভটের মতো ভাস্করের যন্ত্রপাতিও পরিচালিত হয় সৌরশক্তির সাহায্যে। এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ যন্ত্রাংশই ভারতে তৈরি। আর্যভটের মতো ভাস্করও ভারত সোভিয়েত যুগ্ম কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় নির্মিত ও উৎক্ষিপ্ত হয়।

ভাস্করের পরে আসে 'রোহিণী'। হ্যাঁ, রোহিণীও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ভারতে তৈরি তৃতীয় সফল কৃত্রিম উপগ্রহ। রোহিণীর সাফল্যে আমরা গর্বিত। বিশেষভাবে গর্বিত এই কারণে যে, এবার এটিকে উৎক্ষেপণের জন্যে বিদেশী রকেটের সাহায্য নিতে হয় নি। সাহায্য নিতে হয় নি, বিদেশের কোন মহাকাশযান বন্দরেরও। ভারতের শ্রীহরিকোটার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে কাঁপিয়ে ভারতীয় এস. এল. ভি.—৩ রকেট পাঠিয়ে দিয়েছে কক্ষপথে। দিনটা ছিল ১৯৮০ সালের ১৮ই জুলাই,—সময় সকাল আটটা বেজে প্রায় চার মিনিট। সাদা কালো ধোঁয়া ছেড়ে রোহিণী উঠে গেছে মহাকাশে মহাশূন্যে—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপন কক্ষপথে, কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর 'রোহিণী' একবার ক'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

এস-এল ভি—৩ হচ্ছে চার স্তর বিশিষ্ট রকেট। ত্রিবান্দ্রমের বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্রে এটি তৈরি হয়েছে। তৈরি করতে মোট খরচ পড়েছে কুড়ি কোটি টাকা।

রোহিণীর আয়ু একশো দিন। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের আশা যে তার প্রকৃত আয়ুষ্কাল আকাঙ্ক্ষিত আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।—ভগবান করুন, তাই যেন হয়। রোহিণীর ভেতরে আছে পাঁচ ওয়াট সৌরশক্তির ব্যাটারি চালিত যন্ত্রপাতি, যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'রোহিণী' তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাচ্ছে—প্রাপ্ত তথ্য পাঠাচ্ছে।

'রোহিণী' হিন্দু বর্ষপঞ্জীর তালিকাভুক্ত সাতাশটি নক্ষত্রের অন্যতম। এই সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে চতুর্থটির নামই 'রোহিণী'।—এ নামের কিঞ্চিৎ দার্শনিক তাৎপর্যও আছে। কথিত আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মও নাকি এই রোহিণী নক্ষত্রে। এ যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফসল যে তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ—তার নামও তাই সেই নক্ষত্রের নামানুসারী।

মহাকাশে 'রোহিণী' উৎক্ষেপণের সাফল্যে আমরা গর্বিত। এ সাফল্য সত্যিই ঐতিহাসিক সাফল্য। কারণ এখন ভারতই হলো পৃথিবীর ষষ্ঠ দেশ—যে দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিবলে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালো। এর আগে এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে যে পাঁচটি দেশ—সেগুলি হলো রাশিয়া, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান ও চীন।

তোমরা, যারা আজ ছোট—তারা আশা নিয়ে থাকতে পার। হয়তো বা কোনদিন তোমাদেরই কেউ যাবে মহাশূন্যে মহাকাশযানে চেপে,—প্রদক্ষিণ করবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে, কিংবা কেউ চলে যাবে চাঁদে—সেখানকার মাটির বুকে সদর্পে পা ফেলে ঘুরে বেড়িয়ে দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসবে ঘরে—এই মাটির পৃথিবীতে।

কে খুনী

যতীন বারুই

ফাইন্যাল ইয়ারে ডাক্তারি পড়ে জয়ন্ত। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। খুব মেধাবী সে। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে থাকে। মেধাবী হলে হবে কি। তুখোড় নয়। বরং গোবেচারি। তাই সতীর্থদের সঙ্গে তার মেলামেশা কম। একা একা থাকতে চায় সে। আর পড়াশোনায় ডুবে যায়।

সেদিন বিকেলে জয়ন্ত খবর পেল তার বাবা নিহত। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তার মাথায়। শুনল—ভোর রাতে ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘুম ভাঙিয়ে রোগী দেখার নাম করে বাড়ির বাইরে কারা নিয়ে যায়। তারপর তাঁকে খতম করে। সবারি সন্দেহ—এ নকশালীদের কাজ।

ডাক্তার চ্যাটার্জী ছিলেন হার্ট বিশেষজ্ঞ। বিদেশ থেকে অনেক ডিগ্রি নিয়ে এসে জেলা শহরে চেম্বার খুললেন। কোন চাকুরিতে গেলেন না। চাকুরিতে আর কত মাইনে পাবেন তিনি ? নিজের যোগ্যতা থাকলে আপনিই পসার বাড়বে। আর পসার হলে আপনা থেকেই টাকা আসবে। আসলে চাই সিনসিয়রিটি। পেশেণ্টের প্রতি সহানুভূতি। বাস্!

হ্যাঁ সত্যই তাঁর দিন দিন পসার বাড়ল। বিরাট নাম তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনের পরিমাণও বাড়তে লাগল। গাড়ি হল। বাড়ি হল বিরাট। কী নয় ? আর এতেই কি নকশালীদের জ্বালা ? তাই তারা তার বাবার মতো একজন নাম-করা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করল ! না, জয়ন্ত আর ভাবতে পারে না।

দেশ থেকে ফিরে এসে জয়ন্ত পড়ায় আবার ডুবে গেল। ভাল ভাবে তাকে পাশ করতে হবে। বাবার নাম রাখতে হবে। মনে পড়ে—দেশে গেলেই বাবা বলতেন, জয় তোকে আমার থেকেও বড় হতে হবে। আমি তো কত কষ্টে ডাক্তারি পড়েছি। টিউশনি করতে করতে পড়তে হয়েছে। তোকে তো সে-সব করতে হচ্ছে না। তবে ভাল ফল হবে না কেন ?

সত্যিই তার ভাল ফল চাই। বাবার ইচ্ছে পূরণ চাই। নইলে সে কেমন ছেলে। মাঝে মাঝেই জয়ন্ত এ সব কথা ভাবে। আর ডাক্তারি বইএ ডুবে থাকে। অন্য বইও যে পড়ে না, তা নয়। ফুটপাতে পুরনো বইয়ের দোকান খুঁজে খুঁজে নানা বইও কেনে।

একদিন তার হাতে এল, 'মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস।' বাঃ বেশ বইটা তো। কিনে এনে পড়তে থাকে জয়ন্ত।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত—মানুষ মরে গেলেও মমি করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়। তাই ধনীলোক বা জ্ঞানীগুণী-মানুষের আর রাজ-রাজাদের মৃত দেহ নানা জাতীয় গাছের আরক নিয়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে মমি করে কবর দেওয়া হয় এবং মৃতের ব্যবহৃত সব কিছুই কবরের মধ্যে প্রোথিত থাকে। কফিনের মধ্যে প্যাপিরাস পাতায় পুঁথি তৈরি করে তাতে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, এবং মৃত আত্মাকে জাগানোর মন্ত্র লিখে মৃতের মাথার কাছে রাখা হয়।

জয়ন্তর খুব ইচ্ছে—প্রাচীন মিশরীয় ভাষা শেখে। তাহলে মিশরের অনেক অতীত ইতিহাস জানবে সে। তাই ডাক্তারী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মিশরীয় ভাষাটাও শিখতে শুরু করল। এতেও তার অবহেলা নেই। এতেও ডুবে যায় সে।

এদিকে আবার ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা হল। পাশ করল জয়ন্ত। হ্যাঁ, আশাতীত ফল। খুব ভাল। তাহলে কি সে বাবার মতো বিশেষজ্ঞ হবে? বিদেশে পড়তে যাবে? বিধবা মা নিমরাজী হয়েও রাজী হলেন। জয়ন্ত বিদেশ পাড়ি দিল।

পাঁচ বছর পর দেশে ফিরছে জয়ন্ত। এয়ারে নয়। জাহাজে। সঙ্গে নানা যন্ত্রপাতি কিনা, তাই। জলপথে আসতে বড় ভাল লাগল জয়ন্তর। তবে সময় বেশি লাগল, এই যা। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। শুধু জল আর জল। চিত্ত যেন বিকল হয়ে যায়। শেষে একদিন বোম্বে পোর্টে পৌঁছল। যা ভয় করছিল জয়ন্ত, তাই। সঙ্গের জিনিসগুলো চেক করতে কাস্টম অফিসার বললেন, ডাঃ চ্যাটার্জী আপনার এই গিফ্‌ট বাক্সে কী আছে?

—একটা স্প্রিংএর খেলনা। আমার এক ভারতীয় বন্ধু লনডনে সেট্‌ল করেছে। সেই এই গিফ্‌টটা আমাকে দিয়েছে।

—ওটা একবার খুলবেন?

—আপনি বললে নিশ্চয়ই খুলবো। তবে বাক্সটা খোলা আবার প্যাক করা, অনেক ঝামেলা। তা আপনি যদি···

কাস্টম অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ডাক্তারের দিকে চাইলেন একবার। তারপর কী যেন ভেবে বললেন, ঠিক আছে, নো নীড।

খুশিতে মন ভরে উঠল জয়ন্তর। হাসি মুখে সে বলল, থ্যাঙ্কস্‌, মেনি থ্যাঙ্কস।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বাবার সেই চেম্বার খুলল জয়ন্ত। ডাঃ জয়ন্ত চ্যাটার্জী। মেডিসিন স্পেসালিস্ট। চেম্বারটি আরও টিপটপ করে নিল সে। আসলে সবেতেই 'শো' চাই। নামের পাশে যেমন, তেমনি চালচলনে, চেম্বারেও। আর বাবার চেম্বারে বসতে না বসতে তার নামও ছড়িয়ে পড়ল। মানে পসার বাড়ল। সবাই বলাবলি করতে লাগল—এই না হলে ছেলে। যেন বাপকো বেটা······।

তার এই পসার আর অর্থ রোজগার দেখে ডাঃ ঘোষ, অমূল্যরতন ঘোষ, ঈর্ষিত হলেন। জয়ন্তর বাবার সমবয়সী তিনি। তাঁর তেমন পসার ছিল না। কিন্তু ডাঃ চ্যাটার্জীর হত্যার পর তাঁর চেম্বারেও রুগীর ভিড় হচ্ছিল। কিন্তু জয়ন্ত বসার পর থেকে আবার তাঁর পসারে ভাঁটা পড়ল। যত রুগী প্রায় সবাই যান জয়ন্তর চেম্বারে। তিনি ভাবতে লাগলেন কী ভাবে আবার পসার ফিরিয়ে আনা যায়। ভাবতে ভাবতে সেই একটা অর্থই ঘুরে ফিরে খুঁজে পান।

একদিন ডাঃ ঘোষ সেই লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। খবর পেয়ে ঝিটকু, ভাল নাম তার নফর আলী, ডাঃ ঘোষের চেম্বারে এল। রাত তখন অনেক। দু একজন রোগী হয়ত এসেছিল তারা সবাই চলে গিয়েছে। এখন তিনি বলতে গেলে একেবারে একা। এমন সময় সেই ঝিটকু এসে ডাঃ ঘোষকে সেলাম ঠুকে বলল, জী ডাক্তার সাব, ক্যা ফরমাস ?

—আবার যে ঝনঝাট সুরু হয়েছে। দেখছ তো এখানে একটা রোগী আসে না। সব ওই জয়ন্তর চেম্বারে।

—ক্যা করনা সাব ? বাতলায়ে।

—ওকে একদম···

বাচ্চা ডাক্তারকো ?

—দেখ কাম ঠিকভাবে করতে পারলে···। এই নাও। ঠিক হ্যায় ?

—নেহি সাব। উসকো বহুত আচ্ছা কাম···।

আরে রাখো। আচ্ছা এই নাও বলে ডাঃ ঘোষ আরো হাজার টাকার নোট ঝিটকুর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। মুখে কিছু বলল না ঝিটকু। ডাক্তার ঘোষের দিকে চাইল একবার। তার ছোট ছোট চোখ দুটো নিমেষে বড়ো আর গোল হল। যেন জ্বলে উঠল। হিংস্র হল কি ? টাকার বাণ্ডিল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

রাত অনেক। কটা বাজে কে জানে। তখনও আলো জ্বলছে ডাক্তার জয়ন্তর ঘরে। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করা তাঁর অভ্যেস। বিদেশ থেকে আনা নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। দিনে সময় কোথায় ? সব সময়েই তো রোগীর ভিড়। তাই রাতের ঘুম কমিয়ে গবেষণার কাজ করতে হয় জয়ন্ত ডাক্তারকে।

গভীর রাত হলেও ঘরের দরজা খোলা থাকে। পর্দা ঝোলে। আর গেটের পাশে দারোয়ান ঢুলে বসে ঘুমোয়।

টেবিলের সামনে যন্ত্রপাতি নিয়ে গভীর ভাবে মগ্ন ডাঃ জয়ন্ত। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় গোটা টেবিল আলোময়। আর ঘরের বাকি অংশ আলো-আঁধারি। যেন ছায়া ছায়া আলো।

হঠাৎই মনে হয় জয়ন্তর ঘরটা কেমন ভারি হয়ে উঠল। মনে হল ঘরে কে যেন ঢুকল। মুহূর্তে আনমনা হল জয়ন্ত। টেবিলের ওপর থেকে চোখ তুলে সে ঘরের দরজার

দিকে চাইল। কে ও! বিস্ময়ে হতবাক জয়ন্ত। বলল—কে? উত্তর না দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

চীৎকার ক'রে দারোয়ানকে ডাকার আগেই জয়ন্তর চোখের সামনে সেই কালো লোকটির পিস্তল-হাত। মুখে চাপা অথচ স্পষ্ট শব্দ—চুপ্।

মুহূর্তে জয়ন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পরক্ষণে যেন আলো জ্বলে উঠল তার মস্তিষ্কে। ডান হাতের আঙুলটা একটু সরিয়ে সুইচটার ওপর রাখল। চাপ দিল। আর অমনি—

অমনি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কঙ্কালটির বিরাট লম্বা দুটি হাত বিদ্যুৎগতিতে প্রসারিত হল। স্পর্শ করল সেই কালো লোকটির দেহ।

বিরাট চীৎকারে সে লাফিয়ে উঠল।

টেবিলের ওপারে প্যাপিরাস পাতার সেই মিশরীয় পুস্তিকা। বিদেশী ভাষায় এতক্ষণ মন্ত্র পড়ছিল জয়ন্ত ডাক্তার। মন্ত্র-পাঠ তখন শেষ হয়নি। এমন সময় ওই সেই কালো লোক।

বাকী মন্ত্রটুকু উচ্চারণ ক'রে সেই কঙ্কালটিকে বলল জয়ন্ত—খতম করো ওকে।

আর যায় কোথায়!

কঙ্কালটা এবার নিজেই স্প্রিংএর মতো লাফিয়ে পড়ল কালো লোকটির ওপর। ততক্ষণে লোকটি কিন্তু এক লাফে ঘরের বাইরে।

তাতে কি? আরও ত্বরিতে বেরিয়ে গেল কঙ্কাল। একটু পরেই ফিরে এল ঘরে। এবং নিজের জায়গায় দাঁড়াল। এতক্ষণ মূক হয়ে বসেছিল জয়ন্ত। মূকই রইল। শুধু ডান হাতটা তুলে সেই সুইচে আবার চাপ দিল।

ভোর হতে না হতেই সবাই দেখল ডাঃ চ্যাটার্জীর চেম্বার থেকে একটু দূরে শহরের সেই কুখ্যাত গুণ্ডা ঝিটকুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। না কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। অথচ সে মৃত। ছেলে বুড়ো সবার মনেই শুধু একটা জিজ্ঞাসা—ঝিটকুই তো কতো লোককে খুন করেছে। তাকে আবার কে খুন করল?

ঝারোয়ার জঙ্গলে

মহাশ্বেতা দেবী

মইনু, সোনাম আর তাতা এখনো জানে না ওদের সেই ঝারোয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা সত্যি, না মিথ্যে না স্বপ্ন। অথচ এ কথাও সত্যি যে ওরা চারজন ঢুকেছিল জঙ্গলে। বাদল আর কোনদিনই ফেরেনি।

বাদলের জেদেই ঝারোয়া যায় ওরা। নইলে ঝারোয়ার নাম ওরা শোনেই নি কোনোদিন। বাদলের কাকা পালামৌয়ের এক জঙ্গলে কাঠ কাটবার ঠিকাদার। এ বছর মার্চ মাসে বাদল ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে। স্কুল থেকেই চারজন বেজায় বন্ধু। মইনু আর তাতা সবে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। সোনাম ওর বাবার খবরের কাগজের আপিসে ঢুকবে এবার।

বাদলই বরাবর বেজায় ছটফটে আর খেয়ালী। স্বাস্থ্যটা ওর রীতিমত ভালো। দেখলে বাঙালী ছেলে মনে হয় না। বাদলের উৎসাহে ওরা সাইকেলে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। হিমালয়ে উঠেছে কয়েকবার।

বাদলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কি সে ক্ষমতা, কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

"তরুণ দল" ক্লাবের সঙ্গে সেবার ওরা গঙ্গোত্রীর কাছে এক গ্লেসিয়ারের গতিপথ দেখতে গিয়েছিল। যেখানে বেস্‌ক্যাম্প করার কথা, বাদল বলল, এখানে নয়। এখানে ভীষণ দুর্ঘটনা হবে।

দলের নেতা মোহনবাবু চটে গেলেন। তিনি একজন পাকা পর্বতারোহী। সঙ্গে আছে তিনজন অভিজ্ঞ শেরপা। তাঁরা বুঝছেন না, বাদল বেশি বুঝছে?

বাদল বলতে গেলে তাঁকে অমান্য করেই বন্ধুদের নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। আর সেই রাতে চাঁদের আলোয় যখন ধুয়ে দিচ্ছে বরফের আঙিনা, অপ্রত্যাশিত বরফের ধস্ নেমে মোহনবাবুদের বেস্‌ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ঠিক এমনি ঘটে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে। হঠাৎ বাদল বলল, এক্ষুণি চল্ এখান থেকে। কিছু একটা ঘটবে। থাকলে জড়িয়ে পড়ব।

ওদের খুব কাছে বসে নিথর হয়ে তাজমহল দেখছিল একটি যুবক। তার মত নিবিষ্ট হয়ে তাজমহল সেদিন আর কেউ দেখেনি।

ওরা তো চলে এল। তার আধঘণ্টা বাদেই না কি দুজন লোক এসে যুবকটিকে

লক্ষ্য করে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে। যুবকটিও প্রস্তুত ছিল। দু পক্ষের সে লড়াইয়ে যুবকটি মরল। কয়েকজন ভ্রমণার্থী জখম হল।

বাদল আগে থেকে অশুভ কিছুর আঁচ পেত। মইনু, সোনাম আর তাতা তো তা স্বচক্ষে দেখেছে। ঝারোয়াতে গিয়ে কি হল?

সব যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

মার্চে কাজে লাগবে বাদল। খুব উত্তেজিত। জঙ্গলে ঘুরবে, কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বাদলই বলল, তোরাও চল্। কয়েকদিন থেকে চলে আয়।

শিকার করা যাবে?

যাঃ, শিকার করা বারণ। পাখি টাখি মারতে পারবি।

আর এক আধটা হরিণ—

থাকব কোথায়?

কাকার বাংলোতে। কাকা বিয়ে করল না: সারা জীবন কাটাল জঙ্গলে জঙ্গলে। এক সময়ে বর্মায় হাতি ধরত। চল্ না, গল্প করবে জমিয়ে।

বাদলের কাকা থাকার জন্যে জায়গা বেছেছেন বটে। ট্রেন থেকে নামো কোমাণ্ডি নামে একটা জঙ্গল ঢাকা স্টেশনে। তারপর কাকার জীপে চল্লিশ মাইল ভিতরে চলো। সুমা নামের একটা জায়গা। সুমা নদী পাথরে পাথরে নেচে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। কাকার বাংলোর চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

এক সময়ে এখানে বক্সাইটের খনির কাজ শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কাজও হয়। তারপর খনির কাজ কেন যেন বন্ধ হয়ে যায়। খনির কাজের জন্যে তৈরি রাস্তা-গুলো এখনো আছে। সেই পথেই কাঠবাহী ট্রাক চলে যায় ডালটনগঞ্জ।

দেখা গেল কাকা সংক্ষেপে জবাব দেন।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছ কাকা?

হাতি আসে।

বেড়া উপড়ে ফেলতে পারে না?

পারে, ফেলে না। প্রখর বুদ্ধি রাখে।

মার্চ মাসেই বিকেল নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা, সন্ধে থেকে শীত শীত।

বনতিতিরের রোস্ট আর চাপাটি খাওয়া হল। কফি খেয়ে কাকার মেজাজ যেন একটু খুশি হল।

তোরা তো এলি, কিন্তু সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভালো জঙ্গলটাতেই কাজকর্ম বন্ধ, কি যে হবে।

কেন? কাজকর্ম বন্ধ কেন?

কি যে বলি, নিজেই বুঝছি না।

বল না, বল না।

ওই পাহাড়টার ওপারে ঝারোয়ার জঙ্গল। কখনো হাত পড়ে নি, ভালো ভালো শালগাছ অঢেল।

কাকা কাহিনীটা বললেন। জঙ্গলটা জমা নেয় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নেয় খুব অদ্ভুত কারণে। নির্জনে থাকবে বলে নেয়।

একটা বাড়ি বানায়। বউ নিয়ে আসে। জানা যায় ওদের একটি বাচ্চাও জন্মায়। সপ্তাহে সপ্তাহে ধীলন হাটে আসত সওদা করতে।

হঠাৎ পর পর কয়েক সপ্তাহ তার দেখা নেই।

অবশেষে এক অবিশ্বাস্য খবর আসে কাকার কাছে। ধীলনের জীপ গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে। আর ধীলনের মৃতদেহ পড়ে আছে তার বাড়িতে। বউ আর বাচ্চা উধাও।

কাকা তো গেলেন। তিনি দেখলেন ধীলন তার বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখে চোখে অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ছাপ। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল গ্রেট ডেন কুকুরটা। ধীলন বা কুকুর, দুটো মৃতদেহেই এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ধীলন কাগজের মত সাদা।

বউ বা বাচ্চার কোন খোঁজ নেই।

খোলামেলা বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে আছে। হায়েনা বা শিয়াল টানাটানি করেনি।

কাকার জঙ্গলকুলিরা বলল, এ কোনো পিশাচদানোর কাণ্ড।

আর তাদের কাছেই কাকা জানতে পারলেন। ধীলন বিয়ে করেছিল একটি মেয়েকে, যার কোনো কুলুজিকুষ্ঠি সে জানত না। জঙ্গলের মধ্যে একা একা মেয়েটিকে ঘুরতে

দেখে সে নিয়ে আসে ও বিয়ে করে। গজাড় জঙ্গলে একা একা কি কোনো মানুষের মেয়ে ঘোরে ?

কাকা সে কথায় কান দেন নি একেবারে। জঙ্গলে কাজ করতে হলে অত ভিতু হলে চলে না। আর এ কথা তিনি জানেন যে কুলিদের বেজায় বিশ্বাস ভূতপ্রেত, দেওপিশাচে। তিনি ধীলনকে দাহ করান, কুকুরটিকে কবর দেওয়ান। বাড়িটা বন্ধ করে চলে আসেন জীপটি নিয়ে।

তারপর জঙ্গল আপিসের সহায়তায় ধীলেনের কে আছে, না আছে খোঁজ নেন। অবশেষে রাঁচি থেকে এল ভার্মা নামে একটি ছেলে। ধীলন তার মামা। ভার্মা বলল, আমি ওখানে বাস করব না। বাড়িতে যা আছে তা জীপে চাপিয়ে নিয়ে রাঁচি চলে যাব।

ভার্মার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছিল। কোনো জঙ্গলকুলি ওদের সঙ্গে গেল না। তারা সাফ বলে দিল। জানোয়ারের ভয় করি না। যেখানে জানোয়ার অব্দি ঢোকে না, সেখানে কে যাবে ?

কাকা তাঁর হেড কুলিকে ধমকালেন। হেড কুলির নাম দাসাইন ওরাওঁ। সে বলল, বাবু! আমরা তো যাবই না। ওই বাবুও যেন না যায়।

ভার্মা সে সব কথা উড়িয়ে দিল। ভার্মার কাছেই কাকা ওই জঙ্গলটা ইজারা নিলেন। আদিম অরণ্য, বড় বড় শাল গাছ, প্রত্যেকটা গাছ খুব দামে বিকোবে। ভার্মা যাবার দিন হাটেও দেখা হল। ভার্মা বলল, কাল সকালে একবার আসবেন। একটু চা বানিয়ে আনলে তো কথাই নেই।

সেই শেষ দেখা। পরদিন সকালে থার্মস্ ভর্তি চা নিয়ে ঝারোয়ার জঙ্গলে হাজির হয়ে কাকা দেখেন ভার্মা এবং তার বন্ধু ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুজনেই মৃত, দুজনের চোখ অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিস্ফারিত দুজনের শরীরই রক্তশূন্য।

ছেলেরা বলল, তারপর ?

দুজনের গলাতেই ছোট ছোট পাংচারের দাগ ছিল।

তার মানে কি ?

জানি না। পুলিস এখনো খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো কিনারা হয়নি। শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যাচ্ছে না ওখানে গাছ কাটতে।

পুলিস যাচ্ছে না ?

কয়েকবার গেছে। সেও এক রহস্য।

কি রকম ?

বাড়িটা পুলিস বন্ধ করে তালা মেরে আসছে। পরে গিয়ে বাড়ি খোলা পাচ্ছে। সব ঝকঝকে তকতকে। কে বলবে যে বাড়িতে মানুষ থাকে না।

তার মানে কি ?

কোনো মানুষ আছে এর পেছনে। আমার তাই বিশ্বাস। হাজার সত্তর শাল গাছ, করম গাছ, তেঁতুল গাছ, লাখ লাখ টাকার জঙ্গল তো। কেউ আতঙ্ক সৃজন করছে।

কাকা খুব মুশড়ে পড়েছেন মনে হল। ঝারোয়ার জঙ্গলের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন।

বাদল বলল, তুমি ভাবছ কেন ? আমরা চারজন আছি, বন্দুক নিয়ে থেকে যাব ওখানে। সব রহস্য ফরসা হয়ে যাবে।

পরদিন দাসাইন ওরাওঁ ওদের নিয়ে গেল চিপা ফরেস্টে। সেখানে এখন গাছ কাটা চলছে। দাসাইন খুব আত্মসম্মানী ভারভারিক্কি লোক। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরেও, হাতে রাখে ছড়ি। দাসাইন বলল, তোরা যাস না ঝারোয়া।

কেন ? সেখানে কি আছে ?

বোস্, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই, চায় লা।

ওভারসিয়ারের তাঁবুর কাছে একটা লোক কেটলিতে চা বানাচ্ছে, বিড়ি বেচছে। কাটা গাছের উপর বসল ওরা। দাসাইন বলল, বাবু অনেকদূর বুঝে। সবটা বুঝে না।

দাসাইনের গল্পটা জঙ্গলে বসে মনে হয়েছিল গল্প, আর শহরে বসে মংনু, তাতা ও সোনামের আজ মনে হয় সত্যি। কেন এমন হয় ?

গল্পটা এই রকম—

আদি অন্ত কাল আগে যখন পৃথিবী তৈরি হচ্ছিল, তখন বড় দেবতার সঙ্গে অসুরদের বউরা যুদ্ধ করতে যায়। বড় দেবতা শূন্য থেকে বউগুলোকে নিচে ফেলে দেন। তারাই হয়ে গেল পাহাড়। পাহড়ের কোল দিয়ে ক্রমে বনও গজাল। আর একথাও সত্যি যে নানারকম মানুষ এসে সব জঙ্গল, সব মাটির দখল নিয়েছে।

তবু বনের কোনো কোনো জায়গা থাকে সংরক্ষিত। মানুষ সব দখল করছে বলে পাহাড় জঙ্গলের আত্মারা মানুষের উপর ক্ষেপেই থাকে। কেননা তাদের বসত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তখন তারা কোনো কোনো জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে।

ঝারোয়ার জঙ্গল তেমনি এক জায়গা। এ কথা বাবু মানে না, বুঝে না। এ কথা কখনো বাবু ভেবে দেখল না যে ধীলন যেখানে ঘর করল, সেখানে গাছে পাখি বসে না, কোনো জানোয়ার ঢোকে না বাড়ির ভিতর ? আর ধীলনও ভেবে দেখল না, জঙ্গলের মধ্যে একটা মেয়ে কোথা থেকে এল, বিয়ে করে বসল। অবশ্য ধীলন কিছু করতে পারতও না। যখনি ওখানে বাড়ি করেছে, তখনি ও মরেছে। যখনি মেয়েটিকে দেখেছে, তখন তো ওর উপর শাপ লেগে গেছে।

ও তো মেয়ে নয়। মানুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কখন মেয়ে সেজে, কখন হরিণ বা ময়ূর সেজে মানুষকে ভুলায়। তারপর মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে ফেলে রেখে চলে যায়।

কেন ?—সোনাম বলল।

কেন শোধ নেবে না। মানুষ গাছ কেটে, পাহাড়ের পাথর চালান দিয়ে জঙ্গলের রক্ত চুষে নিচ্ছে না ?

তোমাদের কিছু হয়নি তো ?

দাসাইন শান্ত সুন্দর হাসল। বলল, আমরা তো জঙ্গলকে মারছি না বাবু, পাহাড় জঙ্গল শেষ করে টাকা জমাচ্ছি না। আমাদের মারবে কেন ? আমরা জঙ্গলের সন্তান। জঙ্গলের দেওদেওতার নিয়ম মেনে চলি। ওদের রাগ বাইরের মানুষের উপর। আমরা যাচ্ছি জঙ্গল দিয়ে। ধর্ কেন, জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের উপর একটা ডাল ভেঙে পড়ল। বা' নেই, বাতাস নেই, ডাল পড়ল কেন ? তখনি জানলাম আর যাওয়া নিষেধ। আর যাব না, ফিরে আসব।

তাতা বলল, বাড়ি পরিষ্কার রাখছে কে ?

যে ধীলনকে খেয়েছে, সে।

কেন ?

কেন ?

আরো খেতে চায় আরো মানুষ চায়।

পুলিসকে কিছু করে নি কেন ?

কে জানে ?

পুলিসকে যে কিছু করে নি, তাতেই মইনুরা নিঃসংশয় হয় যে এ কোনো মানুষের কারসাজি। তখনি বাদল ঠিক করে যে ওই বাড়িতে গিয়ে ওরা থাকবে।

কাকা বারণ করলেন।

পুলিস অফিসার বারণ করলেন।

বারণ না করে, "যাও" বললে ওদের উৎসাহ ফুরাত। বারণ করার ফলে যা ছিল উৎসাহ, তা হয়ে গেল জেদ। চার চারটে জোয়ান ছেলে। সাঁতার কাটতে, স্কুটার চালাতে, পাহাড়ে উঠতে সবাই পটু। রাইফেল ক্লাবে চারজনই একসঙ্গে ঢুকেছিল। অল্পবিস্তর বন্দুক চালাতে সবাই জানে। বাদলের তো লাইসেনস্‌ও আছে। জঙ্গলের কাজে আসার আগেই সে লাইসেনস্ নিয়েছে। মইনু কারাটে, তাতা আর সোনাম জুডোও শিখেছে।

পুলিস অফিসার সুজা সিং বললেন, ঠিক আছে। পাহাড়ের এপারে সুমাতে আমি রইলাম আজ। অনেক দিন বাদে জমিয়ে তাস খেলা যাবে।

কাকার বাংলোয় রয়ে গেলেন সুজা সিং। আর ওরা যখন গেল বিকেলে, তখন বার বার বলে দিলেন, পাহাড়ে নির্জনে শব্দ বহুদূর যায়। এই হুইস্‌ল্‌টা রাখুন। কিছু বিপদ বুঝতেই বাজাবেন। আমরা চলে যাব।

দাসাইন ওদের কিছুদুর এগিয়ে দিল আর মাথা নাড়তে নাড়তে, বক বক করতে করতে ফিরে গেল।

সুমা থেকে ঝারোয়া, মাঝে একটি পাহাড়। পাহাড়টা খুবই নিচু। যাবার পথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড় ঘিরে। ধীলনের বাংলোটিতে ওরা যখন পৌঁছয় তখন বিকেল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ওরা আশপাশটা দেখতে বেরোল। বাদল বলল, যত সব গাঁজাখুরি কথা। ওই তো হরিণ দৌড়ে গেল, কাঠবিড়ালি ছুটছে। ভূতুড়ে জঙ্গল না হাতি!

মইনু, সোনাম আর তাতা অবশ্য কোনো হরিণ বা কাঠবিড়ালি দেখেনি। কিন্তু বাদল তো দেখেছে?

সন্ধে ঘনাতে ওরা ফিরে এল। বাদল বলল, এত বড় বড় শাল গাছ, ওঃ। কত দাম বলতো?

লাখ লাখ টাকা।

তাহলে?

তুই লক্ষপতি হচ্ছিস।

নাঃ, বেজায় বড়লোক হওয়াটা আর ঠেকানো গেল না দেখছি। কি আর করি বল্। আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিস।

বাংলোতে আলো জ্বলছে। তাই দেখেই ওরা অবাক হয় একটু। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স, ঘরে পেট্রোম্যাক্স, কে জ্বালল? আরেকটু এগিয়ে আসতে জবাব মিলল। বারান্দায় বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা।

ওদের দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটিকে শুইয়ে রেখে। তারপর হাত জোড় করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছেলেরা যত না অবাক, তত বিব্রত, আবার আশ্বস্তও। মইনু বলল, থামুন, থামুন। কাঁদবেন না। আপনি, আপনি ধীলনের বউ?

হ্যাঁ বাবুজী। এ তো আমারই বাংলো।

কোথায় ছিলেন?

কোথায় থাকব? জঙ্গল দিয়ে আমাদের গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম। পুলিস যে বড্ড ঝামেলা করে। কি বলে কিছু বুঝি না। আমি কি জানি যে স্বামী মরে যাবেন? উনি পরব পূজা পছন্দ করেন না। ঝগড়া করে আমি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। তারপর যা যা হল…গাঁয়ে আমায় থাকতে দেয় না। বলে, বাবুকে বিয়ে করেছিলি। সেখানে যা। এখানে এলে পুলিস তাড়া করে।

আপনিই ঘরদোর সাফ করেন?

হ্যাঁ বাবুজী। কে করবে?

ঘর খোলেন কি করে?

এই যে, মাসটার চাবি দিয়ে? এ চাবিগুলো দিয়ে সব তালা খোলা যায়। বাচ্চাটার বড় অসুখ। কেবল শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে চায় না। তাই এসে বসে আছি। ভেবেছি সকাল হলে নিজে যাব পুলিস সাহেবের কাছে। বলব, আমাকে যা বলো তাই করব, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। জংলী মানুষ আমি, কিছু বুঝি না। স্বামী সব বুঝতেন, সব দেখে শুনে রাখতেন। বাবুজী! রাতটুকু থাকব?

ছি ছি, সে কি কথা! আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে থাকুন। আমরা ওই ঘরে থাকব। সকালে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।

মেয়েটি বাচ্চাকে শুইয়ে এল। সেই ওদের খাবার সাজিয়ে দিল প্লেটে। কাকা খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজে কিছু খেল না। কথা বলল অনেক। ধীলনের ভাগ্নে ভার্মাকে কে মেরেছিল তা ও জানে না। ও তো ভয়ের চোটে আসতই না। গ্রামের লোকরা থাকতে দিল না বলে যাওয়াআসা করছে।

বসার ঘরে ওরা শুয়ে পড়ে। ঘুম কি আসতে চায়? এখন তো ঝারোয়ার বাংলোর রহস্যের সব সমাধানই মিলেছে। মেয়েটির গল্পের মধ্যে যে সব ফাঁকফোকর আছে তা ওদের এখন কিছু কানে বাজছে না। মেয়েটির চাউনি এত কাতর, গলার স্বর এমন কান্নায় ভরা!

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠেছিল। ছুটে এসেছিল। বাবুজী, বাবুজী! মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়ছে কেন? একটু দেখ না গো? এমন রাতে আমি কি করি, কোথায় যাই?

ধড়ফড় করে ওরা উঠে যায়, ছুটে যায়। সত্যিই, বাচ্চাটা, তিন-চার মাসের বাচ্চাটা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাদল সামনে ছিল, পাগলিনীর মতো বাচ্চার মা বাদলের হাত ধরে টানতে থাকে।

এসো বাবুজী, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, বলো আমার মেয়ে বেঁচে আছে।

হতভম্ব বাদল এগিয়ে যায় কাছে। আর যে বাচ্চাটা মরার মত পড়েছিল এতক্ষণ, সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বিছানা ছেড়ে যেন ভেসে উঠে আসে, বাদলের গলায় মুখ লাগায়, চুষতে থাকে কি যেন। বাদলের গলার স্বর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ হয় বিস্ফারিত। মইসুরা এক পা নড়তে পারে না। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। মেয়েটি বাদলকে ধরে থাকে আর একেবারে মমতাময় মানুষী মায়ের গলায় বলতে থাকে, খেয়ে নে সোনা, খেয়ে নে মণি, খেয়ে নে···

সোনাম এই ভয়ঙ্করতার অভিশাপ কাটিয়ে বাদলের রাইফেলটা এনে পরপর গুলি করেছিল মেয়েটির উপর। মেয়েটি একটুকু নড়ে নি। বাচ্চাটাকে ও একসময়ে কোলে নিয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বাদল পড়ে যায়।

রাইফেলের শব্দে সুজা সিং ও কাকা এসে পড়েন। তারপর সব অস্পষ্ট। ধোঁয়াটে, গোলমেলে। ওদের চারজনকেই হাসপাতালে নিতে হয়। বাদল অবশ্য জীবিত ছিল না।

তারপর ওরা একদিন ফিরে আসে।

ঝারোয়ার জঙ্গলের নাম ওরা কখনো করে না। কিন্তু খুব ছোট শিশু দেখলে ওর ভীষণ ভয় পায় আজও। জীবনেও এ আতঙ্ক ওদের কাটবে না।

ঝারোয়ার জঙ্গলে এরপর আর কেউ ঢোকেনি।

বোধন

মদন চৌধুরী

ঘুরে ফিরে শরৎ আসে। এবারও এসেছে। নদীর ঘাটে পাল তোলা নৌকো। গেরুয়া পালে হাওয়ার লুকোচুরি খেলা। কাশফুলের সমারোহ। নীল আকাশে তুলো-পেঁজা মেঘের আনাগোনা। টুপ্ টাপ শিউলি ফুল ঝরার শব্দ। যার পাপড়ি মায়ের বুকের মত নরম আর ঠাণ্ডা। বাউল বুড়োর হাতে একতারা। গলায় তার আগমনী সুর। মাঠে মাঠে সোনা ধানের শিষে হলুদ রঙের ঝিলিমিলি। রাখালের মাথায় বট পাতার মুকুট। বাতাসে তার বাঁশির সুর। ঝকঝকে নিকানো উঠোনে মা কাকীমার আঁকা চাল গুঁড়ির আলপনা। কপাটের মাথায় ঢিঁপি ফলের আঁকা গেরিমাটির কলকা।

শরৎ এসেছে। দুগ্গা ঠাকুর গড়ছে রাখাল মিস্ত্রী। প্রতি বছরের মত। সেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। সিংহের চোখে লাল মার্বেল। মহিষাসুরের হাতে টিনের তলোয়ার। গণেশের পাশে লাজুক লাজুক কলা বৌ। চওড়া লালপাড় কাপড়ে ঠিক যেন মা-ঠাকরুণ।

ঘরে ঘরে নতুন কাপড়-জামার গন্ধ। আত্মীয়স্বজন, আপনজনের হৈ-হুল্লোড়। মুখে চোখে হাসি, আর আনন্দের রোশনাই।

অতীতের দুঃখময় জীবনের কথা ধীরে ধীরে ভুলে গেছে মানুষ। যা যাওয়ার তারা তো গেছেই। কত প্রাণই তো অকালে তলিয়ে গেছে! সন্তান হারিয়েছে মা। স্বামী হারিয়েছে স্ত্রী। স্ত্রী হারিয়েছে স্বামী। হারিয়ে গেছে গোয়ালের গরু, মরাইয়ের ধান, পুকুরের মাছ। তিলে তিলে গড়ে তোলা মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে

গেছে। তার তুলনায় কত সামান্য জিনিষই না খোয়া গেছে নিতাইদের। নিতাইয়ের বাবা সান্ত্বনা দিয়েছে নিতাইকে। মা কত বুঝিয়েছে। তবুও নিতাই অতীত ভুলতে পারেনি। বিশেষ করে পুজোর দিনে তার বুক ফেটে যায়। চোখ ছাপিয়ে জল আসে। নির্জন নদীর ধারে বসে কাঁদে। কাঁদে আর ভাবে…

ভাবে, কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিতাই আজও ফুলে ফুলে কাঁদছে। ঢোল ও কাঁসির শব্দ শুনে ওর বুকের ভেতর যেন একটা জবাই করা জন্তু মৃত্যু যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে নিতাই। তার কান্না ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। নদীর ঘোলা জলে, ধানের শিষে, পাখির ডানায়, কাশফুলের মাথায় তার দীর্ঘশ্বাস।

কোথা দিয়ে কি যে ঘটে গেল! দিন নেই, রাত নেই। অবিরাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ সাপ ফণা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সহরে, গ্রাম থেকে গঞ্জে।

জল শুধু জল। মরণ খেলায় মেতে উঠলো নদী। এই সেই নদী। নিতাই সেদিকে তাকালো। এখন কেমন ভাল ছেলেটির মত তির তির করে এগিয়ে চলেছে। অথচ দু'বছর আগে হঠাৎ যে কি হল, একদিন এই ভাল ছেলেটি প্রচণ্ড এক দস্যিপনায় ভেঙে চুরে ডুবিয়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেল। সর্বহারা হল মানুষ। সাপে-মানুষে পাশাপাশি রাত কাটালো। চারদিকে কান্না চিৎকার আর হাহাকার। উৎকণ্ঠা আর ভয়। মৃত্যুর মহা উল্লাস। কে আর কতটুকু সঙ্গে নিতে পারলো। কুলুঙ্গিতে রয়ে গেল সিঁদুর মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপি। সত্যনারায়ণের পট। গোয়ালে খোঁটায় বাঁধা রয়ে গেল গরু বাছুর। খাঁচায় টিয়া, ময়না। থেকে গেল কান লট্‌কানো ছাগল ছানা, চেনে বাঁধা কুকুর। পোষা বিড়াল। প্রচণ্ড জলের স্রোতে অন্ধকার রাত্রে ভেসে গেল বাক্স, তোরঙ্গ, খাট, বিছানা। দেওয়াল চাপা পড়ে রয়ে গেল থালা, ঘটি, বাটি। কিন্তু নিতাই কি হারালো? পুজো এলেই ও কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে? ওর বাবা, মা, বোন সবাই তো প্রাণে বেঁচে আছে। ভিক্ষে দুঃখ করে নিতাইয়ের বাবা আবার মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুও করেছে। তবে?

প্রাণের চেয়েও মূলাবান নিতাইয়ের জীবনে তবে আর কিছু কি ছিল? ছিল, ছিল। ঘরের ভিতর থই থই জল। দিশেহারা মানুষ। নিতাইয়ের বাপের এক কাঁধে নিতাই অন্য কাঁধে বোন। মায়ের হাতে, মাথায় সংসারের টুকিটাকি বোঝা। এক বুক জল ঠেলে চলেছে মানুষ। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ওরাও। নিতাই তখন বোবা পাথর। বোনটা আরো ছোট। শেষ সময়ে জিনিসটার কথা কারও মনে পড়লো না। যখন মনে পড়লো ফেরার পথ নেই। ঘরটা ওদের হুমড়ি খেয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেছে। তখন কেবল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ।…

আজ বোধন। বেলবরণ। সকাল থেকেই নিতাইয়ের চোখে মুখে বিষাদের সকরুণ

ছায়া! এই ষষ্ঠীর দিন নিতাই প্রতি বছর ওর বাবার সঙ্গে শহরে যেত। রাজবাড়িতে গিয়ে কাঁশি বাজাতো, বাপ বাজাতো ঢোল। কত গাড়ি, ঘোড়া, প্যাণ্ডেল! ঝলমলের রাজত্ব!

কু ঝিক্‌ঝিক্,...পোঁ...রেলে. চড়ার কি যে আনন্দ। নিতাইয়ের বুকে কেমন যেন কষ্ট হয়। রাজাবাবুরা কি ভালো লোক! নিতাইকে প্রতি বছর জামা প্যাণ্ট দিত। বাড়ি ফেরার সময় চিঁড়ে মুড়কি, নারকোল নাড়ু, তিলপাটালি আরও কত কি কাপড়ে বেঁধে আনতো নিতাই। দুগ্‌গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো. কালীপুজো কাটিয়ে বাড়ি ফিরতো ওরা। নিতাই বাড়ি ফেরার পথে ওর ছোট্ট সোনা বোনটির জন্য কিনে আনতো পুতুল, চুড়ি, ফিতে।

নিতাইয়ের বাপের কাঁধে ঢোল, নিতাইয়ের হাতে কাঁসি। ওরা ফিরতো খুশির হাট থেকে।

সেদিন কি আর ফিরে আসবে না নিতাইয়ের জীবনে। বাপ-মা বলে—আসবে। ওর কিন্তু আর বিশ্বাস হয় না। অভাবের সংসারে যা যায়, তা আর ফিরে আসতে চায় না।

নিতাই ভাবে। ভাবে আর কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে আপন মনে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—মা দুগ্‌গা, ঠাকুমা যে বলতো সব নদী গিয়ে সাগরে মেশে। মা গো, ঠাকুমা যে বলতো সাগর কিছু নেয়না, সব পাড়ের দিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। মা-গো তবে সাগরকে বলে দাওনা, আমার বাপের ঢোল আর আমার কাঁসিটা যেন তাড়াতাড়ি ফেরত দেয়। মা-গো-মা......!

হীরাপুর 'ডগ শো'

প্রফুল্ল রায়

কাবুল আর টাবুলকে মনে আছে তো ? মানে আমার সেই দুরন্ত দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড দুই ভাগ্নে ? এত তাড়াতাড়ি তাদের ভুলে যাবার কারণই নেই, না কি বল !

তবে যারা এখনও কাবুল টাবুলের নাম পর্যন্ত শোনে নি, বা ওদের দারুণ দারুণ কীর্তিকলাপের কিছুই জানে না তাদের কথা আলাদা। তাদের জানিয়ে দিচ্ছি, কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে ছবির মতো সুন্দর একটা কারখানা শহরে কাবুলরা থাকে। ওদের বাবা ওখানকার বিরাট অফিসার। মা বারোমাস ভোগে আর খাটে শুয়ে দিনরাত ছুঁচের মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে যায়। দুই ভাইয়ের মধ্যে কাবুল বড়, পড়ে ক্লাস সিক্সে। তার মাথায় আলপিনের মতো খাড়া খাড়া চুল; মার্বেল গুলির মতো গোল গোল চোখ। চব্বিশ ঘণ্টা তার ব্রেনের ভেতর নানারকম দুষ্টুমি আর প্ল্যানের চাষ চলছে। টাবুল পড়ে ক্লাস ফাইভে; মাথায় কাবুলের চাইতে দেড় ইঞ্চি ঢ্যাঙা। দুই ভাইয়ের খুব ভাব। একজন আরেকজনের গায়ে সারাক্ষণ আঠার মতো আটকে থাকে। মিলিটারি কায়দায় কাবুলকে যদি জেনারেল বলা যায়, টাবুল তা হলে তার ভীষণ বিশ্বস্ত সোলজার। কাবুলের মুখ থেকে কোন অর্ডার বেরুনোমাত্র সে তা করে ফেলবে। আরেকটা কথা, দুই ভাই দুর্দান্ত গুলতি চালাতে পারে।

আজ রবিবার। স্কুল বন্ধ। তা ছাড়া বাড়ির মারাত্মক মাস্টার ধুরন্ধর সামন্তও পড়াতে আসবে না। সব দিক থেকেই আজ তাদের ছুটি।

এখন বিকেল। দুই ভাই তাদের কোয়ার্টারের সামনে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠে বসে আছে। ডান দিকে নিকু টিকু রুম্পা বুম্বারা বাঁশের গোলপোস্ট বানিয়ে টেনিস বল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ লাগিয়ে দিয়েছে। দেরি করে আসার জন্য কাবুল-টাবুল কোন টীমেই চান্স পায় নি। বাঁ দিকে তাদের বাবার বন্ধু সমীরকাকুর ছেলে বাবিয়া নানারকম কায়দা করে—কখনও হ্যাণ্ডেল ছেড়ে, কখনও দু পা দু'দিকে ছড়িয়ে, কখনও সীটের ওপর শুয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। ভাল সাইকেল চালাতে পারে বলে বাবিয়ার ভীষণ ডাঁট।

সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোকজন সিনেমা হল কি মার্কেটের দিকে যাচ্ছে এখন। রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে যেখানে বিরাট একটা ব্রিজে গিয়ে মিশেছে অনেকে সেদিকেও বেড়াতে চলেছে। আর দেখা যাচ্ছে অগুনতি সাইকেল রিকশা। 'বেল' বাজাতে বাজাতে এধার থেকে ওধারে তারা ছুটোছুটি করছে।

বাঁ হাতের দুটো আঙুল মুখে পুরে মার্বেল গুলির মতো গোল গোল চোখে একবার 'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান' ম্যাচ আর বাবিয়াকে দেখছিল কাবুল। ভাবছিল পকেট থেকে গুলতি বার করে নিকু টিকুদের খেলার বারোটা বাজাবে না বাবিয়ার ডাঁট ভাঙবে!
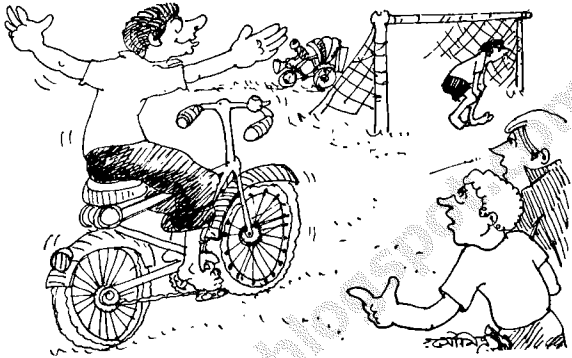
টাবুল কিন্তু এসব ভাবছিল না। সে ভীষণ উসখুস করছিল। একটু আগে কুড়িখানা লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা আর তিনটে আম দিয়ে বাড়ি থেকে টিফিন করে এসেছে। তবু মনে হচ্ছে কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে। দিনরাত টাবুলের খালি খাই খাই। সে জানে খাওয়ার ঘরের আলমারিতে কুড়িটা হিমসাগর আম, দু বাটি ক্ষীর, এক থোকা লিচু, আনারসের জেলির আস্ত একটা শিশি, ঢাউস একটা ফ্রুট কেক রয়েছে। কিন্তু আলমারির চাবিটা থাকে মায়ের আঁচলে। কী করে সেটা সরানো যায়, ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কর মতো পটপট করে ক টা ঘাস তুলে মুখে পুরে ফেলেছিল। চিবিয়েই তক্ষুনি থু করে ফেলতে ফেলতে তার মনে হল, গরুছাগলরা কেন এই সব বিচ্ছিরি বাজে জিনিস খায়!

টাবুল এবার ভাবল, জেলি আর আমটামের ব্যাপারে কাবুলের সঙ্গে পরামর্শ করবে। ওর ব্রেনটা দারুণ। ও ঠিক একটা প্ল্যান বার করে ফেলবে। আর তক্ষুনি দূর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'ডগ শো, ডগ শো, ডগ শো'। বিরাট কুকুর প্রদর্শনী।'

দুই ভাই এধারে ওধারে তাকাতেই দেখতে পেল, ব্রিজের দিক থেকে একটা সাইকেল রিকশা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সীটে দুটো লোক বসে আছে। একজনের হাতে ছোট লাউডস্পীকার। সে সমানে বলে যাচ্ছে, 'যাঁদের ভালো ভালো দিশী বিদেশী কুকুর আছে, তাঁরা দলে দলে 'হীরাপুর ডগ শো'য়ে যোগদান করুন। শুধু কুকুরের চেহারা দেখালেই চলবে না। তাদের নানারকম খেলাও দেখাতে হবে। যে কুকুর সেরা খেলা দেখাতে পারবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পুরস্কার সাত শো

টাকা। তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ শো টাকা। প্রবেশ মূল্য নেই। হীরাপুরে এত বড় কুকুর প্রদর্শনী আর কখনও হয় নি। দলে দলে যোগ দিন। এমন স্বর্ণ সুযোগ হারাবেন না। যোগদানের শেষ তারিখ এ মাসের পনের তারিখ।'

লাউডস্পীকারওয়ালা লোকটার পাশে যে বসে আছে সে রাস্তার লোকজনের হাতে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে। নিশ্চয়ই হ্যাণ্ডবিলগুলোতে 'ডগ শো'য়ের ব্যাপারটা লেখা আছে।

গোল গোল চোখে খানিকক্ষণ লোক দুটোকে দেখল কাবুল। তারপর টাবুলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'একটা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে আয় তো?'

টাবুল জিজ্ঞেস করল 'কেন?'

কাবুল বলল, 'আমরা ডগ শো'তে নাম দেব।'

'ডগ শো'য়ে নাম দিবি!' টাবুল অবাক।

'হ্যাঁ।'

'আমাদের তো কুকুর নেই। 'ডগ শো'য়ে কী দেখাবি তা হলে?'

'আঃ, খালি বড়দের মুখে মুখে তক্কো! যা বলছি তাই কর। কুকুর একটা ঠিক ম্যানেজ করে ফেলব।'

টাবুল জানে, কাবুল না পারে এমন কাজ নেই। কুকুর তো কুকুর, ইচ্ছা করলে সে কুমীর, হাঙর, সাদা হাতি, এমন কি শুশুক পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলতে পারে। আর কিছু না বলে টাবুল উঠে পড়ল। তারপর রাস্তায় গিয়ে একটা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে এল। সেটার একদিকে ইংরেজিতে 'ডগ শো' সম্পর্কে নানারকম নিয়মটিয়ম ছাপানো রয়েছে, আরেক দিকে বাংলায়।

বাংলার দিকটা ভালো করে পড়ে নিল কাবুল। তারপর সেটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে বলল, 'এবার ভন্টিদার কাছে চল।'

টাবুল বলল, 'ভন্টিদার কাছে কেন?'

'ডগ শো'য়ে নাম দিতে যাচ্ছি। এত বড় একটা ব্যাপার। ভন্টিদার হেল্প না পেলে চলবে না।'

'চল—'

দুই ভাই উঠে পড়ল। তারপর ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ওরা ভন্টিদার কাছে পৌঁছুবার আগে তার সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক। তার ভাল নাম লালকমল জোয়ারদার, ডাকনাম ভন্টি। ভন্টিদা আসলে আমাদের মতো জ্যান্ত মানুষ না। মরবার পর মানুষ যা হয়ে যায় সে হল তাই। কাবুল টাবুলের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল পুরীতে। পুরী থেকে ভন্টিদা ওদের সঙ্গে এই হীরাপুরে চলে আসে। সামনে ঐ বিরাট যে ব্রিজটা রয়েছে তার তলায় রেললাইনের ধারে একটা

পড়ো দোতলা বাড়িতে ভন্টিদার থাকবার জায়গা করে দিয়েছে কাবুলরা। আসলে যারা ভন্টিদার মতো তাদের পক্ষে পড়ো বাড়ি, বট শ্যাওড়া কি তালগাছ ছাড়া আর কোথাও থাকা সম্ভব না।

রেললাইনের পড়ো বাড়িটার আশেপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। চারদিকে নানারকম ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কাবুল টাবুল বাড়িটায় ঢুকল। তারপর সোজা দোতলায় উঠে এল।

বাড়িটার দরজা জানালা বলতে কিচ্ছু নেই। দেওয়ালের বালিটালি খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ভাঙাচোরা, মেঝের সিমেন্ট উঠে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে।

ভন্টিদা আসার পর দোতলার দু খানা ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে কাবুলরা। অন্য ঘরগুলো ধুলোবালি এবং অন্য আবর্জনায় বোঝাই।

দোতলায় এসে কাবুল বলল, 'ভন্টিদা আমরা এসে গেছি।'

হাওয়ার ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' তারপর দশ সেকেণ্ডও লাগল না, খানিকটা বাতাস জমাট বেঁধে একটা গোলগাল মধ্যবয়সী লোক হয়ে গেল।

কাবুল বলল, 'একটা ভীষণ দরকারে তোমার কাছে এলাম ভন্টিদা—'

ভন্টিদা বলল, 'দরকারের কথাটা পরে শুনছি। আগে কিছু খেয়ে-টেয়ে নে।'

ভন্টিদা ভীষণ রকমের আয়েসী। ভালো খাবার চাই, শোবার জন্য ভালো বিছানা চাই। মরার পরও এসব অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। কাবুলরা তাই বাড়ি থেকে একটা দামী মাদুর, শতরঞ্জি, তোষক, ফুল-টুল আঁকা নরম জয়পুরী চাদর, ওয়াড়দেওয়া লেপ, মাথার বলিশ, পাশ বালিশ, খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করবার টুথপিক—এমনি অনেক জিনিস দিয়ে গেছে। তবে তার খাওয়া-দাওয়ার জন্য কাবুলদের কিছু করতে হয় না। নিজের খাবার নিজেই সে যোগাড় করে নেয়।

যাই হোক, ভন্টিদা ঘরের কোণ থেকে শতরঞ্জি বার করে মেঝেতে পেতে দিল। তারপর কুলুঙ্গি থেকে তিনটে বড় বড় মাটির ভাঁড় আর বিরাট একটা প্যাকেট বার করে আনল। কাবুল টাবুল তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের বসতে বলে নিজেও বসে পড়ল।

মাটির ভাঁড় তিনটে রাবড়িতে বোঝাই। প্যাকেটে রয়েছে চিকেন কাটলেট, ফিশ রোল আর স্যাণ্ডউইচ। দেখতে দেখতে কাবুল টাবুলের চোখ লোভে চকচক করতে লাগল।

ভন্টিদা বলল, 'হাঁ করে বসে রইলি কেন, খা—'

কাবুল টাবুলরা যখনই এখানে আসে কিছু না কিছু পায়ই। কিন্তু তাই বলে

রাবড়ি? চিকেন কাটলেট ফিশ রোল? খেতে খেতে কাবুল বলল, 'এ সব তুমি পেলে কোথায়?'

ভন্টিদা বলল, 'আজ একটু কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে পার্ক স্ট্রিটে হাজির হলাম। ওখানে বড় বড় দামী দামী সব রেস্তোরাঁ রয়েছে। একটা রেস্তোরাঁ থেকে কাটলেট-টাটলেট তুলে নিলাম। পার্ক স্ট্রিট থেকে গেলাম বড়বাজার। এখানে একটা মিষ্টির দোকান থেকে রাবড়ি নিয়ে এলাম। নিজেকে হাওয়ায় ভ্যানিশ করে রেখেছিলাম তো। কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। তাই জিনিসগুলো আনতে সুবিধে হল।'

টাবুল ফিশ রোলে প্রকাণ্ড কামড় বসিয়ে বলল, 'তোমার কত সুবিধে ভন্টিদা, ইচ্ছে হল তো স্রেফ হাওয়ায় মিশিয়ে গেলে, আবার ইচ্ছে হল তো মানুষের মতো চেহারা নিয়ে সবার সঙ্গে ভিড়ে গেলে। এই রকম যদি আমরা হতে পারতাম, পৃথিবীর সব রেস্তোরাঁ আর মিষ্টির দোকান সাবাড় করে দিতাম।'

ভন্টিদা টাবুলের পিঠে আদর করে টোকা দিতে দিতে বলল, 'দুঃখ করিস না টাবলে, আগে মর। তারপর আমার মতো হতে পারবি। না মরলে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে কাবুলের দিকে ফিরল, 'এবার তোর দরকারী কথাটা শুনি—'

কাবুল বলল, 'দারুণ মুশকিলে পড়ে গেছি ভন্টিদা—'

'কী রকম?'

'ডগ শোয়ে'র ব্যাপারটা বলে গেল কাবুল।

সব শুনে ভন্টিদা বলল, 'এর ভেতর মুশকিলের কী আছে? একটা কুকুর জুটিয়ে 'ডগ শো'য়ে নাম দিয়ে দে—'

'আমাদের যে কুকুর নেই।'

'তোদের না থাক, তোর বন্ধুদের তো আছে।'

একটু ভেবে কাবুল বলল, 'না, আমার বন্ধুদের কারো কুকুর নেই। একজনের বেজী আছে, একজনের টাট্টু, আরেক জনের বাঁদর।'

'তোর বাবার বন্ধুদের নেই?'

কাবুলের মনে পড়ে গেল। সে ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'সমীরণকাকু, মৃন্ময়-কাকু, অশোককাকু আর বিকাশকাকুর কুকুর আছে।'

ভন্টিদা বলল, 'এই তো হয়ে গেল। কাকুদের কারো কাছ থেকে একটা কুকুর শোয়ের দিন ধার নিবি। শো হয়ে গেলে ফেরত দিবি।'

'তা হলে তো হবে না। কুকুরের খেলাও দেখাতে হবে। শোয়ের দিন ধার নিলে কুকুরের খেলা দেখাব কী করে?'

'তবে এক কাজ কর, আগেই ধার নে।'

'তা না হয় নিলাম। কিন্তু কুকুরকে কে খেলা শেখাবে?'

'আমার কাছে নিয়ে আসিস; শিখিয়ে দেব। একসময় আমি ডগ ট্রেনার ছিলাম।'

রাবড়ি-টাবড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাবলু বলল, 'তা হলে আমরা এখন বাবার বন্ধুদের বাড়ি চলে যাই।'

ভন্টিদা বলল, 'যা।'

'কুকুর পেলেই কিন্তু চলে আসব।'

'আচ্ছা।'

কাবুল টাবুল উঠে পড়ল।

কিন্তু ওদের বাবার চার বন্ধু মৃন্ময়কাকু, সমীরণকাকু, বিকাশকাকু এবং অশোক-কাকু—কেউ কুকুর দিল না। সবাই জানালো হীরাপুর 'ডগ শো'য়ে' তারাও নাম দেবে। কাজেই কুকুর ধার দিতে পারবে না।

খুবই ভাবনার কথা। কাবুল টাবুল আবার ভন্টিদার সেই পড়ো বাড়িটায় ফিরে এল। ভন্টিদা মানুষের চেহারা নিয়ে শতরঞ্জির ওপর বসেছিল। কাবুল টাবুলকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, তোরা খালি হাতে চলে এলি! কুকুর কোথায়?'

কাবুল জানালো, তার বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে কুকুর পাওয়া গেল না।

'বড় মুশকিল হয়ে গেল রে।' বলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল ভন্টিদা। আর ভাবতে ভাবতে তার মুখ আলো হয়ে উঠল। এবার সে বলল, 'হয়েছে।'

কাবুল টাবুল একদৃষ্টে ভন্টিদার দিকে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না তাদের। একসঙ্গে দু'জনে বলে উঠল, 'কী ভন্টিদা?'

'ভালো কুকুর যখন পাওয়া গেল না, রাস্তা থেকেই একটা কুকুর ধরে নিয়ে আয়।'

কাবুল টাবুল অবাক। তারা বলল, 'কিন্তু সেগুলো তো নেড়ি কুকুর ভন্টিদা—'

ভন্টিদা বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। নেড়ি কুকুরকেই সাত দিনে এমন ট্রেনিং দেব যে অ্যালসেশিয়ান আর বুলডগকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।'

কাবুল টাবুলের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারা বলল, 'ঠিক তো ভন্টিদা?'

'ঠিক ঠিক, দেখে নিস তোরা।'

পরের দিনই স্কুল ছুটির পর কাবুল টাবুল 'ডগ শো'য়ে নাম দিয়ে এল। ওদের ভালো নাম তাপসকুমার দত্ত আর অরুণকুমার দত্ত। নাম লেখাবার পর থেকে শুরু হল কুকুর খোঁজা।

স্কুল, বাড়ির মাস্টারের কাছে পড়া—এ সবের পর খুব বেশি একটা সময় পায় না কাবুল টাবুল। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে কুকুর ধরার জন্য বেরিয়ে পড়তে লাগল তারা।

কিন্তু ব্যাপারটা যত সোজা ভাবা গিয়েছিল তত সোজা নয়। হীরাপুরে সব মিলিয়ে একশো রাস্তা। আর এই একশো রাস্তায় আছে মোট আটশো বাহাত্তরটা কুকুর। এই

রাস্তার কুকুরগুলো সবাই কাবুল টাবুলকে হাড়ে হাড়ে চেনে। কেননা, এদের ওপরেই গুলতির টিপ প্র্যাকটিশ করে করে দু'জনে হাত পাকিয়েছে। আধমাইল দূরে দুই ভাইয়ের গন্ধ পেলেই ওরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

কাবুল টাবুল, বুঝতে পারল, এভাবে হবে না। ওরা দিনকয়েক রাস্তার কোণে পাঁউরুটি, সন্দেশ, বিস্কুট সাজিয়ে হাতে বকলস আর লোহার লম্বা শেকল নিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল ক'দিন। খাবারের লোভে যদি কোন কুকুর আসে গলায় বকলস পরিয়ে লোহার চেইনে বেঁধে ফেলবে।

দু-একটা কুকুর এলেও খাবারগুলো খেতে গিয়ে কীসের একটা গন্ধ পেল যেন। বোধ-হয় কাবুল টাবুলের। তারপর চমকে উঠে এদিক সেদিক তাকিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়।

ব্যাপার স্যাপার দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ল কাবুল টাবুল। বাবার বন্ধুরা তো ভালো জাতের কুকুর দিলই না, রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কুকুরই যদি না পাওয়া যায়, 'ডগ শো'য়ে নাম দেওয়া যায় কী করে?

অগত্যা দুই ভাই ভন্টিদার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল। সব শুনে ভন্টিদা বলল, দুনিয়ার সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়, নইলে দরকারের সময় উপকার পাওয়া যায় না। গুলতি মেরে মেরে সবগুলো কুকুরকে চটিয়ে রেখেছিস। এখন তারা কেন সাহায্য করবে?'

মুখটা ভীষণ করুণ করে কাবুল বলল, 'তা হলে কী হবে ভন্টিদা, আমাদের কি ডগ শোয়ে নাম দেওয়া হবে না?'

ভন্টিদা বলল, 'দাঁড়া একটু ভেবে নিই।' বলে গালে হাত দিয়ে চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, 'এক কাজ কর, হীরাপুরে সব রাস্তায় কুকুর তোদের চেনে। এখানে হবে না। তোরা ট্রেনে করে পরের স্টেশন সুলতানগঞ্জে চলে যা। ওখানকার কুকুরেরা তোদের চেনে না। সুলতানগঞ্জ থেকে একটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

এছাড়া আর উপায়ও নেই। ভন্টিদার পরামর্শটা তাদের বেশ ভালো লাগল। কাবুল টাবুল আর দেরি করল না, বকলস, লোহার চেইন, পাঁউরুটি, কেক, এইসব নিয়ে সেদিনই সুলতানগঞ্জে চলে গেল। পাঁউরুটি কেক নেবার কারণ আছে; ওগুলোর লোভ দেখিয়ে কুকুর ধরা। কিন্তু সারাদিন সেখানকার চৌষট্টিটা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে একটাকেও ধরা গেল না। হীরাপুরের মতো সুলতানগঞ্জের কুকুরগুলোও কাবুল টাবুলকে দেখামাত্র চোঁ চাঁ দৌড় লাগিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। খুব সম্ভব হীরাপুরের কোন কুকুর এখানে এসে তাদের সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে গিয়েছিল। হয়ত কাবুল টাবুলের চেহারার একটা ডেসক্রুপশানও দিয়ে গিয়েছিল যা থেকে খুব সহজেই তাদের চেনা যায়।

যাই হোক, দুই ভাই এবার আর পরামর্শের জন্য ভন্টিদার কাছে গেল না। নিজেরাই মাথা খাটিয়ে পরের দিন সুলতানগঞ্জের আরো দুটো স্টেশন পর হৃদয়পুরে চলে গেল। আর কী আশ্চর্য, স্টেশন থেকে বেরিয়ে দু'পা যেতে না যেতেই একটা রোগা লোম ওঠা কুকুর কেক এবং পাঁউরুটির লোভে কান আর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাবুল টাবুলের সামনে এসে দাঁড়াল।

কাবুল কুকুরটাকে পাঁউরুটি ছিঁড়ে দিতে দিতে টাবুলকে বলল, 'টাবলে, এটার গলায় বকলস পরিয়ে শেকল বেঁধে ফেল।'

টাবুল খুঁতখুঁত করতে লাগল, 'এই মরকুটে লোম ওঠাটাকে ডগ শোয়ে দেখাবি নাকি?'

'হ্যাঁ। দেখলি তো হীরাপুর আর সুলতানগঞ্জে আমরা কত ঘুরলাম কিন্তু কোন কুকুর আমাদের সাহায্য করল! এটা যখন নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে তখন একেই ডগ শোয়ে নামিয়ে দেব। ওর কাছে আমরা—আমরা—ভালো কথায় কী যেন বলে—ঠিক কথাটা মনে করতে না পেরে একটু ভাবল কাবুল। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ, কৃতজ্ঞ।'

ফেরার ট্রেনে কুকুরটাকে নিয়ে হীরাপুরে নেমেই কাবুল টাবুল ভন্টিদার পড়ো বাড়িতে চলে গেল। বিচ্ছিরি চেহারার এই রকম একটা জন্তুকে দেখে ভন্টিদা বলল, 'এটা কী ধরে এনেছিস!'

কেন কুকুরটাকে ধরে এনেছে, কাবুল জানিয়ে দিল। শুনে ভন্টিদা বেজায় খুশি। বলল, 'এই তো চাই। যার কৃতজ্ঞতা নেই সে মানুষই না।'

ঝোঁকের মাথায় কুকুরটাকে ধরে এনেছে ঠিকই তবু মনে মনে চিন্তা ছিল কাবুলের। বলল, এই লোম ওঠাটাকে ডগ শোয়ে নামানো যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই যাবে। আমার কাছে যখন নিয়ে এসেছিস তখন এটাকে অ্যালসেশিয়ান, ফক্সটেরিয়ার আর বুলটেরিয়ারের জ্যেঠামশাই বানিয়ে দেব। ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। খাইয়ে খাইয়ে দশ দিনের ভেতর ওটাকে কী করে ফেলি, দেখিস।'

'ওকে খেলা শেখাবেন না?'

'শেখাব রে, শেখাব। কিছু ভাবিস নি। শুধু বাড়ি থেকে একটা ডগ সোপ, ব্রাশ একটা টেনিস বল আর সরু একটা বেত দিয়ে যাস। আজ কুকুরটা রেস্ট নিক। কাল থেকে ওর ট্রেনিং শুরু করব।'

পরের দিন রবিবার। সকাল হতে না হতেই কাবুল টাবুল ভন্টিদার আস্তানায় হাজির হয়ে গেল। কাল সন্ধেবেলা অদৃশ্য হয়ে হীরাপুরের বাজারে গিয়েছিল ভন্টিদা। সেখান থেকে দুধ, মাংসের চপ, ছানা, পাঁউরুটি, সন্দেশ—এইসব এনে রেখেছিল। কাবুল টাবুলরা দুই ভাই, ভন্টিদা নিজে আর কুকুরটা—চারজনে মিলে প্রথমে খেয়ে নেওয়া হল।

তারপর সাবান দিয়ে কুকুরটাকে স্নান করিয়ে ব্রাশ দিয়ে গা আঁচড়ে আঁচড়ে পোকা বার করা হল।

এত আদরযত্ন কোনদিন পায় নি কুকুরটা। যে সমানে কেঁউ কেঁউ করে যেতে লাগল।

যাই হোক, স্নানটানের পর গা শুকোবার জন্য ভন্টিদা কুকুরটাকে রোদে বেঁধে রেখে এসে বলল, 'ট্রেনিং স্টার্ট করার আগে ওটার একটা নাম দেওয়া যাক।'

কাবুল টাবুল জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম দেবে?'

চিন্তা-টিন্তা করে ভন্টিদা বলল, 'ইথিওপিয়ান হারকিউলিস। তবে আমরা হারকিউলিস বলেই ডাকব।'

কাবুল বলল, 'এত জায়গা থাকতে ইথিওপিয়ার নাম দিলেন কেন?'

'তোদের আগেই বলেছি আমি ম্যাট্রিক, স্কুলফাইনাল, হায়ারসেকেণ্ডারি দিয়েছি। তিনবারই জিওগ্রাফিতে ইথিওপিয়ার রাজধানীর নাম লিখতে বলেছিল। একবার লিখেছিলাম লণ্ডন, একবার মাদ্রাজ, একবার কাবুল। সাতের বেশি কোনবার জিওগ্রাফিতে পাইনি। তবে ইথিওপিয়াটাকে বড় ভাল লেগে গেছে রে। ডগ শোয়ের সময় তোদের যখন জিজ্ঞেস করবে এটা কী কুকুর, বললি ইথিওপিয়ান ডগ।'

'কিন্তু ওটাকে দেখলেই তো বোঝা যায় ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুকুর।'

'ওটা কি আর এই রকম থাকবে! দেখবি, সাজিয়েগুজিয়ে ওটাকে কী বানিয়ে দিই।' কিন্তু আর দেরি নয়। এবার ট্রেনিং শুরু করা যাক।'

কুকুরটাকে ফের ঘরে এনে ভন্টিদা ভীষণ স্নেহমাখা গলায় বলল, 'বয়, স্ট্যাণ্ড আপ—'

কুকুরটা শুধু বলল, 'কেঁউ—'

'বয় সীট ডাউন—'

'কেঁউ—'

'কিছু ভয় নেই। লক্ষ্মী মানিক আমার। বয় স্ট্যাণ্ড আপ—'

উত্তর পাওয়া গেল, 'কেঁউ—'

এবার বিরক্ত হল ভন্টিদা। বলল, 'আমি খুব নরম লোক, কিন্তু দরকার হলে শক্ত হতে পারি। স্ট্যাণ্ড আপ—'

'কেঁউ—'

'নাঃ, নির্মম না হয়ে উপায় নেই দেখছি।' বলে ঘরের কোণ থেকে কাবুলদের আনা বেতটা নিয়ে এল। তারপর কড়া গলায় বলল, 'স্ট্যাণ্ড আপ—'

বেত-টেত দেখে কুকুরটা বেজায় ঘাবড়ে গেল। ল্যাজটা পেছনের দুই পায়ের ভেতর ঢুকিয়ে ভীতু চোখে আড়ে আড়ে ভন্টিদাকে দেখতে দেখতে বলল, 'কুঁই—'

'দারুণ ঠেটা দেখছি? আর অতি অবাধ্য। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আস্ত বাঁদর হয়ে

উঠেছে! কোন কিছু শেখার জানার ইচ্ছা নেই।' বলেই হুমকে উঠল ভন্টিদা, 'স্ট্যাণ্ড আপ—'

কুকুরের জবাব এল, 'কুঁই—'

কী ভেবে ভন্টিদা এবার বলল, 'বুঝেছি, তোর এখন 'স্ট্যাণ্ড আপ' 'সিট ডাউন' করতে ভাল লাগছে না। ঠিক আছে অন্য খেলাই শুরু করা যাক।' বলে কাবুলদের আনা সেই বলটা বার করে ঘরের আরেক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বয়, বলটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ব্রিং দি বল—'

কুকুরটার লেজ আরো ঢুকে গেল। চোখ নামিয়ে সেটা শুধু বলল, 'কুঁই—'

এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল ভন্টিদা। গর্জন করে বলল, 'অতি বেয়াদব কুকুর তো! বড়দের সম্মান দিতে জানে না! গো—'

'কুঁই—'

'যাও বলছি—'

'কুঁই—'

যাই হোক, এইভাবে কুকুরের ট্রেনিং চলতে লাগল। দিন সাতেক পরেও দেখা গেল ভন্টিদা যখন থেকে শুরু করেছিল ঠিক সেইখানেই পড়ে আছে।

তার মানে ভন্টিদা যখন বলে, 'স্ট্যাণ্ড আপ,' কুকুরটা বলে, 'কেঁউ—'। ভন্টিদা যখন বলে, 'সীট ডাউন,' কুকুরটা বলে, 'কুঁই।' বল ছুঁড়ে আনতে বললে আনে না, ল্যাজটা শুধু তার পেছনের দুই পায়ের ভেতর ঢুকে যায়।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার দেখা গেল। ভন্টিদা কুকুরটাকে সত্যিকার হারকিউলিস বানাবার জন্য প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছিল। মাছ, দুধ, ফল, আইসক্রীম, মাংস, ছানা—এমনি নানা জিনিস। কিন্তু ভন্টিদার তর্জন গর্জনের জন্যই কিনা কে জানে, ভয় পেয়ে সেটা সারাদিন সিঁটিয়ে থাকে। অমন ভালো ভালো জিনিস ছুঁয়েও দেখে না। ফলে সেটা আরো রোগা আরো ঘিয়ে ভাজা হয়ে যেতে থাকে।

দেখেশুনে ঘাবড়ে গেল কাবুলরা। বলল, 'এটা খেলা শিখল না এবং গায়ের লোম আরো উঠে গেল। এটাকে নিয়ে কী করে ডগ শোয়ে যাব?

ভন্টিদা হাত তুলে বলে. 'কুছ পরোয়া নেই। তোদের ডগ শো কবে?'

'পরশু বিকেল।'

'তার মধ্যে হারকিউলিসকে কী বানিয়ে দিই দেখিস।'

কাবুল টাবুল আর কিছু বলল না। তবে ভন্টিদার কথায় খুব একটা ভরসা পেয়েছে বলে মনে হল না।

দেখতে দেখতে ডগ শোয়ের দিন এসে গেল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কাবুল

টাবুল ভন্টিদার কাছে চলে এল। এসেই অবাক। ভন্টিদা লাল নীল সবুজ হলুদ এমনি নানা রঙের প্রচুর লোম, চমৎকার নতুন বকলস, আটা, ক্লিপ, কুকুরদের মুখ আটকাবার জন্য নাইলনের জাল এমনি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছে।

কাবুলরা জিজ্ঞেস করল, 'এসব দিয়ে কী হবে ভন্টিদা?'

ভন্টিদা বললেন, 'হারকিউলিসকে সাজানো হবে।'

'এগুলো পেলেন কোথায়?'

'কাল সন্ধেবেলা তোরা চলে যাবার পরে কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। চিৎপুরে একটা মেক আপের দোকানে ঢুকে এগুলো নিয়ে এসেছি। ওরা নানা রকম সাজের জিনিস বিক্রি করে। তোরা হারকিউলিসকে ধর। আমি ওকে সাজাতে শুরু করি।'

কাবুল হারকিউলিসের গলার দিকটা ধরল, টাবুল ধরল কোমর। ধরে তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখল। আর ভন্টিদা তার মুখে নাইলনের জাল পরিয়ে আঠা আর ক্লিপ দিয়ে সারা গায়ে লোম লাগিয়ে দিতে লাগল।

দু' তিন ঘণ্টা পর হারকিউলিসকে আর চেনা গেল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বড় বড় লাল নীল হলুদ সবুজ লোম ঝালরের মতো দেখাচ্ছে। ঘিয়ে ভাজা লেজটা সাদা লোমে এখন ঢাকা।

সাজগোজ হয়ে যাবার পর গলায় নতুন বকলস পরিয়ে ভন্টিদা বললেন, 'এখন আর হারকিউলিসকে নেড়ি কুত্তা বলে মনে হচ্ছে?'

'না ভন্টিদা, সত্যি তুমি ম্যাজিক জানো।' হারকিউলিসের এই নতুন বাহার দেখে কাবুল টাবুল বেজায় খুশী। তবু তারা জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তার নেড়ি কুকুরকে তো ইথিওপিয়ান হারকিউলিস বানিয়ে দিলে। কিন্তু ও যে কোন খেলাই শিখল না। ডগ শোয়ে গিয়ে হারকিউলিস কী দেখাবে?'

ভন্টিদা বললেন, 'সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি? কাছে আয়, তোদের কানে কানে বলি—' কাবুল টাবুল এগিয়ে এলে নীচু গলায় তাদের কিছু বললেন।

শুনতে শুনতে হাসি ফুটল দুই ভাইয়ের মুখে। তারা লাফিয়ে উঠল, দারুণ হবে।'

'বলছিস!'

'হ্যাঁ ভন্টিদা।'

'তা হলে বিকেলে ডগ শোয়ের আগে ভালো ড্রেস করে চলে আসিস। তখন হারকিউলিসকে নিয়ে যাবি। আমিও তোদের সঙ্গে যাব।'

'কিন্তু তোমাকে যে সবাই দেখে ফেলবে।'

'আরে বাবা, যাতে দেখতে না পায় সেইভাবেই যাব।'

'বুঝেছি।'

বিকেলে ফুলপ্যান্ট টাইফাই পরে কাবুল টাবুল হারকিউলিসকে নিতে এল।

ভন্টিদা বললেন, 'ওকে কোলে নিয়ে নে।' বলতে বলতে তার হাত পা আস্তে আস্তে গা থেকে আলগা হয়ে খসে গেল। তারপর কুয়াশার মতো ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

একটু পর হাওয়ার ভেতর থেকে ভন্টিদার গলা ভেসে এল, 'চল এবার।'

সবাই বেরিয়ে পড়ল।

ডগ শোয়ের জন্য হীরাপুরের খেলার মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছিল। প্যাণ্ডেলটার চারদিক ঘেরা তবে ওপরটা খোলা। সেখানে একদিকে বিরাট মঞ্চ, অগুনতি কুকুর পর পর বসে আছে। কুকুরগুলোর পেছনে তাদের মালিকেরা দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরগুলোর নানারকম চেহারা। কোনটা হোঁতকা, কোনটা বেঁটে, কোনটা সরু লিকলিকে কোনটা এত্তটুকুন। কোনটার থ্যাবড়া গম্ভীর মুখ, কোনটার বেজায় বিরক্ত চোখ। কোনটার দুষ্টু দুষ্টু চাউনি। নামও তাদের নানারকম—বুলটেরিয়ার, ফক্সটেরিয়ার, পিকীনীজ, অ্যালসেশিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি। কুকুরদের উল্টোদিকে সারি সারি চেয়ারে হীরাপুরের সব লোক বসে আছে।

কাবুলরা প্যাণ্ডেলে ঢুকতেই একটা লোক তাদের সঙ্গে করে মঞ্চের কাছে নিয়ে গেল। অন্য একটা লোক খাতা পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কুকুরের নাম?'

কাবুল বলল, 'ইথিওপিয়ান হারকিউলিস।'

নাম টুকে নিয়ে লোকটা বলল, 'কুকুর নিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়াও—' বলে মঞ্চটা দেখিয়ে দিল।

কাবুলরা মঞ্চে গিয়ে হারকিউলিসকে বসিয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্য কুকুরেরা হারকিউলিসের মতো এমন আজব চেহারার জন্তু বোধ হয় আগে আর দেখেনি। তারা একসঙ্গে ভৌ ভৌ করে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। হারকিউলিসের মুখে নেট পরানো থাকায় সে ঠিক উত্তর দিতে পারল না, কুঁই কুঁই করে একটু আওয়াজ করল শুধু।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডগ শো শুরু হয়ে গেল। একজন মাইকে বলতে লাগল, প্রথমে তরুণকুমার সেন তাঁর বুলডগের খেলা দেখাবেন।

একটা লোক তার বিরাট বুলডগ নিয়ে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর তার গলায় একটা কাগজ বেঁধে দর্শকদের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা ওঁকে দিয়ে এসো।' বুলডগটা তক্ষুনি তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাততালির শব্দ উঠল।

এইভাবে পিকীনিজ, ফক্সটেরিয়ার, অ্যালসেশিয়ান, গ্রেহাউণ্ড এমনি নানা কুকুর

একের পর এক খেলা দেখিয়ে গেল। কেউ আগুনের চাকার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে গেল। কেউ পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুপা জোড়া করে দর্শকদের নমস্কার করল। কেউ যোগাসন করে দেখাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শেষে ডাক পড়ল কাবুল টাবুলের। দুই ভাই হারকিউলিসকে নিয়ে মঞ্চের সামনের দিকে চলে এল। কাবুল হারকিউলিসকে কোলে নিয়ে বলল, 'আমার এই কুকুর এমন খেলা দেখাবে যা পৃথিবীর আর কোন কুকুর কোনদিন দেখাতে পারেনি, পারবেও না। এখুনি এটাকে আমি ওপরে ছুঁড়ে দেব। ওটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আকাশে মিলিয়ে যাবে। দশ মিনিট পর আবার ওটা ফিরে আসবে!' বলে গলা নামিয়ে আস্তে করে ডাকল, 'ভন্টিদা—'
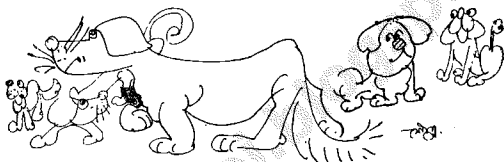
হাওয়ার ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'আমি রেডি। ছুঁড়ে দে।'

কাবুল হারকিউলিসকে ছুঁড়ে দিল। হাওয়ার ভেতর থেকে তাকে লুফে নিলেন ভন্টিদা।

দর্শকরা দেখতে লাগল ইথিওপিয়ান হারকিউলিস প্যাণ্ডেলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক দশ মিনিট বাদে আবার সেটা মঞ্চে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে যে হাততালি শুরু হল তা থামতে কুড়ি মিনিট লেগে গেল। সত্যি এমন কুকুরের খেলা কেউ কখনও দেখেনি।

এক সময় মাইকে জানানো হল, 'ডগ শোয়ের ফার্স্ট' প্রাইজটা পেয়েছে কাবুল টাবুলের ইথিওপিয়ান হারকিউলিস।

ভন্টিদা অর্থাৎ ভূতের আইডিয়াটা পেয়েছি একটা বিদেশী গল্প থেকে।

বাঁদরের কৃতজ্ঞতা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আমাদের গনু ইস্কুলে পড়তে পড়তে অনেকবার পালিয়েছিল। শেষ যেবার এক মাস্টার মশাইকে মেরে একেবারে জার্মানীতে পালিয়ে যায়—সে গল্প এর আগে আমি লিখেছি। এ তার আগের একবারের কথা।

বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল অল্প কিছু টাকা নিয়ে। গিছল বৃন্দাবন। বৃন্দাবন কেন? আর কোন জায়গা ওর তত জানা ছিল না। বৃন্দাবনে নাকি দু ঘণ্টা 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' করলে একটা সিধে আর কিছু পয়সা পাওয়া যায়—সেই ভরসাতেই গিছল। তেমন 'থ্যাটে'র জোর দেখলে কোন বৈরাগীর দলে ভিড়ে গিয়ে সাধু হবে, এ মতলবও ছিল।

কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি। লোকগুলোকে তেমন পছন্দ হবার কথা নয়, কারণ তারা বেশির ভাগই বড় ভক্তির ভান করে—জায়গাটাও ভাল লাগল না, মাছ মাংস পাওয়া যায় না বলে। পেঁড়া রাবড়ি ভাল জিনিস—তবে বারোমাসই কি তাই বলে ঐ সব খেয়ে থাকা যায়?

সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখতে হয়েছিল, তাঁরাও টাকা পাঠিয়েছিলেন। তবে সে ঐ গাড়ি ভাড়ার মতোই, তার সঙ্গে আর মাত্র দুটি টাকা বেশী, পথে খাওয়ার খরচা।

বিকেলে বৃন্দাবন থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে চেপে মথুরা এল। সেখান থেকে মাঝারি লাইনের গাড়িতে চেপে হাতরাস যেতে হবে—হাতরাস থেকে বড় লাইনের গাড়ি ধরলে তবে হাওড়া বা কলকাতা।

কোনই অসুবিধে হবার কথা নয়। গাড়ির সময় সব জেনে নিয়েছিল ঠিক ঠিক, একটা গাড়ি থেকে নামলে এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্য লাইনের গাড়ি পাবে। অসুবিধে হ'ল ওর বিখ্যাত ঘুমের জন্যে। যেখানে সেখানে যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল গনুর। মথুরাতে গাড়ি ধরে—সেই সন্ধ্যাবেলাতেই এমন ঘুমিয়ে পড়ল যে কখন হাতরাসে ট্রেন এসেছে, কানের কাছে কতকগুলো লোক 'পান বিড়ি সিগারেট' 'চা গরম' হেঁকে গেছে কিছুই শুনতে পায় নি। এই মেজো লাইনের গাড়িখানা হাতরাসে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়ায়। তারপর অন্যদিকে চলে যায়। ফলে যখন হঠাৎ একবার ওর হুঁশ হ'ল, চেয়ে দেখল অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটেছে—কোন শহর কি লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

ওর কেমন খটকা লাগল। এত দেরি তো হবার কথা নয়। গনু পাশের বিরাট পাগড়ি-পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, 'মেঢ়ু কিৎনা দুর আউর?'

মেঢ়ু হ'ল হাতরাসের স্থানীয় নাম।

'মেঢ়ু ?' লোকটি তো অবাক, 'মেঢ়ু তো কব্বই ছোড়কে আয়ী ই গাড়ি!'

'ছোড়কে আয়ী !' গনুর ঘুমের ভাব তখনও কাটেনি। সে বোকার মতো চেয়ে থাকে।

'আউর কেয়া ! আব্ তো "রতি-কি-নাগলা" আতা হ্যায়।'

বলতে বলতেই একটা নিচু প্ল্যাটফর্ম-ও'লা ছোট্ট স্টেশন এসে গেল। গনু আর কিছু ভাবারও সময় পেল না, হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল সেখানেই।

নিহাতই একরত্তি স্টেশন, আর কেউই নামল না। স্টেশনেও কেউ নেই, একটিই মাত্র বাবু দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই গাড়ি ছাড়ার ফ্ল্যাগ নাড়লেন, তারপর টিকিট নেবার জন্যে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অবিশ্যি যাত্রীই নেই…তা টিকিট দেবে কে !

গনু তাঁকে গিয়েই ওর বিপদের কথাটা জানাল, 'মেঢ়ু কিৎনা দূর' তাও জানতে চাইল।

সে বাবুটি গোড়ায় বোধ হয় একটু ভয় পেয়ে থাকবেন, কেন না এমন ফরসা ধুতি পাঞ্জাবি পরা কেউ বিশেষ ওখানে নামে না। কিন্তু অন্ধকারেই (প্ল্যাটফর্মে কোন আলো নেই) ভাল ক'রে চেয়ে দেখে যখন বুঝলেন নিহাতই ছেলেমানুষ, তখন বললেন 'য়্যয়সা তো কোই খাস দুর নেই হ্যায়। করিব সাত মিল হোগা—ঘণ্টাভর নেহি তো দেড় ঘণ্টা মে পৌঁছ যা সাকোগে, লেকিন রাস্তা মে বহুত ডাকু কি ডর হ্যায়—লাইন কে দোনো তরফ আঁধিয়ার মে বৈঠা রহতা। কোই রাহী যানে সে হি জান মারকে লুঠ লেতা।'

গনু জানাল, তার কাছে তো কিছুই নেই, এক টাকা আর ক আনা পয়সা মাত্র। ডাকু কি নেবে ? স্টেশনবাবুটি হেসে উত্তর দিলেন, ওরা আগে তো মানুষটাকে মারবে, তারপর তো দেখবে কি আছে না আছে। আর এক টাকা তো অনেক, এক পয়সা পেলেও এইসব জাঠ ডাকুরা অনেক পেয়েছি মনে করে। না না, ওসব চেষ্টা ক'রো না। এই 'লাটফর্ম' পর শুয়ে থাকো, ভোর হ'লে সামনের মেঠো পথ দিয়ে চলে যেয়ো। একটা ছোট জঙ্গল পড়বে, সেটুকু পার হয়েই, বড় চওড়া শাহী সড়ক। ঐ পথে এই সময় অনেক গেঁহুর গাড়ি যায়। একটা গাড়িকে দুটো একটা পয়সা কবুল করলেই তোমাকে উঠিয়ে নেবে। ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক তালাও আছে, সেখানে মুখ হাত ধুয়ে নিও—চাই কি আস্নানও ক'রে নিতে পারো। তোফা চলে যাবে। এ গাড়ি তো পাবে না। দু পহরমে কলকাত্তার গাড়ি আসে। সে গাড়ি পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

কী আর করবে গনু। শুয়ে না হয় রইল এই 'লাটফর্মের' কাঁকরের ওপরই। সঙ্গে একটা চাদর আছে, সেটা পেতে শোওয়া চলবে—কিন্তু খাবে কি ? খিদেয় তো নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে।

বলতে লজ্জা করে—তবু বলতেই হ'ল। স্টেশনের মাষ্টারমশাই ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এখানের বাজার অনেক দূর, আর সেখানে চুড়া গুড় ছাড়া কিছু মেলেও না। সেও, অনেকক্ষণ সেসব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আমার খানাও খেয়ে ফেলেছি, আমরা সন্ধ্যেতেই খাই, তবে—দাঁড়াও আমার বাড়ি থেকে কিছু 'মিঠা' দিয়ে গেছে—তাই একটু আছে। খাবে তো খাও। জলও এক লোটা দিতে পারি।'

তিনি স্টেশন ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা ময়লা ন্যাকড়াতে বাঁধা সেই মিঠা নিয়ে এলেন। খুলে দেখল গনু—ওরা যাকে কটকটি বলে তাই, বেসমের মোটা মোটা ঝুড়ি-ভাজার মতো—কলকাতার বড়বাজারে বলে 'গাঁঠিয়া'—সেইগুলো গুড়ে পাক করা, শুখা শুখা। মুখে ফেলে দেখল দাঁত ভেঙে যায় এত শক্ত—তবু কি আর করবে, তাই যথাসাধ্য কয়েকটা খেল। একলোটা জল—একটু ফুটো লোটা বা ঘটিতে এনে ওর সামনে বসিয়ে রেখে মাষ্টারমশাই ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একা থাকেন—কে কি মতলবে এসেছে তা তো জানা নেই, ভয় তো পেতেই পারেন। ফুটো লোটা, ওটা যদি নিয়ে যেতে চায় তো যাক, যদিও বলে গেলেন—জল খাওয়া শেষ হলে ঐ টিকিট ঘরের খোপে যেন বসিয়ে রেখে যায়।

চাদর পেতে শুলো গনু, তবে ঘুম হ'ল না আর। প্রধান কারণ ভয়। দুদিকে কি সব অন্ধকার অন্ধকার গাছপালা, তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী জ্বলছে—সবটা জড়িয়ে গা ছমছম করে। ওদিকে দূরেও যতদূর নজর চলে বড় বড় গাছ আর তার ছায়া; ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত। চারদিকে শুধুই যেন ভূতের খেলা। চোখ বুজে শুয়ে রইল, সে ঐ ভয়ের জন্যেই, চোখ চাইলেই মনে হবে—কত সব কারা সব যেন চারদিকে নড়ে বেড়াচ্ছে, তারা চেয়ে আছে ওর দিকেই।

এই ভাবে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে বলেই মনে হতে লাগল যেন রাত আর ফুরোচ্ছে না। একটা কি গাড়ি গুমগুম ক'রে চলে গেল—স্টেশন কাঁপিয়ে, শেষের দিকে একটা মাল গাড়িও, কোনটাই এখানে থামে না, তাই মাষ্টার মশাইয়েরও ঘর থেকে বেরোবার দরকার নেই। তবে মাঝে মাঝে টেলিফোন আসছে—তাই যা একটু ভরসা, মানে উনি জেগেই আছেন।

চারটে নাগাদ আকাশ একটু ফরসা হতেই যেন প্রাণ ফিরে পেল গনু, উঠে বসে চারি-দিক তাকিয়ে দেখল—জায়গাটা যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল ততটা নয়। গাছপালাও আছে মাঠও আছে। চাষবাস হয়।

সে আর একটু বসে বেশ খানিকটা আলো ফুটলে উঠে পড়ল একেবারে।

কটকটির পুঁটলিটা ফেলল না। চাদর আর ওর কাপড় জামার সঙ্গে ওটাও গুছিয়ে নিয়ে সামনের জঙ্গলের মধ্যেকার কাঁচা পায়ে-চলা রাস্তাটা ধরল।

অনেকটা দূর গিয়ে সেই পুকুরটা দেখতে পেল। মাষ্টারমশাই যা বলেছিলেন, মুখ হাত ধোওয়া নয়, স্নানই সেরে নিল একেবারে। তারপর ভিজে গামছাকে ঘাসের ওপর মেলে দিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে সেই দাঁতভাঙা মিঠাই একটু খেতে চেষ্টা করল। দাঁত ভাঙে ভাঙুক—পেটের জ্বালার কষ্ট আরও বেশী—যা হোক কিছু না খেলে চলছে না।

খেতে খেতে হঠাৎ নজরে পড়ল, সামনের একটা বড় কি গাছের ওপর থেকে গোদা বাঁদর একটা ওকে লক্ষ্য করছে। এ লক্ষ্য করার মানে সে বোঝে—বৃন্দাবনে এমন দৃশ্য অনেক দেখেছে, এখুনি ঝপ করে লাফিয়ে পড়বে আর কাপড়শুদ্ধ মিষ্টি গাঁটিয়াগুলো নিয়ে যেতে গিয়ে সব ছড়িয়ে ফেলে দেবে। বাঁদরটা দু একটা চটপট মাটি থেকে তুলে খাবে—কিন্তু ওর আর খাওয়া হবে না।

কী মনে হ'ল, হাতছানি দিয়ে গনু বাঁদরটাকে ডাকল। ডাকতেই ভাল ছেলের মতো সে নেবে এসে সামনে বসল বেশ ভক্তিযুক্ত হয়ে। গনু হাত বাড়িয়ে একটা মিষ্টি দিতে মানুষের মতোই হাত থেকে টেনে নিল আর যেন খুব উদাসীনভাবে কট-কট শব্দ করে খেতে লাগল।

তারপর থেকে ঐ ব্যাপারই চলল। গনু একটা করে নেয়, ওকে সেই সঙ্গে একটা দেয়! বানরটা সুশীল ছেলের মতোই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে যেন। ইচ্ছে করলেই সবগুলো কেড়ে নিয়ে পালাতে পারত কিন্তু তা করল না। পুঁটলির খাবার শেষ হ'তে গনু যখন খালি ন্যাকড়াটা দূরে ফেলে দিয়ে বলল, 'যাঃ, আর কিছু নেই, সব শেষ!' তখন ও নীরবে উঠে গিয়ে পুকুর থেকে একটু জল খেয়ে আবারও গাছে উঠে গেল।

গনুরও আর অপেক্ষা করার কারণ ছিল না। গামছা শুকিয়ে গেছে। সেও পুকুর থেকেই দু আঁচলা জল খেয়ে আবার রওনা দিল।

বরাত ভাল—বড় রাস্তায় পড়তে সামনেই দেখতে পেল একটা গমের গাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করে চলেছে। এখানের গমের গাড়ি বড় অদ্ভুত—গম কেন, সব ফসলই এইভাবে নিয়ে যায়—খুব উঁচু চৌবাচ্ছার মতো বিরাট একটা খোল, দরমার দেওয়াল দেওয়া, তাতেই বস্তা ক'রে নয়, এমনি গমই ঢেলে নিয়ে যায়। ফলে অনেক গম ধরে তাতে, বস্তাও লাগে না। যেখানে নামায় একদিকের বেড়ার মতো দোর খুলে গাড়িটা সেই দিকে কাত ক'রে দেয়—মোষ কি গরুর জোয়াল খুলে—সব গম (বা ছোলা কি যব—যা নিয়ে যায়) সেখানে পাতা একটা চট কি চাটাইতে পড়ে যায়।

গাড়িটা আপনমনেই চলেছে, গাড়োয়ান গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গনু গিয়ে ঠেলে তুলে বলল, 'আমাকে নিয়ে যাবে? মেড়ু পর্যন্ত? পয়সা দোব।'

সে চোখটোখ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ওকে অনেকক্ষণ। বোধহয় একটু সন্দেহ হল। এই একটা চ্যাংড়া ছেলে মোটে সাত মাইল পথ হেঁটে না গিয়ে পয়সা খরচ করে গাড়ি চেপে যেতে চায়—এ আবার কি কথা। এত পয়সা পাবে কোথায়? বাকতাল্লা দিচ্ছে না তো?

সে বলল, 'দো আনা লাগে গা। দেনে সাকো গে।'

দু আনা মানে এখনকার বারো নয়া পয়সা।

গনু বললে, 'দেগা।' বলে নিজেই তরতরিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে গাড়ির ওপর চড়ে বসল।

'ইৎনা পয়সা হ্যায় তুমহারে পাস! দেগে—!'

গনুর দুর্মতি সে বুক পকেট থেকে একটা টাকা আর পকেট থেকে, যা ছিল দশ-বারো আনা পয়সা বার করে দেখাল ওকে।

ব্যাস, আর যায় কোথায়। সে হাত পেতে বেশ কড়া গলায় বললে, 'দেও হামকো।'

গনু ভাবল ভাড়ার পয়সাটাই ও আগাম চাইছে। সে একটা দোয়ানি বার ক'রে দিতে গেল, গাড়োয়ান চোখটোখ পাকিয়ে বলল, উয়ো কেয়া দেতা হ্যায়? সব দেও।'

'কাহে দেগা সব।' গনুও হিন্দীতে বলার চেষ্টা করে, যো কেরায়া হ্যায় উয়ো লে লেও। হামারা পয়সাকা দরকার নেহি হ্যায়?'

লোকটা কোথা থেকে সাঁ করে একটা কুড়ুল বার করল। বেশ বড়সড় কুড়ুল। সেটা গনুর মাথার ওপর তুলে বলল, 'পয়সা রুপেয়া সব দে দেও, দেকে উতার যাও, নেহি তো একদম জানসে মার ডালেগা।'

তার যা চোখের চেহারা, এমনিতেই বোধহয় গাঁজা খায়—চোখ লাল, সে চোখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এক পয়সার জন্যেও এ লোকটা মানুষ খুন করতে পারে।

অগত্যা—কী আর করে—সে পয়সাগুলো গুছিয়ে পকেট থেকে বার করতেই গেল—

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল, সেখানটায় মাথায় ওপর একটা বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল ডালপালা মিলে। সেদিকে কেউ লক্ষ্য করেনি, গাছ আছে কিনা তাও দেখেনি—সে অবস্থাও ছিল না কারও, একপক্ষে বিষম আতঙ্ক আর একপক্ষে নিদারুণ লোভ। কিন্তু সেই গাছের ওপর থেকে আর একটি প্রাণী লক্ষ্য করেছিল।

সে সেই বাঁদরটি।

যাকে হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে খাইয়েছে গনু একটু আগে।

সে হয়ত এই ধরনের একটা বিপদ আসতে পারে ভেবেই নিয়েছিল, কিংবা গনুর ভদ্রব্যবহারে ওর মধ্যেই একটু ভালবেসে ফেলেছিল বলে—সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসেছিল। সে এবার মারল এক লাফ ওপর থেকে একেবারে—গাড়োয়ানটার ঘাড়ের ওপর পড়ে চোখের নিমেষে ওর একটা কান কেটে নিস খানিকটা, দাঁত দিয়ে—তারপর মারল কষে দুটি চড়।

বুঝতেই পারছ গাড়োয়ানের অবস্থা।

যাকে বলে "বাপরে মারে" বলে চিৎকার করা—সেই ভাবে 'আরে পিরেত বা, পিরেত বা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দিশেহারা হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল, 'পিরেত' বা ভূতের হাত থেকে রেহাই পেতে।

বানরটা ধীরে সুস্থে কুড়ুলটা কুড়িয়ে গনুর হাতের কাছে ফেলে দিয়ে—বলদ দুটোকে অল্প অল্প ল্যাজ মুষড়ে দিল, যেমন গাড়োয়ানরা দেয়—তারা অত কি বোঝে, চলবার ইশারা পেয়েছে চলতে শুরু করল আবার। ক্যাচ ক্যাচ শব্দ উঠল গাড়ি থেকে।

বাঁদরটা বাকী রাস্তা পেরিয়ে ততক্ষণে আবার গাছের গুঁড়ির কাছে চলে গেছে। সেখান থেকে হাত দিয়ে যেন পিছনের দিকটা দেখিয়ে গাছে উঠে গেল আবার।

পিছন দিকে চেয়ে দেখল আরও দুতিনটে এমনি গমের গাড়ি আসছে। বোধহয় বলতে চেয়েছিল, ইচ্ছে করলে ও গাড়িও চড়তে পারো।

কিন্তু গনু তা করল না। জানে ভূতের ভয়ে কানকাটা গাড়োয়ান আর এখন কাছেই আসবে না। সে হাত নেড়ে বাঁদর বন্ধুকে একটা ধন্যবাদ জানাবার ভঙ্গী করে ওপর থেকে নেমে গাড়োয়ানের জাঃগায় বসল। গাড়ি চালানোর কৌশলটা শিখে নিয়েছে এর মধ্যে। সে নিজেই চালিয়ে যাবে।

আর যদি কেউ আসে? কিংবা সেই গাড়োয়ানটা?

কুড়ুলটা তো রইলই। আসুক না কে আসবে।

আশ্চর্য মাঝি

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবার সঙ্গে রাজের একটা ঝগড়া হয়ে গেল। রাজ ক্লাশ ফোরে উঠবে। বেশ বড় হয়ে গেছে। তাছাড়া রূপ ওর ছোট ভাই, জিৎ ওর খুড়তুতো ভাই, সেও ওর চাইতে ছোট, গৌহাটি থেকে বেড়াতে এসেছে। সবার সামনে বাবার রাজকে কান ধরে কথা বলাটা ঠিক কি ?

বড়রা যেন কী ! তারা বিচার করে না, জানতে চায় না। সোজা এসে মেরে দেয়। কান ধরে সবার সামনে। এমন কি তার থেকে বয়সে ছোটদের সামনেও। রাজের চোখ বেয়ে জল নেমে এল। আর তখনি ও ঠিক করে ছিল, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। বাড়ি থেকে চলে যেতে হলে কিছু জামাকাপড় নেওয়া দরকার। কিন্তু সেটা করতে গেলে মুশকিল। মা জেনে যাবে। ও তাই লাট্টু, লেত্তিটা শুধু নিল। মা কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। জিৎ আর রূপ অন্য কোথাও আছে। ও দরজাটা খুট করে খুলে বেরিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে জিৎ আর রূপও ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল। বললে, কোথায় যাচ্ছিস রে ? আমরাও যাব। রাজ দেখলো মহা বিপদ ! এই দুটো বাচ্চাকে নিয়ে কি বাড়ি থেকে পালানো যায় ? অথচ ওদের না নিয়ে গেলে ওরা চেঁচাবে, মার ঘুম ভেঙে যাবে। তাই ওদের দুজনকেই নিতে হ'ল। তিনতলা থেকে একতলায় নেমে রাস্তায় পড়ে রাজের ভাবনা হ'ল কোথায় যায় ?

রাজ রাগ করেছে, বাড়ি থেকে পালাবে ঠিক করেছে কিন্তু পালানো যে এত শক্ত কে জানতো ? ওরা তখন নদীর দিকে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। ওদের বাড়ির থেকে গঙ্গা বেশি দূরে নয়। সুতরাং ওরা কিছুক্ষণ বাদে এসে পড়ল গঙ্গার ধারে।

গঙ্গার ধারটা ভারী সুন্দর। ওরা তিনজন গিয়ে বসলো একটা বাঁধানো বেঞ্চির ওপর। সামনে দিয়ে নৌকা চলছে। জিৎ বলে চলেছে, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রতে কত তফাত। রূপ চুপ করে আছে তবে মাঝে মাঝেই বলছে, আমার কিন্তু একটু পরে খিদে পাবে। রাজের মনে হতে লাগলো এই ছোট ভাইগুলোর জ্বালায় বাড়ি থেকে পালিয়েও নিষ্কৃতি নেই।

এমন সময় ঘাটে একটা নৌকা এসে থামলো। নৌকাটা ভারী সুন্দর দেখতে। নীল লাল হলুদ রঙ। নৌকা থেকে মাঝি নেমে এল। মাঝির গায়ে একটা বিচিত্রবর্ণের আলখাল্লা। রোগা লম্বা চেহারা। মুখে সাদা দাড়ি। বুকের অনেকটা অবধি নেমে এসেছে। মাঝি এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বললো, রাজ মহারাজ, জিৎ মহারাজ, রূপ মহারাজ আপনাদের বান্দা হাজির। রাজ জানত বান্দা মানে যে হুকুম মেনে চলে। সে বললো, আপনি আমাদের বান্দা হলেনই বা কিভাবে, আর কুর্নিশ করলেনই বা কেন, নামই-বা জানলেন কেমন করে? মাঝি আবার কুর্নিশ করে বললো, পাতালের রাজা আমায় পাঠিয়েছেন। তিনিই আমায় আপনাদের নাম বলেছেন। এই যে নদী দেখছেন তার তলায় একটা পথ আছে। আর তার ভেতর দিয়ে যেতে হয় পাতাল সাম্রাজ্যে। সেখানকার রাজামশায় ছোট ছেলেমেয়েদের দুঃখ একদম দেখতে পারেন না। তোমরা গম্ভীরভাবে বসে আছ দেখে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছে। তাই তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে আমার নৌকা দেখছো এতে চড়িয়ে তোমরা যেখানে যেতে চাও সেইখানে নিয়ে যাব। রাজ, রূপ জানে অচেনা লোক যদি এইভাবে কোথাও নিয়ে যেতে চায় যাওয়া উচিত নয়। ছেলেধরা দেশে আছে। মা তাকে পইপই করে বারণ করে দিয়েছে কোন অচেনা লোকের সঙ্গে কোথাও যাস নে। কিন্তু জিতের মা বোধ হয় বারণ করে নি। তাই জিৎ বলে উঠলে, যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পার? মাঝি বললো, হ্যাঁ যেখানে খুশি। জিৎ বললো, তুমি আমাদের হট্টমেলার দেশে নিয়ে যেতে পার? রূপ বললো, হ্যাঁ সেই বুদ্ধু ভুতুমের দেশে নিয়ে চল। যেখানে ঢোলের ডাইনে ঘা দিলে হট্টমেলা বসে আর বাঁয়ে ঘা দিলে হাট ভেঙে যায়। রাজ জানে যে এসব রূপকথার গল্প। সত্যি সত্যিই এসব জায়গা নেই। কিন্তু মাঝির কথা শুনে রাজ তাজ্জব। মাঝি বললো, এমন একটা সোজা জায়গায় যাবেন মহারাজরা? চলুন নিয়ে যাই। এই তো পরশুই গিয়েছিলাম সেখানে। রাজ জানলো কাজটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। তবু কী ভেবে ওর ছোট দুই ভাই-এর সঙ্গে নিজেও নৌকার দিকে পা বাড়াল।

নৌকায় উঠে মাঝি বললো, আপনারা চোখ বুজুন, দুহাত দিয়ে দুকান চেপে ধরুন আর বলুন 'বদর বদর নাও হট্টমেলায় যাও।' ওরা যেই এ কথা বলেছে অমনি নৌকাটা ছুটতে আরম্ভ করলো যেন রাজধানী এক্সপ্রেস। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটা থেমে গেল। মাঝি বললে, হট্টমেলায় এসে গেছি। ওরা চোখ খুলতেই দেখে একটা প্রান্তরের ধারে এসে পড়েছে। পাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাঁদর আর একটা পেঁচা। নৌকার পাশে মোচার খোলের মতন একটা নৌকাও আছে। মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে ওরা সবাই পাড়ে গিয়ে উঠলো। বুদ্ধু ভুতুম ওদের দেখে এগিয়ে এল। মাঝিকে দেখে বেজায় চটে গেল ভুতুম। সে বলতে লাগলো, মাঝি তোমায় নিয়ে আর পারি

না। আমরা এখানে কুঁচবরণ রাজকন্যা যার মেঘবরণ চুল তার খোঁজে এসেছি। আর তুমি হুটহাট করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হাজির হও কেন? মাঝি বললো, ভুতুম ভাই তুমি রাগ করো না। পাতালরাজের হুকুমে আমি এই তিন ভাইএর কাছে গিয়েছিলাম। ওরা যে এখানে আসতে চাইবে কেমন করে জানবো। এই সময় রূপ বলে উঠলো, তোমরা তো বুদ্ধু ভুতুম নও তোমরা তো বুধকুমার জিৎ বলে উঠলো, আর রূপকুমার। এবার বুদ্ধু ভুতুম দুজনেই চটে গেল। বললো, এসব খবর এরা জানলো কি করে? এখনো আমাদের রাজকন্যার সঙ্গেই দেখা হ'ল না। মাঝি হাত জোড় করে বললো, এ ছেলে-গুলো অনেক খবর জানে। এটাও কেমন করে জানি জেনে ফেলেছে। রাজ বললো, জানাজানির কি আছে? তোমাদের কথা ঠাকুমার ঝুলিতে আছে। গানের মধ্যে আছে, তোমাদের কথা সবাই জানে। এবার বুদ্ধু অবাক হয়ে বললো, সে কি গানও আছে? রূপ অমনি গেয়ে উঠলো 'যদি ডাইনে ঘা দাও কষে তবে হট্টগোল বসে' তার পরেই বললো, একটু ঢোলটায় ঘা দাও না। রূপ থামতেই জিৎ বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ দাও দাও। রাজ বললো, বুদ্ধু ভাই, আমার এই দুটি ভাইকে তো চেনো না, এক্ষুনি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। তার চাইতে হট্টমেলা বসানোই ভাল। রূপ দাদার কথা শুনে বলে উঠলো, আমরা খুব কাঁদতে পারি আমাদের কান্না শুনেই তো বাবা দাদার কান মুলে দিল আর দাদা বাড়ি থেকে পালিয়ে এল। আমরাও সঙ্গে এলাম। ভুতুম বললো, আমি বাচ্চা ছেলের কান্না একদম সহ্য করতে পারি না। বুদ্ধু, তুমি ঢোলে ঘা দিয়েই ফেল। বুদ্ধু সঙ্গে সঙ্গে ঢোলে দিল এক ঘা কসিয়ে।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে হট্টমেলা বসে গেল। হট্টমেলার হাট কলকাতার হগ সাহেবের বাজারের থেকে অনেক বড়। সেখানকার দোকানের কোনো তুলনা হয় না। দোকান-গুলো কি সুন্দরভাবে সাজানো। আর দোকানীরা সবাই রাজপুত্রের মতন পোশাক পরে আছে। রাজ, রূপ আর জিৎ মাঝিকে সঙ্গে করে হাটের মধ্যে ঘুরছিল। হট্টমেলায় দোকানীরা সবাই ওদের দেখে খুব খুশি। সবাই বলছিল, এ বিদেশীরা খুব ভালো। একটা দোকানে চকোলেটের মতন মিষ্টি সাজানো আছে। রূপ বললো, সে চকোলেট খাবে। রাজ খুব অপ্রস্তুত হল। কিন্তু দোকানী বলে উঠলো, সে কি! তোমরা নিশ্চয়ই মিঠাই খাবে। রাজ বললো, আমাদের টাকাকড়ি তো নেই। দোকানী বললো, টাকা কি? আমরা কড়ি দিয়ে জিনিস বিক্রি করি। ওই তো কড়ির পাহাড় রয়েছে নিয়ে এসো। সত্যিই তো কড়ির পাহাড় এসে গেছে। ওরা কড়ি দিয়ে চকোলেটের মতন মিষ্টি কিনলো। ওরা শুনলো মিষ্টিটার নাম তুষ্টপসন্দ। তা সত্যিই তাই। রূপ খুব আনন্দ করে খেলো।

আরেকটা দোকানে ভারী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল। একটা প্রদীপ দেখে রাজের মনে হ'ল যেন চেনা চেনা। দোকানীকে বললো, এই পুরনো প্রদীপ দোকানে কেন?

দোকানী বলল, ওটা আলাদীন ব্যবহার করতো। রাজ জিজ্ঞেস করলো ও প্রদীপটা আমায় বিক্রী করবে? দোকানী বললে, ও প্রদীপের একদম লোভ নেই এমন লোক যদি এসে দাঁড়ায় তাহ'লে আপনা থেকেই তার হাতে চলে যায়। কড়ি দিয়ে কেনা যায় না।

আরেকটা দোকানে সব হারানো জিনিস পাওয়া যায়। সেই দোকানে যে কত মার্বেল, কত সুন্দর সুন্দর বই, কত কলম আর ছাতা আছে তা বোঝানো যায় না।

এর মধ্যে খুব গোলমাল শুরু করেছে বুদ্ধু ভুতুম। তারা দারুণ রাগ করছে। রাজ জিৎ রূপ ওদের মেঘবরণ রাজকন্যার কাছে যাওয়ার দেরি করিয়ে দিচ্ছে। বুদ্ধুকে মাঝি বলতে লাগলো, আরেকটু সবুর করো। কে কার কথা শোনে। বুদ্ধু ঢোলটার বাঁ দিকে দিল এক ঘা আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ রূপ জিৎ ফিরে এল গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে।

একটু পরেই খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির লোকরা এসে হাজির হ'ল। রাজ ভেবেছিল খুব বকবেন ওরা। কিন্তু বড়দের বোঝা ভার। কিছুই বললেন না। রাজ রূপ জিৎ কেউ কারুর দিকে তাকাল না। ওরা কাউকে না বলে কোথায় গিয়েছিল। বড়রা তো বিশ্বাস করবে না। ওরা নিজেরা একত্র হলে ফিসফিস করে বলে হট্টমেলার কথা, আশ্চর্য মাঝির কথা। আর কি?

মেয়ের বিয়ের ঝকমারি

দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়

আলোর বিয়ে, তাই তার পিসি-মাসি এমন কি পিসির পিসি, মাসির মাসি আর তাদের ছেলেমেয়ে সবাই মানে নাতি-নাতনি পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে থৈথৈ করছে। তা তো করবেই। একমাত্র মেয়ে নিশীথবাবুর। হৈচৈ হবে না? আর তাছাড়া নিশীথবাবুও মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে কারোই বাদ রাখেন নি। হবু জামাইও দেখাবার মতোই জামাই। দেখতে সুন্দর। স্বাস্থ্যবান। ব্যাঙ্কে চাকরি। সব মিলিয়ে চৌকস ছেলে। তাই ছেলে দেখা, মেয়ে দেখানো তারপর পাকা দেখাদেখি সব সাত দিনেই সমাধা করে চৌদ্দ দিনের মাথায় শুভ দিনটি বাছাই করেছেন নিশীথবাবু। তার আগেই পত্রে অথবা পদব্রজে বন্ধু-বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী দূর-দূরান্তের আত্মীয় কুটুম্ব সকলকেই আহ্বান করেছেন। তেমন বড়লোক তিনি নন। তবুও। আর তার জন্য ধারকর্জ করতে কিছু কসুর নেই। আর যোগাড়যন্ত্র কেনাকাটা সব কাজেই তাঁকে পইপই করে ঘুরতে হয়েছে। তা তিনি ঘুরবেন না তো ঘুরবে কে? মেয়ের বাপ বলতে কথা।

বেশ হিসেবী মানুষ নিশীথবাবু। ত্রুটি নেই কোথাও। আলোর অভাবে রাতে বিকল্প আলোর ব্যবস্থাও পাকা। আসলে তিনি নিজেই যে পাকা মাথার লোক কিন্তু এই পাকা লোকের মেয়ের বিয়ের দিন সাতসকালেই এমন ঝকমারি কাণ্ড হবে কে জানে!

না কোন মারামারি না। নয় হাতাহাতিও। তবু খুন্তি হাতে গৃহিণী ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে।

আর এসেই 'বলি শুনছো, রেডিওর খবর শুনেছো?'

যার উদ্দেশে কথাগুলো বলা তিনি বসে বসে তেল মাখছিলেন। স্নান সেরে মাছের বাজার যাবেন। সেখানে কোটা মাছ গুনে গুনে আনতে হবে। এমন সময় গৃহিণীর ওই···

কী ব্যাপার? তুমি অমন ছুটে এলে কেন? জলখাবার সকলকে দেওয়া হল?' নিশীথবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ! ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন স্ত্রীকে।

'আর রাখ তোমার জলখাবার।' বলি জল কই, জ অ-ল। এখন শুধুই খাবার দিতে হবে। জল নেই। জল নে-এ-ই। বুঝলে?

'জল নেই!' অবাক হলেন নিশীথবাবু। মুখে বললেন—'জল নেই কী আবার?'

'আ আমার মরণ। তা এতক্ষণ রেডিওর খবর কী শুনলে? এই মাত্র বলল—টালার জলট্যাঙ্কি না কি টেঁসে গিয়েছে। সারাদিন আজ উত্তর কলকাতায় জল নেই।

সেই শুনেই তো জলখাবারের লুচির বেগুন-ভাজা ভাজতে ভাজতে বলতে এলাম।'

এই বিপদের কথা (হ্যাঁ বিপদ বৈকি, বিয়ে বাড়িতে জল নেই ভাবা যায়।) নিশীথ-বাবুর মুখ ফসকে বেড়িয়ে এল, 'তাই তুমি অমন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলে!'

আর যায় কোথা? গরম তেলেই যেন ছিটকে পড়ল জল। ছ্যাক করে উঠলেন নিশিথিনী! মানে নিশীথবাবুর গৃহিণী। মানে যার বিয়ে সেই আলোর জন্মদায়িনী স্বয়ং মা জননী। এখন একেবারে চণ্ডালিনী উগ্রমূর্তিধারিণী। বললেন, 'বলি আমার জ্বলে ওঠাই দেখলে। আমিও তো তোমার সংসারে দিন দিন ভাজা ভাজা হচ্ছি। আলোর বিয়েটা চুকে যাক। তারপর আমি অন্ধকার। টের পাবে তখন। তখন আর লোডশেডিং নয় যে আবার আলো আসবে। একেবারে শেষ-লোড। বুঝলে?'

না, বোঝেন নি নিশীথবাবু। আসলে উনি শোনেনই নি। রসিকতা করেই উঠে গেলেন। জলের ব্যবস্থা তো একটা করতে হবে। রাতের লোড শেডিংএর বিকল্প ব্যবস্থা—জেনারেটর রেখে দিয়েছেন বাড়ির দোরগোড়ায়। তা এমন গোড়ায় গলদ মানে জল নিয়ে লোডশেডিং হবে কে জানে? তাহলে তো আলো জ্বালানোর মতো জল তোলার লোক রেখে দিতেন গোটা কয়েক। জল তো চাই-ই।

সকাল থেকেই জল চাই। সব-সময়েই জল চাই। জল না হলে কি চলে? নইলে গোটা দেহটাই যে অচল হয়ে যাবে অ-জলে। এই দেহ-ই তখন জ্বলে উঠবে।

আর বিয়ে বাড়িতে তো অঢেল জল চাই ই। এত লোক যেখানে। এত রান্না যেখানে। এত খাওয়া যেখানে। এত হাত ধোওয়া যেখানে। তাই জল যোগাড় করতে নিশীথবাবু ছুটলেন।

আর ওদিকে কলতলায় কে আগে ঢুকবে সেই নিয়ে কলকলানি শুরু হল সমানে।

কাজের লোক নিশীথবাবু। চালুও। নইলে সাত তাড়াতাড়ি অমন পাত্র খুঁজে পান! আধ ঘণ্টার চেষ্টাতেই তিনি গোটা বাড়ি জল ভর্তি করিয়ে নিলেন।

টালায় জল নেই বলে বাড়ি বাড়ি জল দেওয়ার জন্য পুরসভা জল-ভর্তি লরিটি পাঠিয়েছে। নিশীথবাবু সেই লরির সব জলই নিজের বাড়িতে পুরে নিলেন। হ্যাঁ তাতে অবশ্যি কিছু টাকা তাঁর পকেট থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারের পকেটে ঢুকল। এছাড়া উপায়ই বা কী। নিশীথবাবু ম্যানেজ মাস্টার। এখন আর জল জল রব নেই বিয়েবাড়িতে।

সকাল থেকে এইসব ঝকমারি আর রকমারি কাজ করতে করতে দুটো ভাত যখন মুখে দিলেন নিশীথবাবু তখন ঘড়িতেও দুটো বাজে। খেতে খেতেই তিনি ভাবেন, আর কঘণ্টা পেরোলেই বিয়ের লগ্ন এসে যাবে। সন্ধে লগ্নেই বিয়ে। সাত সকালেই জল নিয়ে যা হটে গেল...আচ্ছা যদি জলের লরিটা না আসতো, তাহলে ?

গোটা বিয়েটাই যে জলো হয়ে যেতো। না, আর ভাবতে পারেন না নিশীথবাবু। উঠে পড়েন তিনি। মুখ ধুয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসতেই চোখ দুটো বুজে আসে। এমন সময় গৃহিণী মানে আলোর মা এসে বলে—'ওগো শুনছো ?'

চমকে চেয়ে উঠেন নিশীথবাবু। আবার কী হল ? দুপুরের খবরে রেডিও কিছু নতুন ঘোষণা করল নাকি, তা কী বলবে—সন্ধে থেকে লোডশেডিং হবে। তা হোক না জেনারেটর আগেই তো আনিয়ে রেখেছেন। জল, সেতো চৌবাচ্চা ড্রামে ভর্তি। টালায় আর টালবাহানি নেই। হড় হড় করে জল পড়ছে কলে। তাহলে ? মুখে বললেন—'কী হল ?' গৃহিণী—'কেন, শুনতে পাচ্ছো না। চেয়ারে গা দিতেই ঘুমিয়ে এলিয়ে পড়লে। কানে কিছু ঢুকছে না ?' বিরক্ত হয়ে নিশীথবাবু বললেন—'কী ?'

'মেঘের ডাক গো, মেঘের ডাক। মেঘের গর্জন শুরু হয়েছে। কান দিয়ে শুনো।'

মেঘের গুড়গুড় ডাক নিশীথবাবুর কানে যায়। উনি চট করে উঠে গেলেন ওপরে। ছাদের ওপরে। হ্যাঁ, কালো মেঘ যেন হাঁ করে এদিকেই ছুটে আসছে। তাহলে কি জলে ভাসিয়ে দেবে গোটা কলকাতা! কী হবে ? নিচে নেমে ফোন করলেন হবু বেয়াই-বাড়িতে। আকাশে দারুণ মেঘ। কলকাতা ভাসাবে কিনা কে জানে। আপনারা বর আর বরযাত্রীরা সবাই যেন এখুনিই রেডি হন। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি বর আনতে। ফোন রেখে আবার ফোন করলেন মিনি-বাসঅলাকে জলদি গাড়ি বের করে নিয়ে এসো। বৃষ্টি আসবে। তার আগেই বর আর বরযাত্রী আনতে হবে। বাস নিয়ে একেবারে বেহালা চলে যাও বরের বাড়ি। এখান থেকে কাউকে সোজাসুজি ওখানে পাঠাচ্ছি।

আলোর মামা মানে নিশীথবাবুর আপন শ্যালক সুশোভনবাবু বরের বাড়িতে হাজির। হাজির মিনিবাসও। বরযাত্রীরাও সব তাড়াহুড়া করে তৈরি হয়ে নিলেন। সত্যি যেভাবে মেঘটা তেড়ে আসছে তাতে ঠনঠনিয়া কীভাবে পৌঁছবেন তাই চিন্তা। ছেলের বাবা খুব পারটিকুলার। উনিই সবাইকে তাড়া লাগিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি করিয়েছেন। যাত্রা শুরু হল। মিনিতে বরযাত্রীরা সব। আর প্রাইভেট কারে বর আর তার কজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। গাড়ি দুটো স্টার্ট দিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল। অবশ্যি টিপি

টিপি। তবে থেকে থেকে মেঘের গর্জন। মানে এক একটা হুংকার আর কি।

গাড়ি দুটো যত এগোয়, বৃষ্টিও তত জোরে জোরে পড়তে থাকে। বৃষ্টির দোসর আবার দমকা হাওয়া। সব মিলিয়ে বেশ তোড়জোড়। তা কলেজ স্ট্রিটে এসে সবাই অবাক। এ কি! এখানে এত বৃষ্টি হয়েছে। জলে যে সব জলময়। গাড়ির ভিতরে জল ঢুকছে। এক কোমর জল। মিনি বাস যাবে তো? তা আমি নিয়ে যাবো ঠিক। আপনারা হৈচৈ করবেন না। কিন্তু প্রাইভেট তো যাবে না। ওই তো আটকে গেল। স্টার্ট নিচ্ছে না আর। তাহলে? তাহলে আর কি, কার থেকে বর আর তার বন্ধুরা মিনিতে চলে আসুক। মিনিবাসের আপত্তি এতে আর জায়গা কোথায়? কোথায় ঢুকবে ওরা। আর ঢুকবেই বা কেমন করে। দেখছেন কী জোরে বৃষ্টি পড়ছে।
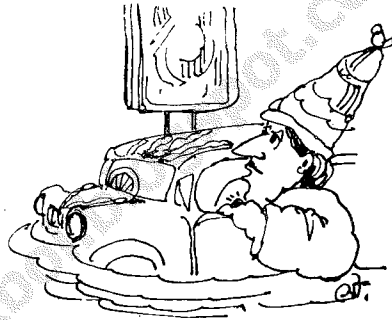
তবু তো আসতে হবে ভাই। বর ছাড়া তো আর বরযাত্রী যায় না। মেয়ের বিয়ে হবে বরের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত মিনিবাসটা জলে অচল সেই কারটার কাছে আনা হল। জুতো-মোজা ভিজিয়ে বর আর বরের বন্ধুরা মিনিতে উঠল। আর তারপরেই মিনিটা যেন মোটরলঞ্চ হয়ে জল কেটে কেটে ঠনঠনিয়ায় কনের দরজায় ঠেকল। আর তখুনিই বর এসেছে বর এসেছে চীৎকার উঠল। বৃষ্টির যন্ত্রণার কথাও হয়তো ক্ষণেকে ভুলে গেল। বর আর বরযাত্রী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

তারপর পরের দিন মেয়ে বিদায়ের সময় সবার চোখে জল। মা মাসি পিসি আত্মীয় কুটুম্ব পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আলোকে বুকে নিয়ে কাঁদছে। আলোও সবার বুকে মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেলছে অঝোরে। পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে নতুন জামাই তার চোখও ছলছল করছে। আর নিশীথবাবু! তিনি কোথায়? ওই দূরে, সবার একটু আড়ালে, আকাশের দিয়ে চেয়ে। তাঁর চোখের কোণায় কাণায় জল টলটল করছে। ভাবছেন বোধহয় মেয়ের বিয়ের আসল ঝক্‌মারি এখানেই। এই চোখের জল।

এ স্মৃতি সুখের, এ স্মৃতি আনন্দের

প্রদীপকুমার ব্যানার্জী (পি. কে)

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা আমাদের বারে বারে বললেন, আমরা তাদের দেশের আবহাওয়ার ভারসাম্য উল্টে দিয়েছি। কিন্তু তার জন্য তারা দুঃখিত নয়। কেননা তাদেরও যায়-যায় করে শীতের আমেজ ভালোই লাগছিল। তার উপর সর্বোপরি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধ। গোটা দেশ জুড়ে তারা প্রস্তুত। চার বছরের পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টায় তাদের দেশ এতবড় একটা সংগঠনের ঝুঁকি নিয়েছে। পূর্ব গোলার্ধে তারাই প্রথম। প্রথম দেশ যারা বিশ্ব ওলিম্পিক অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

হ্যাঁ, ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন ওলিম্পিকের একটা বিশেষ ঘটনাই আমি আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের কাছে তুলে ধরছি। তখন মোটে দিন দু'য়েক হোল আমরা মেলবোর্ন ওলিম্পিক ভিলেজে পৌঁছেছি। দিল্লী থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে সারারাত উড়ে উড়ে সিঙ্গাপুর নেমেছি। আবার সিঙ্গাপুর থেকে উঠে আমাদের সুপার কনস্টিথেমন বিমান উড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার দিকে। মনে রেখো, তখনও কিন্তু আধুনিক জেট বিমান আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের সংসারভুক্ত হয় নি। তখনকার সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন বিমান ছিল—সুপার কনি বা সুপার কন্স্টিথেমন—যা ঘণ্টায় বড় জোর ৩৫০ থেকে ৩৮০ মাইল বেগে উড়তে পারতো। আর এখন তোমরা তো সুপারসনিক যুগের ছেলেমেয়ে। সুপারসনিক (কনকর্ড) বিমান শব্দের গতিকে হার মানায়। দুই বা তিনগুণ বেশি দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দেয়।

যাক্‌গে, যা বলছিলাম, সিঙ্গাপুর থেকে আবার যাত্রা শুরু করে সারাদিন ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দ্বীপপুঞ্জ—জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা সব পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম অস্ট্রেলিয়ার দিকে। মাঝে একবার মাত্র জাকার্তায় ফুয়েলিং এর জন্য থামতে হয়েছিল। আবার উড়েছি, দিন তাড়াতাড়ি ছুটছে। কেননা আমরা চলেছি পুবের দিকে। ডারউইনে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে। দারুণ গরম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এই হঠাৎ হঠাৎ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বদলে আমরা সবাই খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। আমাদের এখানে থামা মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য। আবার যখন উড়লাম তখন সময় রাত দশটা। পরের দিন ভোরে পৌঁছলাম সিড্‌নি। সারাদিন সিড্‌নি কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলায়

আবার উড়ে মেলবোর্ন শেষ রাতে। দেখলাম, বিমানবন্দরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছাচ্ছেন, অভ্যর্থনার ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের জন্যই সমান। বিমান থেকে অবতরণ করার সাথে সাথেই অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা প্রত্যেকের সঙ্গে Shake-hand করছেন। সুন্দরী মহিলারা এসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তারপরে একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের পরিবেশনের সাথেই আমাদের Pass Port, Air Ticket, Health Card, Visa সব দেখে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই Customs Clearance ও Baggage Cheek শেষ হয়ে গেল। আর আমরা জানতে পারলাম না—কখন সব মালপত্র আমাদের নিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাসগুলির পেটের মধ্যে সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে গেছে। সব সদস্য নিয়ে আমাদের পুরো ভারতীয় দলটির সংখ্যা প্রায় সোয়া'শ। আমরা সবাই যখন আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসে উপবিষ্ট ততক্ষণে অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা অপর কোন দেশ থেকে আগত কোন বিমানকে স্বাগত জানাতে চলে গেলেন। মহামান্য বিদেশী অতিথি বা দেশের রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের মত অতিথিদের যেরকম Outrider motorbike এবং carcade করে নিয়ে যাওয়া হয় তেমনি ব্যবস্থা এখানে। ঝকঝকে জামাকাপড় পরিহিত (নীল ও সাদা) পুলিশ অফিসারেরা আমাদের Escort করে রাস্তার দু'ধারের আর সব গাড়িকে থামিয়ে রাজসিক হালে ওলিম্পিক ভিলেজে পৌঁছে দিলেন। মেলবোর্নের আকাশে সিঁদুর ছিটিয়ে তখন সূর্যোদয়ের ঘটা চলেছে। কিন্তু তার একটু পর থেকেই আর সূর্যের প্রায় মুখ দেখতে পাই নি। আমরা ঐ শীত ও বৃষ্টির মাঝেই আমাদের নির্ধারিত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর বৃষ্টিতে আমাদের প্রশিক্ষক রহিমসাহেব জ্বরে পড়ে গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেরাই অনুশীলন চালিয়ে নিচ্ছি।

নির্দিষ্ট সময়ে ওলিম্পিকের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে ট্র্যাক ও ফিল্ডের ইভেন্ট শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন আমাদের অনুশীলন শেষ করেই Main Stadium-এ দৌড়াই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা দেখার জন্য। কিছু ড্রাই লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে দেখাই ছিল আমার নেশা। কখনও ভেলোড্রামে সাইক্লিং দেখছি। কখনও সুইমিং। ওয়াটার পোলো বা ডাইভিং বা কখনও বা ইনডোরে খেলা দেখছি। তখন বেশ কিছুদিন ওলিম্পিক শুরু হয়ে গেছে। আমাদের মিলখা সিং, প্রদ্যুম্ন সিং, বলকার সিং একে একে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। পাকিস্তানের আব্দুল খালিক কেবল ১০০ মিটার দৌড়ের সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে। সেদিন আমাদের মেয়ে লীলা রাও ১০০ মিটার দৌড়াবে। আমরা সবাই দল বেঁধে লীলাকে সমর্থন জানাতে সেই বিখ্যাত মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সমবেত একলক্ষ চল্লিশ হাজার দর্শকের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি, বিশেষ করে বদ্রুদা (সমর ব্যানার্জী, অধিনায়ক)। কেষ্টদা (কেষ্ট পাল)। নিখিলদা (নিখিল নন্দী) এবং নেভিল-ডি সুজা অর্থাৎ আমরা যে ক'জন একটা বাংলোয় থাকতাম সবাই

মেইন টেরাসের তিনতলায় দাঁড়িয়ে প্রথমে পুরুষদের ১০০ মিটার হিট্স্ দেখলাম। আমেরিকার ববি মরো, ইরা মার্চিসন, লেমন কিং, গ্রেটব্রিটেনের ম্যাক্‌ডোনাল্ড বেলী, জামাইকার হার্ভ মেকিন্‌লে স্ব স্ব হিটে জয়লাভ করলেন অনায়াসে। এদের মধ্যে Best Timing করলেন ববি মরো ও ইরা মার্চিসন। তারা দু'টি হিটেই ১০.৩ করলেন। বিশেষ করে ইরা মার্চিসন—সেই খর্বকায় নিগ্রো দৌড়বীর মেলবোর্ন ওলিম্পিকের আগেই Pan Amarican গেমসে তার মার্কিন সতীর্থ উইলি উইলিয়ামসের সঙ্গে ১০.১ করে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। তাই বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে আর সবাইকার মত আমরাও তাকিয়ে আছি Starterএর গুলির সংকেতের সঙ্গে Starting Block থেকে গুলির মত ছিট্‌কে বেরিয়ে যাওয়া সেই খর্বকায় অসাধারন গতিসম্পন্ন মানুষটির দিকে।

মেয়েদের ১০০ মিটার হিট্ শুরু হতে যাচ্ছে। সবাই দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছি। এদিকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ারও অব্যাহতি নেই। আমার পাশে উপবিষ্ট এক মার্কিন যুবক প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি ভারতীয়? যদিও এই হিটে অনেক ভাল ভাল প্রতিযোগিনী আছেন। কিন্তু তোমাদের ঐ ভারতীয় মেয়েটি কি অপূর্ব দেখতে। নানা রঙের শাড়ী পরিহিত তার কত না ছবি এখানকার কাগজে বেরিয়েছে। আচ্ছা, বলতে পার তোমাদের মেয়েরা এতো সুন্দরী হয় কি করে?'

আমি জবাব দিলাম ভারতীয়দের সামাজিক শিক্ষা তাদের ঐ রকম সুন্দর করে তোলে। মুখের মধ্যে উগ্রতাবিহীন একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে।

তারপরেই মার্কিন ভদ্রলোকটি হাত তুলে জানালেন যে ইভেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে। Starter-এর বন্দুকের নল থেকে আগুন বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই একটু ধোঁয়া এবং সেই সময়ে আওয়াজ, আর সাথে সাথেই সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। আমরাও সবাই যতটা গলায় জোর ছিল চিৎকার করে বলে উঠলাম; Come on India, Come on Leela. কিন্তু হায়, বিধি বাম। আমাদের সবাইকে হতাশ করে লীলা ব্লক থেকে বেরুলোই দেরি করে। তারপরে গজ দশেক যেতেই হঠাৎ ছিট্‌কে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সাথে সাথে গোটা Stadium-এর বহু লোক হায় হায় করে উঠলো।

আমরাও সকলে মর্মাহত। আর একবার ৬২ কোটি ভারতবাসীর আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। নিখিলদা তো প্রায় কেঁদেই ফেললেন যেন সে নিজেই পড়ে গেছে। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে অন্যান্য Events দেখতে দেখতে আমরা তখন তিন নম্বর টিয়ারে Press Pavillion-এর দিকে এগুচ্ছি, উদ্দেশ্য—উপর থেকে events দেখা ও বেরীদার (বেরী সর্বাধিকারী) সাথে খানিকটা গল্প করা। তখনও আমরা জানতাম না যে আমাদের জন্য (এবং এখন তোমাদের জন্য) একটা বিশেষ আনন্দ সংবাদ জমা হয়ে রয়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে যখন পৌছাই তখন দেখি Stadium-এর ১ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন হাতে পানের ডিবে ও এক মুখ পান নিয়ে মোটা

ফ্রেমের চশমা পরিহিত সেই ভারতীয় ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির অনন্য ব্যক্তিত্ব পঙ্কজদা (শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত—যিনি একাধারে ভারতের ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির প্রেসিডেন্ট হবার অনন্য গৌরব অর্জন করেছিলেন) আমাদের দেখতে পেয়েই এক গাল হেসে সম্ভাষণ জানালেন, "হ্যালো বয়েজ, এই বাঙালী সবকটা কি করছিস এখানে ?"

আমরা বিনয়ের সাথে বললাম, "লীলার রেস ছিল, তাই দেখতে এসেছিলাম ও কি করে।"

উনিও সখেদে বললেন, "আমিও সেই জন্যই আগে ভাগে Stadium-এ এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু ওকে দেখে দারুণভাবে নিরাশ ও বিরক্ত! কেননা Olympic শুরুর ছয় মাস আগে ওকে আমরা জার্মানী ও আমেরিকায় তিন মাস করে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়েছিলাম। এতোগুলো টাকা ও পরিশ্রম সবই জলে গেল। যাক্ গে, তোরা প্র্যাকটিস্ করছিস্ না ?"

সঙ্গে সঙ্গেই বক্রদা বললেন, "হ্যাঁ পঙ্কজদা, আমরা তিন ঘণ্টা প্র্যাক্টিস করেই তবে বেরিয়েছি।"

পঙ্কজদা তখন আমার দিকে ফিরে বললেন। "তোরা কিন্তু ওরকম করিস না। তোদের অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে" বলেই তার পাশে দাঁড়ানো একজন ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এতক্ষণে তার দিকে আমাদের নজর পড়লো। পঙ্কজদার সঙ্গে তিনিও অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় মুচকি হেসে রসিকতা করে বললেন, "অস্ট্রেলিয়াকে তোমাদের দলের হারাতে হচ্ছে না। সেই ব্যক্তিটির মুখে চোখে এমন একটা কিছু ছিল যা ঐ এক মুহূর্তেই পঙ্কজদার মতই আমাদের সকলের সমীহ আদায় করে নিল।

আমি ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলোর ঘুণপোকা, পৃথিবীতে যতগুলি মেজর ও মাইনর গেমস্ আছে সাধ্যমত চেষ্টা করি তার খবরাখবর রাখবার। ঐ ব্যক্তিটির মুখের দিকে তাকিয়েই আমার সারা শরীরে এক বিদ্যুৎ সংকেতের মত শিহরণ খেলে গেল। এই মুখটা কোথায় যেন দেখেছি—ভীষণ পরিচিত। ঐ মুখটি যদি সঠিক মনে রেখে থাকি—তবে কি তিনি ? কিন্তু অ্যাথেলেটিকদের পরিবেশে এক পাল সাংবাদিকের মাঝখানে ধূসর রঙের স্যুট্ পরিহিত এই লোকটি কি……না। সব কিরকম যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ পঙ্কজদার হয়ত মনে হোল আমরা যেমন হতবাক হয়ে তার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে আছি তার উচিত সৌজন্যমূলকভাবে তার সাথে আমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া। ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। উনি পঙ্কজদাকে "পিটার পিটার" বলে সম্বোধন করছিলেন। কিন্তু তার ইংরাজী উচ্চারণ আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পঙ্কজদা বললেন, 'Boys Meet my friend Don—Sir Donald Bradman."

সকাল থেকে অনেক রকম দুর্ভোগ গেছে। তারপরে লীলার ঘটনাটাও মনে দাগ কেটেছিল। কিন্তু তখনও জানতাম না, দিনের চরম সৌভাগ্যটি অপেক্ষা করে আছে সেই বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটার—সেই জীবিত কিংবদন্তী—স্যার ডোনাল্ড ব্যাডম্যাক-এর সাথে করমর্দন করার দুর্লভ সুযোগটির।

আমাদের সাথে পরিচিত হতেই একটা অদ্ভুত উচ্চারণে তিনি কিছু একটা বললেন, আমরা যখন কিছুতেই তার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারছিলাম না তখন পঙ্কজদা ভৎর্সনা করে বললেন, 'কি রে বুঝতে পারছিস না? উনি জিজ্ঞাসা করছেন, তোরা কবে এসেছিস।'

তারপরের ঘটনা—আমি বব্রুদা, নিখিলদা, কেষ্ট পাল ও নেভিল—আমরা সকলেই যে ক্রিকেটেরও অনুরাগী এবং তাঁর সাহচর্যে অত্যন্ত গৌরবান্বিত—এ'কথা শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। এবং আমাদের দলের সাফল্য কামনা করলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তাঁর দল। তাই তিনি সেদিন পিটার গুপ্তের বিরোধী দলে বসেই খেলা দেখবেন বললেন। আমাদের ক্রিকেটের কিছু সরঞ্জামের দরকার ছিল শুনে সেই প্রবাদ পুরুষটি হাসি মুখে একটি চিঠি লিখে দিলেন। পড়ে দেখি চিঠিটি আর এক বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটের নায়ক লিনডসে হ্যাসেটের দোকানে লেখা। সেখানে কিন্তু আর এক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। আলাপ হোল আরও এক কিংবদন্তীর নায়কের সাথে—নীল হার্ভে। সে আর এক গল্প। আর এক দিনের জন্য তোলা রইল।

পৃথিবীতে প্রথম অভিযান

ঈশানী বসু

অথৈ সাগর। তার ওপর ভেসে চলেছে ইজিপসিয়ান জাহাজ। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। কত বিপদ, ঝড়-তুফান কত রাতের অন্ধকার! সব পেরিয়ে ধ্রুবতারা সম্বল করে তারা এগিয়েই চলেছে। সামনে শুধু এক লক্ষ 'পাণ্ট' (Punt)।

কোথায় পাণ্ট? কোন্ দিকে? তারা তো আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল ধরে এগিয়েই চলেছে। লোহিত সাগরের বুকের ওপর দিয়ে এই অজানা অভিযান বয়ে চলেছে খাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে। জাহাজের নাবিকরা অধীর আগ্রহে খুঁজছেন—একজন মানুষেরও কি দেখা মিলবে না? —না কোন মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। এ কোনদিকে যাচ্ছে তারা? তীরে তীরে ধু-ধু বালিয়াড়ি। দূরে নিবিড় বন। এ দৃশ্য আর ফুরোয় না। বানর লাফিয়ে বেড়ায় গাছে গাছে। কোন কোন রাতে জ্যোৎস্নায় চারদিক ধুয়ে যায়। একজন নাবিক ফিসফিস করে আর একজনকে দেখায় দূরে হিংস্র জন্তুর ছায়ামূর্তি।

বহু মাস পেরিয়ে গেল এই জাহাজগুলো মিশর থেকে বেরিয়েছে। তিরিশজন করে সুদানের ক্রীতদাস অবিরাম দাঁড় বেয়ে চলছে এক একটা জাহাজের। সত্যিই কি 'পাণ্ট' নামে কোন জায়গা আছে? কতকটা শোনা, কতকটা অনুমান—এডিন উপসাগরের
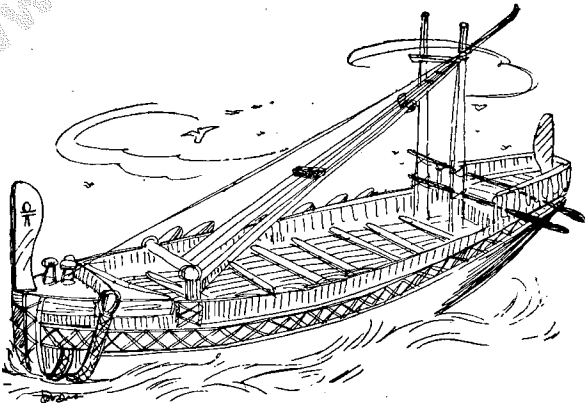
কাছাকাছি যেখানে এশিয়া মহাদেশের আরব আর দক্ষিণ আফ্রিকার একটা অংশ পরস্পরকে প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে সেইখানে 'পান্ট'। সুগন্ধ মীর (Myrrh) গাছের সুরভিতে সে জায়গা স্বর্গের মত পবিত্র।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ১,৫০০ বছর আগে সমগ্র মিশরের শাসনকর্ত্রী ছিলেন একজন প্রভাবশালিনী রানী। সেই সৌন্দর্যময়ী রানী হাৎশেপসাট (Hatshepsut) ঘোষণা করলেন নীল নদের তীরে থীবস্-এ তিনি দেবরাজ 'আমন-রি' (Amon-Re)-র পুণ্য নামে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। পৃথিবীতে এ মন্দির হবে আশ্চর্যতম। মন্দিরের চারপাশ উঁচু বাগান দিয়ে ঘেরা হবে। সেই বাগানে অবসর সময়ে দেবতা অনন্তকাল ধরে ভ্রমণ করবেন—দেবরাজের প্রিয় আবাসস্থল হবে সেই উদ্যান। রানী আদেশ করলেন সুগন্ধি মীর বৃক্ষ দিয়ে দেবরাজের বেদি সুরভিত করতে হবে। কিন্তু ইজিপ্টের কোথাও জন্মায় না সে গাছ। তাই লোহিত সাগর দিয়ে দক্ষিণে দূর দেশে তিনি পাঠালেন দুঃসাহসী অভিযাত্রী দল। সে অভিযানের সঠিক সময় খ্রীস্ট পূর্ব ১৪৯৩ অব্দ। শোনা যায় হাৎশেপসাটের শাসনকালে পাঁচ-শ' বছর আগে আরেক দল অভিযাত্রী 'পান্টে' গিয়েছিল। কিন্তু আজ সে পথ কেউ জানে না। এমন কি আদৌ কোথাও 'পান্ট' আছে কিনা তাও সঠিকভাবে কারও জানা নেই।

পথ অজানা—তবু সুদক্ষ নাবিক নেহ্সি-র নেতৃত্বে নাবিকরা ভেসেই চলেছে। 'পান্ট'এ পৌঁছানোর সব আশা শেষ। কোথাও কোন মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। নাবিকরা যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছে তখন হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল দূরে তীরে কয়েকজন মানুষ। পামগাছের ছায়ায় জলের প্রায় ধারেই তাদের কোনাচে কুটির। বিস্মিত, উল্লসিত হয়ে নাবিকরা জাহাজ ভিড়িয়ে নেমে দাঁড়াল। আরও অবাক হয়ে তাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল তীরের মানুষ। তারা হতভম্ব! নিজেদের ভাষায় কেবল জিজ্ঞাসা করতে লাগল 'তোমরা কি স্বর্গের পথ ধরে এলে? নাকি সূর্যের রশ্মির পথে এসেছ? তোমরা কি দেবতা?' —হ্যাঁ, এই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত 'পান্ট'। নাবিকদের এতদিনের সংগ্রাম শেষে সফলতার তীরে এসে ঠেকেছে!

অভিযাত্রীরা তাদের রানীর জন্যে শুধু সুরভিত 'মীর' বৃক্ষই নিয়ে ফিরল না, তাদের জাহাজে ভরে নিয়ে এল—সোনা, হাতির দাঁত, মণি-মুক্তো, আবলুস কাঠ আর ধুপ-ধুনো কতো সব গন্ধ-দ্রব্য। ভঙ্গুর কাঠের জাহাজ নিয়ে কোন ম্যাপ ছাড়া এই মিশরের দুঃসাহসীরা অজানা সমুদ্রকে জয় করে দেশে ফিরে এল। মিশরের অধীশ্বরী তাদের এই গৌরবময় জয় মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করে দিলেন।

সাড়ে তিন হাজার বছর পরে আজও পণ্ডিতরা সেই দেওয়াল-চিত্র থেকে পৃথিবীর সকল অভিযান-কাহিনী জানতে পারেন।

কুঁকড়ো

লীলা মজুমদার

তা অমন সুন্দর পাখি, ঘরে একটু ময়লা করলে কি হয় কুমু ভেবে পায় না। দেখতে দেখতে শুকিয়ে খরখর করে, কুমু হাতে করে তুলে ফেলে দেয়। হাতও ধোবার দরকার হয় না। কেউ টেরও পায় না। এক যদি না দেখে ফেলে। এত রাগের কোনো মানেই হয় না, কাকীর খোকাটা কি কম নোংরা, থাক্ গে সে কথা।

কাকী নাকি ভারি সুন্দরী, সবাই তাই বলে। শুনে কুমুর হাসি পায়। কুঁকড়োর কাছে ঐ কাকী! কুঁকড়োর মতো সাদা ধবধবে গা, হলদে চকচকে পা, লাল টুক্‌টুকে ঝুঁটি আছে কাকীর? প্রথমটা ছাড়েনি কুমু। আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ময়লা করলে তো আমি ফেলি। কুঁকড়োকে রাতে কাঠ-গুদোমে রাখলে, কাকীর মুন্নুকেও সেখানে রাখতে হবে।'

কাকী রেগেমেগে মুন্নুকে কোলে তুলে, দুমদুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। রাগের চোটে খোঁপা খুলে গেল, একরাশি কালো কোঁকড়া চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। মুন্নু তার একমুঠো মুখে পুরে কেশেটেশে একাকার।

তখন বাবা বলল, 'ছিঃ, কাকীকে কড়া কথা বলতে হয় না। ছেলেমানুষ তো।'

কুমু শুনে অবাক। ঐ বুড়োধাড়ি নাকি ছেলেমানুষ, বাবা যে কি বলে! কুঁকড়োর গলা জড়িয়ে সে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু কুঁকড়ো থাকলে তবে তো! বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে, সে ডানা ঝাপটাতে লাগল। কি ভালো দেখতে কুঁকড়ো। যখন এত্তটুকু তুলোর গুলির মতো ছিল, তখন কাকুই এনে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ওকে দেখলেই বলে—'ইস্, জিবে জল আসছে যে রে কুমু! দে না আমাকে!' অবিশ্যি দেয় না কুমু। রাতে কুঁকড়ো ঘরের কোণে সেঁদিয়ে চুপচাপ থাকত। ভোর হলেই কুমু দরজা খুলে দিত। তারপর একদিন অন্ধকার একটু ফিকে হতেই, খুদে ঘুলঘুলি দিয়ে মুণ্ডু বের করে কুঁকড়ো বলল, কঁকর—কঁকর—কঁকর—কুক্রু—কু! বাবা রেগে গেল, 'এ্যাই কুঁকড়ো, চোপ!'

কুঁকড়ো বলল, 'কঁকর কঁকর কঁকর, করবি কি তু? কুক্রু-কু!'

তারপর চোখ লাল করে বাড়িসুদ্ধু সবাই উঠে এসে, কুঁকড়োর গলা ধরে টেনে ঘরের বার করে দিল। কুঁকড়োও অমনি ডানা ঝাপটে, খড়ের গাদায় চড়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে, গলা ছেড়ে ডাক দিল, 'কুক্রু কু, আর কত ঘুমুবি তু?' আর এধার থেকে, ওধার থেকে, বাঁশবাগানের ওপার থেকে, শিমলী-নদীর ঘাট থেকে, পাহাড়তলির বাট থেকে, পঁচিশ পাখি গলা ছাড়ল, 'কুকরু কু! আছি মু!' আর ঘুমোয় কার সাধ্যি! গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে সবাই উঠে পড়ল। সবার মুখ গোমড়া, খালি মুন্নু তার ফোকলা মুখের একটা দাঁত বের করে বলল, 'কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্!' কাকী তাকে ধরে দিল ঝাঁকি। মুন্নু অমনি ভ্যাঁ!

সেই দিন থেকে কুঁকড়োর জায়গা হল কাঠ-গুদোমে। সেখানে পাহাড়তলির বন থেকে, বাবা কাকা কাঠ কেটে এনে সারা বছরের জন্য রোদে শুকোয়। শুকিয়ে ঠনঠনে হলে কাঠ-গুদোমে তোলে। সেখানে কুঁকড়ো হয়তো সুখেই থাকে। বেড়ে জায়গাটা, ধুনো-ধুনো মিষ্টি গন্ধ, চেলা কাঠ থেকে সুবাস ছাড়ে। কিন্তু অন্ধকারে একা থাকে কুঁকড়ো। কুমুর কান্না পায়।

একদিন সকালে ঝমরু এসে বলল, 'মোরগ আগলে রাখিস্। এ সময় বন থেকে শ্যাল নামে। শীতকালে সব ছোট জানোয়ার লুকোনো জায়গায় ঘুম দেয়। খিদের চোটে শ্যালরা গাঁয়ে আসে।'

কুমু বলল, 'আমার কুঁকড়ো কাঠ-গুদোমে শিকলি বন্ধ থাকে।' ঝমরুর কি হাসি। 'গুদোমের দ্যালের আর চালের মধ্যে ফাঁক আছে না? বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকতে কতক্ষণ।'

'দেখতে পাবে না। গন্ধ পাবে। কুঁকড়োর গায়ে বোঁটকা গন্ধ। তাছাড়া শ্যালরা অন্ধকারে দেখতে পায়, নইলে রাতে বনে শিকার ধরে কি করে?'

কুমুর বুক টিপটিপ করতে লাগল। মুখে বলল, 'ধেৎ! বনের জানোয়ার গাঁয়ের

মধ্যিখানে ঢুকবার সাহস পাবে না। গাঁয়ের লোকরা তীর ধনুক নিয়ে তাড়া করবে না!' কিন্তু এরপর রোজ লোকের হাঁস-মুরগি রাতারাতি উপে যেতে লাগল। চারদিকে শেয়ালের পায়ের ছাপ!

রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটল। ভোরে 'কুঁকড়োর কুকরু-কু' শুনে তবে কুমু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত। একদিন ঘুম ভাঙতেই মায়ের কাছে শুনল বাসু মামাদের বাড়ির হাঁসের ঘরের চাটাইয়ের দেয়ালে গর্ত করে দুটো হাঁস নিয়ে গেছে আর তিনটে হাঁসকে মেরে রেখে গেছে। তারা নাকি ধুলোর ওপর পা টান করে পড়ে আছে। গলা কামড়ে নিয়েছে, চারদিকে রক্তে-রক্ত!

কুমুর কান্না দেখে মা ঘাবড়ে গেল। 'আরে কি জ্বালা! বাসুরা আজ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে পাহাড়তলির পথ পাহারা দেবে। শ্যাল বাছাধনরা কেমন আসে দেখা যাবে!'

সে রাতে মোড়লের বাড়ি থেকে একদিন বয়সের দুটো পাঁঠার ছানা চুরি গেল। কেউ বলল মানুষ নিয়েছে, কেউ বলল শ্যাল। বাঁধানো উঠোন তাই ছাপ পড়েনি। মোড়লের লোকরাও তীর-ধনুক বের করল। মারাও পড়ল কয়েকটা শেয়াল। তাদের লাশগুলো বাঁশে ঝুলিয়ে গাঁয়ে আনা হল। গায়ে তখনো তীর বেঁধা। মরা শ্যালের গায়ে ছেলে-বুড়ো বাখারির খোঁচা দিতে লাগল। কুমু বাড়ি গিয়ে বমি করে শুয়ে রইল। দুপুরে ভাত খেল না।

কাকী মহা বিরক্ত। 'এ কি বাড়াবাড়ি, বাপু তোর কুঁকড়ো তো ঘরেই আছে। শ্যালের যা উপদ্রব। মেরেছে বেশ করেছে। তা একটু আনন্দ-ও করবে না?' কুমু বলল, 'ওয়াক্!' কাকী পালাল।

সারা রাত পড়ে পড়ে ঘুমুল কুমু। পরদিন সকালে কুঁকড়ো চুপ। কাঠ-গুদোমের দরজা খুলে কুমু দেখল চালের কাছে একটা ফাঁক, তার নিচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কুঁকড়ো নেই!

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কুমু ছুটে বেরিয়ে এল। সব শুনে সবাই চুপ। খালি কাকা বলল, 'তখনি বললাম জিবে জল আসে, আমাকে দে! তা তো শুনলি না!' কুমু সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এর পর আরো দু-দিন কাটল। আরো দু-দশটা পাখি মল। চারটে শেয়ালও তীর খেয়ে মল। তাদের শরীরগুলো পরদিন সকালে গাঁয়ের মধ্যিখানে, যেখানে পুজোর সময় যাত্রা হয়, সেই মাঠে একটা তেঁতুল-গাছ, তার ডালে ঝুলিয়ে রাখা হল. গাঁয়ের সবাই দেখতে এল। ছোটরা দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। খুব সাহসীরা কাছে গিয়ে খোঁচাও দিল। কুমুও গেছিল মজা দেখতে। একটা ঢিল-ও ছুঁড়েছিল। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল মরা শ্যালটার জিব ঝুলে আছে, চোখ উল্টে গেছে।

আর কি সেখানে দাঁড়ায় কুমু! এক ছুটে বাড়ি গিয়ে সারা দিন কেঁদে ভাসাল। শ্যাল মল, কিন্তু কুঁকড়ো তো আর ফিরে এল না। বগ্‌ড়ি, ঝমরু, শালিনী এরা তো

অবাক! মোরগ গেছে শ্যালের পেটে, সে আবার ফিরবে কি করে। কুমু রেগে বকাবকি করতে লাগল। ওরাও সরে পড়ল।

মোড়লের হুকুম খিদের চোটে শেয়ালের পাল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। তার যেন একটাও বাকি না থাকে! হয় তাড়াও, নয় মার! গাঁ-সুদ্ধু সবাই খুশি। তীর ধনুক দা কুড়ুল নিয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন শ্যাল শিকার চলল।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। মা আর কাকী গেছে ঠাকুরবাড়িতে আনন্দ-নাড়ুর জন্য নারকেল কোরা, চাল কোটা হবে। বাবা, কাকা, বড়দাও দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিকট হৈ-হৈ শোনা যাচ্ছে। শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে!

এমন সময় কলা-বাগানের মধ্যে দিয়ে কি একটা সাদা রঙের জানোয়ার মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে, লাল চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, হাট করে খোলা কাঠ-গুদোমের দরজার কাছে পৌঁছে, মানুষের মতো গোঙাতে গোঙাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার পেটের কাছে দুটো তীর বিঁধে আছে, রক্ত পড়ছে। দূরে গাঁয়ের লোকদের হোহো শুনে, জানোয়ারটা নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে কোনোমতে গুদোম-ঘরে ঢুকে, আবার পড়ে গেল। কুমুর বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দু-চারজন বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কুমু কাঠ-গুদোমের দরজা বন্ধ করে, বাইরে থেকে শিকলি তুলে, দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিল। ঠিক কুঁকড়োর রক্তের মতো। বাবা কাকা এসে দেখল বাড়ি চুপচাপ, কুমু চোখ বুজে শুয়ে আছে। 'এখানে নেই, এখানে নেই, এগিয়ে চল! ঐ বুঝি পালায়!' আবার সব চুপচাপ।

পরদিন সকালে কাঠ-গুদোমের দরজা খুলেই মা একেবারে থ'! দোরের সামনে এতখানি জায়গা জুড়ে মা-শেয়ালটা মরে পড়ে আছে আর তার কোল ঘেঁষে এতটুকু একটা বাচ্চা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দু-জনার রং প্রায় সাদা। মায়ের বগলের তলা দিয়ে গলে, বাচ্চাটাকে তুলে বুকে জড়িয়ে কুমু আবার গিয়ে শুল। মা দেখল কি দেখল না বোঝা গেল না।

শেয়াল শিকারের কথা শুনে খবরের কাগজের লোকেরা জীপে চড়ে এসে ছিল। সাদা শেয়াল শুনে তারা দেখতে এল। কি দুঃখ তাদের! 'আহা! মেরে ফেললেন! সাদা শেয়ালের অনেক দাম! খুব একটা দেখা যায় না। ঐ জানোয়ার কি মারতে হয় কখনো!' তখন কাকা বলল, যিনি এ-কথা বললেন তিনি নাকি পশু সংরক্ষণের লোক। ওরা নাকি জানোয়ার বাঁচায়, মারে না। তাই শুনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কুমু বেরিয়ে এল। সবাই তো হাঁ!

সেই লোকটির কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে কুমু বলল, 'ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও, মেরো না।' বলে দৌড়ে পালাল।

খুশী

দিব্যেন্দু পালিত

চাকরিতে বদলির নোটিশ পেয়ে সেবার খুবই চিন্তায় পড়লেন পুষির বাবা বলাইবাবু। এক মাসের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে ভাগলপুর থেকে চলে যেতে হবে পাটনায়। বাড়ি-টাড়ি ঠিক হয়ে আছে সেখানে। যাতায়াত আর নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসার মাঝখানে ছুটি মোটে তিন দিন।

চিন্তাটা অবশ্য বদলির জন্যে নয়। বদলিরই চাকরি। এ-পর্যন্ত কোনো জায়গাতেই এক সঙ্গে তিন বছরের বেশি থাকতে পারেন নি। সাত পাঁচ ভেবে অনেকদিন আগেই হস্টেলে দিয়েছেন বড় ছেলেকে—এখন সে স্কুল পেরিয়ে কলেজে। তবে ব্যাপারটা বোঝা যাবে তাঁর ছোট ছেলে পুষির দিকে তাকালে। পুষির জন্ম হয়েছিল দ্বারভাঙ্গায়; মুখে-ভাত গয়ায়। পুষি দাঁড়াতে ও ছুটোছুটি করতে শিখেছিল ডাল্টনগঞ্জে; আর শুরু হাতে-খড়ি হয়েছিল জামশেদপুরে। সেখানে স্কুলে ভর্তি হতে না হতেই চলে আসতে হলো ভাগলপুরে। আবার ভর্তি হওয়া নতুন স্কুলে। দশ বছরের পুষি এবার যাবে পাটনায়।

সমস্যাটা অবশ্য পুষির স্কুল নিয়ে নয়। কাজকর্মে সুনাম আছে বলাইবাবুর, নানা জায়গায় বন্ধু-বান্ধবও অনেক। বদলির নোটিশ আসবার তিনদিনের মধ্যে পাটনা থেকে এক বন্ধু পাঠিয়ে দিলেন স্কুলে ভর্তির ফর্ম। তাহলে আর ভাবনা কী! পুষির মা মাটির মানুষ, জায়গা নিয়ে বাছবিচার নেই কোনো। তাহলে?

ব্যাপারটা বলেই ফেলা যাক। ভাবনার কারণ পুষি নয়, পুষির মা'ও নয়। ভাবনার কারণ খুশী।

নোটিশ পেয়ে দিন তিনেক ব্যাপারটা নিজের মাথাতেই চেপে রাখলেন বলাইবাবু। এমনকি জানাজানি হবার ভয়ে স্ত্রীকেও বললেন না কিছু। কিন্তু, এ কি চেপে রাখার খবর! চাপতে চাপতে ঘুম হয় না রাতে, হজম হয় না দিনে। সারাক্ষণ পেট গুড়গুড় করে, ঢেকুর ওঠে, ব্যথা করে মাথায়। শেষে চেপে রাখতে না পেরে একদিন রাতে বলেই ফেললেন পুষির মাকে।

সরল মানুষ পুষির মা। শুনে বললেন, 'বদলি হয়েছে, এ আর নতুন কথা কী! তার ওপর উন্নতি যখন! হ্যাঁ গো, এতে আবার চিন্তার কী কারণ হলো!'

বলাইবাবু মাথা নাড়লেন, বললেন, 'কারণ আছে।' তারপর বললেন, 'খুশীর কী হবে?'

শুনে পুষির মা বললেন, 'ও মা, তাই তো ! খুশীর কী হবে !'

আরও দিন দুয়েকের মধ্যে একটা বুদ্ধি বার করলেন বলাইবাবু। অফিস থেকে ফিরে চুপিচুপি পুষির মাকে বললেন, 'শোনো, এখন পুষিকেও বলবার দরকার নেই—। যাবার আগে বললেই হবে।'

'ও মা, তা কী করে হয় ! পুষি জানবে না ! স্কুলে জানাতে হবে না। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না পেলে তো ভর্তিই করা যাবে না ওকে !'

'সে-কথাও ভেবেছি।' পুষির মাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলাইবাবু বললেন, 'স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে খাম বন্ধ করে পাঠিয়ে দেবো কাল। পুষি টের পাবে না।'

'হ্যাঁ, তাই কোরো। এটাই ভালো বুদ্ধি।'

বলাইবাবু সুখী লোক। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমোলেই নাক ডাকান। তখন তাঁর দিন কি রাত মনে থাকে না। তো সেদিন রাতে তিনি সবে নাক ডাকা শুরু করেছেন, এমন সময় পুষির মা ঠেলা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, শুনছ ?'

সেই ঠেলায় ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে বলাইবাবু বললেন, 'চোর নাকি !'

'চোর নয়। আমি। বলছিলাম কি, খুশীকে সঙ্গে নেওয়া যায় না ?'

'পাগল ! এখানে ছিল ছিল, পাটনায় নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি !'

'সাতকুলে কেউ নেই। ওইটুকু তো ছেলে, দশ বছর হয়েছে কি হয়নি। ওকে কে দেখবে !'

পুষির মা'র গলা ভিজে এলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বলাইবাবু। তারপর বললেন, 'কে আর দেখবে। ভগবান।' বলতে বলতে হাই তুললেন। তারপর আবার ঘুমোতে ঘুমোতে বললেন, 'দেখি, আর কাউকে গছাতে পারি কিনা। যার কপালে যা আছে তাই তো হবে—'

বলাইবাবু ঘুমিয়ে পড়লেও ঘুম এলো না পুষির মার। পাশের ঘরে পুষি শোয় তক্তপোশের ওপর বিছানায়। নিচে মেঝেয় মাদুরের ওপর শতরঞ্জি পেতে খুশী। সেখানে গিয়ে দুজনকেই দেখলেন তিনি। শীত পড়তে শুরু করেছে অল্প। পুষির গায়ের চাদরটা ঠিকঠাক করে দিয়ে এলেন খুশীর কাছে। বলাইবাবুর পুরনো লুঙ্গি সেলাই করে চাদর বানানো হয়েছে খুশীর। সেটা পায়ের কাছে গড়ানো। তুলে খুশীর গায়ে বিছিয়ে দিতেই টের পেয়ে ঘুমের মধ্যেই জেগে উঠল খুশী। বলল, 'আমার শীত করছে না, মা ?'

'তা হোক। ঠাণ্ডার দিন। চাদরটা গায়ে দিয়ে রাখ।'

খুশী ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক ওর কালো, তেল চকচকে মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পুষির মা। হাড়গোড়ে দাঁত বসাতে সামনে আসছে আরও বড়ো শীত। তখন তাঁরা থাকবেন পাটনায়। আহা ! কে যে দেখবে ছেলেটাকে।

চিন্তায় ঘুম এলো না পুষির মার চোখে। ভাবলেন, মায়া দেখিয়ে তখন ছেলেটাকে ঘরে না আনলেই হতো!

খুশী অবশ্য গোড়াতে খুশী ছিল না। সত্যি বলতে, ওর কোনো নামই ছিল না। আর চেহারাটা ছিল না-খেতে পাওয়া, রোগা, ডিঙডিঙে। ভাগলপুরে আসার পর পরই একদিন সব্জিঅলা বাবুলালের দোকানে কর্তা গিন্নী পুষিকে নিয়ে বাজার করছেন, দেখলেন দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে নাকে ঠোঁটে সিকৃনি মাখানো বাচ্চা একটা ছেলে পা দোলাতে দোলাতে কাগজের ঠোঙা থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি তুলে খাচ্ছে। চোখের তলায় গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে শুকনো জলের দাগ। দেখেই বোঝা যায় মুড়ির ঠোঙাটা হাতে পাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়েছে।

কৌতূহল হলো। মায়াও। বাবুলালই বলল, ওদের গাঁয়ের লোকের ছেলে। মা'টা কমাস হলো মারা গেছে কলেরায় ভুগে। বাপটা ধারেকাছেই থাকত, কুলিগিরি করত। দিন পাঁচ সাত হলো তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটা এখন এখানেই পড়ে থাকে। কোথায় আর যাবে!

শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন বলাইবাবু আর পুষির মা। মন্দ কী, ছোট্ট একটা পেট বই'তো নয়। ফাইফরমাশ খাটার জন্যে একটা লোকও তো তাঁরা খুঁজছিলেন।

'নেবেন বাবু ছেলেটাকে?' ভাবগতিক দেখে বাবুলাল নিজেই বলে ফেলল, 'দু মুঠো খেতে আর থাকতে দেবেন। ছোকরা কাজকর্ম করতে পারে। আমি তো আছিই, খোঁজ করব। ঝামেলা করলে ফেরত নিয়ে আসব।'

শুনে মাথা নাড়লেন বলাইবাবু।

'বয়সটা তো পুষির মতোই মনে হচ্ছে। ওরও একটা খেলার সঙ্গী জুটবে। এখানে তো কোনো বন্ধুবান্ধব নেই!'

'কী রে, পুষি?' পুষির মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর পছন্দ তো?' এদিকে পুষিও ঘাড় নেড়ে দিল।

খালি ঠোঙা হাতে ছেলেটি তখনো পা দোলাচ্ছে আর অবাক হয়ে কথাবার্তা শুনছে ওঁদের। বলাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে, কী নাম তোর?' এক গাল হেসে ছেলেটি

বলল, 'ছোকরা।'

বোঝা গেল বিলক্ষণ লজ্জা পেয়েছে। বাবুলালের কথাবার্তা বুঝে কিছুটা উত্তেজনাও বোধ করছে। পা নাচানো বন্ধ হলো না।

পুষির মা বললেন, 'ও মা ছোকরা আবার কারুর নাম হয় না কি!'

'গরীবের ছেলে, বাপ-মা'র ঠিক-ঠিকানা নেই।' বাবুলাল বলল, 'ওর আর আলাদা কোনো নাম হয় নি, মা! পছন্দ হলে আপনারাই একটা নাম দিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে। বলাইবাবু বললেন, 'আজ শুক্রবার। রবিবার সকালে নিয়ে এসো ওকে—'

সত্যি সত্যিই রবিবারের সকালে বাবুলালের হাত ধরে বলাইবাবুর বাড়িতে চলে এলো ছোকরা। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ওকে সভ্য ভব্য করে তোলার পরিচর্যা। ছোকরার গায়ের মাথার ময়লা তুলতে প্রায় গোটা একটা লাইফবয় সাবান খরচ করে ফেললেন বলাইবাবু। পুষির পুরনো জামা প্যান্টই দিব্যি ফিট করে গেল ওর গায়ে। মোটা দাঁড়ের চিরুনিতে ওর চুল আঁচড়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলাইবাবু বললেন, 'এখন থেকে তোর ভালো নাম হলো গোপাল।'

ছোকরা মাথা নাড়ল। হাসতে লাগল দাঁত বের করে। কৃতার্থের হাসি। এদিক ওদিক ঘোরে আর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। মাথার চুলে হাত বোলায় আর জামার বোতাম খোঁটে নখে। হাসে। যেন তার নিজের চেয়ে অবাক আর দর্শনীয় জীব পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

সাতদিনের মধ্যেই অনেকটা চেহারা ফিরে গেল গোপালের। মিশেও গেল এ-বাড়ির সকলের সঙ্গে। বলাইবাবুকে 'বাবু' ডাকে, পুষির মাকে 'মা'। পুষিকে কখনো পুষি কখনো 'দাদাবাবু।' ভাষাটাও শিখতে লাগল তাড়াতাড়ি। কিছুদিনের মধ্যে আর বোঝাই গেল না ওকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে রাস্তা থেকে।

পুষির মা বললেন, 'ছেলেটা ভালো। চটপটে। কোনো ঝামেলা করে না। খায়ও না তেমন।'

'হুঁ।' বলাইবাবু বললেন, 'ভালোবাসায় মানুষের অর্ধেক পেট ভরে যায়।'

পুষি বলল, 'মা, ওকেও আমার সঙ্গে খেতে দাও না কেন!'

বলাইবাবু ও পুষির মার মধ্যে চোখাচোখি হলো। অবস্থা সামাল দেবার জন্যে বলাইবাবু বললেন, 'হবে হবে। আর কিছুদিন যাক—'

গোপালের অবশ্য সেজন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই। যা বলা হয় তাই শোনে। যা পায় তাই খায়। রোজই পুষির মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর খাওয়া দেখেন। এক-একদিন বলাইবাবু আর পুষিও থাকে।

একদিন খেতে খেতে গোপাল হঠাৎ বলল, 'মা, ভাত খেতে আমার খুব ভালো

লাগে। আমি এখান থেকে যাবো না।'

'আহা!' শুনে চোখে জল এসে গেল পুষির মার। আড়ালে বলাইবাবু বললেন, 'বাচ্চা ছেলে, এক আধদিন এক আধ টুকরো মাছও দিও ওকে। কী আর এমন বাড়তি খরচ!'

গোপাল এক আধটুকরো মাছও পেতে লাগল।

মজার ব্যাপারটা ঘটল এরই পরে। সেদিন রবিবার। বলাইবাবুর সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে পুষির মা'র কাছাকাছি একটু বেশিই ঘুরঘুর করতে লাগল গোপাল। বঁটিতে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন পুষির মা। সন্দেহ হতে বললেন, 'কী রে, কিছু বলবি?'

'গোপাল নামটা ভালো নয়, মা।'

'নামের আবার ভালো মন্দ কী!' সরল মনে বললেন পুষির মা, 'গোপাল গোপালই—'

যেন খুব সমস্যায় পড়েছে, এইভাবে বলল, 'গোপাল নয়। আমাকে তোমরা খুশী বলে ডেকো!'

'খুশী! খুশী আবার কারও নাম হয় নাকি!'

'হবে না কেন! পুষির ভাই খুশী!'

শুনেতো পুষির মার চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। বলাইবাবু শুনে বললেন, 'খুশী যে তা তো বোঝাই যায়। মুখে এলে ডাকো।'

তা সেদিন থেকে কখনো গোপাল কখনো খুশী ডাক শুনে শুনে ক্রমশ খুশী-তেই দাঁড়িয়ে গেল নামটা। বাড়িতে তো বটেই, বাইরেও। প্রত্যেক রবিবার সকালে দেখা করতে আসত সব্জীঅলা বাবুলাল। ঘাবড়ে গিয়ে সে বলল, 'ছোকরা ছিল, গোপাল হলো। এখন আবার গোপাল খুশী হলো! তা বাবু, এই নামটাই পাকা তো!'

'আপাতত পাকা।' বলাইবাবু বললেন, 'মাথায় একটু ছিট আছে মনে হয়। এখন মর্জি না পাল্টালেই হলো।'

যাই হোক, চেপে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পাটনায় বদলির ব্যাপারটা খুশীও জেনে ফেলল। যাত্রার তখন আর চার পাঁচদিন বাকি।

একদিন সকালে বলাইবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন। খুশী এসে দাঁড়াল সামনে। 'বাবু, তোমার নাকি পাটনায় বদলি হয়েছে?'

চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে প্রমাদ গুণলেন বলাইবাবু। এই ভয়টাই পাচ্ছিলেন।

'কে বলল?'

'পুষি দাদাবাবু বলছে!'

খুশীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবনার খেই হারিয়ে ফেললেন বলাইবাবু। আমতা আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই। বদলির অর্ডার এসেছে। কী আর করা! যেতে হবে!'

খুশী যেন কিছু আঁচ করেই এসেছে। নড়ল না সামনে থেকে। বেশ কিছু পরে বলল, 'তো আমিও যাবো তো ?'

'তুই !' চোখ থেকে চশমাটা খুলে গেঞ্জির খুঁটে মুছতে মুছতে মুখ না তুলেই বললেন বলাইবাবু, 'দেখা যাক। এখনও তো দেরি আছে ক'দিন।'

খুশী বলল, 'তাহলে বিছানা-পত্তর বেঁধে নেবো তো ?'

'বিছানা ? বাঁধবি ?' চশমাটা আবার চোখে পরতে পরতে হ্যাঁ-না মেশানো গলায় বলাইবাবু বললেন, 'বেশ তো।'

যেদিন প্রথম পেট ভরে ভাত খেয়েছিল সেদিনও এতো খুশী হয়নি খুশী। আট-দশ বছরের গোটা শরীরটা আহ্লাদে কাঁপিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে চলে গেল সে।

আড়ালে থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই শুনছিলেন পুষির মা। এখন সামনে এসে বললেন, 'এ কী করলে !'

'হয়তো ভুল করলাম ! নাকি ঠিক করলাম ! একই ধরনের খেই হারানো গলা বলাইবাবুর। বললেন, 'মায়া বড় বিষম ব্যাপার। তাকে শাসনে, রাখতে হয়। যাবার সময় তো বুঝতে পারবেই। দু চারদিন অন্তত খুশীতে থাক।'

'এদিকে পুষিরও তো মন খারাপ !'

'হুঁ—'

আরও দুটো দিন চলে গেল দেখতে দেখতে। রবিবার যাওয়া। আজ শুক্রবার। ইতিমধ্যে এর ওর কাছে ঘুরেও খুশীকে নেবার মতো একটা ঘর খুঁজে পেলেন না বলাইবাবু। সবারই মুখে এক কথা, দিনকাল খারাপ, একটা পেটের খোল ভরানো যে সে ব্যাপার নয়। এখন বাড়ের মুখে, জ্ঞানবুদ্ধি হচ্ছে। এরপর খাঁই আরও বাড়বে। শুনে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন বলাইবাবু, 'তা ঠিক তা ঠিক।' ভাবলেন, এখন উপায় বাবুলাল। বাঁচালে সেই বাঁচাবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় একা-একাই বাবুলালের কাছে গেলেন বলাইবাবু। বললেন বিস্তারিত। হাজার হোক, পরের ছেলে ; অতো দূর কি আর টেনে নিয়ে যাওয়া যায় !

'সে তো ঠিকই, বাবু।' বাবুলাল বলল, 'আপনার দয়ায় তবু তিন বছর থাকল। এখন গায়ে লেগেছে, আর ছোটও নেই। আমি দেখি। স্টেশান বাজারে আমাদের চেনাশোনা লোক রেস্টোরেণ্ট দিচ্ছে। দেখি ওখানে লাগানো যায় কিনা। মার কাছে কাজও তো শিখেছে। কিছু না হলে সব্জি বেচবে। আপনি চলে যান। রবিবার সকালে আমি ওকে নিয়ে আসব। আপনাদের ট্রেন তো সাড়ে সাতটায় !'

উঠতে উঠতে বলাইবাবুর হঠাৎ খেয়াল হলো এতোক্ষণ তিনি বসেছিলেন দোকানের সামনের সেই নড়বড়ে বেঞ্চিটায়, যেখানে বসে একদিন পা দোলাতে দোলাতে কাগজের ঠোঙা থেকে খুঁটে খুঁটে মুড়ি খাচ্ছিল খুশী। একটা নিশ্বাস চাপলেন তিনি। এই প্রথম

বদলি হওয়ার ব্যাপারটা ছোট্ট ঘা দিয়ে গেল তাঁর বুকে।

রবিবার। অফিসের গাড়ি এসেছে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে। আসবাবপত্র আগেই বুক করা হয়ে গেছে ট্রেনে। সুটকেস, বাক্স যা ছিল বাবুলাল আর ড্রাইভার তুলে দিল গাড়ির ক্যারিয়ারে।

অবুঝ, উত্তেজনায় ভরা মুখ নিয়ে দড়ি বাঁধা নিজের ছোট বিছানাটা বগলদাবা করে দাঁড়িয়েছিল খুশী। ড্রাইভার ক্যারিয়ারের ঢাকা নামাচ্ছে দেখে ছটফট করে উঠল।

'আমারটা কোথায় যাবে?'
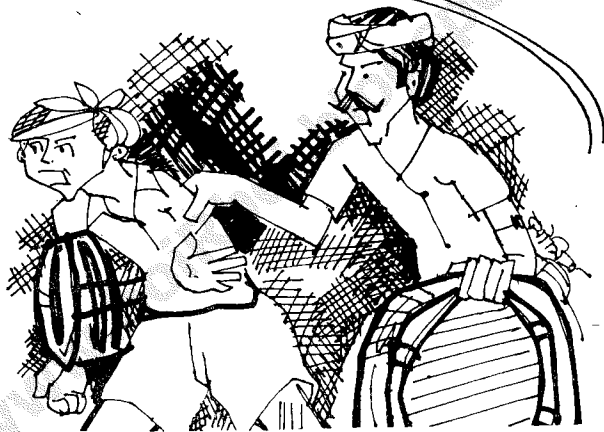
'দাঁড়া, খুশী।' হঠাৎ ওর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল বাবুলাল, 'বাবুরা আগে উঠুন গাড়িতে। উঠুন বাবু, উঠন মা। ওঠো খোকা—'

ওরা উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিল গাড়িটা। নিখুঁতভাবে ছকা একটা পরিকল্পনা যেন; খুশী কিছু টের পাবার আগেই এগিয়ে গেল অনেকটা। তারপর সীটের পিছনের কাচ দিয়ে তাকিয়ে ওরা দেখল, বাবুলালের শক্ত হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে খুশী। কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। দূরত্বটা বেড়ে উঠছে ক্রমশ। গাড়িটা স্টেশনের রাস্তায় বাঁক নেবার সঙ্গে সঙ্গে আর দেখা গেল না।